আল-হিদায়া

প্রথম খণ্ড

শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী
ইবন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগীনানী(র)

মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ্
অনূদিত
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র

শিরোনাম **পৃষ্ঠা**

অধ্যায়ঃ তাহারাত-08

পরিচ্ছেদঃ উযূ ভংগের কারণসমূহ--------------------------------------11

পরিচ্ছেদঃ গোসল---১৩

প্রথম অনুচ্ছেদঃ পানি---১৬

পরিচ্ছদঃ কুয়ার মাসআলা---২০

পরিচ্ছদঃ উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি---২3

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম--26

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসহ-----------------------------------31

http://islaminonesite.wordpress.com/

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ হায়য় ও ইসতিহাযা------------------------------------34

পরিচ্ছদঃ মুসতাহাযা---37

পরিচ্ছদঃ নিফাস সম্বন্ধে--38

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ বিভিন্ন---40

পরিচ্ছদঃ ইসতিনজা--44

অধ্যায়ঃ সালাত-45

প্রথম অনুচ্ছেদঃ সালাতের সময়সমূহ---------------------------------------45

পরিচ্ছেদঃ সালাতের মুসতাহাব ওয়াক্ত-----------------------------------46

পরিচ্ছেদঃ সালাতের মাকরূহ ওয়াক্ত------------------------------------47

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ আযান---48

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ---------------------------------
-50

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ-------------------------------
-53

পরিচ্ছেদঃ কিরাত---56

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ ইমামত---70

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া-----------------------------------
75

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ যা সালাতকে ভংগ করে এবং যা সালাতকে মাকরূহ করে-------
--------79

http://islaminonesite.wordpress.com/

পরিচ্ছেদঃ সালাতের মাকরূহ---82

পরিচ্ছেদঃ পায়খানায় কিবলামুখী বসা---------------------------------------85

অষ্টম অনুচ্ছেদঃ সালাতুল বিতর--85

নবম অনুচ্ছেদঃ নফল সালাত---87

পরিচ্ছেদঃ কিরাত সংক্রান্ত--88

পরিচ্ছেদঃ কিয়ামে রমাযান---92

দশম অনুচ্ছেদঃ জামা'আত পাওয়া--93

একাদশ অনুচ্ছেদঃ কাযা সালাত---------------------------------------96

দ্বাদশ অনুচ্ছেদঃ সাজদায়ে সাহও---98

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদঃ অসুস্থ ব্যক্তির সালাত------------------------------------103

চতুর্দশ অনুচ্ছেদঃ তিলাওয়াতে সাজদা---------------------------------------106

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদঃ মুসাফিরের সালাত---------------------------------------109

ষোড়শ অনুচ্ছেদঃ সালাতুল জুমুআ--115

সপ্তদশ অনুচ্ছেদঃ দুই ঈদের বিধান--118

পরিচ্ছেদঃ তাকবীরে তাশরীক--119

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদঃ সালাতুল কুসূফ---120

http://islaminonesite.wordpress.com/

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদঃ ইসতিসকার সালাত------------------------------------121

বিংশ অনুচ্ছেদঃ ভয়কালীন সালাত--122

একবিংশ অনুচ্ছেদঃ সালাতুল জানাযা---------------------------------------123

পরিচ্ছেদঃ কাফন পরান---124

পরিচ্ছেদঃ মাইয়েতের উপর সালাত আদায়-----------------------------------126

পরিচ্ছেদঃ জানাযা বহন---127

পরিচ্ছেদঃ দাফন---130

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদঃ শহীদ--131

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদঃ কা'বার অভ্যন্তরে সালাত--------------------------------132

অধ্যায়ঃ যাকাত-131

প্রথম অনুচ্ছেদঃ গবাদি পশুর যাকাত-------------------------------------135

পরিচ্ছেদঃ উটের যাকাত--136

পরিচ্ছেদঃ গরুর যাকাত---137

পরিচ্ছেদঃ বকরীর যাকাত---138

পরিচ্ছেদঃ ঘোড়ার যাকাত---139

http://islaminonesite.wordpress.com/

পরিচ্ছেদঃ যে সব পশুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই-----------------------------------143

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ সম্পদের যাকাত--144

পরিচ্ছেদঃ রুপার যাকাত--145

পরিচ্ছেদঃ স্বর্ণের যাকাত---146

পরিচ্ছেদঃ পণ্যদ্রব্যের যাকাত--150

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ উশর উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী----------------------152

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ খনিজ-সম্পদ ও প্রোথিত-সম্পদ--------------------------------157

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ ফসল ও ফলের যাকাত-----------------------------------162

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ যাকাত-সাদকা কাকে দেয়া জাইয বা জাইয নয়----------------------165

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ সাদাকাতুল ফিতর--------------------------------------169

পরিচ্ছেদঃ সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও সময়--------------------------------২৩০

অধ্যায়ঃ সিয়াম-169

প্রথম অনুচ্ছেদঃ যে কারণে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়-------------------------২৪৪

পরিচ্ছেদঃ রোযা ভংগ---২৫১

http://islaminonesite.wordpress.com/

পরিচ্ছেদঃ সে সিয়াম প্রসঙ্গে যা চান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করে--------------------২৬১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ইতিকাফ---২৬৪

অধ্যায়ঃ হজ্জ-194

পরিচ্ছেদঃ ইহরামের স্থানসমূহ--২৭৪

প্রথম অনুচ্ছেদঃ ইহরাম---২৭৬

পরিচ্ছেদঃ উকুফের সাথে সংশ্লিষ্ট--৩০১

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ কিরান--৩০৬

তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ হজ্জে তামাত্তু--৩১১

চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ অপরাধ ও ত্রুটি--৩২০

পরিচ্ছেদঃ ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সম্ভোগ--------------------------------------৩২৭

পরিচ্ছেদঃ তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট বিষয়-----------------------------৩৩০

পরিচ্ছেদঃ শিকার---৩৩৬

পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা---------------------------৩৫২

http://islaminonesite.wordpress.com/

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ ইহরামের সম্পর্ক সম্বন্ধে-- ৩৫৬

সপ্তম অনুচ্ছেদঃ অবরুদ্ধ হওয়া-- ৩৬০

অষ্টম অনুচ্ছেদঃ হজ্জ ফউত হওয়া-- ৩৬৪

নবম অনুচ্ছেদঃ অপরের পক্ষে হজ্জ করা------------------------------------ ৩৬৬

দশম অনুচ্ছেদঃ হাদী সম্পর্কে-- ৩৭২

বিবিধ মাসআলা-275

।।দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)।।

যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তাদের জন্য তিনিই যথেষ্ট হন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি ইলমের নিদর্শন ও দৃষ্টান্তসমূহ ‘সমুন্নত’ করেছেন এবং যিনি শরীয়তের বিধান ও নির্দেশনাবলী সুপ্রকাশিত করেছেন, আর সত্যের পথ প্রদর্শনকারী রুপে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন, (তাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হোক) আর যিনি আলিমগণকে তাদের স্থলবর্তী করেছেন যারা তাদের সুন্নতের পথের আহবান করেন। যে সকল বিষয়ে তাদের পক্ষ থেকে কোন বাণী বর্ণিত হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদের নীতি অনুসরণ

করেন এবং সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট পথ-নির্দেশনা প্রার্থনা করেন। আর আল্লাহই সঠিক পথ প্রদর্শনের অধিকারী।

আর তিনিই প্রাথমিক যুগের মুজতাহিদগণকে বিশেষভাবে তাওফীক দান করেছেন, ফলে তারা সুস্পষ্ট ও সূক্ষ সকল প্রকার মাসআলা সন্নিবেশ করেছেন। তবে যেহেতু ঘটনাবলী পরস্পরায় ঘটমান এবং 'আলোচ্য বিষয় অব্যাহত সমস্যাবলী বেষ্টন করতে অক্ষম উপরন্তু উৎসস্থল থেকে বিচ্ছিন্ন মাসআলাসমূহ আহরণ করা এবং সদৃশ মাসআলাসমূহের উপর কিয়াস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অতি কামিল লোকদের কীর্তি-রূপে স্বীকৃত। আর মাসায়েলের উৎসসমূহ সম্পর্কে অবগতির মূলে তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা সম্ভব হয়, উল্লেখ্য যে, 'বিদায়াতুল মুবতাদী' নামক কিতাবের ভূমিকা অংশে আমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাওফীক দান করেন তাহলে 'ফিকায়াতুল মুনতাহী' নাম-কারণপূর্বক উক্ত কিতাবের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করবো। অতএব আমি শরাহ্ লেখতে আরম্ভ করলাম, যদিও কৃতপ্রতিশ্রুতি বাধ্য-বাধকতা ছিল না। অবশেষে যখন রচনা কার্য থেকে অবসর হওয়ার কাছাকাছি উপনীত হলাম তখন তাতে কিছু 'বিশদতা' অনুভব করলাম এবং আশংকা করলাম যে, একারণে গ্রন্থখানি পরিত্যাক্ত হতে পারে। তাই আল-হিদায়া নামকরণপূর্বক আর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক দিলে এর প্রতি অধ্যায়ে অতিরিক্ত বিষয় পরিহার করে আমি সুনির্বাচিত বর্ণনা এবং অকাট্য দলীলসমূহ সমাবিষ্ট করবো। এ জাতীয় বিষয়ে অতিবিশদ আলোচনা উপেক্ষা করে চলবো। তবে এমন সকল মূলনীতি তাতে সন্নিবেশিত হবে যার উপর ভিত্তি করে বহু আনুষঙ্গিক বিষয় আহরিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে তা সম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন এবং তার সমাপ্তির পর যেন সৌভাগ্যের সাথে আমার জীবনের অবসান ঘটান।

অতএব অধিক জ্ঞান অর্জনের উচ্চস্পৃহা যাদের হবে তারা সাগ্রহে সুদীর্ঘ ও বৃহত্তর ব্যাখ্যা গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবে। আর যাদের সময়ের তাড়াহুড়া থাকবে তারা সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র পরিধির ব্যাখ্যা গ্রন্থের উপরই নির্ভর করবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এরপর আমার কতিপয় ভ্রাতা অনুরোধ করলেন, যেন আমি তাদের জন্য উক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করি। সুতরাং আমি আল্লাহ্ তা’আলার সাহায্য কামনা করে আবার তা আরম্ভ করলাম, তাঁর দরবারে সকাতর প্রার্থনা সহকারে, যেন আমার প্রয়াস সহজ করে দেন। তিনিই সকল কঠিনকে সহজ করেন। তিনি তো যা ইচ্ছা করেন, তাঁর উপর ক্ষমতাবান এবং দু’আ কবুলের যোগ্য কেউ নেই। আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কর্ম-বিধায়ক।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেনঃ

অধ্যায়ঃ তাহারাত

আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেনঃ

http://islaminonesite.wordpress.com/

হে ঈমানদারগণ, যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াতে মনস্থ কর তখন নিজেদের মুখমণ্ডল ধৌত কর......আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণ হলো যে, উযুতে তিনটি অংগ ধোয়া এবং মাথা মাসহ করা ফরয।

ধোয়া, (পানি) প্রবাহিত করা। আর (ভিজা হাত) লাগান। আর মুখমণ্ডলের সীমা। (কপালের উপরের) চুলের গোড়া থেকে চিবুকের নীচ পর্যন্ত এবং উভয় কানের লতি পর্যন্ত। কেননা, (মুখমণ্ডল) শব্দটি (মুখোমুখি হওয়া) থেকে উদ্ভূত। আর এ পুরা অংশের দ্বারাই সামনা সামনি হওয়া সংগঠিত হয়।

কনুইদ্বয় ও গোড়ালিদ্বয় ধৌত করার বিধানের অন্তর্ভূক্ত। আমাদের তিন ইমামের মতে। যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, সীমানা তার পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভূক্ত হয় না, যেমন সাওম সম্পর্কিত বিধানে রাত্রি অন্তর্ভূক্ত নয়। আমাদের যুক্তি এই যে, এ সীমানার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পরবর্তী অংশকে বহির্ভূত করা। কারণ, যদি সীমানার উল্লেখ না থাকত তবে ধোয়ার হুকুম পুরো হাতকে শামিল করতো। পক্ষান্তরে সাওমের ক্ষেত্রে সীমানা উল্লেখের উদ্দেশ্য হল সে পর্যন্ত হুকুমের বিস্তার ঘটানো। কেননা শব্দটি সামান্য সময়ের বিরতির উপর ব্যবহার হয়।

বিশুদ্ধ মতে পায়ের গোড়ায় বের হয়ে থাকা হাড়। এ থেকে উদ্ভিন্ন স্তন তরুণীকে বলা হয়।

গ্রন্থকার বলেন, মাথা মাসহ-এর ক্ষেত্রে মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ স্পর্শ করা ফরয। কেননা মুগীরা ইবন শুবা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার বস্তির আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে পেশাব করে উযূ করলেন। তখন তিনি মাথার সম্মুখভাগ এবং মোজা মাসহ করলেন।

যেহেতু আল-কুরআনের বক্তব্য এখানে পরিমাণের দিক থেকে অস্পষ্ট, সেহেতু আলোচ্য হাদীছটি তার ব্যাখ্যা রুপে যুক্ত করা হয়। এ হাদীছটি ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক তিন চুলের দ্বারা নির্ধারণের বিপক্ষে প্রমাণ। তদ্রুপ ইমাম মালিক (র.) কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ মাসহ শর্ত করার বিপক্ষে প্রমাণ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, আমাদের ইমামদের মধ্যে কেউ কেউ ফরয মাসহর হাতের তিন আংগুল পরিমাণ করেছেন।কেননা তা প্রকৃতপক্ষে যে অঙ্গ দ্বারা মাসহ করা হয়, তার সিংহভাগ।

গ্রন্থকার বলেন, উযুর সুন্নত হলোঃ

০১. পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর আগে উভয় হাত ধোয়া, যখন উযূকারী তার নিদ্রা থেকে উঠে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ

তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ডুবায়। কেননা, সে জানে না, নিদ্রিত অবস্থায় তার হাত কোথায় ছিলো (অর্থাত্ কোন অংগ স্পর্শ করেছিল)। তাছাড়া হাত হলো তাহারাত সম্পাদনের উপকরণ। সুতরাং তার পবিত্রকরণের মাধ্যমে শুরু করাই সুন্নত। এ হাত ধৌত করার পরিমাণ কবজি পর্যন্ত। কেননা, তাহারাত সম্পাদনের জন্য অতটুকুই যথেষ্ট।

০২. উযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ যে বিসমিল্লাহ্ বলেনি তার উযূ হয়নি। এখানে উদ্দেশ্য হলো, উযূর ফযীলত হাসিল হবে না। বিশুদ্ধ মত হল, উযূতে বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। যদিও (মূল পাঠে)তাকে সুন্নত বলেছেন। এবং ইস্তিনজার আগে ও পরে বিসমিল্লাহ্ বলরে; এ-ই সঠিক মত।

০৩. মিসওয়াক করা। কেননা নবী (সা.) সব সময় তা করতেন। মিসওয়াক না থাকলে আংগুল ব্যবহার করবে। কেননা নবী (সা.) এরুপ করেছেন।

০৪. কুলি করা ও (০৫) নাকে পানি দেয়াঃ কেননা নবী (সা.) সবসময় উভয়টি করেছেন। এ দু'টির পদ্ধতি এই যে, তিনবার কুলি করবে এবং প্রতিবার নতুন পানি নিবে। একইভাবে নাকে পানি নিবে। নবী (সা.)-এর উযূতে এরূপ বর্ণনায় এসেছে।

০৬. উভয় কান মাসহ করা। মাথা মাসহ এর (অবশিষ্ট) পানি দ্বারা তা সম্পাদন করা সুন্নত। ইমাম শাফিঈ ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলীল হলো নবী (সা.) বলেছেনঃ কর্ণদ্বয় মাথারই অংশ বিশেষ।এর উদ্দেশ্য হল শরীআতের হুকুম বর্ণনা করা, সৃষ্টিগত অবস্থা বর্ণনা করা নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

০৭. দাড়ি খেলাল করা। কেননা হযরত জিবরীল নবী (সা.)-কে তা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি আবূ ইউসূফের মতে সুন্নত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তা (সুন্নত নয়) বৈধ মাত্র। কেননা, সুন্নত হল এমন কাজ, যা দ্বারা ফরযকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হয়। অথচ দাড়ির ভিতরের অংশ (মুখমণ্ডল ধৌত করা) ফরযের স্থান নয়।

০৮. আংগুল খেলাল করা। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের আংগুলসমূহ খেলাল কর, যাতে জাহান্নামের আগুন তাতে প্রবেশ না করে। আর এ ভাষ্য যে, এ দ্বারা ফরযকে তার স্থানে পূর্ণতা দান করা হচ্ছে।

০৯. তিনবার পর্যন্ত পুনঃ ধৌত করা- কেননা নবী (সা.) একেকবার করে ধৌত করেছেন এবং বলেছেন, এটা এমন উযূ, যা না হলে আল্লাহ্ সালাত কবুলই করবেন না। আবার দু' দুবার করে ধৌত করেছেন এবং বললেন, এটি ঐ ব্যক্তির উযূ, যাকে আল্লাহ্ দ্বিগুন বিনিময় দান করবেন। এরপর তিন তিন বার ধৌত করে বললেন, এটা আমার উযূ এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উযূ। যে এর বেশী বা কম করবে, সে সীমালংঘন করল ও অন্যায় করল।

অবশ্য এই কঠোর হুশিঁয়ারি হচ্ছে তিনবার করে ধোয়াকে সুন্নত বলে বিশ্বাস না করার জন্য।

উযূকারীর জন্য মুস্তাহাব হলোঃ

০১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যত করা। আমাদের মতে উযূতে নিয়্যত হলো সুন্নত। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তা ফরয। কেননা, উযূ একটি ইবাদত, সুতরাং তায়াম্মুমের মতো উযূও নিয়্যত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। আমাদের দলীল এই যে, নিয়্যত ছাড়া উযূ ইবাদতরূপে গণ্য হবে না ঠিকই, তবে সালাতের প্রবেশ-মাধ্যমরূপে অবশ্যই বিবেচিত হবে। কেননা, পবিত্রতার উপকরণ(পানি)ব্যবহারে পবিত্রতা অর্জিত হবে। তায়াম্মুমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সালাত আদায়ের নিয়্যত ছাড়া অন্য অবস্থায় মাটি মূলত পবিত্রতা সৃষ্টিকারী নয়। তাছাড়া শব্দটি ইচ্ছা ও নিয়্যতের অর্থবহ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

০২. সম্পূর্ণ মাথা মাসহ্ করা। এটাই হচ্ছে সুন্নত। আর ইমাম শাফিঈ বলেন, সুন্নত হচ্ছে প্রত্যেকবার নতুন পানি নিয়ে তিনবার মাসহ করা। মাসহকে তিনি ধোয়ার অংগগুলোর উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলীল এই যে, আনাস (রা.) মুখ, হাত, পা তিন তিনবার করে ধুয়ে উযূ করলেন আর মাথা একবার মাসহ করলেন। তারপর তিনি বললেন, এ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর উযূ। আর তিনবার মাসহ্ করার যে হাদীছ বর্ণিত আছে, তা মূলত একবারের পানির ব্যবহারের উপর ধরা হয় এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত মত অনুযায়ী তাও শরীআত সম্মত।

তাছাড়া ফরয হলো মাসহ্ করা। অথচ বারংবার মাসহ্ করলে তা ধোয়াতেই পরিণত হয়ে যাবে। সুতরাং তা সুন্নত হতে পারে না। অতএব মাথা মাসহ্ মূলতঃ মোজার উপর মাসহ্ করার সদৃশ। অংগ ধৌত করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বারংবার তা দ্বারা ধোয়ার হুকুমের ক্ষতি হচ্ছে না।

০৩. তরতীবের সাথে উযূ করা, অর্থাত্ আল্লাহ্ যেভাবে বর্ণনা শুরু করেছেন, সে ধারায় শুরু করা এবং

০৪. ডান দিক থেকে শুরু করা। আমাদের মতে উযূতে তরতীব রক্ষা করা সুন্নত। আর ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতে তা করা ফরয। তাঁর দলীল এই যে, উযূর আয়াত – এ অব্যয়টি রয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বোঝায়। আর ভাষাবিদদের সর্বসম্মত মতে এ অব্যয়টি নিছক একত্রীকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আয়াতের চাহিদা হচ্ছে সবক'টি অংগের ধৌত কার্য পরবর্তী সম্পন্ন করা।

আর ডান দিক থেকে শুরু করা উত্তম। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ সব বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করেন। এমনকি জুতা পরিধান করা চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রেও।

পরিচ্ছেদঃ উযূ ভংগের কারণসমূহ

http://islaminonesite.wordpress.com/

উযূ ভংগের কারণগুলো যথাক্রমেঃ

০১. পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে কোন কিছু বের হওয়া। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন তোমাদের কেউ শৌচ স্থান থেকে আসে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-জিজ্ঞাসা করা হলো কি? তিনি বললেন, পেশাব ও পায়খানা দু'দ্বারে যা রের হয়।

আলোচ্য হাদীছের যা কিছু শব্দটি ব্যাপকতা জ্ঞাপক। সুতরাং প্রকৃতিগত ও অপ্রকৃতিগত সবকিছুই এর অন্তর্ভূক্ত।

০২. দেহের কোন অংশ থেকে বা পুঁজ বের হয়ে যদি পাক করার বিধান প্রযোজ্য হয় এমন স্থান অতিক্রম করে।

০৩. মুখ ভর্তি বমি। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পেশাব পায়খানার রাস্তা ছাড়া (দেহের অন্য কোন স্থান থেকে) কিছু বের হলে উযূ ভংগ হবে না। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সা.) বমি করে উযূ করে নি।

তাছাড়া যে স্থানে নাজাসাত স্পর্শ করেনি, তা ধৌত করা যুক্তি-উর্ধ্ব করণীয় বিধান।

সুতরাং শরীআতের নির্দেশিত স্থানে তা সীমিত থাকবে। আর তা হল প্রকৃতিগত পথ। আমাদের প্রমাণ হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ সকল প্রবাহিত রক্তের জন্যই উযূ আবশ্যক। তিনি আরো বলেছেনঃ

সালাত অবস্থায় কারো বমি হলে কিংবা নাকে রক্ত ঝরলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযূ করে এবং পূর্ববর্তী সালাতের উপর 'বিনা' করে যতক্ষণ না কথা বলবে।

আর যুক্তি হলো নাজাসাত নির্গত হওয়া তাহারাত ও পবিত্রতা ভংগের কারণ মূল আয়াতের এতটুকু তো যুক্তিসংগত।অবশ্য নির্দিষ্ট চার অংগ ধোয়ার নির্দেশ যুক্তির উর্ধ্বে। কিন্তু প্রথম বিষয়টি স্থানান্তরিত হলে দ্বিতীয় বিষয়টিও স্থানান্তরিত হওয়া অনিবার্য হবে। তবে নির্গত হওয়া তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন তা তাহারাতের হুকুমভূক্ত কোন অংশ গড়িয়ে পৌঁছবে। আর বমির ক্ষেত্রে যখন তা মুখ ভরে হবে। কেননা, 'আবরণত্বক' উঠে গেলে রক্ত বা পুঁজ স্বস্থানে প্রকাশ পায় মাত্র; নির্গত হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার পথ দু'টি ব্যতিক্রম (অর্থাত্ সেখানে নাজাসাত দেখা গেলে উযূ ভংগ হয়েছে বলে ধরা হবে) কেননা, তা নাজাসাতের প্রকৃত স্থান নয়। সুতরাং সেখানে নাজাসাতের প্রকাশ থেকেই তার 'স্থানচ্যুতি ও নির্গত হওয়া প্রমাণিত হবে।

মুখ ভরা বমির অর্থ হলো, অনায়াসে যা আটকানো সম্ভব নয়। কেননা, দৃশ্যতঃ তা নির্গত হতে বাধ্য। সুতরাং নির্গত হয়েছে বলেই গণ্য হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, অল্প ও বিস্তর বমি সমপর্যায়ের। তদ্রূপ (রক্তের ক্ষেত্রেও তিনি) প্রবাহিত হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না। পেশাব-পায়খানার স্বাভাবিক নির্গত হওয়ার স্থানের উপর কিয়াস করে।

তাছাড়া নবী করীম(সা.)-নিম্নোক্ত বাণীঃ বমি উযূ ভংগের কারণ হচ্ছে শর্তমুক্ত।

আমাদের প্রমাণ হল নবী করীম (সা.)-এর হাদীছঃ প্রবাহিত না হলে এক দু'ফোঁটা রক্ত বের হলে উযূ আবশ্যক নয়।

এবং হযরত আলী (রা.) উযূ ভংগের সবক'টি কারণ গণনা প্রসংগে বলেছেন,(মুখ ভরা বমি) এখানে যখন হাদীছগুলো পরস্পর বিরোধী তখন (সমন্বয়ের জন্য) ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছকে অল্প বমির উপর এবং ইমাম যুফার বর্ণিত হাদীছকে বেশী বমির উপর ধরা হবে। পক্ষান্তরে পেশাব-পায়খানার রাস্তা এবং অন্যান্য স্থান থেকে নাজাসাতে নির্গত হওয়ার পার্থক্য ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি।

যদি বিভিন্ন দফায় এত পরিমাণ বমি করে যে, একত্র করা হলে তা মুখ ভর্তি পরিমাণ হবে, তখন ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে স্থানের অভিন্নতা বিবেচ্য হবে। এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে বমনোদ্রেককারী হেতু অর্থাত্ উদগারের অভিন্নতা বিবেচ্য।

ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণিত যে, পদার্থ উযূ ভংগের কারণ নয়, তা নাপাকও গণ্য নয়; ইমাম আবূ ইউসূফের যুক্তি এই যে, (উদারস্থ) শ্লেষ্মা নাজাসাতের সংস্পর্শহেতু নাজাসাত রূপে গণ্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি কেউ রক্তবমি করে এবং তা জমাট হয়, তবে এতে মুখ ভরতি বিবেচনা করা হবে। কেননা মূলতঃ তা পিত্ত-নিঃসৃত গাঢ় কাল পদার্থ। আর যদি তরল হয়, তবে ইমাম মুহম্মদ (র.) এর মতে, অন্যান্য প্রকার বমির নিরিখে এক্ষেত্রেও অনুরূপ মুখ ভর্তি হওয়া বিবেচ্য।

অন্য দুই ইমামের মতে, যদি স্বতঃস্ফূর্ত বেগে প্রবাহিত হয় তাহলে অল্প হলেও উযূ ভেংগে যাবে। কেননা পাকস্থলী রক্তের স্থান নয়। সুতরাং তা উদরস্থ কোন ক্ষত থেকে নির্গত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(আর রক্ত) মাথার ভিতর থেকে গড়িয়ে নাকের নরম অংশ পর্যন্ত উপনীত হলে সর্বসম্মত মতে উযূ ভেংগে যাবে। কেননা তা তাহারাতের হুকুমভূক্ত অংশে চলে এসেছে। সুতরাং নির্গত হওয়া সাব্যস্ত।

(৪) ঘুমানো-কাত হয়ে কিংবা হেলান দিয়ে কিংবা এমন কিছুতে ঠেস দিয়ে য়ে, তা সরিয়ে দিলে সে পড়ে যাবে। কেননা, পার্শ্ব শয়ন শরীরের গ্রন্থিগুলোর শিথিলতার কারণ। ফলে এ অবস্থা স্বভাবতই কিছু (বায়ু) নির্গত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর স্বভাবতঃ যা বিদ্যমান তা ইয়াকিনী বিষয় বলে গণ্য।

আর তা হেলান অবস্থায় ঘুম আসলে ভূমির সাথে নিতম্বের সংলগ্নতা না থাকার কারণে জাগ্রতাবস্থার নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়। আর কিছুতে উক্ত প্রকার ঠেস দিয়ে ঘুমালে অংগ শৈথিল্য চরমে পৌছে যায়। ঠেকনাটি তার পড়ে যাওয়া থেকে বাচিয়ে রাখে পক্ষান্তরে (সালাতে বা সালাতের বাইরে) দাড়ানো, বসা, রুকু ও সাজদা অবস্থার ঘুম তেমন নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, আংশিক নিয়ন্ত্রণ তখনো বহাল থাকে, তা না হলে তো পড়েই যেতো। সুতরাং পুরোপুরি অঙ্গ শিথিল হয় না। এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো নবী (সা.) এর বাণীঃ

দাড়িয়ে, বসে,রুকুতে বা সাজদায় যে ঘুমায়, তার উপর উযূ আবশ্যক নয়। উযূ আবশ্যক হলো তার উপর, যে প্বার্শে ভর দিয়ে ঘুমায়, কেননা পার্শ্বের উপর ঘুমালে তার গ্রন্থি শিথিল হয়ে পড়ে।

(৫) এমন সংজ্ঞাহীনতা, যাতে বোধ-লোপ পায় এবং (৬) অপ্রকৃতিস্থতা। কেননা, এগুলো অংগ শৈথিল্যের ক্ষেত্রে পার্শ্ব শয়নের চাইতেও বেশী ক্রিয়াশীল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সংজ্ঞাহীনতা সর্বাবস্থায় উযূ ভংগের কারণ। ঘুমের ক্ষেত্রও কিয়াস ও যুক্তির দাবী এটাই ছিল। কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্য আমরা হাদীছ থেকে পেয়েছি। সংজ্ঞাহীনতা কে আবার নিদ্রার উপর কিয়াস করার সুযোগ নেই। কেননা তা নিদ্রার চাইতে বেশী প্রবল।

(৭) রুকু-সাজদাবিশিষ্ট সালাতে অট্টহাসি। অবশ্য কিয়াস ও যুক্তির দাবী হল উযূ ভংগ না হওয়া। ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতও তাই। কেননা তা নির্গত নাজাসাত নয়। এ কারণে সালাতুল জানাযায়, তিলাওয়াতের সাজদায় এবং সালাতের বাইরে তা উযূ ভংগের কারণ নয়।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী, শুনো, তোমাদের কেউ অট্টহাসি করলে উযূ ও সালাত উভয়ই পুনরায় আদায় করবে।বলা বাহুল্য যে, এ ধরনের (মশহুর হাদীছ) দ্বারা কিয়াস করা হয়ে থাকে। তবে হাদীছটি যেহেতু পূর্ণ আকারের সালাত সম্পর্কিত, সেহেতু তার হুকুম তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অট্টহাসি হলো যা নিজে এবং পার্শ্ববর্তী শুনতে পায়। আর হাসি হলো যা নিজে শোনতে পায়, কিন্তু অন্যরা শুনতে পায় না। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, হাসি দ্বারা উযূ নষ্ট হয় না, কিন্তু সালাত ফাসিদ হয়ে যায়।

(৮) পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কীট বের হলে তা উযূ ভংগকারী হবে। তবে ক্ষতস্থান থেকে কীট বের হলে বা মাংসখণ্ড খসে পড়লে উযূ ভংগ হবে না।

মূল পাঠে 'দাব্বা' দ্বারা উদ্দেশ্য 'কীট' কেননা (মূলতঃ কীট নাজাসাত নয় বরং) তার দেহ লেগে থাকা পদার্থ হলো নাজিস বা নাপাক এবং তা অতি অল্প। আর অল্প নাজাসাত পেশাব-পায়খানার রাস্তায় নির্গত হওয়া উযূ ভংগের কারণ। কিন্তু অন্য স্থান থেকে অল্প বের হওয়া উযূ ভংগের কারণ নয়। তাই (অন্য স্থান থেকে অল্প বের হওয়া) ঢেকুরের সঙ্গে তুলনীয় এবং (পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে অল্প বের হওয়া) নিঃশব্দ বাতকর্মের সাথে তুলনীয়। পক্ষান্তরে নারী অথবা পুরুষের পেশাবের রাস্তা দিয়ে নির্গত বায়ু উযূ ভংগকারী নয়। কেননা তা নাজাসাতের স্থান থেকে সৃষ্ট নয়। তবে 'উভয় পথ সংযুক্ত এমন কোন নারীর বায়ু নির্গত হলে তার জন্য উযূ

http://islaminonesite.wordpress.com/

করে নেয়া মুসতাহাব।কেননা, সেটা পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

কোন ফোড়া-ফোস্কার চামড়া তুলে ফেলার কারণে তা থেকে পানি-পুজ ইত্যাদি গড়িয়ে যদি ক্ষতস্থানের মুখ অতিক্রম করে তাহলে উযূ ভংগ হবে, আর পানি যদি অতিক্রম না করে তবে উযূ ভংগ হবে না।

ইমাম যুফার (রা.) এর মতে উভয় অবস্থায় উযূ ভংগ হবে। ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে উভয় অবস্থাতেই উযূ ভংগ হবে না। মূলতঃ এটা পেশাব-পায়খানার রাস্তা ছাড়া ভিন্ন পথে নাজাসাত নির্গত হওয়ার মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত। এই সমস্ত পানি পুজ ইত্যাদি অবশ্যই নাজিস। কেননা এগুলো মূলতঃ রক্ত, পর্যায়ক্রমে পক্ব হয়ে নির্গত ক্লেদ এবং আরো বেশী পক্ব হওয়ার পর পুজ, এরপর এই পার্থক্য তখনই হবে যখন আবরণ-ত্বক সরিয়ে ফেলার কারণে তা আপনা আপনি বের হয়। পক্ষান্তরে চিপ দেওয়ার কারণে বের হলে উযূ ভংগ হবে না। কেননা (হাদীছ) বা নির্গত শব্দ রয়েছে, অথচ) এটা নির্গত নয়, বরং নিঃসরণ করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদঃ গোসল

গোসলের ফরয হল কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সমস্ত শরীর ধোয়া।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে গোসলের মধ্যে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুন্নত।কেননা নবী করিম (সা.) বলেছেন দশটি বিষয় ফিতরাত অর্থাত্ সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে তিনি কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেনঃ এ কারণেই উযূতে এ দু'টিকে সুন্নত গণ্য করা হয়।

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার ইরশাদঃ যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে পূর্ণ রুপে তাহারাত হাসিল কর।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এখানে পূর্ণরূপে তাহারাত হাসিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।যার মর্ম হল সমস্ত শরীর পবিত্র করা। তবে যেখানে পানি পৌছানো দুস্কর, সেগুলো (ধোয়ার আওতা থেকে) বহির্ভূত।

উযূর অবস্থা ভিন্ন। কেননা, উযূর মধ্যে চেহারা ধোয়া ওয়াজিব। আর আভিধানিক অর্থে চেহারার দ্বারা এতটুকু অংশ বুঝায়, যা মুখোমখিতে প্রকাশ পায়। আর মুখ ও নাকের অভ্যন্তরের মধ্যে মুখামুখির অবস্থা অনুপস্থিত।

(ইমাম শাফিঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটির উদ্দেশ্য হচ্ছে উযূ ভংগের অবস্থা এর প্রমাণ হল নবী (সা.) এর বাণী।

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উভয়টি জানাবাতের গোসলে ফরয এবং উযূতে সুন্নত।

গোসলের সুন্নত এই যে, গোসলকারী প্রথমে দুই হাত এবং লজ্জাস্থান ধুবে। আর শরীরে নাজাসাত লেগে থাকলে তা পরিস্কার করবে, অতঃপর সালাতের উযূর অনুরূপ উযূ করবে, তবে পদদ্বয় ধুবে না। এরপর মাথায় ও সারা শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। এরপর গোসলের স্থান থেকে সরে গিয়ে দু'পা ধুয়ে নেবে।

মায়মূনা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর গোসলের অনুরূপ বিবরণই দিয়েছেন। পা ধোয়া সর্বশেষে করার কারণ এই যে, পা দুটো ব্যবহৃত পানি জমা থাকার জায়গায় থাকে। তাই আগে ধোয়াতে কোন লাভ নেই। এমনকি তক্তার উপরে (বা উচু স্থানে) দাড়িয়ে গোসল করলে তখন পা ধোয়া বিলম্বিত করবে না। প্রথমে হাকীকী নাজাসাত (নাপাক পদার্থ) দূর করে নেয়ার কারণ এই যে, পানি লেগে তা যেন আরো ছড়িয়ে না পড়ে।

স্ত্রী লোকের জন্য গোসলের সময় বেণী খুলে নেওয়া জরুরী নয়, যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উম্মু সালামা (রা.) কে বলেছেনঃ চুলের গোড়ায় পানি পৌছলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

বেণী ভিজানোও স্ত্রীলোকের জন্য জরুরী নয়, এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা তা কষ্ট সাধ্য দাড়ির ব্যাপার অবশ্য ভিন্ন। কেননা দাড়ির ভিতরে পানি পৌছানো কষ্টদায়ক নয়।

ইমাম কুদূরী বলেন, গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ হলঃ

(১) জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় নারী বা পুরুষের সবেগ ও সকাম বীর্যস্খলন।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে, যে কোন অবস্থায় বীর্যস্খলনেই গোসল ওয়াজিব হয়।কেননা রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ পানির কারণে পানি আবশ্যক। আমাদের দলীল এই যে, পবিত্রতা অর্জনের নির্দেশ 'জুনুবীর' সাথে সম্পর্কিত। লোকটি জুনুবী হয়েছে তখনই বলা হয়, যখন লোকটি স্ত্রীর সাথে কাম-ইচ্ছা চরিতার্থ করে।

উক্ত হাদীছ সকাম বীর্যস্খলনের অর্থেই ব্যবহৃত। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে মূল স্থান থেকে বীর্যেরস্খলনের কামোত্তেজনা থাকাই যথেষ্ট।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে বীর্যের প্রকাশ বা নির্গমন কামোত্তেজনাসহ হওয়া শর্ত। তিনি নির্গমন অবস্থাকে মূল স্থান থেকে স্খলন অবস্থার উপর কিয়াস করেন। কেননা গোসলের সম্পর্ক উভয়ের সাথে।

উক্ত দুই ইমামের যুক্তি এই যে, যখন গোসল ওয়াজিব হওয়ার এক কারণ বিদ্যমান তখন সতর্কতার চাহিদা হল গোসল ওয়াজিব সাব্যস্ত করা।

(২) বীর্যস্খলন ব্যতিরেকে দুই অংগের 'মিলন'। কেননা নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ

উভয় খাতনা স্থান যখন মিলিত হয়; বীর্যস্খলন ঘটুক কিংবা না ঘটুক।

আর এ জন্য যে, দুই অংগের মিলন হল বীর্যস্খলনের কারণ। আর পুরুষাঙ্গ রয়েছে তার দৃষ্টির অগোচরে। পরিমাণ অল্প হলে স্খলন তার অজ্ঞাতও থাকতে পারে। কাজেই কারণকে স্খলনের স্থলবর্তী ধরে নেওয়া হয়েছে। গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করানোরও এই হুকুম। কেননা স্খলনের কারণ এখানেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। আর যার সাথে একাজ করা হয়, সতর্কতা-স্বরূপ তার উপরও গোসল ওয়াজিব।

http://islaminonesite.wordpress.com/

পশু সংগম ও যৌনাঙ্গ ছাড়া মৈথুন এর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে স্খলনের কারণ দুর্বল।

(৩) ঋতুস্রাব (এর সমাপ্তি) কেননা–আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

যতক্ষণ না তারা উত্তমরূপ পবিত্রতা অর্জন করবে।

(৪)তদ্রুপ সর্বসম্মত মতে নিফাস ও (প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব)ঃ

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গোসল সুন্নত করেছেন, জুমুআ, দুই ঈদ, আরাফায় অবস্থান ও ইহরামের জন্য গোসল।

মূল গ্রন্থকার (ইমাম কুদূরী) স্পষ্ট সুন্নত বলেছেন। কারো কারো মতে এই চার সময়ের গোসল মুসতাহাব। মূল (মাবসূত) গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র.) জুমুআর গোসলকে উত্তম বলেছেন। আর ইমাম মালিক বলেছেন ওয়াজিব। কেননা রাসূল করীম (সা.) বলেছেনঃ জুমুআয় যে শরীক হয়, সে যেন গোসল করে নেয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ

জুমুআর দিন যে উযূ করে, তা তার জন্য যথেষ্ট ও ভাল। আর যে গোসল করে তা উত্তম। (সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য) ইমাম মালেক বর্ণিত হাদীছের নির্দেশকে মুসতাহাব অর্থে নেওয়া হবে; কিংবা রহিত বলে গণ্য।

আর ইমাম আবূ ইউসূফের মতে এই গোসল হল সালাতুল 'জুমআর জন্য এবং এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা সময়ের তুলনায় তার ফযীলত অধিক। তাছাড়া সালাতের সাথেই তাহারাতের বিশেষ সম্পর্ক। এ বিষয়ে ইমাম হাসান এর ভিন্নমত রয়েছে।

দুই ঈদ ও জুমুআর মতই। কেননা, উভয় ঈদেই বড় সমাবেশ হয়। সুতরাং দুর্গন্ধজনিত কষ্ট দূর করার জন্য তাতে গোসল মুসতাহাব।

আরাফা ও ইহরামের গোসল সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ্ হজ্জের বিষয় প্রসংগে আলোচনা করবো।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কুদূরী (র.) বলেন, ‘মযী’, ও ‘অদী’ বের হলে তাতে গোসল আবশ্যক নয়, তবে উযূ আবশ্যক।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সকল পুরুষেরই মযী নির্গত হয়। আর তাতে উযূ আবশ্যক। আর তা হল পেশাবের পর নির্গত অপেক্ষাকৃত গাঢ় তরল পদার্থ। তাই তা পেশাবের হুকুমের মধ্যেই গণ্য হবে। হচ্ছে সাদা আঠাল পদার্থ, যার স্খলন পুরুষাংগকে নিস্তেজ করে দেয়। হল সাদাটে তরল পদার্থ, যা স্ত্রীর সঙ্গে আদর-আহলাদের সময় নির্গত হয়। এ ব্যাখ্যা ‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত।

প্রথম অনুচ্ছেদ

পানি

যে পানিতে উযূ জাইয এবং যে পানিতে উযূ জা্ইয নয়।

আসমানের (বৃষ্টির) পানি দ্বারা, উপত্যকায় জমা পানি দ্বারা, ঝরনার পানি দ্বারা, কূপের পানি দ্বারা ও সমুদ্রের পানি দ্বারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা জাইয। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেছেনঃ আসমান থেকে আমি অতি পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি। (২৫ঃ৪৮)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ

পানি পবিত্র, কোন কিছু তাকে না পাক করে না, কিন্তু যে অপবিত্র বস্তু তার বর্ণ, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন করে দেয়।

অন্য হাদীছ সমুদ্র সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মরা হালাল। আর সাধারণভাবে বিশেষণ ছাড়া পানি শব্দটি এই সকল পানির উপর প্রয়োজ্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

বৃক্ষ কিংবা ফল থেকে নিংড়ানো পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জা্ইয নয়। কেননা, তা সাধারণ পানি নয়। আর সাধারণ পানি না পাওয়া গেলে (পবিত্রতা অর্জনের) হুকুম তায়াম্মুমে রূপান্তরিত। আর এ সকল অংগ ধৌত করার হুকুম কিয়াস বহির্ভূত। সুতরাং তা শরীআতের বাণীতে উল্লেখিত বস্তুকে অতিক্রম করবে না। তবে আংগুর বৃক্ষ থেকে ফোটা ফোটা যে পানি পড়ে, তা দ্বারা উযূ জাইয হবে। কেননা তা হস্তক্ষেপ ছাড়া নির্গত হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসূফ এ মাসআলা উল্লেখ করেছেন। মূল কুদূরী কিতাবেও এ দিকে ঈংগিত রয়েছে। কেননা তাতে নিঃসরণের শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

এমন পানি দ্বারা (পবিত্রতা অর্জন) জাইয নয়, যাতে অন্য কোন বস্তু প্রভাব বিস্তার করে পানির প্রকৃত গুণ দূরীভূত করে দিয়েছে। যেমন, শরবত, সিরকা, গোলাব জল, সবজির পানি, শুরুয়া পানি। কেননা এগুলোকে সাধারণ পানি বলা হয় না। সবজির পানির উদ্দেশ্য হল যা জ্বাল দেওয়ায় পরিবর্তিত হয়েছে। আর যদি বিনা জ্বালে তাতে পরিবর্তন আসে তাহলে তা দ্বারা উযূ জাইয হবে।

যে পানির সাথে কোন পাক জিনিস মিশ্রিত হয় আর তা পানির (তিনটি গুণে) কোন একটিকে পরিবর্তন করে দেয়, সে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জাইয। যেমন বন্যার ঘোলা পানি এবং জাফরান, সাবান ও 'উশনান' মিশ্রিত পানি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, কুদূরীতে লোধ্র ভিজিয়ে রাখা পানিকে ঝোলের পর্যায়ের ধরা হয়েছে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত মতে তা জাফরান মিশ্রিত পানির সমপর্যায়ের। এ-ই বিশুদ্ধ। নাতিফী ও ইমাম সারখসী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জাফরান ও এর অনুরূপ এমন পদার্থ মিশ্রিত পানি যা মাটি জাতীয় নয়, তা দ্বারা উযূ জাইয নয়।তুমি লক্ষ্য করছ না যে তাকে (শুধু পানি না বলে) জাফরানের পানি বলা হয়ে থাকে। মাটি জাতীয় পদার্থ মিশ্রিত পানি এর ব্যতিক্রম। কেননা পানি সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয় না।

আমাদের যুক্তি এই যে, এক্ষেত্রে 'পানি' নামটি এখনও সাধারণভাবেই অক্ষুণ্ন আছে। এজন্য তার ক্ষেত্রে আলাদা নতুন কোন নাম যুক্ত হয়নি। জাফরানের দিকে

http://islaminonesite.wordpress.com/

সম্বোধন করে (জাফরানের পানি বলা) মূলতঃ কুয়া ও ঝরনার দিকে সম্বোধন করার মত।

তা ছাড়া সামান্য মিশ্রণ পরিহার করা সম্ভব নয় বিধায় তা ধর্তব্যও নয়, যেমন মাটি জাতীয় পদার্থের ক্ষেত্রে। সুতরাং প্রবলতাই বিবেচ্য বিষয় হবে। আর প্রবলতা সাব্যস্ত হবে অংশগত পরিমাণ দ্বারা; রং-এর পরিবর্তন দ্বারা নয়। এই বিশুদ্ধ মত।

মিশ্রণের পর যদি জ্বাল দ্বারা পানি পরিবর্তিত হয় তবে সে পানি দ্বারা উযূ জাইয নয়। কেননা তা আসমান থেকে বর্ষিত পানির স্বভাবে বহাল নেই। অবশ্য যদি পানিতে এমন কিছু জ্বাল দেওয়া হয় যা দ্বারা অধিক পরিষ্করণ, উদ্দেশ্য হয়। যেমন, পটাশ (বা বড়ই পাতা) তা হলে ভিন্ন কথা। কেননা মাইয়েতকে বড়ই পাতার জ্বাল দেওয়া পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়।হাদীছেও তা আছে। তবে যদি তা পানির উপর প্রবল হয়ে ছাতু (মিশ্রিত পানির) মত হয়ে যায় (তাহলে জাইয হবে না) কেননা তখন পানি নামটি তা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

যে কোন (নিশ্চল ও অল্প) পানিতে নাপাকি পড়লে তা দ্বারা উযূ জাইয নয়। নাপাকি অল্প হোক বা বেশী হোক।ইমাম মালিক (র.) বলেন, যতক্ষণ পানির তিনটি গুনের কোন একটির পরিবর্তন না হয় ততক্ষণ উযূ জাইয। উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীছ দ্বারা তিনি দলীল গ্রহণ করেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পানি দুই মটকা পরিমাণ হলে উযূ জাইয হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পানির যদি দুই মটকা পরিমাণ হয়, তাহলে তা নাপাকি গ্রহণ করে না।

আমাদের দলীল হল ঘুম থেকে জেগে উঠা ব্যক্তি সম্পর্কিত হাদীছ এবং নিম্নোক্ত হাদীছ- তোমাদের কেউ যেন নিশ্চল পানিতে পেশাব না করে এবং তাতে জানাবাতের গোসল না করে। এখানে (মটকা পরিমাণে) পার্থক্য করা হয়নি।

ইমাম মালিক (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তা বুযা'আ নামক কূপ সম্পর্কিত। তার পানি ছিল প্রবাহিত বিভিন্ন বাগানে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিই বর্ণিত হাদীছকে ইমাম আবূ দাউদ 'দুর্বল' বলেছেন। অথবা এর অর্থ নাপাকি গ্রহণে দুর্বল (অর্থাত্ নাপাক হয়ে যাবে)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রবহমান পানিতে নাজাসাত পড়লে সে পানি দ্বারা উযূ জাইয, যদি তাতে নাজাসাতের কোন আলামত দেখা না যায়। কেননা, পানির প্রবাহের কারণে তা স্থির থাকে না। আর আলামত হল স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ। প্রবহমান ঐ পানিকে বলা হয় যা পুনঃ পুনঃ ব্যবহার আসে না। কেউ কেউ বলেন, যা 'খড়কুটা' ভাসিয়ে নেয়।

এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অপর পার্শ্বের পানি তরংগায়িত হয় না, এমন বড় পুকুরের এক পার্শ্বে নাজাসাত পড়লে অপর পার্শ্বে উযূ করা জাইয। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, অপর পার্শ্বে নাজাসাত পৌছবে না। কারণ, ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে তরঙ্গের প্রভাব নাজাসাত এর প্রভাবের চেয়ে বেশী।

ইমাম আবূ হানাফী (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোসলের দ্বারা সৃষ্ট তরঙ্গ গ্রহণ করেন। এই ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মত। আবূ হানাফী (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় তিনি হাত নাড়ার তরঙ্গ করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত মতে তিনি উযূ দ্বারা সৃষ্ট 'তরঙ্গ' গ্রহণ করেন। প্রথম মতের যুক্তি এই যে, হাউজ ও পুকুরে উযূর তুলনায় গোসলের প্রয়োজনই বেশী।

কোন কোন ফকীহ্ বিষয়টিকে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ করার উদ্দেশ্য মাপের দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাত্ কাপড় মাপার হাতে দশ দশ হাত (চতুর্দিকে)-এর উপরই ফাতওয়া। গভীরতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য এই যে, তা এমন পরিমাণ হবে যে, অঞ্জলি ভরে পানি তোলার সময় তলা জেগে উঠবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। মূল কিতাবের এ কথা 'অন্য পার্শ্বে উযূ জাইয হবে' ইংগিত করে যে, নাজাসাত পড়ার স্থান নাপাক হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উক্ত স্থানও নাপাক হবে না, যতক্ষণ না নাজাসাত প্রকাশ পায়; যেমন প্রবহমান পানির হুকুম।

মশা, মাছি, বোলতা, বিচ্ছু ইত্যাদি যে সকল প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলোর মৃত্যুর পানি নাপাক হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এটি পানিকে নষ্ট করে দিবে। যা হারাম করা হয়েছে, কিন্তু সম্মানার্থে নয় তা নাজিস হওয়ার পরিচায়ক। তবে মৌমাছি ও ফলের পোকার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা তাতে মানবীয় প্রয়োজন বিদ্যমান।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, এ ধরনের পানি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- এটা খাওয়া ও পান করা এবং তা দ্বারা উযূ করা জাইয। এমন কি, যবাহকৃত জন্তু হালাল করা হয়েছে, প্রবাহিত রক্ত তা থেকে দূরীভূত হওয়ার কারণে অথচ সে সকল জন্তুর মধ্যে রক্ত নেই। (ইমাম শাফিঈ (র.) এর জবাব এই যে) হারাম হওয়ার জন্য নাজিস হওয়া অনিবার্য নয়। যেমন মাটি হারাম কিন্তু তা নাজিস নয়।

মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া ইত্যাদি যা পানিতে থাকে, পানিতে তার মৃত্যু, পানি নষ্ট (নাপাক) করবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পূর্বোল্লেখিত যুক্তির আলোকে মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর মৃত্যু পানি নষ্ট করে দিবে। তার দলীল উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, এগুলো নিজ উৎপত্তিস্থলে মারা গেছে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে নাজাসাতের হুকুম প্রয়োগ করা হবে না। যেমন ডিমের কুসুম রক্তে পরিবর্তিত হলেও (তা নাপাক হয় না)।

তাছাড়া এগুলোতে রক্ত নেই, কেননা রক্তবাহী প্রাণী পানিতে বাস করে না। আর রক্তই হল নাজিস। পানি ছাড়া অন্য কিছুতে এগুলো মারা গেলে, কেউ বলেছেন, মাছ ব্যতীত অন্যান্য জন্তু তা নাপাক করে দিবে, সেসব উৎপত্তিস্থল না থাকার কারণে। আবার কেউ বলেছেন তা নষ্ট করবে না রক্ত না থাকার কারণে। এ মতই বিশুদ্ধ। জলজ ব্যাঙ ও স্থল ব্যাঙ দু'টির হুকুম সমান। আর কেউ কেউ বলেছেন, স্থল জাতীয় ব্যাঙ পানি নষ্ট করে দিবে, কেননা এতে রক্ত বিদ্যমান। এবং যেহেতু তা উৎপত্তিস্থলে মারা যায় নি।

জলজ প্রাণী দ্বারা সে সকল প্রাণী বুঝায়, যার জন্ম ও বাস পানিতে। যে প্রাণী পানিতে অবস্থান করে কিন্তু জন্ম পানিতে নয়, তা পানি নষ্ট করে।

ইমাম কুদূরী বলেন, ব্যবহৃত পানি ‘হাদাছ’ থেকে পবিত্রতা দান করে না।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলেন, (কুরআনে বর্ণিত) অর্থ যা অন্যকে বারবার পাক করতে পারে, যেমন বলে তাকে, যা বারবার কর্তন করতে সক্ষম। ইমাম যুফার (র.) বলেন, এবং এটা ইমাম শাফিঈ

http://islaminonesite.wordpress.com/

(র.) এর দ্বিতীয় মত-পানি ব্যবহারকারী যদি উযূ অবস্থায় থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহারকৃত পানি দ্বারা আবার তাহারাত হাসিল করা যাবে। আর যদি পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি অপবিত্র থেকে থাকে তাহলে তার ব্যবহৃত পানি পবিত্র থাকবে, কিন্তু পবিত্রকারী থাকবে না।

কেননা অংগ বাহ্যত পবিত্র। সে হিসাবে পানি পবিত্র থাকা চাই। কিন্তু বিধান অনুযায়ী সে অংগ নাপাক। সে হিসাবে পানি নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তাই উভয় অবস্থা বিবেচনা করে আমরা পানির পবিত্রকরণ গুণের বিলুপ্তি এবং পবিত্র থাকার পক্ষে মত পোষণ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও বর্ণিত- ব্যবহৃত পানি পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়। কেননা দুই পবিত্র বস্তুর সংস্পর্শে অপবিত্র হওয়ার কারণ হতে পারে না। তবে যেহেতু তা দ্বারা একটি ইবাদত আদায় করা হয়েছে, সেহেতু তার গুণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন, সাদাকার মাল।

ইমাম আবূ হানীফা (র)হতে ইমাম হাসান (র.) এর সূত্রে বর্ণিত মতে হাকীকী নাজাসাত দূর করার জন্য ব্যবহৃত পানির সমতুল্য গণ্য করে এ পানিও নাজাসাতে গালীজা (গুরু নাপাক)।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর সূত্রে বর্ণিত মতে এ পানি নাজাসাতে খাফীফা (লঘু নাপাক)। কেননা, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।

ব্যবহৃত পানি অর্থ, যে পানি দ্বারা হাদাছ দূর করা হয়েছে কিংবা সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবূ ইউসূফের মত। কেউ কেউ বলেছেন, যে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এরও মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, শুধু সাওয়াব হাসিলের নিয়্যতেই পানি 'ব্যবহৃত' গণ্য হবে। কেননা গুনাহের স্থানান্তরিত হওয়ার কারণেই পানি 'ব্যবহৃত' সাব্যস্ত হবে। আর গুনাহ্ দূর হয় সাওয়াবের নিয়্যত দ্বারা। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, (পানির মধ্যে) ফরয আদায় করারও প্রভাব রয়েছে। সুতরাং উভয় কারনেই (পানির) নষ্ট হওয়া সাব্যস্ত হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কখন পানি ‘ব্যবহৃত’ রূপে গণ্য হবে? বিশুদ্ধমত এই যে, (ধৌত) অংগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র তা ‘ব্যবহৃত’ বলে গণ্য হবে। কেননা (পানি শরীর থেকে)বিচ্ছিন্ন হওয়া পূর্বে প্রয়োজনের তাকীদে ‘ব্যবহৃত হওয়ার হুকুম দেওয়া হয় না। আর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রয়োজন নেই।

জুনুবী ব্যক্তি যদি বালতি করার জন্য কূপের মধ্যে ডুব দেয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফের মতে সে জুনুবী থেকে যাবে। সে তার গায়ে পানি ঢালে নি। আর তার মতে ফরয গোসল আদায় হওয়ার জন্য তা শর্ত। আর পানিও পূর্ব অবস্থায় পাক থাকবে; কেননা, উভয় কারণই এখানে অনুপস্থিত। ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে (পানি ও মানুষ) উভয়ই পাক।

লোকটি পবিত্র হয়ে গেল পানি ঢালার শর্ত না হওয়ার কারণে, আর পানি পবিত্র থাকল সাওয়াবের নিয়্যত না থাকার কারণে।

ইমাম আবূ হানাফী (র.) এর মতে উভয়ই অপবিত্র। পানি একারণে অপবিত্র যে, (পানির সাথে) প্রথম সংস্পর্শের সাথে সাথে শরীরের অংশবিশেষ থেকে জানাবাত দূরীভূত করা হয়েছে। আর লোকটি অপবিত্র এজন্য যে, অবশিষ্ট অংগে হাদাছ বিদ্যমান রয়ে গেছে। আর কেউ কেউ বলেন, তার মতে লোক অপবিত্র থাকার কারণ হলো ব্যবহৃত পানির অপবিত্র হওয়া। তার থেকে বর্ণিত আরেকটি মত হলো, লোকটি পবিত্র হয়ে যাবে। কেননা (শরীর থেকে) বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে পানির উপর ব্যবহৃত হওয়ার হুকুম আরোপ করা হয় না। তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোর মাঝে এটিই অধিক যুক্তিসংগত।

শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত যে কোন চামড়া ‘পাকা করা হয় তা পাক হয়ে যায়।তাতে সালাত আদায় করা এবং তা থেকে (তৈরী পাত্রের পানি দিয়ে) উযূ জাইয। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যে কোন চামড়া পাকা করা হয়, তা পাক হয়ে যায়।

এ হাদীছটি তার অর্থ ব্যপকতার ভিত্তিতে মৃত পশুর চামড়ার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.) এর বিপক্ষে দলীল। আর মৃত পশুকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে বর্ণিত নিষেধবাণী- তোমরা মৃত পশুর চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ কর না। এ হাদীছ

http://islaminonesite.wordpress.com/

উপরোল্লেখিত হাদীছের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা যে চামড়া পাকা করা হয়নি, তাকেই বলা হয়।

তদ্রূপ আলোচ্য হাদীছ কুকুরের চামড়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে দলীল। কেননা, কুকুর (শূকরের মত) সত্তাগত ভাবে নাপাক নয়। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না যে, পাহারা দেওয়া ও শিকার করার ক্ষেত্রে তার থেকে উপকার গ্রহণ করা হয়? আর শূকর হলো সত্তাগত ভাবেই নাপাক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী (নিঃসন্দেহে তা নাজাসাত) এর সর্বনাম নিকটবর্তী এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। মানব দেহের কোন অংশ দ্বারা উপকার লাভ হওয়ার কারণ (নাপাকি নয় বরং) তার মর্যাদাও। সুতরাং এ দু'টি আমাদের বর্ণিত হাদীছের আওতার বাইরে।

যা দুর্গন্ধ ও পচনে রোধ করে, তাকেই পাকা করা বলে; রোদে শুকিয়ে হোক বা মাটি মেখে হোক। কেননা মূল উদ্দেশ্য এর দ্বারা অর্জিত হয়। সুতরাং অন্য কোন শর্ত আরোপ করার কোন যুক্তি নেই।

যে চামড়া পাকা করলে পাক হয়, তা যবাহ্ করার মাধ্যমেও পাক হয়। কেননা, যবাহ্ দ্বারা নাপাক আর্দ্রতা দূর করার ক্ষেত্রে পাকা করার ক্রিয়া পাওয়া যায়। এইরূপ যবাহ্ দ্বারা গোশতও পাক হয়ে যায়। এটাই বিশুদ্ধ মত। যদিও তা খাওয়া হালাল নাও হয়।

মৃতপশুর পশম ও হাড় পাক।

ইমাম শাফিঈ (র.) নাপাক বলেন, কেননা এগুলো মৃত পশুরই অংশ।

আমাদের দলীল এই যে, তাতে প্রাণ নেই, এজন্য এগুলো কাটলে ব্যথা অনুভূত হয় না। সুতরাং এ দুটোতে মৃত্যু প্রবেশ করে না। কেননা মৃত্যু অর্থ প্রাণের বিলোপ।

মানুষের চুল ও হাড় পাক।

ইমাম শাফিঈ (র.) নাপাক বলেন। কেননা, এ দ্বারা উপকার লাভ করা বৈধ নয় এবং তা বিক্রি করাও জাইয নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, তার ব্যবহার ও বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মানুষের মর্যাদা রক্ষা। সুতরাং তা তার নাজাসাতের পরিচায়ক নয়।

পরিচ্ছেদ-কুয়ার মাসআলা

কুয়াতে কোন নাজাসাত পড়লে (যদি ১০ ন্ড ১০ হাতের কম হয়) তার পানি বের করে নিতে হবে। আর তাতে বিদ্যমান পানি নিষ্কাশনই তার জন্য তাহারাত বলে গণ্য। এর দলীল হল সলফে সালেহীনের ইজমা। আর কুয়া সংক্রান্ত মাসআলার ভিত্তি হচ্ছে সলফে সালেহীনদের ফাতওয়া, কিয়াস নয়।

কূপে উট বা বকরীর দু'একটি লাদি পড়লে পানি নষ্ট হবে না। এ হুকুম সূক্ষ কিয়াসের ভিত্তিতে। আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হল পানি নষ্ট হয়ে যাওয়া। কেননা, নাজাসাত পড়েছে অল্প পানিতে।

সূক্ষ কিয়াসের কারণ এই যে, খোলা মাঠের কুয়ার উপরে বাধাদানকারী কোন কিছু থাকে না, আর গবাদিপশু তার আশেপাশে মল ত্যাগ করে, ফলে বাতাসে তা কুয়ায় ফেলে। তাই প্রয়োজনের তাকীদে অল্প পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত। আর অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকীদ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে 'দর্শক' যা অধিক মনে করে, তা-ই অধিক। এ মতই নির্ভরযোগ্য। শূষ্ক ও তাজা বিষ্ঠা এবং গোটা ও টুকরা বিষ্ঠা আর উটের লাদা ও ঘোড়ার বা গরু গোবরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, প্রয়োজন সবগুলোতেই ব্যাপ্ত।

দোহন পাত্রে বকরী দু'এক গোটা বিষ্ঠা ত্যাগ করলে সে সম্পর্কে ফকীহগণ বলেছেন, বিষ্ঠা ফেলে দিয়ে দুধ পান করা যাবে। কেননা, এখানে প্রয়োজন রয়েছে। কারো কারো মতে সাধারণ পাত্রে অল্পও মা'ফযোগ্য নয়। কেননা, এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'এক গোটা বিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটাও কুয়ার অনুরূপ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি কুয়ায় কবুতর বা চড়ুইর বিষ্ঠা পড়ে তাহলে পানি নষ্ট হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার দলীল এই যে, (বিষ্ঠা) পচা ও দূষিত পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং তা মুরগীর বিষ্ঠার অনুরূপ।

আমাদের দলীল এই যে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত সত্ত্বেও মসজিদে কবুতরের অবাধ বিচরণের অনুকূলে মুসলমানদের সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে। আর উহার রূপান্তর দুর্গন্ধযুক্ত পচা পদার্থের দিকে নয়। সুতরাং তা কালো কাদা সদৃশ।

যদি কূপে বকরী পেশাব করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে সবটুকু পানি ফেলে দিতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যতক্ষণ তা পানির উপর প্রভাব বিস্তার না করে এবং পানির পবিত্র করার গুণ নষ্ট না করে, ততক্ষণ পানি ফেলতে হবে না।

আলোচ্য মতপার্থক্যের ভিত্তি এই যে, হালাল পশুর পেশাব ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে পাক আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফের মতে নাপাক।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, হালাল পশু ও হারাম পশুর মাঝে কোন পার্থক্য নির্দেশ না করে নবী (সা.) বলেছেন- তোমরা পেশাব থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, কবরের অধিকাংশ আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে।

তাছাড়া উক্ত পেশাব পচন ও দুর্গন্ধে পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এমন পশুর পেশাবের মত গণ্য হবে, যার গোশত খাওয়া নিষেধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ওয়াহীর মাধ্যমে (উটের পেশাবে) তাদের রোগ আরোগ্য জানতে পেরেছিলেন।

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে চিকিৎসা হিসাবেও তা পান করা হালাল নয়। কেননা তাতে আরোগ্য লাভ নিশ্চিত নয়। সুতরাং হারাম হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করা যাবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)-এর মতে (উরায়না গোত্রের) ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পান করা হালাল।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে উক্ত পেশাব পাক হওয়ার কারণে চিকিৎসা হিসাবে এবং সাধারণভাবে তা পান করা হালাল।

যদি কুয়ায় ইঁদুর, চড়ুই, কোয়েল, দোয়েল, টিকটিকি ইত্যাদি মারা যায়, তাহলে বালতির বড়ত্ব ও ছোটত্ব হিসাবে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পর্যন্ত পানি তুলে ফেলতে হবে।

অর্থাত্ ইঁদুর বের করে নেয়ার পর। এর প্রমাণ হল, আনা্স (রা.) বর্ণিত হাদীছে ইঁদুর সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, তা কুয়াতে মারা গেলে এবং তৎক্ষণা্ত্ তা বের করে নিলে কুয়া থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে।

চড়ুই ও অনুরূপ জন্তু যেহেতু দৈহিক পরিমাণে ইঁদুরের সমান তাই এসবের ব্যাপারে একই হুকুম প্রযোজ্য। বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলা ওয়াজিব আর ত্রিশ বালতি পরিমাণ মুস্তাহাব।

যদি কবুতর কিংবা তার মত প্রাণী যেমন, মুরগী, বিড়াল ইত্যাদি কুয়ায় পড়ে মারা যায়, তাহলে চল্লিশ থেকে বিশ বালতি পরিমাণ পানি তুলে ফেলতে হবে।

গ্রন্থে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এর কথা আছে। আর তাই অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে তিনি মুরগী সম্পর্কে বলেছেন, তা কুয়ায় পড়ে মারা গেলে সেখান থেকে চল্লিশ বালতি পানি তুলে ফেলতে হবে। এ পরিমাণ হলো ওয়াজিবের বিবরণ। আর পঞ্চাশ হলো মুস্তাহাব।

প্রত্যেক কুয়ার ক্ষেত্রে সেই বালতিই বিবেচ্য হবে, যা তা থেকে পানি তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। কারো কারো মতে এমন আকারের বালতি হতে হবে, যাতে এক সা’আ পরিমাণ পানি ধরে। আর যদি বৃহৎ বালতি দ্বারা একবার বিশ বালতি পানি ধরে, এমন পানি তুলে ফেলা হয়; তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার কারণে তা জাইয হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি তাতে বকরী, মানুষ বা কুকুর পড়ে মারা যায়, তাহলে তাতে বিদ্যমান সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে। কেননা ইবন 'আব্বাস ও ইবন যুবায়র (রা.) যমযম কূপে জনৈক নিগ্রোর মৃত্যুর কারণে সবটুকু পানি তুলে ফাতওয়া দিয়েছিলেন।

যদি মৃত প্রাণী কুয়ার মধ্যে ফুলে পচে গলে যায়, তাহলে প্রাণী বড় হোক বা ছোট হোক, কুয়ার সবটুকু পানি তুলে ফেলতে হবে।

কেননা পানির সর্বাংশে মৃত দেহের নিঃসৃত রস ছড়িয়ে পড়েছে।

কূপ যদি এমন প্রস্রবণ প্রকৃতির হয় যে, তার পানি তুলে ফেলা অসম্ভব হয়, তাহলে তাতে বিদ্যমান পানির সমপরিমাণ তুলে ফেলতে হবে।

এর পরিমাপ জানার উপায় এই যে, কূয়ার পানির সমতল পরিমাণ অনুরূপ একটি গর্ত খোড়া হবে এবং পানি তুলে তা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাতে ফেলতে হবে। কিংবা তাতে একটি বাঁশ নামিয়ে পানির উচ্চতা পরিমাণ স্থানে তাতে দাগ কাটা হবে। তারপর ধরুন, দশ বালতি তুলে আবার বাশ নামিয়ে দেখা হবে, কি পরিমাণ হ্রাস পেলো। এরপর প্রত্যেক এই পরিমাণের জন্য দশ বালতি করে পানি উত্তোলন করা হবে।

এ দু'টি উপায় আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দু'শ খেকে তিনশ' বালতি তুলে ফেললেই হবে। সম্ভবতঃ তিনি নিজ শহরের (বাগদাদে দেখা কুয়াগুলোর) উপরই তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছেন। গ্রন্থে এ ধরনের ক্ষেত্রে আবু হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি অনবরত তুলতেই থাকবে, যতক্ষণ না পানি তাদের পরাজিত করে ফেলে। তবে পরাজিত করার নির্দিষ্ট সীমা তিনি নির্ধারণ করেননি। (এ ধরনের ক্ষেত্রে) এটাই তাঁর অনুসৃত নীতি। কারো কারো মতে পানির (গভীরতা) সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন লোকের মতামত গ্রহণ করা হবে। এ মত ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যদি লোকেরা ইদুর বা এ ধরনের অন্য কোন প্রাণী কুয়াতে দেখতে পায় এবং কখন পড়েছে তা জানা না যায়, আর তা ফুলে গিয়ে না থাকে আর যদি তারা সে কুয়ার পানি দ্বারা উযূ করে থাকে, তাহলে একদিন এক রাত্রের সালাত দোহরাবে আর ঐ

http://islaminonesite.wordpress.com/

কুয়ার পানি লেগেছে এমন প্রতিটি জিনিস ধুয়ে ফেলতে হবে। আর যদি ফুলে বা পচে গলে গিয়ে থাকে তাহলে তিন দিন তিন রাত্রের সালাত দোহরাবে। ইহা আবূ হানীফা (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, পতিত হওয়ার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া তাদের কিছুই দোহরান জরুরী নয়। কেননা নিশ্চিত অবস্থা সন্দেহ দ্বারা দূরীভূত হয় না। এটা হল ঐ ব্যক্তির অবস্থার মত যে তার কাপড়ে নাজাসাত দেখতে পেলো, কিন্তু কখন লেগেছে তা সে জানে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, এখানে মৃত্যুর একটি প্রকাশ্য কারণ রয়েছে। তা হল পানিতে পতিত হওয়া। সুতরাং এর সাথে মৃত্যুকে সম্পৃক্ত করা হবে। তবে যেহেতু ফুলে উঠা সময়ের দীর্ঘতার প্রমাণ, সেহেতু সময় সীমা তিন দিন নির্ধারণ করা হবে। আর ফুলে ফেটি না যাওয়া যেহেতু সময়ের নৈকট্যের প্রমাণ; সেহেতু তার সময়সীমা আমরা একদিন একরাত্র নির্ধারণ করেছি। কেননা, এর নীচে হচ্ছে মূহুর্তসমূহ,যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য (কাপড়ে) নাজাসাত (লেগে থাকার) বিষয়টি সম্পর্কে মুআল্লার বক্তব্য হল, এর মধ্যেও মতভেদ রয়েছে। অর্থাত্ পুরাতন লাগা নাজাসাতের জন্য তিন দিনের সময় সীমা নির্ধারণ করা হবে। আর তাজা নাজাসাতের বেলায় একদিন এক রাত্রের। আর যদি মতভেদ না থাকার দাবী স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তা হলে যেহেতু কাপড় তার দৃষ্টির সম্মুখে থাকে আর কুয়া থাকে দৃষ্টির আড়ালে। সুতরাং দু'টোর মাসআলা আলাদা।

পরিচ্ছেদঃ উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি

প্রত্যেক প্রাণীর ঘাম তার উচ্ছিষ্টের সাথে বিবেচ্য। কেননা (লালা ও ঘাম) দু'টোরই জন্ম তার গোশত থেকে। সুতরাং একটিতে অপরটির বিধান প্রযোজ্য।

মানুষের উচ্ছিষ্ট এবং যে প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়, তার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তার সাথে লালা মিশ্রিত হয়েছে। আর তা সৃষ্ট হয়েছে পাক গোশত থেকে। জুনুবী, ঋতুমতী এবং কাফিরও এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। সে কোন পাত্রে মুখ দিলে তা ধুতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-কুকুরের মুখ দেওয়ার কারণে পাত্র তিনবার ধুতে হবে।

কুকুরের জিহ্বা (সাধারণত) পানি স্পর্শ করে, পাত্র নয়। সুতরাং পাত্র যখন নাপাক হয়ে যায়, তখন পানি নাপাক হওয়াত অনিবার্য।

এ হাদীছে নাপাক হওয়া এবং ধোয়ার সংখ্যা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) এর সাতবার ধোয়ার শর্ত আরোপের বিপক্ষে দলীল।

তা ছাড়া, যে বস্তুতে কুকুরের পেশাব লাগে, তা তিনবার ধুইলে পাক হয়ে যায়। কাজেই যে বস্তুতে তার উচ্ছিষ্ট লাগে-যা পেশাবের চেয়ে সাধারণ, তা পাক হওয়া তো আরো স্বাভাবিক। আর সাতবার ধোয়া সম্পর্কে বর্ণিত নির্দেশ ইসলামের প্রথম যুগের অবস্থায় প্রয়োজ্য।

শূকরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শূকর সত্তাগতভাবেই নাপাক।

হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট নাপাক। শূকর ও কুকুর ছাড়া অন্যান্য হিংস্র পশুর উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপরীত মত রয়েছে।

আমাদের দলীল হল, কেননা হিংস্র পশুর গোশত নাপাক এবং তা থেকেই লালা সৃষ্ট। আর লালার হুকুম গোশতের উপরই নির্ভরশীল।

বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক কিন্তু (তা ব্যবহার করা) মাকরূহ।

ইমাম আবূ ইউসফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তা মাকরূহও নয়। কেননা, নবী (সা.) বিড়ালের জন্য পাত্র কাত করে ধরতেন। বিড়াল তা থেকে পানি পান করতো, পরে তা দ্বারা তিনি উযূ করতেন। (দারা কুতনী)

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর দলীল হলো, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-বিড়াল হিংস্র প্রাণী। এ হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিধান বর্ণনা করা। তবে নাকেস হওয়ার হুকুম রহিত করা হয়েছে (গৃহের অভ্যন্তরে) সর্বদা ঘুরাফেরার কারণে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সুতরাং মাকরূহ হওয়ার হুকুম বাকী থেকে যায়। আর পাত্র কাত করে ধরার বর্ণনা হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের উপর ধর্তব্য।

উল্লেখ্য যে, কারো মতে তার উচ্ছিষ্ট মাকরূহ হওয়ার কারণ, গোশত নাপাক হওয়া। আর কারো মতে নাজাসাত পরিহার না করার কারণে। আর শেষোক্ত মতে তানযীহের এবং প্রথম মতে হারামের কাছাকাছি হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে।

বিড়াল যদি ইদুর খেয়ে সাথে সাথে পানি পান করে, তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তবে কিছু সময় বিলম্ব করার পর হলে নাপাক হবে না। কেননা সে লালা দ্বারা মূখ পরিস্কার করে ফেলে। এ ব্যতিক্রম শুধু ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতানুযায়ী। আর অনিবার্য প্রয়োজনবশতঃ পাক হওয়ার জন্য পানি ঢালার শর্তটি রহিত হয়ে যাবে।

ছেড়ে দেয়া মুরগীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। কেননা ছাড়া মুরগী নাজাসাত ঘটে। তবে যদি এমন ভাবে বাঁধা থাকে যে, তার পায়ের নীচ পর্যন্ত তার চঞ্চু পৌছে না, তাহলে নাজাসাতের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকার কারণে মাকরূহ হবে না।

হিংস্র পাখীর উচ্ছিষ্টও তদ্রূপ নাপাক। কেননা এরা মরা খায়, সুতরাং ছাড়া মুরগীর মতই হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, হিংস্র পাখী যদি আবদ্ধ থাকে এবং মালিক জানে যে, পাখীর ঠোটে ময়লা নেই, তাহলে (নাজাসাতের) সংস্পর্শ থেকে সংরক্ষিত থাকার কারণে (তার উচ্ছিষ্ট) মাকরূহ হবে না। মাশায়েখগণ এ মতই উত্তম বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সাপ, ইদুর ইত্যাদি গৃহে অবস্থানকারী প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাকরূহ।কেননা (এগুলোর) গোশত হারাম হওয়ার অবশ্যম্ভাবী চাহিদা হল উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়া। তবে সর্বদা গৃহে বিচরণের কারণে নাজাসাতের হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং মাকরূহ হওয়ার হুকুম অবশিষ্ট থাকে। আর বিচরণের কারণটি বিড়ালের ব্যাপারে (হাদীছে) উল্লেখ করা হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট সন্দেহযুক্ত। কারো মতে সন্দেহটি পবিত্রতা সম্পর্কে। কেননা উচ্ছিষ্ট পানি পবিত্র হলে অবশ্যই পবিত্রকারীও হবে, যতক্ষণ না লালা পানির চেয়ে অধিক হয়।

অন্য মতে সন্দেহটি পানির পবিত্রকরণ গুণ সম্পর্কে। কেননা সে যদি পানি পায়, তবে তার মাথা ধোয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। তদ্রূপ তার দুধ পাক। তার ঘাম নামাযের বৈধতাকে বাধাগ্রস্ত করে না, যদিও পরিমাণে তা বেশী হয়। সুতরাং তার উচ্ছিষ্ট অনুরূপ হবে। এ মতই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। গাধার উচ্ছিষ্ট পাক হওয়ার সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদের স্পষ্ট মত বর্ণিত রয়েছে। সন্দেহের কারণ হচ্ছে গাধার গোশত হালাল বা হারাম হওয়া দলীলগুলো পরস্পর বিরোধী। কিংবা তার উচ্ছিষ্ট পাক বা নাপাক হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে।

আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হারাম ও নাপাক হওয়াতে অগ্রাধিকার দিয়ে গাধার উচ্ছিষ্টকে নাজিস বলেছেন। খচ্চর যেহেতু গাধার প্রজননভূক্ত, সুতরাং সেও গাধার পর্যায়ের হবে। যদি গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি না পাওয়া যায়, তাহলে তা দ্বারা উযূ করবে এবং তায়াম্মুম করবে। এবং যে কোনটা আগে করা জাইয।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উযূকে অগ্রবর্তী না করলে জাইয হবে না। কেননা তা এমন পানি (শরীআতের হুকুম মতে) যার ব্যবহার করা ওয়াজিব। সুতরাং তা সাধারণ পানির সদৃশ।

আমাদের দলীল এই যে, যেহেতু পবিত্রকারী হল দু'টির যে কোন একটি, ফলে উভয়ের একত্র হওয়াই বাঞ্চনীয়; এর চাহিদা ক্রমবিন্যাস নয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ঘোড়ার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা তার গোশত হালাল। বিশুদ্ধ বর্ণনায় ইমাম আবূ হানীফার মতও অনুরূপ। কেননা গোশত মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো তার মর্যাদা প্রকাশ করা।

যদি খোরমা ভিজানো পানি ছাড়া কোন পানি পাওয়া না যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, তা দ্বারা উযূ করবে, তায়াম্মুম করবে না। কেননা জিন

http://islaminonesite.wordpress.com/

সম্প্রদায়ের সাথে সাক্ষাতের রাত্রি সম্পর্কীয় হাদীছ রয়েছে যে, নবী (সা.) পানি না পেয়ে খোরমা ভিজানো পানি দ্বারা উযূ করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, তায়াম্মুম করবে, তা দিয়ে উযূ করবে না। আবূ হানীফা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র.) ও এমত পো্ষণ করেন; তায়াম্মুমের আয়াতের উপর আমলের পরিপ্রেক্ষিতে। কেননা আয়াত অধিক শক্তিশালী। অথবা হাদীছ আয়াতের দ্বারা রহিত। কেননা তায়াম্মুমের আয়াত মাদানী আর জিনের রাত্রির ঘটনা হল মাক্কী।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উযূ ও তায়াম্মুম দু'টোই করবে। কেননা হাদীছের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা রয়েছে। আর (ঘটনাটির) তারিখ (সঠিক) জানা নয়। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনে উভয়টির উপর আমল করা ওয়াজিব।

আমাদের পক্ষ থেকে জবাব এই যে, লায়লাতুল জিনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছিলো। সুতরাং রহিত হওয়ার দাবী সঠিক নয়। আর হাদীছটি মশহুর পর্যায়ের, যার উপর সাহাবায়ে কিরাম আমল করেছেন। এধরনের মশহুর হাদীছ দ্বারা কিতাবুল্লাহ (এর হুকুমে) বাড়ানো যায়।

আর তা দ্বারা গোসল করার ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তা জাইয আছে, উযূর উপর কিয়াস করে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, গোসল জাইয নয়। কেননা গোসল উযূর চেয়ে উপরের স্তরের।

ঐ নাবীয সম্পর্কে বিরোধ রয়েছে, যা মিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এমন তরল যে, সাধারণ পানির মত অংগে প্রবাহিত হয়। আর যা গাঢ় হয়ে গেছে, তা হারাম হবে; তা দ্বারা উযূ জাইয হবে না। আর যদি আগুনে জ্বাল দেয়ার কারণে তাতে পরিবর্তন আসে, তাহলে মিষ্ট থাকা পর্যন্ত অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। আর যদি গাঢ় হয়ে যায় তাহলেও আবূ হানীফা (র.) এর মতে তা দ্বারা উযূ জাইয। কেননা, তাঁর মতে তা পান করা হালাল। আর ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে তা পান করা হারাম বিধায় তা দ্বারা উযূ করা যাবে না।

'নাবীযুত্তামর' ছাড়া অন্য সকল নাবীয দ্বারা কিয়াসের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে উযূ জাইয হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

তায়াম্মুম

মুসাফির অবস্থায় কিংবা বাইরে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি পানি না পায় আর তার ও শহরের মাঝে এক মাইল বা ততোধিক দূরত্ব হয়, তাহলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ আর যদি তোমরা পানি না্ পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-মাটি হলো মুসলমানের জন্য পবিত্রকারী, যতক্ষণ পানি না পাওয়া যায়, এমন কি দশ বছরও যদি হয়।

দূরত্বের পরিমাণের ক্ষেত্রে 'মাইল'ই হলো গ্রহণযোগ্য। কেননা (এতটুকু দূরত্ব থেকে) শহরে প্রবেশ করতে তার কষ্ট হবে। আর প্রকৃতপক্ষে পানিতো অনুপস্থিত। দূরত্বই হলো বিবেচ্য, নামায ফউত হওয়ার আশংকা বিবেচ্য নয়। কেননা ত্রুটি এর পক্ষ থেকেই এসে থাকে। যদি পানি পেয়ে যায় কিন্তু সে অসুস্থ থাকে এবং আশংকা করছে যে, পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তবে তায়াম্মুম করবে।

ঐ আয়াতের ভিত্তিতে যা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া অসুস্থতা বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি পানির মূল্যবৃদ্ধিজনিত ক্ষতির চেয়ে বেশী। অথচ এতে তায়াম্মুমের অনুমতি রয়েছে।

সুতরাং তাতে অনুমতি হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

আর যোগ বৃদ্ধির আশংকা নড়াচড়ার কারণে হোক কিংবা পানির ব্যবহারের কারণে হোক এতে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম শাফিঈ (র.) তায়াম্মুম জাইয হওয়া অংগহানী বা প্রাণহানীর আশংকার উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তা অগ্রাহ্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

জুনুবী ব্যক্তি যদি আশংকা করে যে, সে গোসল করলে ঠান্ডায় মারা যাবে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তাহলে সে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে পারবে।

এ হুকুম ঐ অবস্থায় যখন সে শহরের বাইরে। এর কারণ (ইতোপূর্বে) আমরা বর্ণনা করেছি। আর যদি শহরেই থাকে তাহলে আবূ হানীফ (র.) এর মতে একই হুকুম। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। তারা বলেন, শহরে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া বিরল। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়।

ইমাম সাহেবের যুক্তি এই যে, অক্ষমতা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তা বিবেচনা করা জরুরী।

তায়াম্মুম হল (মাটিতে) দু'বার উভয় হাত লাগান। একবারের দ্বারা মুখ মাসহ করবে এবং দ্বিতীয় বারের দ্বারা কনুই পর্যন্ত উভয় হাত মাসহ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তায়াম্মুম হলো (মাটিতে) দুবার হাত লাগান, একবার হাত লাগান হলো মুখমন্ডলের জন্য। আরেক বার হাত লাগান হলো উভয় হাতের জন্য।

আর উভয় হাত এমন ভাবে ঝাড়া দিবে, যেন মাটি ঝরে যায়। যাতে তার আকৃতি বিকৃত না হয়ে যায়।

যাহিরী রিওয়ায়াত মতে মাসহ পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরী। কেননা তায়াম্মুম উযূর স্থলবর্তী। এ জন্যই ফকীহগণ বলেছেন যে, আংগুলগুলো খেলাল করবে এবং আংটি খুলে নিবে, যাতে মাসহ পূর্ণাঙ্গ হয়।

তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে হাদাছ ও জানাবাত দু'টোই সমান। তদ্রুপ হায়য ও নিফাছের তায়াম্মুম। কেননা বর্ণিত আছে যে, এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে এসে আরয করলো, আমরা মরুভূমিতে বাস করি, ফলে এক দু'মাস আমরা পানি পাই না। অথচ আমাদের তোমরা তোমাদের মাটির সাহায্য নিবে (অর্থাত তায়াম্মুম করবে)।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে মৃত্তিকা জাতীয় যে কোন বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জাইয। যেমন-মাটি, বালু, পাথর, সুরকি চুনা, সাধারণ চুনা, সুরমা,

http://islaminonesite.wordpress.com/

ও হরিতাল। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, মাটি ও বালু ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জাইয হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উৎপাদনকারী মাটি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা তায়াম্মুম জাইয হবে না। আবূ ইউসূফ থেকেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- তোমরা পবিত্র (অর্থাত্ উৎপাদনকারী) মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। অর্থাত্ উৎপাদনকারী মাটি দ্বারা এ কথা ইবন 'আব্বাস (রা.) বলেছেন।

তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) আমাদের বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীছের কারণে মাটির সাথে বালু বর্ধিত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, ভূ-পৃষ্ঠের নাম, (শব্দের অর্থ উচ্চু) ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চুত্বের কারণেই তার এ নামকরণ করা হয়েছে। আর শব্দটি 'পবিত্র' অর্থও বহন করে। সুতরাং সে অর্থেই তাকে প্রয়োগ করা হবে। কেননা, তাহারাতের ক্ষেত্রে এ অর্থই অধিক উপযোগী। অথবা ইজমার দ্বারা এ অর্থ গৃহীত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে মৃত্তিকার উপর ধূলা থাকা শর্ত নয়। কেননা, আমাদের উল্লেখিত আয়াতটি নিঃশর্ত।

তদ্রুপ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে মাটি ব্যবহারে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ধুলা দ্বারা তায়াম্মুম জাইয। কেননা তা মিহি মাটি।

তায়াম্মুমে নিয়্যত ফরয।

ইমাম যুফার (র.)বলেন, ফরয নয়। কেননা, তায়াম্মুম উযূর স্থলবর্তী। সুতরাং গুণের দিক থেকে তার বিপরীত হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, (আভিধানিক ভাবে) তায়াম্মুম শব্দ দ্বারা ইচ্ছা বুঝায়। সুতরাং ইচ্ছা (নিয়্যত) করা ছাড়া তা সঠিক হবে না।

কিংবা মাটিকে বিশেষ অবস্থায় পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পানি স্বকীয়ভাবেই পবিত্রকারী। তবে যদি তাহারাতের কিংবা সালাতের বৈধ হওয়ার নিয়্যত করে তাহলে তা যথেষ্ট। হাদাছের বা জানাবাতের তায়াম্মুমের (আলাদা) নিয়্যত করা শর্ত নয়। এটিই বিশুদ্ধ মাযহাব।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কোন খৃষ্টান (বিধর্মী) যদি ইসলামের গ্রহণের নিয়্যতে তায়াম্মুম করে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে সে তায়াম্মুকারী গণ্য হবে না। আর আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুকারী গণ্য হবে। কেননা সে একটি উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়্যত করেছে। পক্ষান্তরে মসজিদে প্রবেশের এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করার জন্য তায়াম্মুম করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এটা উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না এমন উদ্দিষ্ট ইবাদতের নিয়্যত করার অবস্থা ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে মাটিকে পবিত্রকারী সাব্যস্ত করা হয়নি। আর ইসলাম হলো এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয়।তিলাওয়াতের সিজদার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা এমন উদ্দিষ্ট ইবাদত, যা তাহারাত ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না।

আর যদি সে ইসলাম গ্রহণের নিয়্যত না করেই উযূ করে তারপর ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সে উযূকারী গণ্য হবে। নিয়্যত শর্ত হওয়ার ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কোন মুসলমান যদি তায়াম্মুম করে তারপর আল্লাহ্ না করুন মুরতাদ হয়ে যায় তার পর পুনঃইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার পূর্ব তায়াম্মুম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা কুফর তায়াম্মুমের বিপরীতধর্মী। সুতরাং এতে প্রথম অবস্থা ও শেষ অবস্থা উভয়ই সমান হবে। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার ব্যাপার।

আমাদের দলীল এই যে, (তায়াম্মুম তো আর স্ব-সত্তায় বিদ্যমান থাকে না যাকে কুফর এসে দূর করে দিবে, বরং) তায়াম্মুমের পর ব্যক্তির মাঝে পবিত্র হওয়ার গুণই বিদ্যমান থাকে।সুতরাং তার উপর কুফর আরোপিত হলে তা পবিত্রতার বিপরীতধর্মী নয়। যেমন, উযূর উপর যদি কুফর আরোপিত হয়।

উল্লেখ্য যে, কাফিরের নিয়্যত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় তার তায়াম্মুম দুরস্ত হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

উযূ ভংগকারী সকল বিষয় তায়াম্মুমও ভংগ করে। কেননা, তায়াম্মুম উযূর স্থলবর্তী। সুতরাং তা উযূর হুকুম গ্রহণ করবে।

আর পানির দেখা পাওয়াও তায়াম্মুম ভংগ করে; যদি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। কেননা পানি পাওয়া দ্বারা ব্যবহার সক্ষমতাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। যে প্রাপ্যকে মাটির পবিত্রীকরণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

হিংস্র প্রাণী, শত্রু বা পিপাসার আশংকায় শংকিত ব্যক্তি কার্যতঃ অক্ষম। আর আবু হানীফা (র.) এর মতে ঘুমন্ত ব্যক্তি বস্তুত সক্ষম। তার মতে তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় পানির নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তার তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। (পানি দেখতে পাওয়া) অর্থ হলো ঐ পরিমাণ (পানি) যা উযূর জন্য যথেষ্ট হয়। কেননা প্রথম অবস্থায়ই এর চেয়ে কম পরিমাণ ধর্তব্য নয়। সুতরাং শেষ অবস্থায়ও তা ধর্তব্য হবে না।

পবিত্র মাটি ছাড়া তায়াম্মুম করবে না। কেননা আয়াতের শব্দ দ্বারা পবিত্র বুঝানো হয়েছে। তা ছাড়া মাটি হলো পবিত্রীকরণের উপাদান। সুতরাং পানির মতো তার পবিত্র হওয়া জরুরী।

পানি যে পাচ্ছে না, অথচ পাওয়ার আশা করছে, তার জন্য আখেরি ওয়াকত পর্যন্ত সালাত বিলম্বিত করা মুসতাহাব। তারপর পানি পেয়ে গেলে উযূ করবে; অন্যথায় তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নিবে।

যাতে দু'টি পবিত্রতার পূর্ণতমটি দ্বারা সালাত সম্পাদন হয়। সুতরাং বিষয়টি জামাআত পাওয়ার আশায় অপেক্ষমান ব্যক্তির মতো হলো।

মূল ছয় গ্রন্থের বহির্ভূত বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে বিলম্ব করা ওয়াজিব। কেননা প্রবল ধারণা বাস্তবতুল্য।

যাহেরুর রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, অপারগতা প্রকৃতই বর্তমান। সুতরাং অনুরূপ নিশ্চয়তা ছাড়া অপারগতার বিধান রহিত হবে না।

তায়াম্মুমকারী তার তায়াম্মুম দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয, নফল সালাত আদায় করতে পারবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে প্রতিটি ফরয সালাতের জন্য আলাদা করতে হবে। কেননা, তা জরুরী অবস্থার তাহারাত।

আমাদের দলীল এই যে, পানির অনুপস্থিতিতে মাটি পবিত্রকারী। সুতরাং যতক্ষণ তার শর্ত বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকর থাকবে।

শহর এলাকায় যদি জানাযা উপস্থিত হয় এবং (জানাযার) ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ হয়, আর উযূ করতে গেলে জানাযা ফউত হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে সুস্থ ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারবে। কেননা জানাযার কাযা নেই। সুতরাং অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়।

অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি ঈদের জামা'আতে হাযির হল এবং উযূ করতে গেলে ঈদের সালাত ফউত হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, তবে তায়াম্মুম করতে পারে। কেননা ঈদের জামা'আত দোহরানো হয় না।

ইমাম কুদূরী (র.) এর বক্তব্য আর ওয়ালী সে ছাড়া অন্য কেউ কথাটির উদ্দেশ্য হল, ওয়ালীর জন্য তায়াম্মুম করা জাইয নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ইমাম হাসান ইবন যিয়াদের বর্ণনা। এবং এটাই শুদ্ধ। কেননা, ওয়ালীর অধিকার আছে সালাত দোহরনোর। সুতরাং তার পক্ষে ফউত প্রযোজ্য নয়।

ইমাম কিংবা মুকতাদী যদি ঈদের সালাতের (মধ্যে) হাদাছগ্রস্ত হয়। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে সে তায়াম্মুম করবে এবং বিনা করবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে তায়াম্মুম করতে পারবে না। কেননা ব্যক্তি ইমামের ফারেগ হওয়ার পর অবশিষ্ট সালাত আদায় করতে পারে। সুতরাং তার ফউত হওয়ার আশংকা নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে আশংকা বিদ্যমান আছে। কেননা সেদিন হলো ভিড়ের দিন। ফলে এমন কোন পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে, যা তার সালাত ফাসিদ করার কারণ হয়ে দাড়াবে।

এ মত পার্থক্য ঐ ক্ষেত্রে , যখন উযূ দ্বারা সালাত শুরু করে থাকে। আর তায়াম্মুম দ্বারা শুরু করে থাকলে সকলের মতেই তায়াম্মুম 'বিনা' করবে। কেননা যদি আমরা

http://islaminonesite.wordpress.com/

তার উপর উযূ ওয়াজিব করি, তাহলে সালাতের মধ্যে সে পানি পেয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তো সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

জুমুআর সালাতের ব্যাপারে যদি আশংকা করে যে, উযূ করলে তা ফউত হয়ে যাবে, তাহলেও তায়াম্মুম করবে না। বরং (উযূ করার পর) যদি জুমুআর সালাত পায় তাহলে জুমুআ আদায় করবে। অন্যথায় চার রাকাআত যুহর আদায় করবে। কেননা তা স্থলবর্তী রেখে ফউত হয়। আর তা হল যুহরের সালাত। আর ঈদের সালাত এর বিপরীত।

তদ্রুপ যদি উযূ করার ব্যাপারে সালাতের সময় ফউত হওয়ার আশংকা করে তাহলে তায়াম্মুম করতে পারবে না; বরং উযূ করবে এবং যে সালাত ফউত হয়েছে তা কাযা করবে। কেননা এ সালাত স্থলবর্তী রেখে ফউত হচ্ছে। আর তা হলো কাযা।

মুসাফির যদি তার বাহনে রক্ষিত পানির কথা ভুলে যায় এবং তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে নেয়। এর পরে পানির কথা স্মরণ হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে উক্ত সালাত দোহরাবে না। আর আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, উক্ত সালাত দোহরাবে।

এ মত-পার্থক্য হলো ঐ অবস্থায়, যখন পানি সে নিজে কিংবা তার নির্দেশে অন্য কেউ রেখে থাকে। ওয়াকতের ভিতরে এবং ওয়াকতের পরে স্মরণ হওয়ার একই হুকুম।

ইমাম আবূ ইউসূফের দলীল এই যে, সে পানিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং সে হলো ঐ ব্যক্তির মত, যে তার বাহনে রাখা কাপড়ের কথা ভুলে যায়। তাছাড়া মুসাফিরের বাহনে সাধারণতঃ পানির মওজুদ রাখা হয়; সুতরাং পানির খোঁজ করা ফরয।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, জানা না থাকলে সক্ষমতা প্রয়োজন হয় না। আর পানির প্রাপ্তির দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। আর বাহনে (সাধারণত) খাওয়ার পানি রাখা হয়, ব্যবহারের জন্য নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর বস্ত্রের মাসআলাটিরও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর যদি এ মাসআলায় ঐকমত্যও থাকে, তাহলে উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সতরের ফরয ফউত হচ্ছে স্থলবর্তীহীন ভাবে। আর পানি দ্বারা তাহারাত এর বিষয়টি ফউত হচ্ছে একটি স্থলবর্তী রেখে, আর তা হলো তায়াম্মুম।

তায়াম্মুমকারীর অন্তরে যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কাছেই পানি আছে, তবে তার জন্য পানির খোঁজ নেওয়া জরুরী নয়। কেননা বিশাল প্রান্তরে পানি না থাকারই সম্ভাবনা বেশী। আর পানির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। সুতরাং সে ব্যক্তি পানিপ্রাপ্ত নয়।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সেখানে পানি আছে, তাহলে খোঁজ না নিয়ে তায়াম্মুম করা তার জন্য জাইয হবে না। কেননা (প্রবল ধারণা-জনিত) প্রমাণের প্রেক্ষিতে সে পানিপ্রাপ্ত বল সাব্যস্ত হবে। তবে পানির অনুসন্ধানের ব্যাপার এক তীরের দূরত্ব পর্যন্ত (কেউ কেউ বলেন, অর্থাত্ তিনশ গজ) খোজ করবে। এক মাইল দূরত্ব পর্যন্ত যেতে হবে না, যাতে সে তার কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

যদি তার সফর সংগীর কাছে পানি থাকে, তাহলে তায়াম্মুমের আগে তার কাছে পানি চাইবে। কেননা, সাধারণত পানি দিতে অসম্মতি থাকে না। যদি সে তাকে পানি না দেয় তাহলে অপারগতা সাব্যস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে তায়াম্মুম করে নিবে।

যদি চাওয়ার আগেই তায়াম্মুম করে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা অন্যের মালিকানা থেকে চাওয়া জরুরী নয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, তায়াম্মুম তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা পানি সাধারণতঃ এমনিই দেওয়া হয়ে থাকে।

যদি ন্যায্য মূল্য ছাড়া দিতে অস্বীকার করে আর তার কাছে পানির মূল্য থেকে থাকে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম যথেষ্ট হবে না। সক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তবে অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্য বহন করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা ক্ষতিগ্রস্ততা হুকুম রহিতকারী। আল্লাহই অধিক জানেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

মোজার উপর মাসহ

মোজার উপর মাসহ করার বৈধতা 'সুন্নাহ' দ্বারা প্রমাণিত। এ সংক্রান্ত হাদীছসমূহ প্রসিদ্ধ। এমন কি বলা হয় যে, যে ব্যক্তি মাসহ এর বৈধতা বিশ্বাস করবে না সে বিদআতপন্থী। তবে যে ব্যক্তি মাসহ এর বৈধতা বিশ্বাস করার পর আযীমত-এর উপর আমলের উদ্দেশ্য মাসহ তরক করে, সে সাওয়াবের অধিকারী হবে।

উযূ ওয়াজিবকারী যে কোন হাদাছের জন্য মোজার উপর মাসহ করা জাইয। যদি পূর্ণাঙ্গ তাহারাতের অবস্থায় তা পরিধান করে থাকে এবং পরবর্তীতে হাদাছগ্রস্ত হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র.) মোজার উপর মাসহকে উযূ ওয়াজিবকারী হাদাছের সাথে বিশিষ্ট করেছেন, কেননা জানাবাতের ক্ষেত্রে মাসহ বৈধ নয়, যা যথাস্থানে ইনশাল্লাহ বর্ণনা করবো।

সেই সাথে (মাসহকে তিনি) পরবর্তী হাদাছ এর সাথে (বিশিষ্ট করেছেন)। কেননা, শরীআতের দৃষ্টিতে মোজা হাদাছ বোধকারী। এখন যদি আমরা পূর্ববতী হাদাছ বলায় মাসহ জাইয বলি, যেমন মুস্তাহাযা নারী মোজা পরলো তারপর সালাতের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। তদ্রুপ তায়াম্মুমকারী ব্যক্তি মোজা পরলো, তারপর দেখতে পেলো তাহলে তো মাসহ (বিদ্যমান হাদাছ) দূরকারী হবে।

যখন পূর্ণাংগ তাহারাত অবস্থায় মোজা পরবে। ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্য পরিধানের সময় (তাহারাতের) পূর্ণাংগতার শর্ত উদ্দেশ্য নয়, বরং (পরবর্তী) হাদাছের সময়ের জন্য।

এটা হলো আমাদের মাযহাব। সুতরাং কেউ যদি আগে দু'পা ধুয়ে মোজা পরে নেয় তারপর তাহারাত পূর্ণ করে তারপর হাদাছগ্রস্ত হয় তাহলে সে মাসহ করতে পারে। এ হুকুমের কারণ এই যে, মোজা পায়ের ভিতরে হাদাছের অনুপ্রবেশ রোধ করে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সুতরাং রোধ করার সময় তাহারাতের পূর্ণাংগতা লক্ষণীয় হবে। কেননা, সে সময় যদি তাহারাত অসম্পূর্ণ থাকে, তবে মোজা হাদাছ রোধকারীর পরিবর্তে দূরকারী হবে।

মুকীমের জন্য একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিনরাত মাসহ করা জাইয। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ বলেছেন- মুকীম একদিন একরাত্র এবং মুসাফির তিনদিন তিনরাত্র মাসহ করবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন- সময়সীমার শুরু হবে হাদাছ এর পর থেকে। কেননা, মোজা হাদাছের অনুপ্রবেশ রোধকারী, সুতরাং রোধ করার সময় থেকে সময় ধর্তব্য হবে।

মাসহ করা হবে উভয় মোজার উপরাংশে আংগুল দ্বারা রেখা টানা রূপে (পায়ের) আংগুলের দিক থেকে শুরু করে পায়ের ‘সাক’ (টখনু থেকে হাটু) এর দিকে নিবে। কেননা মুগীরাহ (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী (সা.) তাঁর উভয় মোজার উপর নিজের দুইহাত রেখে পায়ের আংগুল থেকে উপরের দিকে একবার মাসহ করলেন। আমি এখনো যেন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মোজার উপর আংগুল রেখে মাসহ এর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।

উপরাংশে মাসহ করা ওয়াজিব। সুতরাং মোজার তলায়, গোড়ালীতে বা গোড়ায় মাসহ করা জাইয হবে না। কেননা মাসহ (এর মাসআলা) কিয়াস বহির্ভূত। সুতরাং শরীআত নির্দেশিত যাবতীয় বিষয়ের অনুসরণ করতে হবে।

আঙ্গুল থেকে মাসহ শুরু করা মুস্তাহাব আসল হুকুম ধৌত করণের অনুসরণে (ক্ষেত্রে)।

মাসহর ফরয হল হাতের আংগুলের তিন আংগুল পরিমাণ। ইমাম কারখী (র.) বলেন, পায়ের আংগুলের পরিমাণ। প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ যেহেতু মাসহর উপকরণ বিবেচনা বাঞ্চনীয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ঐ মোজার মাসহ করা জাইয হবে না, যাতে প্রচুর ছেড়া আছে এবং তা দিয়ে পায়ের তিন আংগুল পরিমাণ জায়গা দেখা যায়। যদি তার চেয়ে কম হয় তাহলে জাইয হবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সামান্য ছেড়া হলেও মাসহ জাইয হবে না। কেননা প্রকাশিত অংশটি ধোয়া যখন ওয়াজিব হয়ে গেলো তখন অবশিষ্ট অংশও ধোয়া ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল এই যে, মোজা সাধারণতঃ সামান্য ছেঁড়া থেকে মুক্ত থাকে না। সুতরাং খুলতে গেলে পরিধানকারিগণ কষ্টের সম্মুখীন হয়। বেশী ছেঁড়া থেকে সাধারণত মুক্ত থাকে, সুতরাং এর কারণে কষ্ট হবে না।

আর ‘অধিক’ এর পরিমাণ হলো পায়ের কনিষ্ঠ আংগুলগুলোর তিন আংগুল পরিমাণ। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, পায়ের পাতার মধ্যে আংগুলই হলো আসল। আর তিন হলো অধিকাংশ। তাই তিনকে সমগ্রের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে। আর সতর্কতা অবলম্বনে অগ্রভাগ ঢুকে যাওয়াটা ধর্তব্য নয়। প্রতিটি মোজায় আলাদাভাবে এই পরিমাণ হিসাব করা হবে। অর্থাত্ একটি মোজার সবকটি ফুটো একত্রে (হিসাব) করা হবে। কিন্তু উভয় মোজার ফুটোগুলো একত্র করা হবে না। কেননা, এক মোজার ফুটো অন্য মোজার দ্বারা সফর করতে বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে লেগে থাকা নাজাসাত এর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে তো সমগ্র নাজাসাত-ই বহনকারী। ছতর খুলে যাওয়ার বিষয়টি (বিক্ষিপ্তভাবে লেগে থাকা) নাজাসাতের নজীর হিসাবে গণ্য।

যার উপর গোসল ওয়াজিব হয়েছে, তার জন্য মাসহ করা জাইয নয়। কেননা, সাফওয়ান ইবন আসসাল (র.) বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) সফরের সময় আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, যাতে আমরা জানাবাত ছাড়া পেশাব, পায়খানা ও ঘুম ইত্যাদি হাদাছের ক্ষেত্রে তিনদিন তিনরাত আমাদের মোজা না খুলি।

তাছাড়া জানাবাত সাধারণত বারংবার ঘটে না। সুতরাং মোজা খোলায় তেমন কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে হাদাছের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা বারংবার ঘটে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

উযূ ভংগ করে এমন প্রতিটি বিষয় মাসহ ভংগ করে। কেননা মাসহ তো উযূরই অংশ বিশেষ।

মোজা খুলে ফেলাও মাসহকে ভংগ করে। কেননা রোধকারী না থাকার কারণে পায়ের পাতায় হাদাছ অনুপ্রবেশ করবে। তদ্রূপ একটি মোজা খুললেও (হাদাছ ভংগ হবে)। কেননা একই নির্দেশনায় মাসহ ও ধোয়ার হুকুম একত্র করা অসম্ভব। তদ্রূপ সময় উত্তীর্ণ হওয়া (মাসহ ভংগের কারণ)। (এ হুকুম) পূর্ব বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী।

সময়সীমা যখন পূর্ণ হবে তখন উভয় মোজা খুলে ফেলবে এবং উভয় পা ধুয়ে সালাত আদায় করতে পারবে। উযূর অবশিষ্ট কার্য দোহরানো জরুরী নয়। সময়ের আগে খুলে ফেলারও একই হুকুম। কেননা, খোলার সময় পূর্ববর্তী হাদাছ পায়ের পাতায় অনুপ্রবেশ করে, যেন সে তা ধোয়াইনি। মোজা খুলে যাওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হবে পায়ের পাতা মোজার সাক পর্যন্ত (খাড়া অংশে) এসে গেলে। কেননা মাসহের ক্ষেত্রে এ অংশটা ধর্তব্য নয়। পায়ের পাতার অধিকাংশ বের হয়ে গেলেও একই হুকুম। এটাই বিশুদ্ধ মত।

মুকীম অবস্থায় যে ব্যক্তি মাসহ শুরু করেছে, অতঃপর একদিন একরাত্র পূর্ণ হওয়ার আগেই সফরে বের হয়ে যায়, সে তিনদিন তিন রাত্র মাসহ করবে।

এ হুকুম হাদীছের শর্তহীন থাকার কারণে এটাই কার্যকর। তাছাড়া মাসহর হুকুম হল সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তার ক্ষেত্রে শেষ সময় বিবেচ্য হবে। মুকীম অবস্থার সময়সীমা পূর্ণ করার পরে সফর করার বিষয় এর বিপরীত। কেননা, (সময় সীমা পার হওয়া মাত্র) হাদাছ পায়ের পাতায় অনুপ্রবেশ করে যায়। আর মোজা হাদাছ দূরকারী নয়।

মুকীমের মুদ্দত (এক দিন এক রাত) পূর্ণ করার পর যদি কোন মুসাফির মুকীম হয় তাহলে মোজা খুলে ফেলবে। কেননা, সফর শেষ হওয়ার পর সফরের সুবিধামূলক হুকুম অব্যাহত থাকবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি মুকীমের মুদ্দত পূর্ণ না করে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে। কেননা, এ হল মুকীম অবস্থার মুদ্দত। আর বর্তমানে সে মুকীম। মোজার উপর যে ব্যক্তি ‘জারমুক’ (আবরণী মোজা) পরে সে তার উপরই মাসহ করতে পারবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বিকল্পের আরেক বিকল্প হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) আবরণী মোজা দু’টির উপর মাসহ করেছেন। তাছাড়া ব্যবহারে ও উদ্দেশ্যে এ হল মোজারই আনুসাঙ্গিক বস্তু। সুতরাং এটা দু’পরত মোজার মতোই গণ্য।

আর মূলতঃ ‘জারমুক’ পায়ের বিকল্প, মোজার নয়। অবশ্য হাদাছগ্রস্ত হওয়ার পর জারমুক পরার হুকুমটি এর বিপরীত। কেননা, হাদাছ মোজায় পৌছে গেছে। সুতরাং অন্য কিছুর দিকে তা স্থানান্তরিত হবে না।

আর যদি জারমুক মোটা কাপড়ের হয়, তাহলে তার উপর মাসহ জাইয হবে না। কেননা তা পায়ের স্থলবর্তী হওয়ার উপযুক্ত নয়। তবে আর্দ্রতা মোজা পর্যন্ত পৌছলে জাইয হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে ‘জওরব’ (চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর তৈরী মোজা) এর উপর মাসহ করা জাইয নয়, তবে যদি উপরে-নীচে বা শুধু নীচে চামড়া যুক্ত হয়, তবে জাইয হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ‘জওরব’ এমন পুরো হয় যে, অপর দিকে প্রকাশ না পায়, তাহলে এতে মাসহ জাইয হবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তাঁর ‘জওরবের’ উপর মাসহ করেছেন।

তাছাড়া এটা যখন মোটা হয় তখন তা পরে হাঁটা যায়। পুরো হওয়ার পরিমাণ এই যে, কিছু দ্বারা না বাঁধা সত্ত্বেও তা পায়ের গোছার সাথে আটকে থাকে। এমতাবস্থায় তা মোজার সদৃশ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, এটি মোজার সম-মানের নয়। কেননা তা পরে অব্যাহতভাবে চলা সম্ভব নয়, যদি না তা চামড়াযুক্ত হয়। অনুরূপ

http://islaminonesite.wordpress.com/

‘জওরব’ই হলো হাদীছের প্রয়োগ ক্ষেত্র। তাঁর নিকট থেকে আর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর এর উপরই ফাতওয়া দেয়া হয়।

পাগড়ী, টুপি, বোরকা ও হাত মোজার উপর মাসহ জাইয নয়। কেননা এগুলো খুলে নিতে তেমন কোন অসুবিধা হয় না। আর অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যেই অবকাশ দেওয়া হয়েছে।

জখমের পট্টির উপর মাসহ করা জাইয। যদিও তা উযূ ছাড়া অবস্থায় বাধা হয়ে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ করেছেন এবং আলী (রা.) কেও তা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া এ ক্ষেত্রে অসুবিধা মোজা খোলার অসুবিধার চেয়ে বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মাসহ এর বৈধতা অধিক যুক্তিযুক্ত।

আর পট্টির অধিকাংশ স্থান মাসহ করাই যথেষ্ট। ইমাম হাসান (ইবন যিয়াদ) তা উল্লেখ করেছেন। এটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। কেননা এর নির্দিষ্ট সময় শরীআতের মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। যদি জখমের পট্টি নিরাময় ছাড়াই খুলে পড়ে যায়, তাহলে মাসহ বাতিল হবে না। কেননা, ওযর অব্যাহত আছে, আর যতক্ষণ ওযর অব্যাহত আছে, ততক্ষণ তার উপর মাসহ করা তার নীচের অংশ ধোয়ারই সমতুল্য।

আর যদি নিরাময় হওয়ার পর পট্টি পড়ে যায়, তাহলে মাসহ বাতিল হয়ে যাবে।কেননা ওযর দূর হয়ে গেছে। যদিও তখন সে সালাত থেকে থাকে, তাহলে সে সালাত নতুনভাবে আদায় করবে। কেননা বিকল্প দ্বারা অর্জনের পূর্বেই সে আসল কর্মের ক্ষমতা লাভ করেছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

হায়য ও ইসতিহাযা

http://islaminonesite.wordpress.com/

হায়যের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো তিনদিন তিনরাত। এর চেয়ে কম হলে সেটা হবে ইসতিহাযা। কেননা রাসূলুল্লাহ(সা.) বলেছেন-

কুমারী ও বিবাহিতা নারীর হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত হলো তিনদিন ও তিনরাত এবং তার সর্বোচ্চ মেয়াদ দশদিন।

এ হাদীছ একদিন একরাত্র মেয়াদ নির্ধারণের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে দলীল।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার মেয়াদ দুইদিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ। এ হল অধিকাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার ভিত্তি অনুযায়ী।

আমাদের দলীল এই যে এটা শরীআত নির্ধারিত সময়সীমা হ্রাস করার শামিল। তার সর্বোচ্চ মেয়াদ হলো দশদিন। এর অতিরিক্ত হবে ইসতিহাযা।

এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। আর এ হাদীছ পনের দিন মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ(র.) এর বিপক্ষে প্রমাণ। পূর্ববর্তী মেয়াদের অতিরিক্ত বা এর কম রক্ত স্রাব হচ্ছে ইসতিহাযা। কেননা শরীআতের নির্ধারিত মেয়াদ অন্য কিছুকে তার সাথে যুক্ত করতে বাধা দেয়।

স্বচ্ছ-শুভ্রতা দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঋতুগ্রস্ত নারী লাল বা হলদে বা ঘোলা রংয়ের যে কোন স্রাব দেখতে পাবে, তা হায়য।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, ঘোলা বর্ণের স্রাব হায়য বলে গণ্য হবে না রক্ত প্রবাহের না হলে। কেননা, উক্ত রক্ত জরায়ু থেকে নির্গত হলে অবশ্যই ঘোলা স্রাব স্বচ্ছ রক্ত প্রবাহের বের হতো। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর দলীল হলো ‘আইশা (রা.) সম্পর্কে এই বর্ণনা যে, তিনি স্বচ্ছ-শুভ্রতা ব্যতীত সব কিছুকে হায়য বলে গণ্য করেছেন। আর এ ধরণের বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শ্রবণ ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আর (আবূ ইউসূফ (রা.) এর দলীলের জবাব এই যে) জরায়ুর মুখ যেহেতু নিম্নগামী, সেহেতু খোলা রক্তটাই আগে বের হয়, কলসের নীচ দিক দিয়ে ফুটো করলে যেমন(নীচের গাদ আগে বের হয়)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সবুজ রংয়ের স্রাব সম্পর্কে বিশুদ্ধ মত এই যে, স্ত্রী লোকটি ঋতুমতী হলে তা হায়য বলে গণ্য হবে আর রঙের পরিবর্তন খাদ্যের দোষের কারণে হয়েছে বলে ধরা হবে। আর যদি অধিক বয়স্কা হয় যে, সবুজ রং ছাড়া কিছু দেখে না, তাহলে তা উৎসর দোষ বলে ধরা হবে। সুতরাং তা হায়য বলে গণ্য হবে না।

হায়য হায়যগ্রস্তর যিম্মা থেকে সালাত রহিত করে দেয় এবং সিয়াম পালন তার উপর হারাম করে দেয়। ফলে সাওমের কাযা করবে এবং সালাতের কাযা করবে না। কেননা, 'আইশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যামানায় আমাদের কেউ যখন হায়য থেকে পবিত্র হতো তখন সে সাওমের কাযা করতো কিন্তু সালাতের কাযা করত না।

আর এ কারণে যে, দ্বিগুণ হওয়ার কারণে সালাতের কাযা করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সিয়ামের কাযা করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়।

আর ঋতুমতী মসজিদে প্রবেশ করবে না। জুনুবী ব্যক্তিরও একই হুকুম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- হায়যগ্রস্ত ও জুনুবী এর জন্য মসজিদে প্রবেশ আমি হালাল রাখি না।

শুধু পার হওয়া ও অতিক্রম করার জন্য প্রবেশের বৈধতা দানের ব্যাপারে এ হাদীছের ব্যাপক ভাষ্য ইমাম শাফিঈ (রা.) এর বিপক্ষে দলীল। আর সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না। কেননা তাওয়াফ মসজিদের অভ্যন্তরে হয়ে থাকে।

আর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- আর তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তোমরা স্ত্রী সঙ্গম করবে না।

হায়য, জানাবাত ও নিফাসগ্রস্তদের জন্য কুরআন পাঠ করা বৈধ নয়। কেননা, নবী (সা.) বলেছেন- হায়যগ্রস্ত ও জুনুবী কুরআনের কোন অংশ পাঠ করবে না। হায়যগ্রস্তকে অনুমতি দানের ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম মালিক (র.) এর বিপক্ষে দলীল।

আর এ হাদীছের ব্যাপক ভাষ্য এক আয়াতের কম পরিমাণকেও শামিল করে। সুতরাং উক্ত পরিমাণ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীছ তাহাবীর বিপক্ষে দলীল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এদের জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করার অনুমতি নেই। আর যে মুদ্রায় কুরআনের কোন সূরা লিখিত রয়েছে, খুতি ছাড়া তা স্পর্শ করা বৈধ নয়। তেমনি যার উযূ নেই, তার জন্য গিলাফ ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করা বৈধ নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। যেহেতু হাদাছ ও জানাবাত দু'টোই হাতে অনুপ্রবেশ করে থাকে, তাই স্পর্শের বিধানের ব্যাপারে দু'টোই সমান। আর জানাবাত মুখে প্রবেশ করে, কিন্তু হাদাছ প্রবেশ করে না। তাই পাঠের বিধানে দু'টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

আর এ ক্ষেত্রে গিলাফ তা-ই, যা কুরআন থেকে আলাদা থাকে। তা নয়, কুরআনের সাথে জড়িত থাকে। যেমন, বাঁধাই কৃত চামড়া। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

আস্তিন দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মাকরূহ। এ-ই সহীহ্। কেননা, আস্তিন তো ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। শরীআত সম্পর্কিত (হাদীছ ও ফিকাহ্) গ্রন্থাদির বিধান এর বিপরীত। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আস্তিন দ্বারা স্পর্শ করার অনুমতি রয়েছে। এর কারণ, এতে প্রয়োজন রয়েছে। আর (উযূ না থাকা সত্তেও নাবালকের) হাতে কুরআন তুলে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। কেননা, তাদের বেলায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে হিফযে কুরআন আর পবিত্রতার নির্দেশ তাদের জন্য কষ্টকর। এটাই সহীহ্ মত।

হায়যের রক্তস্রাব যদি দশ দিনের কম সময়ে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জাইয নয়। কেননা, রক্ত কখনো নামে কখনো থামে, সুতরাং থামার দিকটির অগ্রাধিকারের জন্য গোসল করা জরুরী।

আর যদি সে গোসল না করে আর তার উপর সালাতের সর্বনিম্ন সময় অতিবাহিত হয়, এ পরিমাণ যে, সে গোসল করে তাহরীমা বাধতেঁ সক্ষম হতো, তাহলে তার সাথে সহবাস করা বৈধ। কেননা, উক্ত সালাতের ঋণ তার যিম্মায় আরোপিত হয়ে গেছে। বিধান অনুযায়ী সে পবিত্র বলে সাব্যস্ত।

যদি তিন দিনের উপরে কিন্তু পূর্ব অভ্যাসের কম সময়ে রক্তস্রাব বন্ধ হয়, তাহলে অভ্যস্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী তার সাথে সঙ্গম করবে না, যদিও সে

http://islaminonesite.wordpress.com/

গোসল করে থাকে। কেননা, অভ্যস্ত সময়ের ভিতরে পুনঃ স্রাব হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং পরিহার করার মধ্যেই সতর্কতা।

আর যদি দশদিন পূর্ণ হয়ে রক্ত বন্ধ হয়, তাহলে গোসলের পূর্বেই তার সাথে সহবাস জাইয। কেননা, হায়য দশদিনের অতিরিক্ত হতে পারে না। তবে গোসলের পূর্বে সহবাস পসন্দনীয় নয়। কেননা তাশদীদযুক্ত কিরাতের প্রেক্ষিতে এ অবস্থাও নিষেধের আওতাভূক্ত হায়যের মেয়াদের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রক্তস্রাবের মাঝে যদি পবিত্রতা দেখা দেয় তাহলে তা অব্যাহত রক্তস্রাব বলে গণ্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।

এর কারণ এই যে, সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হায়যের পূর্ণ মেয়াদব্যাপী রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং মেয়াদের শুরু ও শেষটাই বিবেচ্য; যেমন, যাকাতের মাসআলায় নিসাবের হুকুম।

ইমাম আবূ ইউসূফ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত অন্য এক রিওয়ায়াত মতে যদি পনের দিনের কম হয়, তাহলে তা (উভয় স্রাবকে) বিচ্ছিন্নকারী হবে না। বরং পূর্ণ মেয়াদ অব্যাহত স্রাব বলে গণ্য হবে। কেননা, এটা তুহুরে ফাসিদ। সুতরাং তা স্রাবের স্থলবর্তী হবে। এ মতামত গ্রহণ আমলের জন্য অধিকতর সহজ। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি আবূ হানীফা (র.) এর সর্বশেষ মত। এ মাসআলার পূর্ণ বিবরণ হায়য অধ্যায়ে জানা যাবে।

তুহুর এর সর্ব নিম্ন মেয়াদ পনের দিন।

ইবরাহীম নাখঈ থেকে এরূপই বর্ণিত। আর এ বিষয়ে শারে (আ.) এর নিকট থেকে অবহিত করণ ব্যতীত জানা সম্ভব নয়।

আর তার সর্বোচ্চ মুদ্দতের সীমা নেই। কেননা, তা এক বছর দু'বছর পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। সুতরাং তা কোন মেয়াদের দ্বারা নির্ণয় করা যাবে না। তবে যে মহিলার স্রাব অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে তার জন্য মেয়াদ ধার্য করা হয়। এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। কিতাবুল হায়যে জানা যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইসতিহাযার রক্ত স্রাবে হুকুম নাক থেকে রক্তক্ষরণের অনুরূপ। যা সিয়াম, সালাত ও সহবাস কোনটিকেই বাধা দেয় না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) (ইসতিহাযাগ্রস্তকে) বলেছেন-চাটাইয়ে রক্তের ফোঁটা পড়তে থাকলেও তুমি উযূ করবে ও সালাত আদায় করবে।

সালাতের হুকুম যখন জানা গেল, তখন ইজমাই ফয়সালার ফলশ্রুতিতে সিয়াম ও সহবাসের হুকুমও সাব্যস্ত হয়ে যায়।

রক্তস্রাব যদি দশদিনের বেশী হয়, আর যদি তার দশদিনের কম প্রচলিত অভ্যাস জানা থেকে থাকে তাহলে তার হায়যকে অভ্যস্ত দিনগুলোতেই সীমিত রাখা হবে। আর অভ্যাসের অতিরিক্ত যা তা ইসতিহাযা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

মুসতাহায নারী তার হায়যেরে নির্দিষ্ট দিনিগুলোতে সালাত বর্জন করবে। তা ছাড়া অভ্যাসের অতিরিক্ত দিনগুলো দশের অতিরিক্ত দিনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তার সাথেই তা যুক্ত হবে।

আর যদি বালেগ হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ কোন মেয়ের রক্ত স্রাব আরম্ভ হওয়ার পর সে মুসতাহাযা হয়ে যায় (অর্থাত্ দশদিন থেকে বেশী স্রাব দেখা যায়) তবে প্রতি মাসের দশদিন তার হায়য গণ্য হবে, অবশিষ্ট দিনগুলো হবে ইতিহাযা। কেননা, তার প্রারম্ভের রক্তস্রাবকে আমরা হায়য হিসাবে জেনেছি, সুতরাং সন্দেহের কারণে (পরবর্তী দিনগুলো) হায়য থেকে বহির্ভূত হবে না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

পরিচ্ছেদঃ মুসতাহাযা

মুসতাহাযা নারী, অব্যাহত মূত্রক্ষরণ নাক থেকে রক্তক্ষরণের রোগী এবং এমন ক্ষতগ্রস্ত ব্যক্তি, যার ক্ষতস্থান থেকে নিঃসরণ থামে না। এরা সকলে প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তের জন্য আলাদা উযূ করবে। তারপর সে ওয়াক্তের ভিতরে ঐ উযূ দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয ও নফল পড়বে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মুসতাহাযা নারী প্রত্যেক ফরয সালাতের জন্য উযূ করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসতাহাযা প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে।

তাছাড়া তার তাহারাতের গ্রহণ যোগ্যতা হচ্ছে ফরয আদায়ের প্রয়োজনে। সুতরাং ফরয থেকে ফারিগ হওয়ার পর তা বহাল থাকবে না।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) বলেছেনঃ

মুসতাহাযা নারী প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তের জন্য উযূ করবে।

শাফিঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীছের উদ্দেশ্যও এটাই। কেননা, অব্যয়কে ওয়াক্তের অর্থেও ব্যবহার করা হয়। বলা হয় অর্থাত্ আমি তোমাদের কাছে আসবো যুহরের সালাতের সময়। তাছাড়া সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে ওয়াক্তকে আদায় এর স্থলবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং তার উপরই বিধান আবর্তিত হবে।

যখন ওয়াক্ত শেষ হবে, তখন তাদের উযূ বাতিল হয়ে যাবে। এবং অন্য সালাতের জন্য নতুন উযূ করবে। এ হলো তিন ইমামের মাযহাব। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, সময় প্রবেশ করার পর নতুন উযূ করবে।

সুতরাং সূর্যোদয়ের সময় যদি তারা উযূ করে তাহলে যুহরের সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত এ উযূ তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.) বলেন, সময় প্রবেশ করার পর নতুন উযূ করবে।

সুতরাং সূর্যোদয়ের সময় যদি তারা উযূ করে তাহলে যুহরের সময় শেয় হওয়া পর্যন্ত এ উযূ তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.) এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও যুফার (র.) বলেন, যুহরের সময় প্রবেশ করা পর্যন্ত তাদের জন্য উযূ কার্যকর হবে।

আলোচ্য মাসআলার খোলাসা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে পূর্ববর্তী হাদাছ দ্বারা মা'যূরের তাহারাত ভেংগে যায় ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে। আর ইমাম যুফার (র.) এর মতে ওয়াক্ত শুরূ হওয়ার কারণে। আর ইমাম আবূ ইউসূফের মতে দু'টোর যে কোন একটির কারণে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এ মতপার্থক্যের ফলাফল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই শুধু প্রকাশ পাবে, যে মধ্যহ্নের পূর্বে উযূ করেছে, যেমন আমারা আগে উল্লেখ করেছি, কিংবা সূর্যোদয়ের পূর্বে উযূ করেছে।

ইমাম যুফার (র.) এর দলীল এই যে, বিপরীত অবস্থা সত্ত্বেও তাহারাতের গ্রহণযোগ্যতা হচ্ছে সালাত আদায়ের প্রয়োজনে, আর ওয়াক্তের আগে সে প্রয়োজন নেই। সুতরাং ওয়াকতের আগের তাহারাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর দলীল এই যে, প্রয়োজন ওয়াকতের সাথে সীমিত। সুতরাং ওয়াকতের পূর্বে ও পরে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রা.) এর দলীল হলো; ওয়াকতের আগে তাহারাত অর্জন করা জরুরী, যাতে সময় হওয়া মাত্র সালাত আদায় করতে সক্ষম হয়। আর ওয়াকত শেষ হয়ে যাওয়া প্রয়োজন শেষ হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং ওয়াকত শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী হাদাছের ক্রিয়া প্রকাশ পাবে।

এখানে ওয়াক্ত দ্বারা ফরয সালাত ওয়াক্ত উদ্দেশ্য। সুতরাং মা'যূর ব্যক্তি যদি ঈদের সালাতের জন্য উযূ করে থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে উক্ত উযূ দ্বারা সে যুহরের সালাত আদায় করতে পারবে। এটিই বিশুদ্ধ মত। কেননা, ঈদের সালাত চাশতের সালাতের ন্যায়।

আর কেউ যদি একবার যুহরের ওয়াকতে যুহরের সালাতের জন্য উযূ কর আর যুহরের সময় থাকতে আরেকবার আসরের সালাতের জন্য উযূ করে, তাহলে ইমামদ্বয়ের মতে সে উযূ দ্বারা সে আসরের সালাত আদায় করতে পারবে না। কেননা, ফরয সালাতের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার কারণে তার উযূ ভেংগে গিয়েছে।

মুসতাহাযা হচ্ছে ঐ স্ত্রীলোক যার উপর দিয়ে সালাতের পূর্ণ ওয়াক্ত হাদাছ আক্রান্ত অবস্থা ছাড়া অতিক্রান্ত হয় না। মুসতাহাযার সমগোত্রীয় অন্যান্য মা'যূরদেরও একই হুকুম অর্থাত্ যাদের আলোচনা পূর্বে আমরা করেছি। আর বিরামহীন দাস্ত ও বাতকর্মের রোগীরও ঐ হুকুম । কেননা, এ সকল ওযর দ্বারা প্রয়োজন সাব্যস্ত হয় আর প্রয়োজনই সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

পরিচ্ছেদঃ নিফাস সম্বন্ধে

নিফাস হচ্ছে প্রসব পরবর্তী সময়ে নির্গত রক্তস্রাব। কেননা, শব্দটি হয় জরায়ু রক্ত ত্যাগ করেছে কিংবা সন্তান বের হওয়া থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে; অথবা এর অর্থ রক্ত।

গর্ভবতী প্রসব পূর্ব সময়ে কিংবা প্রসবকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে যে রক্ত দেখতে পায়, তা ইসতিহাযা, যদিও তা দীর্ঘ সময় প্রবাহিত হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) নিফাসের উপর কিয়াসের করে এটাকে হায়য বলেন। কেননা- উভয় রক্তই জরায়ু থেকে নির্গত হয়।

আর আমাদের দলীল হল, প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভসণ্চার দ্বারা জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়।আর নিফাস হয়ে থাকে সন্তান নির্গমনের মাধ্যমে জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার পরে। এজন্যই ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর বর্ণনা মতে সন্তান আংশিক বের হয়ে আসার পর নির্গত রক্ত নিফাস রূপে গণ্য। কেননা জরায়ু-মুখ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে তা রক্ত ত্যাগ করে। গর্ভপাতিত পিণ্ড যা আংশিক আকৃতি স্পষ্ট হয়েছে, তা সন্তান রূপে গণ্য। সুতরাং এর মাধ্যমে স্ত্রী লোকটি নিফাসগ্রস্ত গণ্য হবে এবং উম্মু ওয়ালদ (মনিব সন্তানের মাতা) সাব্যস্ত হবে। তদ্রুপ এ ভূমিষ্ট হওয়া দ্বারা সমাপ্তি হবে।

নিফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোন সীমা নেই। কেননা, ভূমিষ্ঠ সন্তানের অগ্রবর্তিতা স্রাব জরায়ু থেকে নির্গত হওয়ার প্রমাণ। সুতরাং সময়ের দীর্ঘতাকে প্রমাণ হিসাবে নির্ধারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। হায়যের বিষয় এর ব্যতিক্রম।

নিফাসের সর্বোচ্চ মুদ্দত হলো চল্লিশ দিন এবং এর অতিরিক্ত হলে ইসতিহাযা। কেননা, উম্মু সালামা (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে নবী করীম (সা.) নিফাসগ্রস্ত নারীদের জন্য চল্লিশ দিন সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ষাটদিন ধার্য করার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে দলীল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

রক্তস্রাব যদি চল্লিশ দিন ছাড়িয়ে যায় আর স্ত্রী লোকটি ইতোপূর্বে সন্তান প্রসব করে থাকে এবং নিফাসের ব্যাপারে তার নির্ধারিত অভ্যাস থেকে থাকে, তাহলে নিফাসকে তার অভ্যস্ত সংখ্যক দিনগুলোতে প্রত্যাবৃত্ত করা হবে। এর কারণ আমরা হায়য প্রসংগে বর্ণনা করেছি।

আর যদি তার পূর্ব অভ্যাস না থেকে খাকে তাহলে তার এই প্রথম নিফাসকে ধরা হবে চল্লিশ দিন। কেননা, উক্ত সময়কে নিফাস সাব্যস্ত করা সম্ভব।

আর যদি একই গর্ভে দুই সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তার নিফাস গণ্য হবে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে। এমন কি দুই সন্তানের মাঝে চল্লিশ দিনের ব্যবধান থাকলেও। ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, শেষ সন্তানটির পর থেকে।

এটি ইমাম যুফার (র.) এরও মত। কেননা প্রথম প্রসবের পর তো সে গর্ভবতী রয়ে গেছে। সুতরাং সে নিফাসগ্রস্ত বলে গণ্য হবে না। যেমন গর্ভবতী হায়যগ্রস্ত হয় না। এ জন্যই ইজমায়ী মতে শেষ প্রসব দ্বারাই তার ইদ্দত শেষ হবে।

বড় ইমামদ্বয়ের দলীল হল, আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, গর্ভবতী ঋতুগ্রস্ত হয় না জরায়ুর মূখ বন্ধ থাকার কারণে। আর সেটা তো প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং রক্তক্ষরণ শুরু করেছে, সুতরাং তা নিফাস রূপেই গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইদ্দতের সম্পর্ক হলো তার সাথে সম্পর্কিত গর্ভের সাথে। সুতরাং গর্ভ শব্দটি সমগ্রকেই অন্তর্ভূক্ত করবে।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

বিভিন্ন নাজাসাত ও তা থেকে পবিত্রতা অর্জন

মুসল্লীর শরীর, তার কাপড় এবং সালাত আদায়ের স্থান নাজাসাত থেকে পবিত্র করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেন- তোমার বস্ত্রাদি পবিত্র করো।

এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রথমে তা চেছে নাও। তারপর রগড়িয়ে নাও, তারপর পানি দ্বারা তা ধুয়ে নাও। তার দাগ থেকে তোমার ক্ষতি হবে না।

কাপড়ের ক্ষেত্রে যখন পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব, তখন শরীর ও স্থানের ক্ষেত্রেও তা ওয়াজিব হবে। কেননা সালাতের অবস্থায় সবগুলো ব্যবহারে আসছে।

নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন জাইয হবে পানি দ্বারা, এমন সকল তরল পদার্থ দ্বারা, যার মধ্য নাজাসাত দূর করা সম্ভব। যেমন সিরকা গোলাব জল ইত্যাদি, যা নিংড়ালে নিংড়ে পড়ে।

এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফের মত। আর ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, পানি ছাড়া জাইয হবে না। কেননা প্রথম স্পর্শেই তা নাপাক হয়ে যায়। আর নাপাক জিনিসে পবিত্রতা অর্জন হয় না; তবে পানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবশতঃ এই কিয়াস পরিহার করা হয়েছে।

বড় ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, তরল পদার্থ বিদূরণকারী। আর বিদূরণ ও পরিস্করণের কারণেই তাহারাত অর্জিত হয়। আর মিশ্রিত হওয়ার কারণে নাপাকীর হুকুম আসে। সুতরাং হানীফা (র.) এর মত এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি রিওয়ায়াতের একটি। আর ইমাম আবূ ইউসূফের রিওয়ায়াত মতে উভয়ের মাঝে তিনি পার্থক্য করেছেন। অর্থাত্ শরীরের ক্ষেত্রে পানি ছাড়া জাইয বলেননি।

মোজাতে যদি স্থুলশরীর বিশিষ্ট কোন নাজাসাত লাগে, যেমন গোবর, পায়খানা, রক্ত ও বীর্য আর তা শুকিয়ে যায় এরপর তা মাটি দ্বারা ঘষে নেয়। তাহলে জাইয হবে। এটা সূক্ষ কিয়াস। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জাইয হবে না। এ-ই হলো সাধারণ কিয়াসের চাহিদা। তবে বিশেষভাবে শুক্র ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কেননা মোজাতে যা প্রবেশ করে, তাকে তো শুস্কতা ও ঘসা দ্বারা দূর করতে পারে না। শুক্র এর ব্যতিক্রম। এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

বড় ইমামদ্বয় দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি মোজাদ্বয়ে কোন নাপাকি থাকে তা হলে উভয় দিকে মাটি দ্বারা মুছে ফেলবে। কেননা মাটি মোজাদ্বয়ের জন্য পবিত্রকারী।

তাছাড়া চামড়া শক্ত হওয়ার দরুন তাতে নাজাসাতের খুব সামান্য অংশই ঢুকতে পারে। পরে স্থূল নাজাসাত দূর হবে। তখন তার সাথে যুক্ত সে আর্দ্রতাও দূর হয়ে যাবে।

ভিজা নাজাসাতের ক্ষেত্রে ধোয়া ছাড়া জাইয হবে না। কেননা মাটি দিয়ে নাজাসাত প্রসারিত করবে, তা পাক করবে না।

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি তা মাটি দিয়ে এমনভাবে মুছে যে, নাজাসাতের চিহ্নই অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে তা পাক হয়ে যাবে। কারণ, এ ধরনের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে আর তা উল্লিখিত হাদীছে শর্ত আরোপ করা হয়নি। আর এ মতের উপর আমাদের ফকীহগণের ফতওয়া রয়েছে।

আর যদি মোজায় পেশাব লাগে এবং শুকিয়ে যায় তাহলে তা ধোয়া ছাড়া জাইয হবে না। তদ্রুপ ঐ সমস্ত নাজাসাত, যার স্থূলতা নেই-যেমন, মদ। কেননা, নাজাসাতের অংশ মোজাতে শোষিত হয়ে যায়। আর তা চুষে তুলে আনার মত কোন চোষণকারী নেই। কারো কারো মতে তার সাথে লেগে থাকা ধূলও তার স্থূলতা হিসেবে গণ্য। কাপড় শুকিয়ে গেলেও ধোয়া ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কেননা, কাপড় ফাক ফাক হওয়ার কারণে তাতে নাজাসাতের অংশ অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে। সুতরাং ধোয়া ছাড়া তা বের হবে না।

শুক্র নাপাক; আর্দ্র অবস্থায় তা ধোয়া ওয়াজিব। যদি কাপড়ে শুকিয়ে যায় তাহলে রগড়িয়ে ফেললেও যথেষ্ট হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) ‘আইশা (রা.) কে বলেছেন- আর্দ্র হলে তা ধুয়ে ফেলো আর শুষ্ক হলে তা রগড়িয়ে ফেলো।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, শুক্র পাক; আমাদের বর্ণিত হাদীছ তাঁর বিপক্ষে দলীল।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, পাচটি জিনিস থেকে কাপড় ধুইয়ে নিতে হয়। তার মধ্যে তিনি শুক্র ও উল্লেখ করেছে।।

http://islaminonesite.wordpress.com/

শুক্র যদি শরীরে লাগে তাহলে আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, রগড়ালে তা পাক হয়ে যাবে। কেননা এ ধরনের ঘটনা আরো অধিক নাপাক।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ধোয়া ছাড়া তা পাক হবে না। কেননা, শরীরের তা তা শোষণ করে নেয়। সুতরাং শোষিত অংশ শুষ্ক স্থলে ফিরে আসবে না। আর শরীরকে তো রগড়ানো সম্ভব নয়।

আয়না, তলোয়ার ইত্যাদিতে যদি নাজাসাত লেগে থাকে, তাহলে তা মুছে ফেলাই যথেষ্ট। কেননা নাজাসাত তাতে প্রবিষ্ট হয় না। আর তার উপরাংশে যা আছে, তা মোছার মাধ্যমেই বিদূরিত হয়ে যায়।

মাটিতে নাজাসাত লাগাবার পর যদি সে মাটি রোদের তাপে শুকিয়ে যায় এবং তার চিহ্ন চলে যায় তাহলে উক্ত স্থানে সালাত আদায় করা জাইয হবে।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা, নাজাসাত দূরকারী কিছু পাওয়া যায়নি। এ জন্যই তো ঐ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জাইয নয়।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-শুষ্কতাই হলো ভূমির পবিত্রতা।

তবে তায়াম্মুম জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, কিতাবুল্লাহর বাণী দ্বারা মাটির পবিত্রতার শর্ত সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং হাদীছ দ্বারা যে মাটির পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছে, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হবে না।

রক্ত, পেশাব, মদ, মুরগীর পায়খানা, গাধার পেশাব ইত্যাদি গলীয নাজাসাত পরিমাণে এক দিরহাম বা তার কম হলে তা সহ সালাত জাইয হবে। কিন্তু এর বেশী হলে জাইয হবে না।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, অল্প নাজাসাত ও অধিক নাজাসাত সমান। কেননা পবিত্রতা ওয়াজিবকারী শরীআতের বাণী কোন পার্থক্য করেনি।

আমাদের দলীল এই যে, অল্প পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ক্ষমাই। আর মল নির্গমন স্থলের উপর ভিত্তি করে দিরহামের পরিমাণ দ্বারা আমরা স্বল্পতার পরিমাণ নির্ধারণ করেছি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

বিশুদ্ধ মতে দিরহামের হিসাব করা হয়েছে আয়তনের দিক থেকে। অর্থাত্ হাতের তালুর মধ্যভাগ পরিমাণ। তবে ওযনের দিক থেকে বিবেচনা করার কথাও বর্ণিত আছে। অর্থাত্ বড় দিরহাম, যার ওজন এক মিছকাল (প্রায় পঁচিশ গ্রাম)। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রসংগে বলা হয়েছে যে, প্রথমটি হলো তরল নাজাসাতের ক্ষেত্রে আর দ্বিতীয়টি হলো গাঢ় নাজাসাতের ক্ষেত্রে। এ জিনিসগুলোর গলিজ নাজাসাত হওয়ার কারণ এই যে, তা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর নাজাসাত যদি লঘু হয়, যেমন হালাল পশুর পেশাব, তাহলে কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ে সালাত জাইয হবে।

তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, সালাত জাইয হওয়ার সর্বনিম্ন পরিমাণ কাপড়ের এক-চতুর্থাংশ। যেমন, লুংগী।

কোন কোন মতে কাপড়ের যে আংশে নাজাসাত লেগেছে, তার এক-চতুর্থাংশ। যেমন, আঁচল, কলি।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে ‘এক বর্গ বিঘত’ পরিমাণ হলে সালাত জাইয হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে ঐ কাপড়ে নামায জাইয হবে না। কেননা, গোবরের নাপাকী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছের সাথে অন্য কোন হাদীছের বিরোধ নেই। হাদীছটি এই যে, নবী (সা.) এক খণ্ড গোবর ছুড়েঁ বলেছিলেন- এটা নাপাকী। আর ইমাম সাহেবের মতে এতেই গলীয নাজাসাত প্রমাণিত হয়। আর বাণী বিরোধ দ্বারা লঘুত্ব প্রমাণিত হয়।

সাহেবাইন বলেন, অনেক বেশী পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত জাইয হবে। কেননা এ বিষয়ে ইজতিহাদের অবকাশ আছে, আর তাদের মতে এতেই লঘুত্ব প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া রাস্তাঘাট গোবর ভরা থাকার কারনে তাতে (সম্পৃক্ত হওয়ার) প্রয়োজন রয়েছে। আর লঘুত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রভাব স্বীকৃত। গাধার পেশাবের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ভূমি তা শুষে নেয়। (সুতরাং তাতে প্রয়োজন নেই)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমরা বলি, প্রয়োজন (মূলতঃ) জুতার মধ্যে। আর হুকুম লঘু হওয়ার ব্যাপারে একবার তা ভূমিকা রেখেছে। সুতরাং মুছে নিলেই পাক হয়ে যায়। এতেই প্রয়োজনের দাবী পূর্ণ হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে হালাল পশু ও হারাম পশুর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ইমাম যুফার (র.) উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন। অর্থাত্ হারাম পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং হালাল পশুর ব্যাপারে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন 'রায়' শহরে প্রবেশ করলেন এবং ব্যাপকভাবে লিপ্ততা দেখতে পেলেন, তখন তিনি 'অনেক বেশী' পরিমাণও সালাত আদায়ে বাধা হবে না বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। মাশায়েখগণ এর উপর বুখারার (গোবর মিশ্রিত) কাদা মাটিকে কিয়াস করেছেন। এখান থেকে মোজার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.) পূর্ব শর্ত প্রত্যাহার করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়।

যদি কাপড়ের ঘোড়ার পেশাব লেগে যায় তাহলে আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে বেশী পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তা কাপড় নষ্ট করে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে বেশী পরিমাণ হলেও তা (সালাত আদায়ে) বাধা সৃষ্টি করবে না।

কেননা, তার মতে হালাল পশুর পেশাব পাক। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তা লঘু নাজাসাত। তার উভয়ের মতে তার গোশত হালাল। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তাতে লঘুত্ব এসেছে হাদীছের পরস্পর বিরোধের কারণে।

হারাম পাখীর পায়খানা যদি কাপড়ে দিরহাম পরিমাণের বেশী লেগে যায় তাহলে আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তাতে সালাত জাইয হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে জাইয হবে না।

কারো কারো মতে এ মতপার্থক্য হলো নাজাসাতের ব্যাপারে আর কারো কারো মতে পরিমাণের ব্যাপারে। এটাই বিশুদ্ধতম মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম মুহাম্মদ (র.) যুক্তি দিয়ে বলেন, লঘুত্ব আরোপ করা হয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে। কিন্তু সাধারণত এদের মতে মেলামেশা না থাকার কারণে এখানে প্রয়োজন নেই। সুতরাং লঘুত্ব আরোপিত হবে না।

শায়খাইনের যুক্তি এই যে, পাখীরা শূন্য থেকে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। আর তা থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর। সুতরাং এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন সাব্যস্ত হয়েছে। যদি তা (হারাম পাখীর পায়খানা) পাত্রে পড়ে, তাহলে কোন কোন মতে তা পাত্রকে নষ্ট করে দিবে। আর কোন কোন মতে নষ্ট করবে না। কেননা পাত্রাদি তা থেকে রক্ষা করা দুষ্কর।

যদি কাপড়ে মাছের রক্ত বা গাধা ও খচ্চরের লালা দিরহামের বেশী পরিমাণও লেগে যায়, তাহলে তাতে সালাত দুরস্ত হবে। মাছের রক্তের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে তা রক্তই নয়। সুতরাং তা নাপাক হবে না। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে তিনি অত্যধিক পরিমাণের উপর নির্ভর করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এটাকে তিনি নাজাসাত গণ্য করেছেন।

গাধা ও খচ্চরের লালা সম্পর্কে কারণ এই যে, তা নাপাক হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং কোন পাক বস্তু তা দ্বারা নাপাক হতে পারে না।

যদি কাপড়ে সূচের মাথার মতো পেশাবের ছিটা এসে পড়ে তাহলে তা ধর্তব্য নয়। কেননা, তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

নাজাসাত দু'প্রকার- দৃশ্য ও অদৃশ্য সুতরাং যে নাজাসাত দৃশ্য হয়, তা থেকে পবিত্রতা অর্জিত হবে নাজাসাতের মূল পদার্থ দূর হওয়া দ্বারা। কেননা নাজাসাত সত্তাগতভাবে স্থানটিতে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তার সত্তা দূর হলে নাজাসাত বিদূরিত হবে। তবে দূর করা কষ্টকর, এমন দাগ থেকে গেলে দোষ নেই। কেননা, (শরীআতে) কষ্ট থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

এ হুকুম ইংগিত করে যে, একবার ধোয়ার দ্বারাও যদি নাপাক পদার্থ দূর হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ধোয়ার (তিনবার ধোয়ার) শর্ত নেই। অবশ্য এ সম্পর্কে (মাশায়াখদের) মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যে নাজাসাত দৃশ্য নয় (যেমন, পেশাব ও মদ), তা থেকে তাহারাতের উপায় হলো এমনভাবে ধোয়া, যাতে ধৌতকারীর প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। কেননা নাপাকির নিষ্কাশনের জন্য (ধোয়ার ক্ষেত্রে) বারংবার অপরিহার্য। আর নাজাসাত দূরীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা লাভ সম্ভব নয়। সুতরাং প্রবল ধারণাই হবে বিবেচ্য যেমন কিবলার মাসআলায় রয়েছে।

ফকীহগণ তিনবারের সীমা নির্ধারণ করেছেন এ কারণে যে, তাতে (নিষ্কাশনের) প্রবল ধারণা লাভ হয়ে থাকে। সুতরাং সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রকাশ্য কারণকে প্রবল ধারণার স্থলবর্তী করা হয়েছে। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া সংক্রান্ত হাদীছ দ্বারা এ মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। যাহিরী বর্ণনা মতে প্রতিবার ধোয়ার পর নিংড়ানো জরুরী। কেননা নিংড়ানোই (নাজাসাত) নিষ্কাশনকারী।

পরিচ্ছেদ- ইসতিনজা

ইসতিনজা হলো সুন্নত। কেননা নবী কারীম (সা.) তা সর্বদা করেছেন। আর তাতে পাথর ও এর গুণের স্থলবর্তী জিনিস ব্যবহার করা জাইয আছে। এর দ্বারা মুছে ফেলবে যাতে নাজাসাতের স্থানটি পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা পরিষ্কার হওয়াই হলো মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যা মূল উদ্দেশ্য, সেটাই বিবেচ্য হবে।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তিন সংখ্যা হওয়া জরুরী। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমাদের প্রত্যেকে যেন প্রতিটি পাথর দ্বারা ইসতিনজা করে।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যে ব্যক্তি ইসতিনজায় পাথর ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় (অর্থাত্ তিন) সংখ্যা ব্যবহার করে। যে তা করলো, সে ভাল করলো। আর যে করল না, তার কোন ক্ষতি নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার বাহ্যিক অর্থ বর্জন করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- সেখানে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা উত্তমভাবে তাহারাত লাভ করা পছন্দ করে।

আলোচ্য আয়াত ঐ লোকদের শানে নাযিল হয়েছিলো, যারা পাথর ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতো।

মোটকথা পানি ব্যবহার করা ইসতিনজা আদব। কারো কারো মতে আমাদের যুগে এটা সুন্নত। আর পানি ততক্ষণ ব্যবহার করতো, যতক্ষণ তার প্রবল ধারণা হয় যে, তা পাক হয়ে গেছে। 'কতবার হবে' তা নির্ধারণ করা হয়নি। তবে কেউ খুতখুতে স্বভাবের হলে তার ক্ষেত্রে তিনবার এবং মতান্তরে সাতবার নির্ধারণ করা হবে।

নাজাসাত যদি নির্গমন স্থান থেকে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে পানি ছাড়া যথেষ্ট হবে না। কুদূরীর কোন কোন সংস্করণে এর পরিবর্তে রয়েছে। অর্থাত্ তরল পদার্থ ছাড়া যথেষ্টে হবে না। উভয় নুসখার এ পার্থক্য পানি ছাড়া (অন্য তরল পদার্থ দ্বারা) অংগ পাক করার ক্ষেত্রে ভিন্ন দু'টি মত থাকা প্রমাণ করে।

পানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এ জন্য যে, শুধু মোছা (নাজাসাত) দূরীভূত করে না। তবূও নাজাসাতের নির্গমন স্থানের ক্ষেত্রে (প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে) সেটাকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত হুকুমকে অন্যত্র প্রলম্বিত করা যাবে না।

আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর নাজাসাতের মূল স্থান বাদ দিয়ে নামাযে বাধাদানকারী পরিমাণ বিবেচনা করা হবে। কেননা (শরীআতের বিধান মতেই) উক্ত স্থান ধর্তব্য হওয়া রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে অন্য সকল স্থানের উপর কিয়াস করে এখানেও নাজাসাতের স্থানসহ হিসাব করা হবে।

হাড়, ও শুকনো গোবর দ্বারা ইসতিনজা করবে না। কেননা, নবী করীম (সা.) তা করতে নিষেধ করেছেন। আর যদি কেউ তা করে, তাহলে মূল উদ্দেশ্য হাছিল হওয়ার কারণে জাইয হয়ে যাবে। গোবরের ক্ষেত্রে নিষেধের কারণ তা নাপাক হওয়া। আর হাড়ের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তা জিন জাতির খাদ্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

খাদ্যদ্রব্য দ্বারাও ইসতিনজা করবে না। কেননা এটা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করা এবং অপচয়ের শামিল।

ডান হাতেও ইসতিনজা করবে না। কেননা নবী কারীম (সা.) ডান হাতে ইসতিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

অধ্যায়ঃ সালাত

প্রথম অনুচ্ছেদ

সালাতের সময়সমূহ

ভোরের দ্বিতীয় আলো যখন উদিত হয়, আর দ্বিতীয় আলো হলো যা দিগন্তে বিস্তৃত হয়, আর তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না সূর্য উদিত হয়। কেননা হযরত জিবরীল (আ.) ইমামতি সম্পর্কিত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথম দিন ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ইমাম হয়ে সালাত আদায় করেন যখন আলো উদ্ভাসিত হয়। আর দ্বিতীয় দিন (সালাত আদায় করেন) যখন খুব ফরসা হয়ে গলো, এমন কি সূর্য উদিত হওয়ার উপক্রম হল। হাদীছের শেষে রয়েছে-এরপর হযরত জিবরীল (আ.) বললেন- এ দুই সময়ের মধ্যবর্তী সময়টি হলো আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য সময়।

ধর্তব্য নয়। ফজরুল কাযিব হচ্ছে লম্বা-লম্বিতে উদ্ভাসিত আলো, যার পর অন্ধকার থেকে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

বিলালের আযান যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। তদ্রুপ লম্বালম্বি আলো (যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে)। দিগন্তে উদ্ভাসিত অর্থাত্ বিস্তৃত আলোই হলো ফজরের সময়।

যুহরের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য হেলে পড়ে। কেননা জিবরীল (আ.) প্রথম দিন সূর্য হেলে পড়ার সময় ইমামতি করেছেন।

আবূ হানীফা (র.) এর মতে যুহরের শেষ সময় হলো যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া মধ্যাহ্ন ছায়ার বাদ দিয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ইমামদ্বয় বলেন, যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার সমান হয়। ইহাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত, আরেকটি মত।

মধ্যাহ্ন ছায়া হলো ঠিক মধ্যাহ্নকালে কোন বস্তুর যে ছায়া হয়, তাই। দ্বিতীয় ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, জিব্রীল (আ.) প্রথম দিন এ সময়ে আসরের ইমামতি করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

http://islaminonesite.wordpress.com/

যুহরকে তোমরা শীতল করে পড়ো। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তীব্রতা থেকেই আসছে।

আর আরব দেশে (প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হওয়ায়) এ সময়টাতেই গরম প্রচণ্ডতম হয়। সুতরাং হাদীছ যখন পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো তখন সন্দেহবশতঃ সময় শেষ হবে না।

আসরের প্রথম সময় হলো যখন উভয় মত অনুসারে যুহরের সময় পার হয়ে যায়। আর তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি সূর্য অস্তের আগে আসরের এক রাকাআত পেয়ে গেল, সে আসরের সালাত পেয়ে গেলো।

মাগরিবের প্রথম সময় হলো সূর্য যখন ডুবে যায় এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তিন রাকাআত পড়ার পরিমাণ সময় হলো মাগরিবের সময়। কেননা জিবরীল (আ.) দু'দিন একই সময়ে মাগরিবের ইমামতি করেছেন।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

মাগরিবের প্রথম সময় হলো যখন সূর্য ডুবে এবং তার শেষ সময় হলো যখন অদৃশ্য হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) কে হাদীছ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন, তাতে বিলম্ব না করার কারণ হল মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অর্থ দিগন্তের ফরসা আলো, যার লালিমা পরে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে ইমাম ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে লালিমাটিই হলো এরূপ। এরই অনুরূপ একটি বর্ণনা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও পাওয়া যায়। আর এ-ই হল ইমাম শাফিঈ (র.) এরও (পূর্ববর্তী) অভিমত। কেননা, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- শায়ক হলো দিগন্ত লালিমা।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিম্নোক্ত বাণী- মাগরিবের শেষ সময় হলো, যখন দিগন্ত কালো হয়ে যায়। ইমাম শাফিঈ (র.) এর

http://islaminonesite.wordpress.com/

বর্ণিত হাদীছটি ইবন উমর (রা.) এর উপর মওকুফ ইমাম মালিক মু'আত্তা গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন, আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

'ঈশার প্রথম সময় হলো যখন অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর (সুবহি সাদিক) উদিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- 'ঈশার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়। রাত্রের তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত দ্বারা ঈশার শেষ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে দলীল।

বিতরের প্রথম সময় হলো 'ঈশার পরে এবং তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিতর সম্পর্কে বলেছেন- 'ঈশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে তোমরা তা আদায় কর।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা সাহেবাইনের মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে 'ঈশার সময়ই হচ্ছে বিতরের সময়। তবে তারতীব ওয়াজিব হওয়ার কারণে স্মরণ থাকা অবস্থায় বিতরকে 'ঈশার আগে আদায় করা যাবে না।

পরিচ্ছেদঃ সালাতের মুসতাহাব ওয়াক্ত

ফজর ফরসা হওয়ার পরে আদায় করা মুসতাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমরা ফজর ফরসা হয়ে যাওয়ার পর আদায় কর। কেননা, এতেই রয়েছে অধিক সাওয়াব।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক সালাত অবিলম্বে আদায় করা মুসতাহাব। আমাদের বর্ণিত এ হাদীছ আগামীতে বর্ণিতব্য হাদীছ তাঁর বিপক্ষে দলীল।

গ্রীষ্মকালে যুহরের সালাত সূর্যের তাপ কমে আসলে এবং শীতকালে আউয়াল ওয়াকতে আদায় করা মুসতাহাব। প্রমাণ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শীতকালে যুহর অবিলম্বে আদায় করতেন এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ কমে আসলে আদায় করতেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

শীত-গ্রীষ্ম উভয় মৌসুমে সূর্য বিবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আসর বিলম্ব করা মুসতাহাব। কেননা, যেহেতু আসরের পরে নফল সালাত মাকরূহ; সুতরাং বিলম্বে আদায় অধিক নফল আদায়ের অবকাশ পাওয়া যায়। আর ধর্তব্য হলো সূর্যের গোলক বিবর্ণ হওয়া। অর্থাত্ এমন অবস্থা হওয়া, যাতে চোখ না ধাঁধাঁয়। এই বিশুদ্ধ মত। আর এ পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরূহ্।

মাগরিবের সালাত জলদি আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা ইয়াহূদীদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় তা বিলম্ব করা মাকরূহ।

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- আমার উম্মত যতদিন মাগরিব অবিলম্বে এবং 'ঈশা বিলম্বে আদায় করবে, ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।

'ঈশাকে রাত্রের তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট হবে না মনে না করতাম তাহলে অবশ্যই আমি 'ঈশার সালাত রাত্রের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।

তাছাড়া তা, 'ঈশার পরে হাদীছে নিষিদ্ধ আলাপ-আলোচনা করা থেকে বিরত থাকার উপায়। কারো কারো মতে গ্রীষ্মকালে তাড়াতাড়ি করতে হবে, যাতে জামাআতে মুসল্লীর সংখ্যা কমে না যায়। মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করা বৈধ; কেননা, মাকরূহ হওয়ার দলীল অর্থাত্ জামাআত ছোট হওয়া এবং মুস্তাহাব হওয়ার দলীল অর্থাত্ আলাপচারিতা থেকে বিরত থাকা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং মধ্যরাত পর্যন্ত বৈধতা প্রমাণিত হবে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক পর্যন্ত মাকরুহ হওয়া প্রমাণিত হবে। কেননা তাতে জামা'আত ছোট হয়। পক্ষান্তরে আলাপচারিতা এর আগেই বন্ধ হয়ে যায়।

তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির বিতরের ক্ষেত্রে রাত্রের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। আর যে জাগ্রত হ্ওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত, সে ঘুমের আগেই বিতর আদায় করবে। কেননা রাসূলূল্লা্হ্ (সা.) বলেছেন-

যে ব্যক্তি আশংকা করে যে, শেষ রাত্রে জাগ্রত হতে পারবে না, সে যেন (আগে-ভাগেই) বিতর আদায় করে। আর যে শেষরাত্রে জাগ্রত হওয়ার আশা করে, সে যেন শেষ রাত্রেই বিতর আদায় করে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

মেঘলা দিন হলে ফজর, যুহর ও মাগরিব বিলম্বে আদায় করা এবং আসর ও 'ঈশা জলদি আদায় করা মুস্তাহাব। কেননা মেঘ-বৃষ্টির কারণে 'ঈশা বিলম্ব করায় জামাআত ছোট হবে। আর আসর বিলম্ব করলে মাকরুহ ওয়াক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর ফজরে সে সম্ভাবনা নেই। কেননা সে সময় দীর্ঘ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে সতর্কতার জন্য সকল সালাতে বিলম্বের নির্দেশ বর্ণিত আছে। কেননা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে (কাযা হলেও) সালাত আদায় জাইয আছে। কিন্তু সময়ের আগে জাইয নেই।

পরিচ্ছেদঃ সালাতের মাকরূহ ওয়াক্ত

সূর্যোদয়ের সময়, মধ্যাহ্নে সূর্যের মধ্যাকাশে অবস্থানকালে এবং সূর্যাস্তের সময় সালাত জাইয নেই। কেননা, 'উকবা ইবন 'আমির (রা.) বলেছেন-

তিনটি ওয়াকত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করেছেনঃ সূর্যোদয় কালে, সূর্য উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত; মধ্যাহ্ন কালে সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত; আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

তার বক্তব্য এর উদ্দেশ্য হলো জানাযার সালাত্। কেননা (ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, উক্ত সময়) দাফন করা মাকরূহ নয়। আলোচ্য হাদীছ তার অর্থ-ব্যপকতার কারণে ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে প্রমাণ। ফরযসমূহ এবং মক্কাকে বিশিষ্ট করার উদ্দেশ্য এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর বিপক্ষে প্রমাণ জুমুআর দিন মধ্যাহ্ন কালে নফল সালাত জাইয করার উদ্দেশ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জানাযার সালাত জাইয হবে না।

আমাদের বর্ণিত হাদীছের দলীল মুতাবিক।

সাজদায়ে তিলাওয়াতও জাইয হবে না। কেননা, তা সালাতেরই অংশ বিশেষ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তবে সূর্যাস্তের সময় সে দিনের আসর আদায় করা যাবে। সালাত ওয়াজিব হওয়ার বা হেতু হচ্ছে সময়ের সেই অংশ, যা বিদ্যমান আছে। (অর্থাত্ সালাত শুরুর পূর্ব মুহূর্ত)। কেননা, হেতুর সম্পর্ক যদি সমগ্র সময়ের সাথে হয়, তাহলে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সালাত আদায় করা ওয়াজিব হয়। আর সময়ের বিগত অংশের সাথে যদি সম্পর্কিত হয়, তাহলে শেষ সময়ে সালাত আদায়কারী হয় সালাত কাযাকারী। বিষয়টি যখন এমনই হলো, তবে তো সে যেমন তার উপর ওয়াজিব হয়েছে, তেমনই আদায় করেছে। আর অন্যান্য সালাত এর ব্যতিক্রম। কেননা সেগুলো পূর্ণাংগ সময়ে ওয়াজিব হয়েছে, সুতরাং অপূর্ণাংগ সময়ে তা আদায় হতে পারে না।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, জানাযার সালাত ও তিলাওয়াতের সাজদা সম্পর্কে উল্লেখিত নাজাইযের অর্থ হলো মাকরূহ হওয়া। সুতরাং ঐ সময়ে কেউ যদি জানাযার সালাত আদায় করে কিংবা তখন সাজদার আয়াত তিলা্ওয়াত করে উক্ত তিলাওয়াতের সাজদা করে তাহলে জাইয হবে। কেননা, যেমন নাকিস সময়ে তা ওয়াজিব হয়েছে, তেমনি নাকিস সময়ে তা আদায় করা হয়েছে। কেননা জানাযা উপস্থিত হওয়া ও তিলাওয়াত করার মাধ্যমেই তা ওয়াজিব হয়।

ফজরের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল পড়া, এবং আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নফল আদায় করা মাকরূহ। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তা নিষেধ করেছেন। তবে এই দুই সময়ে কাযা সালাত ও তিলাওয়াতের সাজদা আদায় করতে পারে এবং জানাযার সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, এই মাকরূহ হওয়া ছিলো ফরযের মর্যাদার ভিত্তিতে, যেন সম্পূর্ণ সময়টা সালাতে মশগুল-তুল্য হয়ে যায়। (এই মাকরূহত্ব) সময়ের নিজস্ব কোন প্রকৃতির কারণে নয়। সুতরাং ফরযসমূহের ক্ষেত্রে এবং যে সকল ইবাদত স্বকীয়ভাবে ওয়াজিব হয়েছে, যেমন, তিলাওয়াতের সিজদা, সেগুলোর ক্ষেত্রে সময়ের মাকরূহ হওয়ার হুকুম প্রকাশ পাবে না। আর সালাত (ও মানতকৃত নামায) এর ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পাবে। কেননা উক্ত ইবাদতে আবশ্যকতা তার নিজের পক্ষ থেকে সৃষ্ট কারণের সাথে সম্পৃক্ত। তাওয়াফের রাকাআতদ্বয়ের ক্ষেত্রে মাকরূহ প্রকাশ পাবে। এবং ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মাকরূহ হওয়া প্রকাশ পাবে, যে নফল সালাত শুরু করে তা ভংগ হয়েছে। কেননা

http://islaminonesite.wordpress.com/

উক্ত সালাতের ওয়াজিব হওয়া তার নিজ কারণে নয়, অন্য কারণে। আর তা হলো তাওয়াফ খতম করা এবং শুরু করা সালাতকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা।

ফজরের উদয়ের পর ফজরের দু'রাকাআতের অধিক নফল আদায় মাকরূহ। কেননা সালাতের প্রতি আগ্রহ সত্ত্বেও উক্ত দুই রাকাআতের অতিরিক্ত কিছু নবী করীম (সা.) আদায় করেন নি।

সূর্যাস্তের পর ফরযের পূর্বে কোন নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে মাগরিবকে বিলম্ব করা হয়। তদ্রূপ জুমুআর দিন ইমাম যখন খুতবার জন্য (হুজরা থেকে) বের হবেন, তখন থেকে খুতবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নফল আদায় করবে না। কেননা তাতে খুতবা শোনা থেকে অন্য-মনস্কতা হয়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

আযান

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআর জন্য আযান সুন্নত, অন্য কোন সালাতের জন্য নয়। এ বিধান মুতাওয়াতির (অর্থাত্ সুপ্রচুর সংখ্যক ধারাবাহিক ও নিশ্চিত সূত্রে প্রাপ্ত) হাদীছের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

আযানের বিবরণ সুপরিচিত। অর্থাত্ আসমান থেকে অবতরণকারী ফেরেশতা যেভাবে আযান দিয়েছিলেন এবং তাতে (কালিমা-ই-শাহাদাতের পুনঃ উচ্চারণ নেই) অর্থ উভয় কালিমা-ই-শাহাদাতকে (প্রথমে দু'বার করে) অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে উচ্চারণ করার পর উচ্চস্বরে (দু'বার করে) পুনঃ উচ্চারণ করা।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, আযান রয়েছে। আমাদের যুক্তি এই যে, মশহূর হাদীছগুলোতে নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেন, তা ছিলো (কালিমা-ই-শাহাদাত) শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। সেটাকেই তিনি ধারণা করেছেন।

ফজরের আযানে এর পরে দু'বার যোগ করবে। কেননা (রা.) একবার যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) বলেছিলেন- হে বিল্লাল, কতনা সুন্দর কথা এটা! একে তোমার আযানের অন্তর্ভূক্ত করে নাও। এর সাথে ফজরের আযানকে বিশিষ্ট করার কারণ এই যে, এটা ঘুম ও গাফলতের সময়।

ইকামাত আযানের মতো। তবে তাতে এর পরে দু'বার যোগ করবে। আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা এমনই করেছিলেন, এবং এ-ই মশহূর বর্ণনা (আবূ দাউদ)।

এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে দলীল। কেননা, তিনি বলেন, ইকামাত হচ্ছে এক এক শব্দবিশিষ্ট।

আযান ধীর লয়ে থেমে থেমে উচ্চারণ করবে। আর ইকামাত না থেমে দ্রুতলয়ে উচ্চারণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যখন আযান দেবে, তখন ধীরলয়ে দেবে। আর যখন ইকামাত বলবে, তখন দ্রুতলয়ে বলবে। এ হলো মুস্তাহাবের বর্ণনা। আযান ও ইকামাত উভয়ই কেবলামুখী হয়ে দেবে। কেননা, আসমান থেকে অবতীর্ণ ফেরেশতা কিবলামুখী হয়ে আযান দিয়েছিলেন। তবে কেবলামুখী না হয়ে আযান দিলেও মূল উদ্দেশ্য হাছিল হওয়ার কারণে তা জাইয হবে; তবে সুন্নতের বিরোধিতা করার কারণে তা মাকরূহ হবে।

এবং হাইয়া আলাহ্ সালাহ্, হাইয়া আলাহ্ সালাহ্ বলার সময় মুখমণ্ডল যথাক্রমে ডানে ও বামে ফেরাবে। কেননা তা লোকদের উদ্দেশ্য সম্বোধন। সুতরাং তাদের দিকে মুখ করেই তাদের সম্বোধন করবে।

আর যদি আযানখানায় প্রদক্ষিণ করে, তবে তা উত্তম। একথার উদ্দেশ্য হলো মিনারা প্রশস্ত হওয়ার কারণে যদি সুন্নত মুতাবিক পদদ্বয় স্বস্থানে রেখে মুখমণ্ডল ডানে ও বামে ফেরাতে না পারে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে তা করবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

মুআযযিনের জন্য উত্তম হলো তার উভয়কানের দুই আংগুল স্থাপন করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিলাল (রা.) কে এমনই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ঘোষণা প্রচারের ক্ষেত্রে এটা অধিক কার্যকর। আর যদি তা না করে তাহলেও ভালো। কেননা এটা মূলত, সুন্নত নয়।

ফজরে আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'বার হাইয়া আলাস সালাহ্ হাইয়া আলাস সালাহ্ বলে তাসবীব (বা পুনঃ ঘোষনা দান) উত্তম। কেননা এটা ঘুম ও গাফলাতের সময়। অন্যান্য নামাযে তা মাকরূহ।

পুনঃ ঘোষনা দান। এবং তা লোকদের মধ্যে প্রচলিত পন্থায় করতে হবে। এই তাছবীবের প্রথাটি কূফার আলিমগণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের কারণে সাহাবা যুগের পর আবিষ্কার করেছেন। এবং উপরোল্লেখিত কারণে এটাকে ফজরের সাথেই খাস করেছেন। তবে পরবর্তী আলিমগণ দীনের সকল বিষয়ে শৈথিল্য দেখা দেওয়ায় সকল সালাতেই তাছবীব উত্তম মনে করেছেন। ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন, মুআযযিন প্রত্যেক সালাতের সময় আমীর ও শাসককে উদ্দেশ্য করে একথা বলায় কোন দোষ নেই- হে আমীর! আসসালামু আলায়কুম সালাতে আসুন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ মত গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। কেননা জামা'আতের ব্যাপারে সকল মানুষ সমাণ। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) মুসলমানদের বিষয়াদিতে অধিক ব্যস্ততার কারণে তাদের এ ব্যাপারে বিশিষ্ট করেছেন, যেন তাদের জামা'আত ফউত না হয়ে যায়। এ ব্যাপারে কাযীদের জন্য একই হুকুম।

মাগরিব ছাড়া অন্য সময় আযান ও ইকামাতের মাঝে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। ইমামদ্বয় বলেন, মাগরিবের সময়ও স্বল্পক্ষণ অপেক্ষা করবে। কেননা আযান ও ইকামাতে ব্যবধান করা আবশ্যক আর উভয়কে মিলিয়ে দেওয়া মাকরূহ। আর স্বর-বিরতি ব্যবধান বলে গণ্য হবে না। কেননা তা তো আযানের বাক্যগুলোর মাঝেও বিদ্যমান। সুতরাং স্বল্পক্ষণ বসা দ্বারা ব্যবধান করতে হবে। যেমন দুই খুতবার মাঝে হয়ে থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো; (মাগরিবে) বিলম্ব মাকরূহ। সুতরাং তা পরিহার করার জন্য নূন্যতম ব্যবধানই যথেষ্ট হবে। আর আমাদের আলোচ্য মাসআলাতে স্থানও ভিন্ন এবং স্বরও ভিন্ন। সুতরাং স্বল্প বিরতি দ্বারাই ব্যবধান গণ্য হবে। পক্ষান্তরে খুতবা সেরূপ নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) অন্যান্য সালাতের উপর কিয়াস করে বলেন, দুই রাকাআতে নফলের মাধ্যমে ব্যবধান করবে। (অন্য সালাত থেকে মাগরিবের পার্থক্য আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি)।

ইমাম ইয়া'কুব (আবূ ইউসূফ (র.)) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র.)কে আযান ও ইকামাত দিতে দেখেছি। তিনি আযান ও ইকামাতের মাঝে বসতেন না। আমরা যা বলেছি এটি তার সমর্থন করে। আর এতে এ-ও প্রমাণিত হয় যে, মুআযযিনের শরীআত সংক্রান্ত বিষয়ে আলিম হওয়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের জন্য আযান দিবে।

কাযা সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সফর শেষে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার কারণে পরবর্তী সকাল আযান ও ইকামাত দিয়ে ফজরের সালাত কাযা করেছেন।

শুধু ইকামতকে যথেষ্ট মনে করার ব্যাপারে এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে দলীল।

যদি কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম সালাতের জন্য আযান দিবে ও ইকামাত বলবে। আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছটির কারণে অবশিষ্টগুলোর ক্ষেত্রে তার ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে আযান ও ইকামাত দিবে, যাতে কাযা সালাত আদায় সালাতের অনুরূপ হয়। আর ইচ্ছা করলে শুধু করলে ইকামাতের উপর নির্ভর করবে। কেননা আযান দেয়া হয় উপস্থিত করার জন্য। আর তারা তো উপস্থিত আছেই।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পরবর্তী সালাতসমূহের জন্য শুধু ইকামাতই দেওয়া হবে। মাশায়েখগণও বলেন, হতে পারে

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে এটি তাদেঁর (ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ র.) এর সর্বসম্মত মত।

পবিত্র অবস্থায় আযান ও ইকামাত দেয়া উচিত। তবে উযূ ছাড়া আযান দিলে জাইয। কেননা এটা (আল্লাহর) যিকির, নামায নয়। সুতরাং তাতে উযূ মুস্তাহাব মাত্র। যেমন কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে।

উযূ ছাড়া ইকামাত বলা মাকরূহ। কেননা তাতে ইকামাত ও সালাতের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। অবশ্য বর্ণিত আছে যে, ইকামাতও মাকরূহ হবে না। কেননা এটা তো দুই আযানের অন্যতম। আরেক বর্ণনা মতে আযানও (উযূ ছাড়া) মাকরূহ হবে। কেননা সে এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছে, যার প্রতি সে নিজেই সাড়া দেয়নি।

জুনুবী অবস্থায় আযান দেওয়া মাকরূহ। এ সম্পর্কে একটি মাত্র বর্ণনাই আছে। মুহদিছের আযান সম্পর্কীয় দুইটি রিওয়ায়াতের মধ্যে মাকরূহ না হওয়ার রিওয়ায়াতটির মাসআলার সাথে পার্থক্য এই যে, সালাতের সাথে আযানের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং উভয় সাদৃশ্যের উপর আমল হিসাবে দুই হাদীছের যেটি সবচাইতে কঠোর, তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের শর্ত আরোপ করা হবে, জুনুবীর জন্য নয়।

গ্রন্থে রয়েছে, উযূ ছাড়া আযান এবং একামাত দিলে তা দোহরাতের হবে না। আর জানাবাতের বেলায় দোহরানোই আমার কাছে অধিক প্রিয়। তবে না দোহরালেও চলে। প্রথমটির কারন হাদাছের লঘুতা, আর দ্বিতীয়টির অর্থাত্ জানাবাতের কারণে দোহরানোর ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। তবে অধিকতর যুক্তিপূর্ণ এটি যে, আযান দোহরানো উচিত, কিন্তু ইকামাত দোহরাতে হবে না। কেননা পুনঃ আযান শরীআত অনুমোদিত; পুনঃ ইকামাত অনুমোদিত নয়।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর বক্তব্যের অর্থ হল সালাত হয়ে যাবে। কেননা, সালাত তো আযান-ইকামাত ছাড়াও জাইয হয়।

গ্রন্থকার বলেন- স্ত্রীলোক যদি আযান দিয়ে থাকে তবে এরূপ হুকুম। অর্থাত্ দোহরানো মুসতাহাব, যাতে আযান সুন্নত মুতাবিক হয়ে যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সময় হওয়ার পূর্বে কোন সালাতের আযান দেওয়া বৈধ নয়। ওয়াকত হওয়ার পর আবার দিতে হয়। কেননা, আযান দেওয়া হয় মানুষের অবগতির জন্য। অথচ সময়ের পূর্বে হলে সেটা হবে মানুষকে অজ্ঞতায় ফেলার মধ্যে শামিল।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) বলেন, আর ইমাম শাফিঈ (র.) এর অভিমতও তাই- ফজরের ক্ষেত্রে রাত্রের শেষার্ধে (আযান দেওয়া) বৈধ। কেননা, হারামাইন শরীফের অধিবাসীদের যুগ পরস্পরায় তা চলে আসছে।

এ সকলের বিপক্ষে দলীল হল বিলালের উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশ – ফজর এরূপ ফরসা হওয়ার পূর্বে আযান দিও না। একথা বলে তিনি উভয় হাত চওড়াভাবে প্রসারিত করলেন।

মুসাফির আযান ও ইকামত দেবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবূ মুলায়কার দুই পুত্রকে বলেছিলেন- যখন তোমরা সফর করবে তখন (তোমাদের একজন) আযান দিবে এবংইকামাত বলবে।

যদি আযান ও ইকামাত দু'টোই তরক করে তাহলে তা মাকরূহ হবে। আর যদি শুধু ইকামাতের উপরই ক্ষান্ত হয়, তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, আযান(মূলতঃ) অনুপস্থিতদের উপস্থিত করার জন্য; অথচ সফর সংগীরা তো উপস্থিতই আছে। পক্ষান্তরে ইকামাত হলো (নামাযের) আরম্ভের ঘোষণার জন্য, আর উপস্থিতদের জন্য তার প্রয়োজন রয়েছে।

যদি নগরীতে নিজের ঘরে সালাত আদায় করে, তাহলে আযান-ইকামাত দিয়েই সালাত আদায় করবে, যাতে জামাআত অনুযায়ী সালাত আদায় হয়। আর তা তরক করাও জাইয আছে। কেননা ইবন মাস'উদ (রা.) বলেছেন, মহল্লার আযান আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সালাতের পূর্ববর্তী শর্তসমূহ

http://islaminonesite.wordpress.com/

মুসল্লীর জন্য যাবতীয় হাদাছ ও নাজাসাত থেকে প্রাক-পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব। সে পদ্ধতিতে, যা ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তুমি তোমার কাপড় পাক রাখো।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন- যদি তোমরা জুনুবী হও তাহলে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করো।

আর ছতর ঢাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- অর্থাত্ প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা এমন পোশাক পরিধান করো, যাতে তোমাদের সতর ঢাকে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটুর মধ্যবর্তী অংশ। অন্য বর্ণনায় আছে- তার নাভির নীচ থেকে তার হাঁটু অতিক্রম করে যাওয়া পর্যন্ত । এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নাভি সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

হাটু সতরের অন্তর্ভূক্ত। এ সম্পর্কেও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। হাদীছের কে আমরা সহ এর অর্থে গ্রহণ করেছি। দ্বিতীয় হাদীছের শব্দের উপর আমল করার প্রেক্ষিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিম্নোক্ত হাদীছের উপর আমল করার উদ্দেশ্যে-হাটু সতরের অন্তর্ভূক্ত।

স্বাধীন নারীর মুখমন্ডল ও হাতের কবজি ছাড়া সমস্ত শরীর সতর। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেছেন- স্ত্রীলোক আওরত, যা ঢেকে রাখা কর্তব্য। দু'টি অংগকে ব্যতিক্রম করার কারণ হলো তা প্রকাশ করা অনিবার্য।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ ব্যতিক্রম স্পষ্ট নির্দেশ করে যে, পায়ের পাতা সতর আর এক বর্ণনায় আছে যে, তা সতর নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

যদি কোন স্ত্রীলোক পায়ের গোছার এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ খোলা অবস্থায় সালাত আদায় করে তাহলে সে তার সালাত দোহরাবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মত। আর যদি তা এক-চতুর্থাংশের কম হয়, তাহলে সালাত দোহরাবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, অর্ধেকের কম হলে দোহরাবে না। যেহেতু কোন কিছুকে তখনই অধিক বলে আখ্যায়িত করা হয়, যখন তার বিপরীত বস্তুটি পরিমাণে তার চেয়ে কম হয়। কেননা, কম ও বেশী শব্দ দু'টি তুলনামূলক।

'অর্ধেক' সম্পর্কে তার পক্ষ হতে দু'টি বর্ণনা রয়েছে- এক বর্ণনায় 'কম' এর গণ্ডি বহির্ভূত হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। অপর বর্ণনায় 'বেশী' এর গণ্ডিভূক্ত না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর যুক্তি এই যে, চতুর্থাংশে সম্পূর্ণের স্থলবর্তী হয়ে থাকে। যেমন 'মাথা মাসহের ক্ষেত্রে এবং ইহরামে 'মাথা মুড়ানোর' ক্ষেত্রে। এবং যে ব্যক্তি কারো চেহারা দেখে সে ঐ ব্যক্তিকে দেখেছে বলে খবর দেয়। যদিও সে উক্ত ব্যক্তির চারপাশের একপাশ মাত্র দেখেছে।

চুল, পেট ও উরুও অনুরূপ অর্থাত্ এতেও উক্ত মতভেদ রয়েছে। কেননা প্রতিটাই আলাদা অংগ।

চুল দ্বারা এখানে মাথা থেকে ঝুলে থাকা অংশ উদ্দেশ্য। এ-ই বিশুদ্ধ মত। তবে জানাবাতের গোসলে এটা ধোয়া মা'ফ হওয়ার কারণ হল কষ্ট আরোপ হওয়া।

লজ্জাস্থান দু'টিতেও অংশ সতর, দাসীরও তাই সতর। আর তার পেট ও পিঠও সতর। এছাড়া তার শরীরের অন্যান্য অংগ সতর নয়। কেননা, উমর (রা.) (জনৈকা দাসীকে লক্ষ করে) বলেছিলেন, এই ছেমড়ি! মাথা থেকে ওড়না সরিয়ে নে, স্বাধীন স্ত্রী লোকদের মত হতে চাস বুঝি!

তাছাড়া তাকে তার মনিবের প্রয়োজনে কাজের পোশাকে বাইরে বের হতে হয়। সুতরাং অসুবিধা লাঘবের উদ্দেশ্যে অন্যান্য পুরুষের ক্ষেত্রে তাকে মাহরেমের ন্যায় গণ্য করা হবে।

যদি নাজাসাত দূর করার মতো কিছু না পায়, তাহলে তা সহই সালাত আদায় করবে। এবং সালাত দোহরাতে হবে না। এর দু'ই সুরত। যদি কাপড়ের এক-চতুথাংশ বা তার চাইতে বেশী অংশ পাক হয়, তাহলে ঐ কাপড় পরেই সালাত আদায় করবে যদি বিবস্ত্র হয়ে সালাত আদায় করে, তাহলে জাইয হবে না। কেননা

http://islaminonesite.wordpress.com/

এক-চতুর্থাংশ সম্পূর্ণের স্থলবর্তী হয়। যদি এক-চতুর্থাংশ কম পাক হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে একই হুকুম। আর এটা ইমাম শাফিঈ (র.) ও দু'টি মতের একটি। কেননা ঐ কাপড়ে সালাত আদায়ে একটি ফরয তরক হয়। পক্ষান্তরে উলংগ হয়ে সালাত আদায়ে একাধিক ফরয তরক হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে সে ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা হলে উলংগ হয়ে সালাত আদায় করুক, কিংবা নাপাক কাপড়ে সালাত আদায় করুক। তবে দ্বিতীয়টাই উত্তম। কেননা, সক্ষম অবস্থায় প্রতিটি সালাতের প্রতিবন্ধক। এবং (মা'ফ হওয়ার) পরিমাণের ক্ষেত্রে দুটোই সমান। সুতরাং সালাতের হুকুম ও দুটোই সমান হবে।

তাছাড়া কোন কিছুকে তার স্থলবর্তী রেখে তরক করায় গণ্য হয় না।

(কাপড়ে পরে সালাত আদায়) উত্তম হওয়ার কারণ এই যে, সতর সালাতের সাথে খাস নয়। পক্ষান্তরে তাহারাত সালাতের সাথে খাস।

কেউ যদি সতর ঢাকার কাপড় না পায় তাহলে উলংগ অবস্থায় বসে ইশারায় রুকু সাজদা করে সালাত আদায় করে, তাহলেও তার জন্য জাইয হবে। কেননা বসার মধ্যে লজ্জাস্থানের সতর হয়। আর দাড়িয়ে পড়লে উল্লেখিত রকনগুলো আদায় হয়। সুতরাং দুটোর যে কোন একটি সে গ্রহণ করতে পারে।

তবে প্রথমটিই উত্তম। কেননা, সতর ঢাকা ফরয হয়েছে সালাতের হক হিসাবে এবং মানুষের হক হিসাবে। তাছাড়া এর কোন স্থলবর্তী নেই। আর ইশারা হয়েছে রকনের স্থলবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যে সালাত শুরু করতে যাচ্ছে, সে এমনভাবে নিয়্যত করবে যে, নিয়্যত ও তাহরীমার মাঝে কোন কম দ্বারা ব্যবধানে সৃষ্টি করবে না।

এ শর্তটির মূল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীছ (যাবতীয় আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাছাড়া সালাতের শুরু হয় কিয়াম বা দাড়ানো অবস্থা দ্বারা। আরা তা অভ্যাস ও ইবাদত উভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান। সুতরাং নিয়্যত ছাড়া এতে পার্থক্য সৃষ্টি হবে না।

আর যে নিয়্যত তাকবীরের পূর্বে করা হয়, তা তাকবীরের সময়ও বিদ্যমান আছে বলে গণ্য। যদি তাকে বিচ্ছিন্নকারী কোন কিছু না পাওয়া যায়। অর্থাত্ এমন কোন কাজ, যা সালাতের উপযোগী নয়। আর তাকবীরের পরবর্তী নিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নিয়্যতের পূর্বে যা বিগত হয়েছে, তা নিয়্যতহীনতার কারণে ইবাদত হবে না। সিয়ামের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনের কারণে তা কায়েম রাখা হয়েছে।

নিয়্যত অর্থ ইচ্ছা, তবে শর্ত এই যে, নিজে অন্তরে জ্ঞাত হতে হবে যে, কোন সালাত সে আদায় করছে। মুখে উচ্চারণ করা ধর্তব্য নয়। তবে উচ্চারণ করা উত্তম। কেননা, তা ইচ্ছাকে সংহত করে।

উল্লেখ্য যে, সালাত যদি নফল হয় তাহলে সাধারণ নিয়্যতই যথেষ্ট। বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ মতে সুন্নত সালাতেরও এ হুকুম। আর যদি ফরয সালাত হয় তবে ফরয নির্ধারিত হওয়া জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন, যুহর। কেননা ফরয বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

আর যদি অন্য কারো মুকতাদী হয়, তাহলে সালাতের এবং ইমামের অনুগমনের নিয়্যত করবে। কেননা, ইমামের দিক থেকে তার সালাতে ফাসাদ আরোপিত হয়ে থাকে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ আবশ্যক।

গ্রন্থকার বলেন- আর কিবলামুখী হবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল মুসজিদুল হারাম অভিমুখী কর। তবে যে ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করছে, তার জন্য স্বয়ং কা'বামুখী হওয়া ফরয। আর মক্কায় অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ফরয হলো কা'বার দিকের প্রতি মুখ করা। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা, দায়িত্ব অর্পিত হয় সাধ্য অনুসারে।

যে ব্যক্তি ভীতিগ্রস্ত হয়, সে যে দিকেই সক্ষম হয় সেদিকেই মুখ করে সালাত আদায় করবে। কেননা, ওযর বিদ্যমান থাকার কারণে। সুতরাং কিবলা অজ্ঞাত

http://islaminonesite.wordpress.com/

হওয়ার অনুরূপ হবে। যদি কারো জন্য কিবলা অজ্ঞাত (ও সন্দেহপূর্ণ) হয়ে পড়ে এবং তার কাছে এমন কেউ না থাকে, যাকে কেবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারে। তাহলে সাধ্যানুযায়ী চিন্তা করে কিবলা স্থির করে নেবে। কেননা সাহাবায়ে কিরাম চিন্তা করে (কিবলা নির্ধারণ পূর্বক) সালাত আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেঁর কাজ প্রত্যাখ্যান করেননি।

তাছাড়া অধিকতর শক্তিশালী দলীলের অবর্তমানে প্রকাশ্য প্রমাণের উপর আমল করাই ওয়াজিব। আর সংবাদ জিজ্ঞাসা চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অগ্রাধিকার রাখে।

সালাত আদায়ের পর যদি সে জানতে পারে যে, সে ভুল করেছিলো, তাহলে সালাত দোহরাতে হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যদি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে থাকে, তাহলে ভুল নিশ্চিত হওয়ার কারণে সালাত দোহরাবে।

আর আমাদের দলীল হল, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা নির্ধারিত দিকের অভিমুখী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু তার সাধ্যে ছিল না। আর দায়িত্ব অর্পন সাধ্যের উপর নির্ভরশীল।

আর যদি সে সালাতের মধ্যেই তা জানতে পারে, তাহলে কিবলার দিকে ঘুরে যাবে। কেননা, কুবাবাসীরা যখন কিবলা পরিবর্তনের খবর শুনতে পেলেন তখন তাঁরা সালাতের অবস্থাতেই ঘুরে গেলেন এবং নবী করীম (সা.) তা পসন্দ করেছিলেন। তদ্রূপ যদি তার সিদ্ধান্ত অন্যদিকে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে সে সেদিকের অভিমুখী হবে। কেননা, পরবর্তী ক্ষেত্রে নতুন ইজতিহাদের উপর আমল করা আবশ্যক; তবে তাতে ইতোপূর্বে আদায়কৃত অংশ ভংগ হবে না।

যে ব্যক্তি অন্ধকার রাতে কোন জামা'আতের ইমামতি করল এবং চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কিবলা নির্ধারণ করে পূর্বমুখী হয়ে সালাত আদায় করল, আর তার পিছনে যারা রয়েছে তারাও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রত্যেক একেক দিকে সালাত আদায় করল, এমন অবস্থায় যে, প্রত্যেক ইমামের পশ্চাতে আছে এবং ইমাম কী করছেন তা তাদের জানা নেই, তাহলে তা সবার জন্য জাইয হবে। কেননা, চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নির্ধারিত দিকে অভিমুখী হওয়া তো পাওয়া গেছে। আর ইমামের সাথে এই বিরোধ বাধা সৃষ্টি করে না। যেমন কা'বার অভ্যন্তরের মাসআলা।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কিন্তু তাদের মধ্যে যে ইমামের বিপরীত অবস্থা জানতে পারে, তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা আপন ইমাম ভুলের উপর আছে বলে সে বিশ্বাস করছে।

আর এ হুকুম সে ইমামের সম্মুখে হলেও। কেননা সে তার স্থানগত ফরয তরক করেছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সালাতের ধারাবাহিক বিবরণ

সালাতের ফরয ছয়টি

(প্রথমতঃ) তাহরীমা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- (তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে তাকবীর বলো) আর (মুফাসসিরদের সর্বসম্মতিক্রমে) আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা।

(দ্বিতীয়তঃ) কিয়াম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তোমরা একাগ্র চিত্তে আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হও)

(তৃতীয়তঃ) কিরাআত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয় তোমরা পড়ো, রকু ও সাজদা করা, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তোমরা রুকু করো এবং সাজদা করো।

সালাতের পরে তাশাহুদ পরিমাণ বৈঠক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইবন মাস'উদ (রা.) কে তাশাহুদ শিক্ষাদান কালে বলেছেন- তুমি যখন এ বললে বা এ করলে তখন তোমার সালাত সমাপ্ত হল।

এখানে সালাতের সম্পূর্ণতারেক তিনি বসার কাজের সাথে যুক্ত করেছেন (তাশাহহুদ) পাঠ করুক বা না করুক।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী বলেন, এছাড়া আর যা কিছু, তা সুন্নত।

ইমাম কুদূরী এখানে সুন্নত শব্দটি ব্যবহার করেছেন।অথচ তাতে বিভিন্ন ওয়াজিব বিষয় রয়েছে। যেমন, ফাতিহা পাঠ, তার সাথে সূরা যোগ করা, যে কাজ শরীআত কর্তৃক একাধিকবার নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলোর মাঝে তারতীব রক্ষা করা। প্রথম বৈঠক, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ, সালাতের কুনূত, দুই ঈদের তাকবীরসমূহ এবং যে সকল সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা সে সকল সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পাঠ এবং যে সকল সালাতে অনুচ্চস্বরে কিরাত পাঠ করা হয়, সে সকল সালাতে অনুচ্চস্বরে কিরাত পাঠ। এজন্যই এগুলোর কোন একটি তরক করলে তার উপর দু'টি সাজদাসহ ওয়াজিব হয়। এ-বিশুদ্ধ মত। কুদূরীতে একগুলোকে সুন্নাত বলার কারণ এই যে, এগুলোর ওয়াজিবত্ব সুন্নাহ্ দ্বারা সালাত হয়েছে।

যখন সালাত শুরু করবে তখন তাকবীর বলবে। ইতোপুর্বে আমাদের পঠিত আয়াতের কারণে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তাকবীর হলো সালাতের তাহরীম। আমাদের মতে তাকবীরে তাহরীমা হলো সালাতের শর্ত। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন (তাঁর মতে এটা রুকন)। (আমাদের মতে শর্ত হওয়ার কারণেই) যে ফরযের তাহরীমা বাঁধবে, সে ঐ তাহরীমা দ্বারা নফল সালাত আদায় করতে পারবে।

তিনি বলেন, অন্যান্য রুকনের জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, তাহারীমার জন্যও সেসব শর্ত রয়েছে। আর এটি রুকন হওয়ার আলামত।

আমাদের যুক্তি এই- সে তার প্রতিপালকের নামে নিলো অতঃপর সালাত আদায় করল)।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকবীরের উপর সালাতকে করেছেন। আর এর দাবী হলো উভয়ের বৈপরীত্য। আর একারণেই অন্যান্য রুকনের পুনঃ পৌনিকতার মতো এইটা পুনঃ পৌনিক হয় না।

(রুকনসমূহের) যাবতীয় শর্ত এখানে বিবেচনা করার কারণ এই যে, কিয়াম রুকনটি তার সংলগ্ন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাকবীরের সাথে উভয় হাত উত্তোলন করবে। এটি সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এটা নিয়মিত করেছেন। এই শব্দটি এদিকে ইংগিত করে যে, তাকবীর ও হস্তদ্বয়ের উত্তোলন একত্রে হওয়া শর্ত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে এ মতামত বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম তাহাবী (রা.) এ আমল করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, প্রথমে উভয় হাত উঠাবে। তারপর তাকবীর বলবে। কেননা তার একাজ গায়রুল্লাহ্ থেকে বড়ত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপক। আর অস্বীকৃতি স্বীকৃতির উপর অগ্রবর্তী হয়ে থাকে।

উভয় হাত এতটা উপরে উঠাবে, যাতে বৃদ্ধাংগুলি দু'টো উভয় কানের লতিকার বরাবর হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে হাত উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। কুনূতের তাকবীর, ঈদের তাকবীর ও জানাযার তাকবীর সম্পর্কেও একই মতপার্থক্য।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর দলীল হলো আবূ হুমায়াদ সাঈদী (রা.) বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত কাধ পর্যন্ত তুলতেন।

আমাদের দলীল হলো, ওয়াইল ইবন হাজার, বারা ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ। তারা বলেন, নবী (সা.) যখন তাকবীর বলতেন, তখন উভয় হাত তাঁর কান পর্যন্ত উঠাতেন।

তাছাড়া হাত উঠানোর উপকারিতা হলো বধিরদেরকে অবহিত করণ। আর তা ঐ ভাবেই সম্ভব, যেভাবে আমরা বলেছি।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছকে অপারগতার অবস্থার উপর আরোপ করা হবে। স্ত্রীলোক তার উভয় হাত কাধ পর্যন্ত উঠাবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা এটা তার সতর রক্ষার জন্য অধিক উপযোগী।

যদি তাকবীরের পরিবর্তে আল্লাহু আকবার কিংবা আল্লাহর অন্যান্য নাম (ও গুণ) উচ্চারণ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)এর মতে তা যথেষ্ট হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, যদি সে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে সক্ষম হয়, তাহলে আল্লাহু আকবার ছাড়া অন্য কিছু জাইয হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রথম দু'টি ছাড়া অন্য কিছু জাইয হবে না।

আর ইমাম মালিক (র.) বলেন, প্রথমটি ছাড়া অন্য কিছু জা্ইয হবে না। কেননা (নবী সা. এর আমল রূপে) এটিই বর্ণিত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে শুধু বর্ণিত হাদীছ থেকে জ্ঞান লাভ করাই আসল।

ইমাম শাফি(র.) (নীতিগতভাবে ইমাম মালিকের যুক্তি স্বীকার করে) বলেন, লাম্ আলিফ যুক্ত করা প্রশংসার ক্ষেত্রে অধিক অর্থবহ। সুতরাং এটি তার স্থলবর্তী।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে উভয় 'মাপের' শব্দ সমার্থক। তবে তাকবীরের শুদ্ধ উচ্চারণে অক্ষমতার বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা তখন তো সে মর্ম প্রকাশেই শুধু সক্ষম।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর যুক্তি এই যে, তাকবীরের আভিধানিক অর্থ হলো মর্যাদা প্রকাশ। আর তা প্রকাশিত হয়েছে।

যদি ফার্সীতে সালাত শুরু করে। কিংবা ফারসী ভাষায় সালাতের কিরাত পাঠ করে কিংবা যবাহ্ করার সময় ফারসী ভাষায় বিসমিল্লাহ্ পড়ে অথচ সে শুদ্ধ আরবী বলতে পারে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)এর মতে তা যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, পশু যবাহ্ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট হবে না। তবে যদি শুদ্ধ আরবী বলতে অক্ষম হয়, তাহলে যথেষ্ট হবে।

সালাতের উদ্বোধন (তথা তাকবীর) প্রসংগে আরবী ভাষায় হলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সংগে একমত। পক্ষান্তরে ফারসী ভাষার হলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর সংগে একমত। কেননা আরবী ভাষার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য ভাষার নেই।

আর কিরাত সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর বক্তব্যের দলীল এই যে, কুরআন আরবী শব্দসমষ্টির নাম, যেমন কুরআনের আয়াতে তা বলা হয়েছে। তবে আপারগতার সময় শুধু ভাব ও মর্মকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। যেমন (রুকু

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাজদা আদায়ে অপারগতার সময়) ইশারাকে যথেষ্ট মনে করা হয়। (তবে যবাহের সময়) বিসমিল্লাহির বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহর যিকির যে কোন ভাষায় হতে পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী- নিঃসন্দেহে এ কুরআন পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে বিদ্যমান ছিলো আর সেখানে তা এ ভাষায় অবশ্যই ছিল না। একারণেই অপারগতার সময় অন্য ভাষায় জাইয রয়েছে। ক্রমাগত অনুসৃত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহগার হবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা ভাষার ভিন্নতার কারণে মর্ম ভিন্ন হয় না।

আর মতপার্থক্যটি হলো গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে। সালাত ফাসিদ না হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। বর্ণিত আছে যে, মূল মাসআলায় ইমাম সাহেব উক্ত ইমামদ্বয়ের বক্তব্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর তা-ই নির্ভরযোগ্য। খুতবা ও তাশাহহুদ সম্পর্কেও অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। আর আযানের ব্যাপারে স্থানীয় প্রচলন বিবেচ্য হবে।

যদি বলে সালাত আরম্ভ করে, তাহলে তা জাইয হবে না। কেননা এতে তার স্বার্থের 'মিশ্রণ' রয়েছে। সুতরাং তা খালিস তাযীম থাকেনি। আর যদি শুধু বলে আরম্ভ করে তাহলে কারো কারো মতে জাইয হবে। কেননা এর অর্থ হলো তবে অন্য এক মতে তা জাইয হবে না। কেননা এর অর্থ হলো- হে আল্লাহ্ আমাদের কল্যাণ করুন) সুতরাং এটা প্রার্থনা হলো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সে তার নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- নাভির নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত স্থাপন সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত।

এ হাদীছ হাত ছেড়ে রাখার ব্যাপারে ইমাম মালিক (র.) এর বিপক্ষে দলীল।

তাছাড়া হাত নাভির নীচে রাখা 'তাযীম প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী এবং তা-ই হলো উদ্দেশ্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসূফের মতে ‘হাত বাঁধা’ হচ্ছে কিয়ামের সুন্নাত। সুতরাং ছানা পড়ার সময় তা ছেড়ে রাখবে না। মূল নীতি এই যে, যে কিয়ামের মধ্যে কোন যিকির সুন্নত রয়েছে, তাতে হাত বেঁধে রাখা হবে, অন্যথায় নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত। সুতরাং কুনূতের অবস্থায় এবং জানাযার সালাতে হাত বেঁধে রাখবে, পক্ষান্তরে রুকুর পর দাঁড়ানো অবস্থায় এবং ঈদের তাকবীরসমূহের মধ্যবর্তী সময়ে হাত ছেড়ে রাখবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণিত আছে যে, এর সাথে ইন্নি ওয়াযযাহাতু ওয়াযহিয়াহ্ থেকে শেষ পর্যন্ত দু’আটি যোগ করবে। কেননা, হযরত ‘আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তা বলতেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল হলো, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সা.) যখন সালাত আরম্ভ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং সুবাহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তেন। এর অতিরিক্ত কিছু পাঠ করতেন না। ইমাম আবূ ইউসূফ বর্ণিত হাদীছটি তাহাজ্জুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মশহুর হাদীছগুলোতে বাক্যটি নেই। সুতরাং ফরয সালাতে তা বলবে না। তাকবীরের পূর্বে ইন্নি ওয়াযযাহাতু ওয়াযহিয়া বলবে না, যাতে নিয়্যত তাকবীরের সাথে যুক্ত থাকে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

আর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন- যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো।

এর অর্থ হলো, যখন কুরআন পাঠের ইচ্ছা করবে। বলাই হলো উত্তম, যাতে কুরআনের শব্দের সাথে মিল হয়। আউওযুবিল্লাহ্ শব্দটিও এর কাছাকাছি।

যা হোক, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে- তাজ্ হচ্ছে কিরাতের সাথে সংযুক্ত, ছানার সাথে নয়। আমাদের পেশকৃত আয়াত এর দলীল। তাই মসবূক বলবে, কিন্তু মুক্তাদি বলবে না। এবং ঈদের সালাতের তাকবীরসমূহের পরে

http://islaminonesite.wordpress.com/

বলবে। আবূ ইউসূফ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়বে। মশহুর হাদীছগুলোতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

(আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্) দু'টোই অনুচ্চস্বরে পড়বে। কেননা ইবন মাস'উদ (রা.) বলেছেন- চারটি বাক্য ইমাম নীরবে পড়বে। তন্মেধ্যে তিনি আউযুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ ও আমীন উল্লেখ করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উচ্চৈস্বরে পড়ার সময় বিসমিল্লাহও উচ্চস্বরে পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তার সালাতে বিসমিল্লাহ উচ্চৈস্বরে পড়েছেন।

এর জবাবে আমরা বলি যে, তা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছিলো। কেননা, আনাস (রা.) অবহিত করেছেন যে, নবী (সা.) বিসমিল্লাহ্ উচ্চৈস্বরে পড়তেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে একটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, তাজ এর ন্যায় বিসমিল্লাহ প্রত্যেক রাকাআতের শুরুতে বলবে না (বরং শুধু সালাতের শুরুতে বলবে)। তবে তার থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, সতর্কতামূলক প্রত্যেক রাকাআতে বিসমিল্লাহ্ পড়বে। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতও তাই।

সূরা ও ফাতিহার মাঝে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে নীরব কিরাত বিশিষ্ট সালাতে তা পড়বে।

তারপর সূরাতুল ফাতিহা পড়বে এবং অন্য একটি সূরা কিংবা যে কোন সূরা থেকে ইচ্ছা তিনটি আয়াত।

মোটকথা, আমাদের মতে ফাতিহা পাঠ রুকন হিসাবে নির্ধারিত নয়। তদ্রূপ তার সাথে সূরা মিলানোও। ফাতিহা সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এবং উভয়টি সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.) এর ভিন্ন মত রয়েছে।

ইমাম মালিক (র.) এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- ফাতিহা এবং তার সাথে সংযুক্ত একটি সূরা ছাড়া সালাত হয় না।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- সুরাতুল ফাতিহা ছাড়া সালাত হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – কুরআনের যে অংশ সহজে সম্ভব হয়, তোমরা পড়ো। আর ' খাবরুল ওয়াহিদ' হাদীছ দ্বারা কিতাবুল্লাহর সাথে অতিরিক্ত বিষয় যোগ করা বৈধ নয়। তবে তার উপর আমল ওয়াজিব। তাই আমরা সূরাতুল ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলানোকে ওয়াজিব বলি।

ইমাম যখন ওয়ালাদদওয়াল্লিন বলবে তখন আমিন বলবে। এবং মুক্তাদিও তা বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীছের শেষে বলেছেন- কেননা ইমাম তা বলেন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুক্তাদিয়া তা অনুচ্চৈস্বরে বলবে। কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবন মাস'উদের হাদীছে এরূপ আছে।

তাছাড়া এটা দু'আ বিশেষ। সুতরাং গোপন করার উপরই তার ভিত্তি হবে।

শব্দটিতে দীর্ঘ আলিফ ও হ্রস্ব আলিফ দুটো উচ্চারণই রয়েছে। শব্দে (মীমের) উপর তাশদীদ প্রয়োগ মারাত্মক ভুল।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তারপর তাকবীর বলবে ও রকু করবে।

গ্রন্থে রয়েছে, নত হওয়ার সংগে তাকবীর বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামাযে প্রত্যেক উঠা-নামার সময় তাকবীর বলতেন।

তাকবীরকে খাটোভাবে উচ্চারণ করবে। কেননা তাকবীরের প্রথমাংশে লম্বা করা দীনের দৃষ্টিতে ভুল। কেননা তা প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শেষাংশে লম্বা করা ভাষাগত দিক থেকে ভুল।

উভয় হাত দুই হাটুতে স্থাপন করবে এবং আংগুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনাস (রা.) কে বলেছেন- যখন তুমি রুকু করবে তখন তোমার দু'হাত হাটুতে রাখবে। এবং তোমার আংগুলগুলোর মাঝে ফাক করবে।

এ অবস্থা ছাড়া অন্য কখনো আংগুল ফাক রাখা মুস্তাহাব নয়, যেন শক্ত করে ধরা হয়। তদ্রূপ সাজদার অবস্থা ছাড়া অন্য কখনো আংগুলগুলো মিলিয়ে রাখা মুস্তাহাব নয়। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর পিঠকে সমতল ভাবে রাখবে। কেননা নবী (সা.) যখন রুকু করতেন তখন তার পিঠ সমতলভাবে রাখতেন। এবং নিজ মাথা উপরের দিকে উঠাবে না এবং ঝুকাবেও না। কেননা নবী (সা.) যখন রুকু করতেন তখন তিনি মাথা উপরের দিকে উঠাতেন না এবং ঝুকিয়েও রাখতেন না।

আর তিনবার সুবাহানা রাব্বিয়াল আযিম বলবে। আর এটা হলো তাসবীহের সর্বনিম্ন পরিমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন রুকু করে তখন সে যেন তার রুকুতে তিনবার সুবাহানা রাব্বিয়াল আযিম বলে। আর এটা হলো তার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

অর্থাত্ বহুবচন পূর্ণ করার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

তারপর মাথা তুলবে এবং সামিআল্লাহ্ হুলিমান হামীদা বলবে আর মুক্তাদি রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে। আবূ হানীফা (র.) এর মতে ইমাম তা বলবেন। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম তা মনে মনে বলবেন। কেননা আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) উভয় যিকিরকেও একত্র করতেন।

তাছাড়া ইমাম অন্যকে (তা বলতে) উদ্বুদ্ধ করছেন। সুতরাং তিনি নিজেকে তা বলতে পারেন না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী-

ইমাম যখন বলেন সামিআল্লাহ্......... বলেন তখন তোমরা রাব্বানা........ বলো। এ হলো বন্টন, যা শরীকির পরিপন্থী। এজন্যই তো আমাদের মতে মুক্তাদি সামিআল্লাহ্....... বলবে না। অবশ্য ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাছাড়া ইমামের তাহমীদ মুক্তাদির তাহমীদের পরে হয়ে যাবে, যা ইমামত পদবীর পরিপন্থী।

আর আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছ মুনাফারিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ মতে মুনাফারিদ উভয়টিকে একত্র করবে। যদিও শুধু সামিআল্লাহ্......বলা এবং অপর রিওয়ায়াতে রাব্বানা.......... বলার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম মুক্তাদিকে তাহমীরের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তা পালন করেছেন।

ইমাম কুদূরী বলেন- অতঃপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে এবং সাজদায় যাবে।

তাকবীর ও সাজদার কারণ তা যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তবে সোজা হয়ে দাড়ানো অবশ্য ফরয নয়। তদ্রূপ দুই সাজদার মাঝে বসা এবং রুকু ও সাজদায় সুস্থির হওয়াও ফরয নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মত।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, এগুলো সবই ফরয। ইমাম শাফিঈ (র.) এরও এইমত। কেননা দ্রুততার সাথে সালাত আদায়কারী জনৈক বেদুঈন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- দাড়াও এবং পুনঃ সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, এর আভিধানিক অর্থ মাথা ঝুকানো এবং এর আভিধানিক অর্থ মাথা পূর্ণ অবনত করা। সুতরাং রুকু ও সাজদার সর্বনিম্ন পরিমাণের সাথে রুকুনের সম্পর্ক হবে। তদ্রূপ (রুকু থেকে সাজদায় বা সাজদা থেকে সাজদায়) গমনের ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন পরিমাণ বিবেচ্য হবে। কেননা তা উদ্দেশ্য নয়।

আর বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে বেদুঈন সাহাবীর আমলকে সালাত আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন তা থেকে যে পরিমাণ তুমি কম করলে, মূলতঃ তুমি তোমার সালাত থেকে সেই পরিমাণ ক্ষতি করলে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে, তারপর 'কাওমাহ' ও জালছা' সুন্নাত। তদ্রূপ ইমাম (আবূ আবদুল্লাহ্) জুরজানী (র.) এর তাখরীজ (মাসআলা বিশ্লেষণ) মুতাবিক সুস্থিরতা অবলম্বন করাও সুন্নাত। আর ইমাম কারখী (র.) এর তাখরীজ মুতাবিক তা ওয়াজিব। সুতরাং তার মতে সুস্থিরতা বর্জন করলে সাজদা সাহু ওয়াজিব হবে। আর উভয় হাত মাটিতে রাখবে। কেননা ওয়াইল ইবন হুজুর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সালাতের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে সাজদা করেছেন এবং উভয় হাতের তালুর উপর ভর দিয়েছেন এবং নিতম্ব উচু করে রেখেছেন।

আর মুখমণ্ডল দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে করবে। এবং উভয় হাত উভয় কান বরাবর রাখবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এরূপ করেছেন।

ইমাম কুদূরী বলেন- আর নিজের নাক ও কপালের উপর সাজদা করবে। কেননা নবী (সা.) নিয়মিত এরূপ করেছেন।

তবে যদি দু'টির একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে তাহলে তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে জাইয। ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন, ওযর ছাড়া শুধু নাকের উপর সীমাবদ্ধ করা জাইয হবে না।

আর এটা হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে প্রাপ্ত আরেক রিওয়ায়াত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- আমাকে 'সপ্ত প্রত্যঙ্গের উপর সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে কপালকেও তিনি গণ্য করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, ভূমিতে মুখমণ্ডলের অংশ বিশেষ স্থাপন দ্বারাই সাজদা সম্পন্ন হয়। আর তাই আদিষ্ট বিষয়। তবে সর্বসম্মতিক্রমে গণ্ডদেশ ও চিবুক এর থেকে বহির্ভূত।

আর আলোচ্য হাদীছের প্রসিদ্ধ বর্ণনায় মুখমণ্ডল শব্দটি রয়েছে।

উভয় হাত এরং উভয় হাটু মাটিতে স্থাপন করা আমাদের নিকট সুন্নাত। কেননা এ দু'টো ছাড়াও সাজদা সম্পন্ন হয়।

আর দুই পা মাটিতে রাখা সম্পর্কে ইমাম কুদূরী (র.) বলেছেন যে, সাজদায় তা ফরয।

আর যদি পাগড়ীর 'প্যাঁচ' এর উপর বা বাড়তি কাপড়ের উপর সাজদা করে তবে তা জাইয হবে। কেননা নবী (সা.) তার পাগড়ীর প্যাচের উপর সাজদা করতেন। আরো বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এক কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন এবং বাড়তি অংশ দ্বারা ভুমির গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিজেকে রক্ষা করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এবং নিজের উভয় বাহু খোলা রাখবে। কেননা নবী (সা.) বলেছেন- তুমি তোমার উভয় বাহু খোলা রাখবে। কোন কোন বর্ণনায় যার অর্থ প্রসারিত করা। আর প্রথমটি থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ প্রকাশ করা।

এবং তার পেট উভয় উরূ থেকে পৃথক রাখবে। কেননা নবী (সা.) সাজদা করার সময় এতটা পৃথক রাখতেন যে, বকরীর ছোট বাচ্চা ইচ্ছা করলে তার নীচে দিয়ে অতিক্রম করতে পারতো। বলা হয়েছে যে, কাতারে সালাত আদায়ের সময় বাহু বেশী পৃথক করবে না, যাতে পার্শ্ববর্তী মুসল্লী কষ্ট না পায়।

আর পায়ের আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- মু'মিন যখন সাজদা করে তখন তার প্রতিটি অংগ সাজদা করে। সুতরাং সে যেন তার অংগগুলোর যতদূর সম্ভব কিবলামুখী করে রাখে।

আর সাজদার মধ্যে তিনবার সুবাহ্নাকা রাব্বিয়াল আলা বলবে। আর তা হল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- আর তোমাদের কেউ যখন সাজদা করে তখন সে যেন তার সাজদার তিনবার সুবাহানাকা রাব্বিয়াল আলা বলে। আর এটি হল তার সর্বনিম্ন পরিমাণ।

অর্থাত্ পূর্ণ বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ। রুকু ও সাজদার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যায় শেষ করা সহ তিনবারের অধিক বলা মুসতাহাব। কেননা রাসূলূল্লাহ্ (সা.) বেজোড় সংখ্যায় শেষ করতেন।

আর যদি কেউ ইমাম হয় তাহলে সংখ্যা এত বৃদ্ধি করবে না যা মুসল্লিগণের ক্লান্তির কারণ হয় এবং অবশেষে (জামাআতের প্রতি) তা বিরক্তি সৃষ্টি করে।

রুকু ও সাজদায় তাসবীহ পাঠ সুন্নাত। কেননা আয়াতে উভয়টি তাসবীহ ব্যতিরেকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের উপর বৃদ্ধি করা যাবে না।

আর স্ত্রীলোক নীচু হয়ে সাজদা করবে এবং তার পেট উরুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা এটি তার জন্য সতরের অধিক উপযোগী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর সে তার মাথা উঠাবে এবং তাকবীর বলবে। এর দলীল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ যখন সুস্থির হয়ে বসবে তখন তাকবীর

http://islaminonesite.wordpress.com/

বলবে ও সাজদায় যাবে। কেননা বেদুঈন (কে নামায শিক্ষাদান) সম্পর্কিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তারপর তুমি তোমার মাথা তুলবে এমনকি সোজা হয়ে বসবে।

যদি সোজা হয়ে না বসে তাকবীর বলে আর এক সাজদায় চলে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। পূর্বেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

মাথা তোলার পরিমাণ সম্পর্কে মাশায়েখগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, যদি সে সাজদার অধিক নিকটবর্তী থেকে যায়, তাহলে জাইয হবে না। কেননা, তাকে (পূর্ববর্তী) সাজদায় রয়ে গেছে বলে গণ্য করা হবে। তাতে দ্বিতীয় সাজদা হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সাজদায় গিয়ে সুস্থির হবে এরপর তাকবীর বলবে। এর দলীল আমরা বলে এসেছি।

আর উভয় পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাড়াবে, বসবে না এবং এর দলীল আমরা বলে এসেছি।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সামান্য সময় বসার পর যমীনের উপর ভর দিয়ে দাড়াবে। কেননা, নবী (সা.) এরূপ করেছেন।

আমাদের দলীল হল আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছ। নবী (সা.) সালাতে তার উভয় পায়ের সম্মখ ভাগের উপর ভর করে দাড়াতেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি বার্ধক্যের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া এটি বিশ্রাম বৈঠক। আর সালাত তো বিশ্রাম লাভের জন্য প্রবর্তিত হয়নি।

প্রথম রাকাআতে যা করেছে, দ্বিতীয় রাকাআতে তাই করবে। কেননা দ্বিতীয় রাকাআত হচ্ছে রুকানসমূহের পুনরাবৃত্তি।

তবে ছানা পড়বে না এবং আউযুবিল্লাহ পড়বে। কেননা উভয়টি একবারই পাঠ করা শরীআতে প্রমাণিত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কখনো দুই হাত উঠাবে না। রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) বলেছেন- সাতটি স্থান ছাড়া আর কোথাও হাত তোলা হবে না।তাকবীরে তাহরীমা, কুনূতের তাকবীর ও ঈদের তাকবীরসমূহ।

বাকী চারটি স্থান হজ্জ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন।

হাত তোলা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তা ইসলামের প্রথম যুগের উপর ধর্তব্য। এরূপ ইবন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

দ্বিতীয় রাকাআতের দ্বিতীয় সাজদা থেকে যখন মাথা তুলবে, তখন বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা সম্পূর্ণ দাড় করায়ে রাখবে এবং আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে।

সালাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বসার এরূপ বিবরণই আইশা (রা.) দিয়েছেন।

আর উভয় হাত উরুদ্বয়ের উপর রাখবে ও আংগুলগুলো বিছিয়ে রাখবে এবং তাশাহুদ পড়বে।

ওয়াইল (রা.) এর হাদীছে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এতে হাতের আংগুলগুলো কিবলামূখী হয়।

আর যদি সালাত আদায়কারী মহিলা হয়, তবে সে বাম নিতম্বের উপর বসবে এবং ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে দেবে। কেননা এটা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আর তাশাহুদ হলো এই-

যাবতীয় মৌখিক ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে নবী আমাদের উপর সালাম–শেষ পর্যন্ত। (অর্থাত্ আল্লাহর রহমত ও বরকত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তার বান্দা ও তার রাসূল।)

এটা আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত তাশাহুদ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিলেন; যেমন তিনি আমাকে কুরআনের

http://islaminonesite.wordpress.com/

কোন সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বললেন- (বলো, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি---------- ইলা আখেরিহি)। ইবন মাসউদ (রা.) এর তাশাহুদ গ্রহণ করা উত্তম ইবন ‘আব্বাস (রা.) বর্ণিত তাশাহুদ থেকে। তার তাশাহুদ হচ্ছে-

কেননা, ইবন মাসউদের হাদীছে আদেশবাচক ক্রিয়া রয়েছে, যার নূন্যতম চাহিদা হলো মুস্তাহাব হওয়া। তাছাড়া যুক্ত রয়েছে, যা সামগ্রিকতা বুঝায়। আর মধ্যে ওয়াও আলিফ ওয়াও অতিরিক্ত রয়েছে, যা বক্তব্যের নবায়ন বুঝায়। যেমন কসমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাছাড়া শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এতে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রথম বৈঠকে এর উপর কিছু অতিরিক্ত করবে না। কেননা ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে সালাতের মাঝের এবং সালাতের শেষের তাশাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন। যখন সালাতের মধ্যবর্তী তাশাহুদ হতো, তখন তিনি তাশাহুদ শেষ করে দাড়িয়ে যেতেন। আর যখন সালাতের শেষদিকের তাশাহুদ হতো তখন (এরপর) নিজের জন্য তা ইচ্ছা তা দু’আ করতেন।

শেষ দুই রাকাআত শুধু সূরাতুল ফাতিহা পড়বে। কেননা, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী (সা.) শেষ রাকাআতে কেবল সূরাতুল ফাতিহা পড়েছেন।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো ফাতিহা পাঠ উত্তম। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা প্রথম দুই রাকাআতেই কিরাত ফরয, যার বিবরণ ইনশাল্লাহ্ পরে আসবে।

আর শেষ বৈঠকে ঐ অবস্থাতেই বসবে, যে অবস্থায় প্রথম বৈঠকে বসেছিলো। কেননা ওয়াইল (রা.) ও ‘আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছে এরূপই আছে।

তাছাড়া এরূপ বসা শরীরের জন্য কষ্টদায়ক। সুতরাং তা উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসা, যা ইমাম মালিক (রা.) গ্রহণ করেছেন, তার তুলনায় উত্তম হবে।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিতম্বের উপর বসেছেন বলে বর্ণিত হাদীছকে ইমাম তাহাবী (র.) দুর্বল বলেছেন, অথবা তা বাধ্যক্যের অবস্থার উপর আরোপ করা হবে।

আর তাশাহুদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ওয়াজিব।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর নবী (সা.) এর উপর দুরূদ পড়বে। আমাদের নিকট তা ফরয নয়।

উভয় ক্ষেত্রেই শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল) কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যখন তুমি এটা বলবে বা করবে তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গেলো। যদি তুমি উঠে পড়তে চাও তাহলে উঠে পড়ো আর যদি আরো বসতে চাও তাহলে বসো।

আর সালাতের বাইরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর পাঠ ওয়াজিব। ইমাম কারখী (র.) এর মতে শুধু একবার আর ইমাম তাহাবী (র.) এর মতে যখনই নবী (সা.) এর আলোচনা হয়। সুতরাং আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায়, এর মাধ্যমে। আর তাশাহুদের ক্ষেত্রে শব্দটি যে বর্ণিত হয়েছে, (তার উত্তর এই যে) তার অর্থ হলো নির্ধারিত সময়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এবং কুরআনের শব্দাবলী ও হাদীছে বর্ণিত দু'আসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দু'আ করবে।

প্রমাণ, ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত ইবন মাসউদ (রা.) এর হাদীছ।নবী (সা.) তাকে বলেছেন, এরপর তুমি তোমার কাছে উত্তম ও পসন্দনীয় দু'আ নির্বাচন করে নাও।

আর যে সকল প্রার্থনা মানুষের কাছে করা অসম্ভব নয়, সেগুলোই মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যেমন এ কথা বলা, হে আল্লাহ্! আমাকে অমুক নারী বিয়ে করিয়ে দিন। পক্ষান্তরে যা মানূষের কাছে চাওয়া সম্ভব নয়, তা মানুষের কালামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। যেমন এ কথা বলা, (হে আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন) আর বলাটা প্রথম শ্রেণীভূক্ত। কেননা মানুষের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার রয়েছে। বলা হয় (শাসক বাহিনীকে বেতন বা রেশন দিলেন)।

এরপর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে নিজের ডান দিকে সালাম ফিরাবে। এবং বাম দিকে অনুরূপভাবে সালাম ফিরাবে। কেননা ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা.) তার ডান দিকে এমন ভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তার ডান গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তার বাম দিকে এমন ভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তার গণ্ডদেশের শুভ্রতা দেখা যেতো।

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রথম সালাম দ্বারা তার ডান দিকের নারী-পুরুষ ও ফেরেশতাদের নিয়্যত করবে। তদ্রূপ দ্বিতীয় সালামে। কেননা আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান যুগে স্ত্রী লোকদের নিয়্যত করবে না। এবং তাদেরও নিয়্যত করবে না, যারা তার শরীক নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সম্বোধন উপস্থিতদের প্রাপ্য।

(সালামের সময়) মুক্তাদির জন্য তার ইমামের নিয়্যত করা জরুরী। সুতরাং ডানে বা বামে থাকলে তাদের সাথেই তার নিয়্যত করে নিবে।

আর যদি তার বরাবরে থাকেন, তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে ডান দিকের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সালামের সময় তার নিয়্যত করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে- আর এটা আবূ হানীফা (র.) হতে প্রাপ্ত একটি মত- উভয় সালামে তার নিয়্যত করবে। কেননা তিনি উভয় দিকের অংশীদার।

আর একা একা সালাত আদায়কারী শুধু ফেরেশতাদের নিয়্যত করবে, অন্য কারো নিয়্যত করবে না। কেননা, তার সাথে তারা ব্যতীত অন্য কেউ নেই। আর ইমাম উভয় সালামে উক্ত (মুক্তাদি ও ফেরেশতাদের) নিয়্যত করবে।

এ-ই বিশুদ্ধ মত। ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার নিয়্যত করবে না। কেননা তাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত আছে। সুতরাং তা আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঈমান আনয়নের সদৃশ।

আমাদের মতে 'সালাম' শব্দ উচ্চারণ করা ওয়াজিব, ফরয নয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন-

সালাত শুরু করবে তাকবীর দ্বারা আর তা থেকে বের হবে সালাম দ্বারা।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত ইবন মাসউদ (রা.) এর হাদীছ (যাতে শেষ বৈঠকের পর বসে থাকার কিংবা উঠে পড়ার ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে) আর এই ইখতিয়ার প্রদান ফরয বা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী। তবে আমরা সতর্কতা অবলম্বনে ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব হওয়া সাব্যস্ত করেছি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর এ পযায়ের হাদীছ দ্বারা ফরয হওয়া প্রমাণিত হয় না। আর আল্লাহই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ-কিরাত

ইমাম হলে ফজরে এবং মাগরিবে ও ঈশার প্রথম দুই রাকাআতে উচ্চৈস্বরে কিরাত পড়বে এবং শেষ দুই রাকাআতে অনুচ্চৈস্বরে পড়বে। এটাই পরস্পরায় চলে এসেছে। আর যদি মুনফারিদ হয় তা হলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে উচ্চৈস্বরে পাঠ করবে এবং নিজকে শোনাবে। কেননা নিজের ব্যাপারে সে নিজের ইমাম। আর চাইলে চুপে চুপে পাঠ করবে। কেননা, তার পিছনে এমন কেউ নেই, যাকে সে শোনাবে। তবে উচ্চৈস্বরে পাঠ করাই উত্তম। যাতে জামা'আতের অনুরূপ আদায় হয়।

যুহর ও আসরে ইমাম কিরাত চুপে চুপে পড়বে। এমন কি আরাফাতে হলেও। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- দিবসের সালাত নির্বাক। অর্থাত্ তাতে শ্রুত কিরাত নেই।

আরাফা সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। আর আমাদের বর্ণিত হাদীছটি তার বিপক্ষে দলীল।

আর জুমুআ ও দই ঈদে উচ্চৈস্বরে পাঠ করবে। কেননা উচ্চৈস্বরে পাঠের বর্ণনা মশহূর ভাবে চলে এসেছে। দিবসে নফল সালাত চুপে চুপে পাঠ করবে। আর ফরয সালাতের উপর কিয়াস করে রাত্রের সালাতে মুনাফারিদের ইখতিয়ার রয়েছে। কেননা, নফল সালাত হলো ফরযের সম্পূরক। সুতরাং (কিরাআতের বেলায়) নফল ফরযের অনুরূপ হবে।

যে ব্যক্তির ঈশার সালাত ফউত হয়ে যায় এবং সূর্যোদয়ের পর তা পড়ে, সে যদি উক্ত সালাতে ইমামতি করে তাহলে উচ্চস্বরে কিরাত পড়বে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এর সকালে জামা'আতের সাথে ফজরের সালাত কাযা করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেমন করেছিলেন।

আর যদি সে একা সালাত পড়ে, তাহলে অবশ্যই নীরবে কিরাত পড়বে। (উভয় রকম পড়ার) ইখতিয়ার থাকবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা উচ্চৈস্বরে কিরাত সম্পৃক্ত রয়েছে জামা'আতের সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে, কিংবা সময়ের সাথে স্বেচ্ছামূলকভাবে মুনাফারিদের ক্ষেত্রে। অথচ এখানে দু'টোর কোনটাই পাওয়া যায় নি।

যে ব্যক্তি ঈশার প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা পাঠ করল কিন্তু সূরাতুল ফাতিহা পাঠ করেনি, সে শেষ দুই রাকাআতে তা দোহরাবে না। পক্ষান্তরে যদি সূরাতুল ফাতিহা পড়ে থাকে কিন্তু তার সাথে অন্য সূরা যোগ না করে থাকে, তাহলে শেষ দুই রাকাআতে ফাতিহা ও সূরা দুটোই পড়বে এবং উচ্চৈস্বরে পড়বে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)এর মত। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, দুটোর মধ্যে কোনটাই কাযা করবে না। কেননা ওয়াজিব যখন নিজ সময় থেকে ফউত হয়ে যায়, তখন পরবর্তীতে বিনা দলীলে সেটাকে কাযা করা যায় না।

উল্লেখিত ইমামদ্বয়ের পক্ষে দলীল – যা উভয় অবস্থার পার্থক্যের সাথে সম্পৃক্ত যে, সূরাতুল ফাতিহাকে শরীআতে এমন অবস্থায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, তার পরে সূরা সংযুক্ত হবে। সুতরাং যদি ফাতিহাকে শেষ দুই রাকাআতে কাযা করা হয় তাহলে তরতীবের দিক থেকে সূরার পর সূরাতুল ফাতিহা এসে যাবে। অর্থাত্ এটা নির্ধারিত অবস্থানের বিপরীত। আর (প্রথম দুই রাকাআতে) সূরা ছেড়ে দেয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা শরীআত নির্ধারিতরূপে কাযা করা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, এখানকার পাঠে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে (কাযা করা) ওয়াজিব হওয়া বুঝায়। আর মূল গ্রন্থের উল্লেখিত শব্দে মুস্তাহাব হওয়া বুঝায়। কেননা সূরার কাযা যদিও ফাতিহার পরে হচ্ছে তবু এ সূরা নিজ ফাতিহার সাথে সংযুক্ত হচ্ছে না। সুতরাং নির্ধারিত অবস্থান সর্বাংশে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

আর উভয়টিতে উচ্চৈস্বরে পাঠ করবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা একই রাকাআতে সরব ও নীরব পাঠ একত্র করা মানায় না। আর নফল তথা ফাতিহার মধ্যে পরিবর্তন আনা উত্তম।

অনুচ্চৈস্বরে পাঠ হল যেন নিজে শোনতে পায়। আর উচ্চৈস্বরের পাঠ হল অপরে শোনতে পায়। এ হল ফকীহ্ আবূ জা'ফর হিন্দওয়ানীর মত। কেননা, আওয়াজ ব্যতীত শুধু জিহবা সঞ্চালনকে কিরাত বলা হয় না।

ইমাম কারখী (র.) এর মতে উচ্চৈস্বরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো নিজেকে শোনানো আর অনুচ্চৈস্বরের পরিমাণ হলো হরফের বিশুদ্ধ উচ্চারণ। কেননা, কিরাত বা পাঠ মুখের কাজ, কানের কাজ নয়। কুদূরী গ্রন্থের শব্দে এর প্রতি ইংগিত রয়েছে।

তালাক প্রদান, আযাদ করা, ব্যতিক্রম যোগ করা ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণমূলক যাবতীয় মাসআলার মধ্যে মতপার্থক্যের ভিত্তি হল উক্ত নীতির পার্থক্যের উপর।

সালাতে যে পরিমাণ কিরাত যথেষ্ট হয়, তার সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে এক আয়াত আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে ছোট তিন আয়াত অথবা দীর্ঘ এক আয়াত। কেননা, এর চেয়ে কম পরিমাণ হলে তাকে কারী বলা হয় না। সুতরাং তা এক আয়াতের কম পাঠ করার সমতূল্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী- কুরআনের যতটুকু পরিমাণ সহজ হয়, তা তোমরা পড়ো। এখানে (এক আয়াতে বা তার অধিকের মাঝে) কোন পার্থক্য করা হয়নি। তবে এক আয়াতের কম পরিমাণ (সর্বসম্মতিক্রমেই কুরআন গণ্য হওয়ার হুকুমের) বহির্ভূত। আর পূর্ণ আয়াত আয়াতের অংশবিশেষের সমার্থক নয়।

আর সফরের সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন সূরা ইচ্ছা হয় পড়বে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তার সফরে ফজরের সালাতে ফালাক ও নাস সূরাদ্বয় পাঠ করেছিলেন। তাছাড়া সালাতের অর্ধেক রহিত করার ক্ষেত্রে সফরের প্রভাব রয়েছে। সুতরাং কিরাত হ্রাস করণের ব্যাপারে তার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।এ হুকুম তখন, যখন সফরে তাড়াহুড়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি (মুসাফির) স্থিতি ও শান্তির পরিবেশ থাকে, তাহলে ফজরের সালাতে সূরা বুরূজ ও ইনশাক্কা পরিমাণ সূরা পাঠ

http://islaminonesite.wordpress.com/

করবে। কেননা, এভাবে তাখফীক সহকারে সুন্নাতের উপরও আমল সম্ভব হয়ে যাবে।

মুকীম অবস্থায় ফজরের উভয় রাকাআতে সূরাতুল ফাতিহা ছাড়া চল্লিশ বা পঞ্চাশ আয়াত পড়বে। চল্লিশ থেকে ষাট এবং ষাট থেকে একশ' আয়াত পাঠ করার কথাও বর্ণিত রয়েছে। আর এ সব সংখ্যার সমর্থনে হাদীছ এসেছে। বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান এভাবে হতে পারে যে, (কিরাত শ্রবণে) আগ্রহীদের ক্ষেত্রে একশ' আয়াত এবং অলসদের ক্ষেত্রে চল্লিশ আয়াত এবং মধ্যমদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ থেকে ষাট আয়াত পাঠ করবে।

কারো কারো মতে রাত্র ছোট বড় হওয়া এবং কর্মব্যস্ততা কম-বেশী হওয়ার অবস্থা বিবেচনা করা হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, যুহরের নামাযেও অনুরূপ পরিমাণ পাঠ করবে। কেননা সময়ের প্রশস্ততার দিক দিয়ে উভয় সালাত সমান। মবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'কিংবা তার চেয়ে কম'। কেননা তা কর্মব্যস্ততার সময়। সুতরাং অনীহা এড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে ফজর থেকে কমানো হবে।

আসর ও 'ঈশা একই রকম। দু'টোতেই আওসাতে মুফাসসাল পাঠ করবে। আর মাগরিবে তার চেয়ে কম অর্থাত্ তাতে 'কিসারে মুফাসসাল' পাঠ করবে।

এ বিষয়ে মূল দলীল হলো আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) এর নামে প্রেরিত উমর ইবন খাত্তাব (রা.) এর এই মর্মে লিখিত পত্র যে, ফজরে ও যুহরে 'তিওয়ালে মুফাসসাল' পড়ো।

তাছাড়া মাগরিবের ভিত্তিই হলো দ্রুততার উপর। সুতরাং হালকা কিরাতই তার জন্য অধিকতর উপযোগী। আর আসর ও 'ঈশায় মুস্তাহাব হলো বিলম্বে পড়া। আর কিরাত দীর্ঘ করলে সালাত দু'টি মুস্তাহাব ওয়াক্ত অতিক্রম করার আশংকা রয়েছে। সুতরাং এ দুই সালাতে আওসাতে মুফাসসাল নির্ধারণ করা হয়।

ফজরে প্রথম রাকাআতকে দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় দীর্ঘ করবে, যাতে লোকদের জামা'আত ধরার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী বলেন, যুহরের উভয় রাকাআত সমান।

তা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সব সালাতেই প্রথম রাকাআতকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করা আমার কাছে পসন্দনীয়। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সব সালাতেই প্রথম রাকাআতকে অন্য রাকাআতের তুলনায় দীর্ঘ করতেন। প্রথমোক্ত ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, উভয় রাকাআতই কিরাতের সমান হকদার। সুতরাং পরিমাণের ক্ষেত্রেও উভয় রাকাআত সমান হতে হবে। তবে ফজরের সালাত এর বিপরীত। কেননা, তা ঘুম ও গাফলাতের সময়। আর উদ্ধৃত হাদীছটি সানা, আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ার প্রেক্ষিতে দীর্ঘ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত।

আর কম, বেশীর ক্ষেত্রে তিন আয়াতের কম ধর্তব্য নয়। কেননা অনায়াসে এতটুকু কম-বেশী থেকে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়।

আর কোন সালাতের সহিত এমন কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই যে, এটি ছাড়া সালাত জাইয হবে না। কেননা, আমরা পূর্বে যে আয়াত পেশ করেছি, তা নিঃশর্ত।

বরং কোন সালাতের জন্য কুরআনের কোন অংশকে নির্ধারণ করে নেওয়া মাকরূহ। কেননা, তাতে অবশিষ্ট কুরআনকে বর্জন করা হয় এবং বিশেষ সূরার ফযীলতের ধারণা জন্মে।

মুক্তাদী ইমামের পিছনে কিরাত পাঠ করবে না। সূরাতুল ফাতিহার ব্যাপারে ইমাম শাফিই (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। তার দলীল এই যে, কিরাত হলো সালাতের অন্যান্য রুকনের মত একটি রুকন। সুতরাং তা পালনে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে শরীক থাকবেন।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- যে ব্যক্তির ইমাম রয়েছে, সেক্ষেত্রে ইমামের কিরাত তার কিরাত রূপে গণ্য। এবং এর উপরই সাহাবীদের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর কিরাত হলো উভয়ের মাঝে শরীকানামূলক রুকন। তবে মুক্তাদীর অংশ হলো নীরব থাকা ও মনোযোগসহ শ্রবণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- (ইমাম) যখন কুরআন পাঠ করেন তখন তোমরা খামুশ থাকো।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সতর্কতা অবলম্বন হিসাবে পাঠ করাই উত্তম। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তা মাকরূহ। কেননা এ সম্পর্কে হুশিয়ারি রয়েছে।

আর মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং নীরবে থাকবে। যদিও ইমাম আশা ও ভয়ের আয়াত পাঠ করেন। কেননা, নীরবে শ্রবণ ও নীরবতা আয়াত দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। আর নিজে পাঠ করা, কিংবা জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে পানাহ চাওয়া এ সকল এতে বাধা সৃষ্টি করে।

খুতবার হুকুমও অনুরূপ। তেমনি হুকুম নবী (সা.) এর উপর দুরূদ পাঠ করার সময়ও। কেননা, মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবণ করা ফরয। তবে যদি খতীব এ আয়াত পড়েন- তখন শ্রোতা মনে মনে দুরূদ পড়বে।

অবশ্য মিম্বর থেকে দূরের লোকদের সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে নীরব থাকার মধ্যে ইহতিয়াত রয়েছে, যাতে (কমপক্ষে) খামুশ থাকার ফরয পালিত হয়। সঠিক বিষয় আল্লাহই উত্তম জানেন।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ইমামত

জামা'আত সুন্নাতে মুআক্কাদা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- জামা'আত হিদায়াতের পরিচায়ক সুন্নত, মুনাফিক ছাড়া কেউ তা থেকে পিছিয়ে থাকে না।

ইমামতির জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি হলেন যিনি সালাতের মাসাইল সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত, যিনি কিরাত সর্বোত্তম। কেননা সালাতে কিরাত অপরিহার্য। আর ইলমের প্রয়োজন হয় কোন ঘটনা দেখা দিলে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এর উত্তরে আমরা বলি, একটি রুকন আদায়ে আমরা কিরাতের মুখাপেক্ষী আর সকল রুকন আদায়ে আমরা ইলমের মুখাপেক্ষী।

ইলমের (ক্ষেত্রে উপস্থিত) সকলে সমান হলে যিনি কিরাতে সর্বোত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- আল্লাহর কিতাব পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তি কাওমের ইমাম হবে। যদি এতে সকলে বরাবর হয় তাহলে সুন্নত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি (ইমাম হবে)।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কিতাবুল্লাহ্ পাঠে উত্তম ব্যক্তিই সর্বাধিক জ্ঞানীও হতেন। কেননা, তাঁরা আহকাম ও মাসায়েলসহ কুরআন শিক্ষা করতেন। তাই হাদীছে কিতাবুল্লাহ্ পাঠে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের যুগে অবস্থা সেরূপ নয়, তাই আমরা (দীনী ইলমে) সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

এ ক্ষেত্রে সকলে সমান হলে যিনি অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ। কেননা নবী (সা.) আবূ মুলায়কার পুত্রদ্বয়কে বলেছিলেন- তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই ইমামতি করে। তাছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে বাড়ালে জামা'আতের সমাগম বর্ধিত হবে।

দাসকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো মাকরূহ। কেননা শিক্ষালাভের জন্য (সাধারণতঃ) সে অবসর পায় না। এবং বেদুঈন (ও গ্রাম্য) কে। কেননা, মূর্খতাই তাদের মাঝে প্রবল এবং ফাসিককে। কেননা, সে দীনী বিষয়ে যত্নবান নয়। এবং অন্ধকে কেননা, সে পূর্ণরূপে নাপাকি থেকে বেচে থাকতে পারে না।

আর জারজ সন্তানকে। কেননা, তার পিতা (ও অভিভাবক)নেই, যে তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করবে। সুতরাং অজ্ঞতাই তার উপর প্রভাবিত হয়।

তাছাড়া এদের আগে বাড়ানোর কারণে জনগণের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। সুতরাং তা মাকরূহ। তবে যদি তারা আগে বেড়ে যায় তাহলে সালাত দুরুস্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমরা সালাত আদায় কর যে কোন নেককার ও বদকারের পিছনে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম মুক্তাদীদের নিয়ে সালাত আদায় করতে দীর্ঘ করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যে ব্যক্তি কোন জামা'আতের ইমামতি করে, সে যেন তাদের দুর্বলতম ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী সালাত আদায় করে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি থাকতে পারে।

স্ত্রী লোকদের এককভাবে জামা'আত করা মাকরূহ। কেননা, তা একটি নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত নয়। আর সেটা হলো কাতারের মাঝে ইমামের দাঁড়ানো। সুতরাং মাকরূহ হবে, যেমন উলঙ্গদের জামা'আতের হুকুম।

তবে যদি তারা তা করে তাহলে ইমাম তাদের মাঝে দাড়াবে। কেননা, 'আইশা (রা.) অনুরূপ করেছেন।আর তার এই জামাআত অনুষ্ঠান ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

তাছাড়া এজন্য যে, আগে বেড়ে দাড়ানোতে অতিরিক্ত প্রকাশ ঘটে।

যে ব্যক্তি এক মুকতাদী নিয়ে সালাত আদায় করবে, সে তাকে নিজের ডানপাশে দাঁড় করাবে। কেননা, ইবন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকেঁ মুক্তাদী করে সালাত আদায় করেছেন এবং তাকে নিজের ডান পাশে দাড় করিয়েছেন।

আর সে ইমামের পিছনে দাড়াবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুক্তাদী তার পায়ের আংগুল ইমামের গোড়ালি বরাবর রাখবে। তবে প্রথম মতই যাহিরে রিওয়ায়াতের।

অবশ্য যদি ইমামের পিছনে বা বামে দাড়িয়ে সালাত আদায় করে তাহলে জাইয হবে।

তবে সুন্নাতের বিরোধিতার কারণে সে গুনাহগার হবে।

আর যদি দুই ব্যক্তির ইমামতি করেন, তাহলে তিনি তাদের আগে দাড়াবেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, উভয়ের মধ্যখানে দাড়াবে। আর আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা.) এরূপ করেছেন বলে বর্ণিত আছে।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনাস (রা.) ও তার ইয়াতীম ভাইকে নিয়ে সালাত আদায়ের সময় উভয়ের আগে দাড়িয়েছিলেন।

সুতরাং এ হাদীছের দ্বারা উত্তম প্রমাণিত হয়, আর সাহাবীর আমল দ্বারা এরূপ দাড়ানো মুবাহ প্রমাণিত হয়।

পুরুষদের জন্য কোন নারী বা নাবালেগের পিছনে ইকতিদা করা জাইয নয়। স্ত্রী লোকের পিছনে জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সা.) বলেছেন- আল্লাহ্ যেমন তাদের পিছনে রেখেছেন, তেমনি তোমরাও তাদের পিছনে রাখ।

সুতরাং তাদের (ইমামতির জন্য) আগে বাড়ানো জাইয নয়। আর নাবালেগের পিছনে জাইয না হওয়ার কারণ এই যে, সে নফল আদায়কারী। সুতরাং তার পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদা জাইয হবে না। তবে তারাবীহ ও 'নিয়মিত' সুন্নাত এর ক্ষেত্রে বালখ এর মাশায়েখগণ জাইয রেখেছেন আর আমাদের মাশায়েখগণ তা অনুমোদন করেননি।

আবার কারো কারো তাহকীক অনুযায়ী সাধারণ নফলের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

তবে গ্রহণযোগ্য মত এই যে, কোন সালাতেই তাদের (ইমামতি) জাইয নয়। কেননা, নাবালেগের নফল বালেগের নফলের চেয়ে নিম্নমানের। কেননা, ইজমায়ী মতানুসারে সালাত ভংগ করার কারণে নাবালেগের উপর কাযা ধর্তব্য। আর দুর্বলের উপর প্রবলের ভিত্তি হতে পারে না। 'ধারণা-ভিত্তিক' সালাত এর ব্যতিক্রম। কেননা, (ভঙ্গ হলে কাযা করতে হবে কিনা) এতে মতভেদ রয়েছে। সুতরাং উদ্ভূত ধারণা (মুকতাদীর বেলায়) অস্তিত্বহীন বলে বিবেচিত। অবশ্য নাবালেগের পিছনে নাবালেগের ইকতিদার হুকুম ভিন্ন (অর্থাত্ জাইয) কেননা, উভয়ের সালাত সমমানের।

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রথমে পুরুষে কাতার করবে। তারপর নাবালেগ ও তারপর স্ত্রী লোকেরা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমাদের প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং জ্ঞানবানরা যেন আমার কাছাকাছি থাকে। আর যেহেতু নারী-পুরুষ এক সমানে দাড়ানো সালাত ভংগকারী; সুতরাং তাদের পশ্চাদবর্তিণী রাখা হবে।

যদি স্ত্রীলোক পুরুষের পার্শে দাড়ায় আর উভয়ে একই সালাতে শরীক হয়, তাহলে পুরুষের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি ইমাম স্ত্রী লোকের ইমামতির নিয়্যত করে থাকেন।

আর সাধারণ কিয়াসের চাহিদা হল সালাত ফাসিদ না হওয়া। এবং এ-ই হল ইমাম শাফিঈ (র.) এর মত। স্ত্রীলোকটির সালাতের উপর কিয়াস অনুযায়ী; যেহেতু তার সালাত ফাসিদ হয় না।

আর সূক্ষ কিয়াসের কারণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ, মশহূর শ্রেণীভূক্ত।

আর সেই হাদীছে পুরুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে, স্ত্রীলোককে নয়। সুতরাং পুরুষই হচ্ছে স্থানগত ফরয বর্জনকারী। সুতরাং তার সালাতই ফাসিদ হবে, স্ত্রী লোকটির সালাত নয়। যেমন মুক্তাদী (এর সালাত ফাসিদ হয়) ইমামের আগে দাড়ালে।

আর যদি ইমাম স্ত্রীলোকের ইমামতির নিয়্যত না করে থাকেন, তাহলে পুরুষটির সালাতের ক্ষতি হবে না; স্ত্রীলোকটির সালাত দুরস্ত হবে না।

কেননা আমাদের মতে ইমামের নিয়্যত ছাড়া সে সালাতে শামিল হওয়া সাব্যস্ত হবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

তুমি কি লক্ষ্য করছ না যে, স্থানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ইমামের কর্তব্য। সুতরাং তার দায়িত্ব গ্রহণের উপর বিষয়টি নির্ভর করবে। যেমন ইকতিদার ক্ষেত্রে (মুকতাদির জন্য ইমামের নিয়্যত করা জরুরী)।

তবে ইমামের নিয়্যত তখনই শর্ত হবে, যখন সে কোন পুরুষের পার্শ্বে ইকতিদা করে। পক্ষান্তরে যদি তার পাশে কোন পুরুষ না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে দু'টি মত

http://islaminonesite.wordpress.com/

রয়েছে। উক্ত দু’টি মতের একটির ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সুরতে তো সালাত ফাসিদ হওয়া অনিবার্য। আর দ্বিতীয় সুরতে সম্ভাবনা যুক্ত।

সালাত নষ্টকারী ‘এক সমানে দাড়ানো’ এর জন্য শর্ত হলো (উভয়ের) সালাত অভিন্ন হওয়া এবং (রুকু-সাজদা বিশিষ্ট) সাধারণ সালাত হওয়া। আর স্ত্রীলোকটি কামোত্তেজনাযোগ্য হওয়া এবং উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না থাকা। কেননা, কিয়াস ও যুক্তির বিপরীতে শরীআতের বাণী দ্বারা সালাত ফাসাদকারিণী প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বাণী সংশ্লিষ্ট সকল উপস্থিত থাকতে হবে।

স্ত্রী লোকদের জামা’আতে হাযির হওয়া মাকরূহ। অর্থাত্ তাদের মধ্যে যারা যুবতী (তাদের জন্য এ হুকুম) কেননা তাতে ফতনার আশংকা রয়েছে।

বৃদ্ধাদের জন্য ফরয, মাগরিব ও’ ঈশার জামা’আতের উদ্দেশ্য বের হওয়াতে অসুবিধা নেই।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, সকল সালাতেই তারা বের হতে পারে। কেননা, আকর্ষণ না থাকায় ফিতনার আশংকা নেই। তাই মাকরূহ হবে না, যেমন ঈদের জামাআতে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো; প্রবৃত্তির (দুষ্কর্মে) উদ্বুদ্ধ করে থাকা। সুতরাং ফিতনা ঘটতে পারে। তবে যুহর, আসর ও জুমুআর সময় ফাসিকদের উপদ্রব থাকে। আর ফজর ও ‘ঈশার সময় (সাধারণতঃ) তারা ঘুমিয়ে থাকে এবং মাগরিবে পানাহারে মশগুল থাকে। আর (ঈদের) মাঠ প্রশস্ত হওয়ার কারণে পুরুষদের থেকে পাশ কেটে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব। তাই মাকরূহ হয় না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পবিত্র ব্যক্তি ‘মুস্তাহাযা’ এর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। সেরূপ পবিত্র স্ত্রীলোকও মুস্তাহাযা এর পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা সুস্থ ব্যক্তির (তাহারাতের) অবস্থা মা’যূর ব্যক্তির চেয়ে উন্নততর। আর কোন কিছু তার চেয়ে উন্নত কিছুর দায়িত্ব বহন করতে পারে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম হচ্ছেন দায়িত্ব বহনকারী। অর্থাত্ মুক্তাদির সালাত তার সালাতের আওতাভূক্ত।

কুরআন পাঠে সক্ষম ব্যক্তি উম্মী লোকের পিছনে এবং বস্ত্রধারী ব্যক্তি উলংগ ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, তাদের দু'জনের অবস্থা উন্নততর।

আর জাইয রয়েছে তায়াম্মুমকারীর জন্য উযূকারীদের ইমামতী করা। এ হল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা, তায়াম্মুম জরুরী অবস্থায় তাহারাত। আর পানি হল তাহারাতের মূল উপাদান।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর দলীল এই যে, এটা (সাময়িক তাহারাত নয় বরং) সাধারণ তাহারাত। সুতরাং এ কারণেই তা প্রয়োজনের সাথে সীমিত থাকে না।

(মোজায়) মাসহকারী পা ধৌতকারীর ইমামতি করতে পারে। কেননা, মোজা পায়ের পাতায় 'হাদাছ' এর অনুপ্রবেশে বাধা দেয়। আর মোজায় যে হাদাছ যুক্ত হয়, সেটাকে মাসহ দূর করে দেয়। মুস্তাহাযার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা বাস্তবে হাদাছ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় শরীআত তা বিদূরিত হয়ে গেছে বলে গণ্য করে।

দাড়িয়ে সালাত আদায়কারী বসে সালাত আদায়কারীর পিছনে (ইকতিদা করে) সালাত আদায় করতে পারে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তা জাইয হবে না। কিয়াসের দাবী এ-ই। কেননা, দাড়িয়ে সালাত আদায়কারীর অবস্থা উন্নততর।

আমরা হাদীছের কারণে কিয়াস বর্জন করেছি। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) তার শেষ সালাত আদায় করেছেন আর লোকজন তার পিছনে দাড়িয়ে ছিলেন।

ইশারায় সালাত আদায়কারী অনুরূপ ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, উভয়ের অবস্থা সমান। তবে যদি মুকতাদী বসে এবং ইমাম শুয়ে ইশার করে তবে তার পিছনে জাইয হবে না। কেননা, বসা শরীআতে স্বীকৃত। সুতরাং এর দ্বারা তা উন্নত হওয়া প্রমাণিত হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

রুকু-সাজদাকারী ব্যক্তি ইশারাকারী ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, মুকতাদীর অবস্থা উন্নততর। এ সম্পর্কে ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

ফরয আদায়কারী নফল আদায়কারী ভিন্ন ফরয আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, ইকতিদা অর্থ ভিত্তি করা, আর এখানে ইমামের ক্ষেত্রে 'ফরয গুণটি নেই। সুতরাং যে গুণ নেই, তার উপর ভিত্তি স্থাপিত হবে না।

ইমাম কুদূরী বলেন এক ফরয আদায়কারী ভিন্ন ফরয আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করবে না। কেননা, ইকতিদা হলো (একই তাহরীমায়) শামিল হওয়া এবং সামঞ্জস্য রক্ষা করা। সুতরাং (সালাতে) অভিন্নতা অপরিহার্য।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রে ইকতিদা সহীহ। কেননা, তার মতে ইকতিদা হল সমন্বিত রূপে আদায় করা। আর আমাদের মতে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তির অর্থ বিবেচ্য।

নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর পিছনে সালাত আদায় করতে পারে। কেননা, নফল আদায়কারীর জন্য শুধু মূল সালাত থাকাই হল প্রয়োজন। আর ইমামের ক্ষেত্রে মূল সালাত বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

যে ব্যক্তি কোন ইমামের পিছনে ইকতিদা করলো তারপর জানতে পারলো যে, তার ইমাম হাদাছগ্রস্ত; তখন তাকে সালাত দোহরাতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যে ব্যক্তি কোন জামাআতের ইমামতি করলো, তারপর প্রকাশ পেল যে, সে হাদাসগ্রস্ত অথবা জুনুবী, তখন সে নিজেও সালাত দোহরাবে এবং মুকতাদিরাও দোহরাবে।

এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। পূর্ব বর্ণিত যুক্তির ভিত্তিতে। আর আমরা অন্তর্ভূক্তির মর্ম বিবেচনা করি। আর তা জাইয হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কোন উম্মী ব্যক্তি যখন কুরআন পাঠে সক্ষম একদল লোক এবং উম্মী একদল লোকের ইমামতি করে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)এর মতে সকলের ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমামের সালাত এবং যারা কুরআন পাঠে সক্ষম নয়, তাদের সালাত পূর্ণাংগ হয়েছে। কেননা, ইমাম নিজে মা'যূর এবং তিনি একদল মা'যূর লোকের ইমামতি করেছেন। সুতরাং এটি ঐ অবস্থার সদৃশ, যখন কোন উলংগ ব্যক্তি একদল উলংগ ও একদল বস্ত্রধারীর ইমামতি করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, ইমাম কিরাতের উপর সক্ষমতা সত্ত্বেও কিরাতের ফরয তরক করেছে। সুতরাং তার সালাত ফাসিদ হবে। সক্ষমতার কারণ এই যে, সে যদি কারীর পিছনে ইকতিদা করতো তাহলে কারীর কিরাত তার কিরাত হতো। আর ঐ মাসআলাটি এবং এর অনুরূপ মাসআলার হুকুম ভিন্ন। কেননা, ইমামের ক্ষেত্রে যা বিদ্যমান, তা মুকতাদীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান রূপে গণ্য হবে না।

যদি উম্মী ও কারী একা একা সালাত আদায় করে, তাহলে তা জাইয হবে।

এই বিশুদ্ধমত। কেননা,তাদের উভয় থেকে জামা'আতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়নি।

ইমাম যদি প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত পাঠ করে, অতঃপর শেষ দুই রাকাআতে কোন উম্মীকে (নায়িব হিসাবে) আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে সকলের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা, কিরাতের ফরয আদায় হয়ে গেছে।

আমাদের দলীল এই যে, প্রতিটি রাকাআতই সালাত। সুতরাং তা কিরাত থেকে খালি হতে পারে না। বাস্তবে হোক কিংবা গণ্য করা হিসাবে হোক। আর উম্মীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা না থাকার কারণে কিরাতকে বিদ্যমান গণ্য করার অবকাশ নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

উক্ত দলীলের ভিত্তিতে অনুরূপ মতপার্থক্য রয়েছে। তাশাহুদের সময় তাকে আগে বাড়ালেও। সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক জানেন।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

সালাতের মধ্যে হাদাছ হওয়া

সালাতের মধ্যে যে ব্যক্তির হাদাছ ঘটে যায়, সে ফিরে যাবে। যদি সে ইমাম হয় তাহলে (পিছনে দাড়ানো) একজনকে স্থলবর্তী করবে এবং উযূ করে 'বিনা' করবে।

কিয়াসের দাবী এই যে, নতুনভাবে সালাত শুরু করবে। এটাই হল ইমাম শাফিঈ (র.) এর মত। কেননা হাদাছ সালাতের বিপরীত। আর কিবলা থেকে ফিরে যাওয়া এবং হাটা-চলা করা সালাতকে ফাসিদ করে দেয়। সুতরাং তা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটানোর সদৃশ।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী-

সালাতে যে ব্যক্তির বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয় কিংবা মযী (তরল পদার্থ) বের হয়, সে যেন ফিরে যায় এবং উযূ করে আর নিজের (পূর্ব) সালাতের উপর 'বিনা' করে, যতক্ষণ না সে কথা বলে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেছেন-

তোমাদের কেউ যখন সালাত শুরু করে, তারপর বমি বমি হয় কিংবা নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয়, তখন সে যেন তার মুখে হাত রাখে এবং এমন কাউকে (ইমামতির জন্য) আগে বাড়িয়ে দেয়, যে কিছু সালাতের মাসবূক হয়নি।

আর সাধারণ ওযর রূপে তাই গণ্য, যা অনিচ্ছায় ঘটে যায়। যা ইচ্ছাকৃত ঘটে, তা তার মধ্যে গণ্য নয়। সুতরাং একে তার সাথে যুক্ত করা যায় না। তবে নতুন করে পড়ে নেয়াই উত্তম।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যাতে মতপার্থক্যের দ্বিধা থেকে বাচা যায়। কারো কারো মতে একাকী নতুন ভাবে পড়বে। আর ইমাম ও মুকতাদী হলে জামা'আতের ফযীলত সংরক্ষণ করার জন্য 'বিনা' করবে। আর মুনফারিদ ইচ্ছা করলে নিজের (উযূর) স্থানেই সালাত পুরা করে নিবে। আবার ইচ্ছা করলে সালাতের স্থানে ফিরে আসবে। আর মুকতাদী অবশ্য নিজের স্থানে ফিরে আসবে। তবে যদি তার ইমাম (সালাত থেকে) ফারেগ হয়ে যায় কিংবা যদি উভয়ের মাঝে কোন আড়াল না থাকে (তাহলে ফিরে আসার প্রয়োজন নেই)।

যে ব্যক্তির মনে হলো যে, তার হাদাছ হয়েছে, এবং সে মসজিদ থেকে বের হয়ে পড়ল; পরে বুঝতে পারলো যে, তার হাদাছ হয়নি, সে নতুন ভাবে সালাত আদায় করবে। আর যদি মসজিদ থেকে বের না হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট সালাত পড়ে নিবে।

অবশ্য উভয় অবস্থাতেই কিয়াসের দাবী হলো নতুন করে আদায় করা। এটাই হল ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত। কেননা, বিনা ওযরে সালাত থেকে ফিরে যাওয়া হয়েছে।

সূক্ষ কিয়াসের কারণ এই যে, সে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়েছে। দেখুন না, যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই সে নিজের সালাতের উপর 'বিনা' করতো। সুতরাং সংশোধনের ইচ্ছাকে বাস্তব সংশোধনের সাথে যুক্ত করা হবে যতক্ষণ না বের হওয়ার কারণে স্থানের ভিন্নতা দেখা দেয়।

আর যদি (ইমাম হওয়ার কারণে) সে কাউকে স্থলবর্তী করে থাকে তাহলে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এখানে বিনা ওযরে আমলে কাছীর হয়েছে। আর এটি সে মাসআলার বিপরীত, যদি সে ধারণা করে যে, সে উযূ ছাড়া সালাত শুরু করেছে এবং ফিরে যায় তারপর বুঝতে পারে যে, স উযূ অবস্থায় আছে, তাহলে (মসজিদ থেকে) বের না হলেও তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এই ফিরে আসাটা হলো সালাত পরিত্যাগের ভিত্তিতে। দেখুন না; যদি তার ধারণা বাস্তব হতো তাহলে তো অবশ্যই তার নতুন করে সালাত শুরু করতে হতো। এ-ই মূল কথা।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর খোলামাঠে কাতারগুলোর স্থানটুকু হলো মসজিদের হুকুমভুক্ত। যদি সম্মুখের দিকে যায় তাহলে সুতরাহ (বা লাঠি) হলো সীমানা। আর যদি সুতরাহ্ না থাকে তাহলে (সীমানা হলো) তার পিছনের কাতারসমূহের পরিমাণ। আর মুনফারিদ হলে চারদিকে তার সাজদার জায়গা পরিমাণ।

আর (সালাতের মধ্যে) যদি পাগল হয়ে যায়, কিংবা ঘুম আসার পর ইহতিলাম হয়ে যায়, কিংবা অজ্ঞান হয়ে যায়, তাহলে নতুন করে সালাত শুরু করবে। কেননা, এরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়া বিরল। সুতরাং যে সকল ঘটনা সম্পর্কে 'নসজ' রয়েছে, এগুলো তার অন্তর্ভূক্ত হবে না। সেরূপ যদি অট্টহাসি করে। কেননা এটা 'কথা' বলার পর্যায়ের। আর কথা বলা সালাত ভঙ্গকারী।

যদি ইমাম কিরাতে আটকে যাওয়ার কারণে অন্যকে আগে বাড়িয়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তাদের সালাত দুরস্ত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের সালাত দুরস্ত হবে না। কেননা, এ ধরণের ঘটনা বিরল। সুতরাং তা (সালাতরত অবস্থায়) জানাবাতের সদৃশ হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো স্থলবর্তী করা হয় অক্ষমতার কারণে। আর তা এখানে অধিক প্রযোজ্য। আর কিরাতের অক্ষমতা বিরল নয়। সুতরাং জানাবাতের সাথে যুক্ত হবে না।

আর যদি সালাত জাইয হওয়া পরিমাণ কিরাত পড়ে থাকে, তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে স্থলবর্তী বানান জাইয নয়। কেননা, এক্ষেত্রে স্থলবর্তী করার প্রয়োজন নেই।

যদি তাশাহুদের পরে সে হাদাছগ্রস্ত হয়, তাহলে উযূ করবে এবং সালাম ফিরাবে। কেননা সালাম ফিরানো ওয়াজিব। সুতরাং তা আদায় করার জন্য উযূ করা জরুরী।

আর যদি এ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে 'হাদাছ' ঘটায় কিংবা কথা বলে কিংবা এমন কোন কাজ করে, যা সালাতের বিপরীত, তাহলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, সালাত ভঙ্গকারী বিদ্যমান হওয়ার কারণে 'বিনা' সম্ভব নয়। কিন্তু সালাত দোহরানো তার উপর জরুরী নয়। কেননা কোন রুকন তার যিম্মায় বাকি নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তায়াম্মুমকারী যদি সালাতের মধ্যে পানি দেখতে পায়, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আগে এর আলোচনা হয়েছে।

যদি তাশাহুদ পরিমাণ বসার পরে পানি দেখতে পায়, কিংবা সে মোজার উপর মাসহকারী থাকে, কিন্তু মাসহ করার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়ে থাকে কিংবা আমলে কালীল (অতিসামান্য কাজ) দ্বারা মোজা জোড়া খুলে ফেলে কিংবা উম্মী ছিলো কিন্তু সূরা শিখে ফেলে উলংগ ছিলো, কাপড় পেয়ে যায়, কিংবা ইশারাযোগে সালাত আদায়কারী ছিলো, কিন্তু রুকু সাজদা করতে সক্ষম হয়ে যায়, কিংবা এই সালাতের পূর্ববর্তী কোন কাযা সালাত তার স্মরণ হয় কিংবা কিরাত পাঠে সক্ষম ইমাম হাদাসগ্রস্ত হয়ে কোন উম্মীকে স্থলবর্তী করেন, কিংবা ফজরে সূর্যোদয় হয়ে যায়, কিংবা জুমুআর সালাতে থাকা অবস্থায় আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায় কিংবা সে জখমের পট্টির উপর মাসহকারী ছিলো, জখম ভাল হওয়ার কারণে পট্টি খুলে পড়ে যায় কিংবা সে মা'যূর ছিলো, কিন্তু তার ওযর দূর হয়ে যায়, যেমন মুস্তাহাবা নারী ও তার সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্যরা – এই সকল অবস্থায় সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

এ হল আবূ হানীফা (র.) এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তার সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কারো কারো মতে এ বিষয়ে আসল কথা এই যে, আবূ হানীফা (র.) এর মতে মুসল্লীর নিজস্ব কোন 'কর্ম' দ্বারা সালাত থেকে বের হয়ে আসা ফরয, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তা ফরয নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে এই অবস্থায় (অর্থাত্ তাশাহুদের পরে) এ সকল 'আপদ' দেখা দেওয়া সালাতের মধ্যে দেখা দেওয়ারই সমতুল্য। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে সালামের পরে দেখা দেওয়ার সমতুল্য।

উক্ত ইমামদ্বয়ের দলীল হলো ইতোপূর্বে বর্ণিত ইবন মাস'উদ (রা) এর হাদীছ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, বর্তমান সালাত থেকে বের হওয়া ছাড়া অন্য সালাত আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর যে কাজ ছাড়া কোন ফরয কাজে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, সে কাজটিও ফরয।

আর (হাদীছে বর্ণিত) কাদাত্ শব্দটির অর্থ হলো সম্পূর্ণ কাছাকাছি এসেছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর স্থলবর্তী করা (স্বকীয়ভাবে) সালাত ভংগকারী নয়। এজন্যই কিরাত পাঠে সক্ষম ব্যক্তি (কে স্থলবর্তী করা) এর ক্ষেত্রে জাইয হয়। বরং এখানে ফাসাদ এসেছে একটি শরীআতী হুকুমের অনিবার্য প্রয়োজনে। আর তা হলো (উম্মী ব্যক্তিটির) ইমামতি করার অযোগ্যতা।

যে ব্যক্তি ইমামের এক রাকাআত হওয়ার পর ইকতিদা করলো, তারপর ইমাম হাদাছগ্রস্ত হয়ে তাকে আগে বাড়িয়ে দিলেন, তার পক্ষে (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার) অবকাশ আছে। কেননা, তাহরীমাতে (উভয়ের) অংশীদারিত্ব রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হলো প্রথম থেকে অংশ গ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে আগে বাড়ানো। কেননা, সে ইমামের সালাতকে সম্পন্ন করার ব্যপারে (মাসবুকের তুলনায়) অধিকতর সক্ষম। আর মাসবূকের উচিত সালাম ফিরানো ব্যাপারে নিজের অপারগতার কথা বিবেচনা করে অগ্রসর না হওয়া।

মাসবূক যদি (ইমামের স্থলবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে) অগ্রসর হয়, তাহলে ইমাম যেখানে এসে শেষ করেছেন, সেখান থেকে সে শুরু করবে। কেননা, এখন সে ইমামের স্থলবর্তী।

যখন সে সালাম পর্যন্ত উপনীত হবে তখন ইমামের সাথে প্রথম থেকে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দিবে। সে মুক্তাদীদের নিয়ে সালাম ফিরাবে। কিন্তু এই মাসবূক যদি ইমামের সালাত সম্পন্ন করার পর অট্টহাস্য করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটায় বা কথা বলে বা মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে আর মুক্তাদীদের সালাত পূর্ণ হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে সালাত ফাসাদকারী বিষয়টি সালাতের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মুক্তাদীদের ক্ষেত্রে সকল রুকন সম্পন্ন হওয়ার পর পাওয়া গিয়েছে।

আর প্রথম যদি (অন্যান্যদের সাথে দ্বিতীয় ইমামের পিছনে) সালাত থেকে ফারেগ হয়ে থাকে, তাহলে তার সালাত ফাসিদ হবে না। আর ফারেগ না হয়ে থাকলে ফাসিদ হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধতম মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি প্রথম ইমামের হাদাছ না ঘটে এবং তাশাহুদ পরিমাণ বসেন তারপর অট্টহাস্য করেন কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে হাদাছ ঘটান, তাহলে ঐ লোকের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে, যে সালাতের প্রথম দিক পায়নি।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ফাসিদ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যদি কথা বলেন। কিংবা মসজিদ থেকে বের হয়ে যান তাহলে সকলের মতেই সালাত ফাসিদ হবে না।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, জাইয হওয়া ও ফাসিদ হওয়া উভয় ক্ষেত্রেই মুক্তাদির সালাতের ভিত্তি হলো ইমামের সালাতের উপর। যেহেতু এখানে (সকলের মতেই) ইমামের সালাত ফাসিদ হয়নি, সেহেতু মুক্তাদীর সালাতও ফাসিদ হবে না। বিষয়টি সালাম বলা ও কথা বলার মতো হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, অট্টহাস্য ইমামের সালাতের ঐ অংশকে ফাসিদ করে দেয় যে অংশ অট্টহাস্যের সাথে যুক্ত। সুতরাং মুক্তাদীর সালাতেরও ততটুকু ফাসিদ হয়ে যাবে। তবে ইমামের তো আর 'বিনা' করার প্রয়োজন নেই। আর মাসবূকের বিনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর ফাসিদের উপর বিনা করাও ফাসিদ। সালামের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, সালাম তো সালাত সমাপ্তকারী। আর কথা সালামের সমমানের। তবে ইমামের উযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেহেতু অট্টহাস্য সালাতে থাকা অবস্থায় হয়েছে।

যে ব্যক্তির রকুতে কিংবা সাজদায় হাদাছ হয়ে যায়, সে উযূ করে ' বিনা' করবে এবং যে যে রুকুনে হাদাছ হয়েছে, তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা রকুন পূর্ণ হয় তা থেকে প্রস্থানের মাধ্যমে। আর হাদাছ অবস্থায় প্রস্থান, সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং (উক্ত রুকনটি) দোহরানো জরুরী।

আর যদি তিনি ইমাম হয়ে থাকেন আর অন্যকে আগে বাড়িয়ে থাকেন, তবে যাকে আগে বাড়ানো হয়েছে, সে রুকু দীর্ঘায়িত করবে। কেননা, দীর্ঘায়িত করার দ্বারা পূর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভব।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি রুকুতে বা সাজদায় মনে পড়ে যে তার যিম্মায় একটি সাজদা রয়ে গেছে। তখন সে রুকু থেকেই সাজদায় নেমে গেলো কিংবা সাজদা থেকে মাথা তুলে ঐ সাজদাটি করে নিলো তবে রুকু বা সাজদাতে দোহরাবে।

এটা হলো উত্তম হওয়ার বর্ণনা। যাতে রুকনগুলো যথাসম্ভব তারতীব মুতাবিক হয়। আর যদি না দোহরানো না হয় তবু চলবে। কেননা সালাতের রকুনগুলো সাথে তারতীব রক্ষা করা শর্ত নয়।

তা ছাড়া তাহারাতের অবস্থায় (অন্য রুকনে) গমন শর্ত। আর তা তো পাওয়া গেছে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তার জন্য রুকু দোহরানো জরুরী। কেননা তার মতে 'কাওমা' হলো ফরয।

যে ব্যক্তি মাত্র একজন মুক্তাদীর ইমামতি করছে, এমতাবস্থায় তার হাদাছ ঘটানো আর সে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো, তখন মুক্তাদী ইমাম হয়ে যাবে, তাকে স্থলবর্তী করার নিয়্যত করুন কিংবা না করুন। কেননা, এতে সালাত রক্ষার উপায় হয়।

আর প্রথমজন দ্বিতীয় জনের মুক্তাদী হয়ে সালাত সম্পূর্ণ করবে। প্রকৃতই তাকে স্থলবর্তী করলে যেমন করতো।

যদি তার পিছনে বালক বা স্ত্রী লোক ছাড়া অন্য কেউ না থাকে, তবে কারো কারো মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, যার ইমামতি জাইয নেই, সে স্থলবর্তী হয়েছে। অন্য মতে তার সালাত ফাসিদ হবে না। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে 'স্থলবর্তীকরণ' পাওয়া যায়নি এবং তার ইমামতি করার যোগ্যতা নেই।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

http://islaminonesite.wordpress.com/

যা সালাতকে ভংগ করে এবং যা সালাতকে মাকরূহ করে

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে বা ভুলে সালাতের মধ্যে কথা বলে, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। বিচ্যুতি বা ভুলবশতঃ কথা বলার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার দলীল হলো সেই প্রসিদ্ধ হাদীছটি।

আমাদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

আমাদের এ সালাত কোন মানুষের কথাবার্তার উপযোগী নয়। সালাততো তাসবীহ, তাহলীল ও কুরআন পাঠ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি গুনাহ্ রহিত হওয়ার উপর প্রযোজ্য। ভুলে সালাম করার বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা, এটা 'যিকির' এর মধ্যে গণ্য। সুতরাং ভুলের অবস্থায় একে যিকির ধরা হবে এবং স্বেচ্ছায় বললে কথা ধরা হবে। কেননা এতে সম্বোধনের কাপ সর্বনা্ম রয়েছে।

যদি সালাতের মধ্যে কাতরায় কিংবা উহ্-আহ শব্দ করে বা শব্দ করে কাদে, এগুলো যদি জান্নাত-জাহান্নামের স্মরণের কারণে হয়ে থাকে তবে সালাত নষ্ট হবে না। কেননা, এতে অধিক 'খুশুখুযু' প্রমাণিত হয়।

আর যদি ব্যাথা বা কোন বিপদের কারণে হয়, তবে সালাত ভংগ হয়ে যাবে। কেননা তাতে অস্থিরতা ও আক্ষেপ প্রকাশ পায়। সুতরাং তা মানুষের কথার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহ্ শব্দটি উভয় অবস্থায় সালাত নষ্ট করবে না। আর 'আওয়াহ' শব্দটি নষ্ট করবে।

কেউ কেউ বলেছেন, আবূ ইউসূফ (র.) এর মূল বক্তব্য এই যে, উচ্চারিত শব্দ যদি দুই হরফ বিশিষ্ট হয় আর উভয় হরফ কিংবা একটি যদি (আরবী ব্যকরণ মতে) অতিরিক্ত হরফ সমষ্টির অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলে সালাত ফাসিদ হবে না। আর উভয়টি যদি মূল হরফ সমষ্টির অন্তর্ভূক্ত হয় তবে ফাসিদ হয়ে যাবে। আর অতিরিক্ত হরফ সমষ্টির অন্তর্ভূক্ত ফকীহগণ বাক্যে একত্র করেছেন। এ বক্তব্য সবল

http://islaminonesite.wordpress.com/

নয়। কেননা প্রচলিত অর্থে মানুষের কথা বর্ণোচ্চারণ ও অর্থ বুঝানোর অনুগামী। আর তা এমন ধ্বনির ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হতে পারে, যার সব ক'টি বর্ণ 'অতিরিক্ত' বর্ণসমষ্টির অন্তর্ভূক্ত।

যদি বিনা ওযরে গলা খাকারি দেয়, অর্থাত্ অনন্যোপায় অবস্থায় হয়নি, আর তার ফলে বর্ণসমূহ সৃষ্টি হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে সালাত ফাসিদ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর যদি ওযরের কারণে হয় তবে তা মা'ফ। যেমন হাচিঁ ও ঢেকুর; যখন এতে হরফ প্রকাশিত হয়।

কেউ হাচি দিলো আর অন্যজন সালাতের মধ্যেই তাকে ইয়ার হামুকাল্লাহ্ বলে ফেললো তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এটি ব্যবহৃত হয় মানুষের পরস্পর সম্বোধনের ক্ষেত্রে। সুতরাং কাজের কথার মধ্যে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হাচিদাতা অথবা শ্রোতা যদি আল হামদুলিল্লাহ্ বলে তবে সালাত ফাসিদ হবে বলেই ফকীহদের মত। কেননা, এটা জবাব হিসাবে প্রচলিত নয়।

আর যদি কিরাত পাঠকারী ব্যক্তি আটকা পড়ে লোকমা চায় আর অন্য ব্যক্তি সালাতে থেকেই তাকে লোকমা দিয়ে তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

এর মূল অর্থ হল মুসল্লি নিজে ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে বলে দেয়। কেননা, এরূপ করা শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের অন্তর্ভূক্ত। তা মানুষের কথার মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাবসূত কিতাবে একাধিকবার করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কেননা এটা সালাতের আমলসমূহের অন্তর্ভূক্ত নয়। কাজেই অল্প মা'ফ হবে। কিন্তু 'জামেউস সাগীর' কিতাবে এ শর্ত আরোপ করা হয়নি। কেননা, স্বয়ং মানুষের কথা অল্প হলেও তা সালাত ভঙ্গকারী।

আর যদি নিজের ইমামের কিরাত বলে দেয় তবে তা 'কথা' রূপে গণ্য হবে না, সূক্ষ কিয়াসের দৃষ্টিতে। কেননা মুক্তাদী নিজের সালাত সংশোধন করতে বাধ্য। সুতরাং এরূপ বলে দেয়া প্রকৃতপক্ষে তার সালাতের আমল হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য ইমামের কিরাত বলে দেওয়ারই নিয়্যত করবে। নিজে পাঠ করার নিয়্যত করবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা, তাকে বলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিরাত পাঠের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি ইমাম অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে লোকমাদাতার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং ইমামের সালাতও ফাসিদ হয়ে যাবে, যদি সে তার লোকমা গ্রহণ করে। কেননা, এখানে বিনা প্রয়োজনে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ সংঘটিত হলো। আর মুক্তাদীর উচিত নয় বলে দেওয়ার ব্যাপারে জলদি করা। আবার ইমামেরও উচিত নয় মুক্তাদীদের বলে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা। বরং তার কর্তব্য রুকুর সময় হয়ে গেলে রুকুতে চলে যাবেন কিংবা অন্য আয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন।

যদি সালাতের মধ্যে কারো উত্তরে লা ইলাহা ইলল্লালাহ বলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে তা সালাত ফাসিদকারী কালাম বলে গণ্য হবে। কিন্তু আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, এটা সালাত ফাসিদকারী হবে না।

এই মতভিন্নতা তখনই, যখন এই বাক্য দ্বারা উত্তর দেয়ার নিয়্যত করবে।

ইমাম আবূ ইউসূফের দলীল এই যে, এ বাক্যটি আল্লাহর প্রশংসা অর্থেই গঠিত। সুতরাং তার নিয়্যতের কারণে তা পরিবর্তিত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, বাক্যটি উত্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে। আর উত্তর হওয়ার উপযোগিতা বাক্যটির মধ্যে আছে। সুতরাং একে উত্তর রূপেই গ্রহণ করা হবে। যেমন, হাচির উত্তর (ইয়ারহামুকাল্লাহ)। আর ইন্না লিল্লাহির বিষয়টিও বিশুদ্ধ মতে বিরোধপূর্ণ।

যদি সে এ দ্বারা একথা জানানোর ইচ্ছা করে থাকে যে, সে সালাত রয়েছে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তার সালাত ফাসিদ হবে না।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমাদের কেউ যদি সালাতে কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়, তবে সে যেন তাসবীহ পড়ে।

যে ব্যক্তি যুহরের এক রাকাআত আদায় করল, তারপর আসর বা সাধারণ নফল শুরু করে দিলো, তাহলে তার যুহর ভংগ হয়ে গেলো। কেননা অন্য সালাত শুরু করা সহীহ হয়েছে। সুতরাং সে (বর্তমান সালাতে) যুহর থেকে বের হয়ে যাবে।

যদি যুহরের এক রাকাআত আদায়ের পর আবার যুহরই শুরু করে, তাহলে সেটা যুহরই হবে এবং ঐ রাকাআতই যথেষ্ট হবে। কেননা, যে সালাতে সে বিদ্যমান

http://islaminonesite.wordpress.com/

আছে, হুবহু সেটাকেই শুরু করার নিয়্যত করেছে। সুতরাং তার নিয়্যত বাতিল হবে এবং নিয়্যতকৃত সালাত বহাল থাকবে।

ইমাম যদি কুরআন শরীফ দেখে পাঠ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে সালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। কেননা এখানে এক ইবাদতের সঙ্গে অন্য ইবাদত যুক্ত হয়েছে মাত্র।

তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা এটা কিতাবীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, কুরআন শরীফ বহন করা দেখা এবং পাতা উল্টানো, এগুলো আমলে কাছীর (বা বেশী মাত্রার কাজ)।

তাছাড়া এটা হচ্ছে কুরআন শরীফ থেকে পাঠ গ্রহণ। সুতরাং অন্য কারো কাছ থেকে পাঠ গ্রহণের মতো এটাও সালাত ফাসিদকারী হবে।

দ্বিতীয় দলীলের আলোকে হাতে বহনকৃত ও কোন স্থানে রক্ষিত কুরআনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রথম দলীলের আলোকে উভয়ের মাঝে পার্থক্য হবে।

যদি কোন লেখার দিকে দৃষ্টি দেয় আর বিষয়বস্তু (মুখে না পড়ে) বুঝে ফেলে, তবে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে সর্বসম্মতিক্রমেই তার সালাত ফাসিদ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি কসম করে থাকে যে, অমুকের চিঠি পড়বে না, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে শুধু বুঝার দ্বারাই কসম ভংগ হয়ে যাবে। কেননা সেখানে (উচ্চারণ পড়াটা নয় বরং) বুঝাই হলো উদ্দেশ্য। আর সালাত ফাসিদ হয় আমলে কাছীর দ্বারা। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি।

আর যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে কোন স্ত্রীলোক অতিক্রম করে,তবে সালাত ভংগ হবে না। কেননা হুযূর (সা.) বলেছেন- কোন কিছুর অতিক্রম সালাত ভংগ করে না। তবে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো যে, তার কত গুনাহ হবে, তাহলে সে চল্লিশ (দিন বা মাস বা বছর) পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকতো।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কথিত মতে যদি সে মুসল্লীর সাজদার স্থান দিয়ে অতিক্রম করে এবং উভয়ের মাঝে কোন আড়ালে না থাকে, তদ্রুপ দোকানে (বা অন্য কোন উচু স্থানে) যদি সালাত আদায় করে এবং অতিক্রমকারীর অংগসমূহ তার অংগের সোজাসুজি হয় তবে গুনাহ্গার হবে।

আর যে ব্যক্তি মরুভুমিতে (বা খোলা স্থানে) সালাত আদায় করে তার জন্য উচিত নিজের সামনে একটি সুতরাহ্ গ্রহণ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন মরুভুমিতে সালাত আদায় করে, তখন সে যেন নিজের সামনে সুতরাহ্ গ্রহণ করে।

'সুতরাহ্' এর পরিমাণ হলো একগজ বা তার বেশী। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন মরুভূমিতে সালাত আদায় করে তখন সে কি নিজের সামনে হাউদার পিছনের কাঠের মতো কিছু একটা ধারণ করতে পারে না?

বলা হয়েছে যে, তা আংগুলের মত মোটা হওয়া দরকার। কেননা এর চাইতে সরু হলে দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে না। ফলে উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না।

'সুতরাহ' এর কাছাকাঠি দাড়াবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি 'সুতরাহ' এর সামনে সালাত আদায় করে, সে যেন 'সুতরাহ'র নিকটবর্তী দাড়ায়।

'সুতরাহ্' ডান ভ্রূ বা বাম ভ্রূ বরাবর স্থাপন করবে। হাদীছে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

যদি অতিক্রমণের আশংকা না থাকে এবং রাস্তা সামনে রেখে না দাড়ায়, তবে সুতরাহ্ বাদ দেওয়ার কোন অসুবিধা নেই।

ইমামের সুতরাহ্ জামা'আতের সুতরাহ্ বলে গণ্য হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার 'সমতল ভুমিতে' লাঠি সামনে রেখে সালাত আদায় করেছে; কিন্তু জামা'আতের সামনে কোন সুতরাহ্ ছিল না।

(সুতরাহ্) মাটিতে গেড়ে রাখাই গ্রহণীয়, ফেলে রাখা বা মাটিতে দাগ টানা নয়। কেননা তা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি সামনে সুতরাহ্ না থাকে অথবা তার ও ‘সুতরাহ্’র মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তবে অতিক্রমকারীকে বাধা দিবে। কেননা, রাসূলুল্লা্হ্ (সা.) বলেছেন- যতটা পারো বাধা দাও।

আর ইশারার মাধ্যমে বাধা দিবে। উম্মু সালামা (রা.) এর দুই ‘সন্তান’ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এমনই করেছেন।

কিংবা তাসবীহ পড়ে রোধ করবে। প্রথম হলো ঐ হাদীছ, যা ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

(ইশারা ও তাসবীহ) উভয়টি একত্র করা মাকরূহ হবে। কেননা (উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য) একটিই যথেষ্ট।

পরিচ্ছেদঃ সালাতের মাকরূহ

মুসল্লী নিজের কাপড় নিয়ে বা শরীর (এর কোন অংগ) নিয়ে (সালাতরত অবস্থায়) খেলা করা মাকরূহ। কেননা, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস মাকরূহ করেছেন, তন্মধ্যে তিনি সালাতরত অবস্থায় ক্রীড়া করার কথা উল্লেখ করেছেন।

সালাতের বাইরেও ক্রীড়া হারাম। সুতরাং সালাতের ভিতরে (তা হারাম হওয়া সম্পর্কে) তোমার ধারণা কি? আর পাথর কণা-সরাবে না। কেননা, এও এক ধরণের ক্রীড়া; অবশ্য যদি সাজদা দেওয়া সম্ভব না হয় তবে একবার মাত্র সমান করে নিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- হে আবূ যার! কেবল একবার (পরিষ্কার করতে পারো) অন্যথায় ছেড়ে দাও।

তাছাড়া যেহেতু তাতে তার সালাতের সংশোধন রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর আংগুল মটকাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সালাতরত অবস্থায় তুমি তোমার আংগুল মটকিয়ো না।

আর কোমরে হাত রাখবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা নিষেধ করেছেন। এতে সুন্নতসম্মত অবস্থা তরক করা হয়।

আর অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- মুসল্লী যদি জানত যে, কার সংগে কথোপকথন করছে, তাহলে সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতো না।

যদি মুসল্লি ঘাড় বাকা না করে চোখের কোণ দিয়ে ডানে, বামে তাকায়, তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সালাতে থেকে চোখের কোণ দিয়ে তার সাহাবীদের দিকে তাকাতেন। আর হাটু তুলে বসবে না এবং (সাজদার সময়) ডানা ভুমিতে বিছিয়ে রাখবে না। কেননা আবূ যার (রা.) বলেছেন-

আমার হাবীব আমাকে তিনটি কাজ নিষেধ করেছেন। মোরগের মত ঠোকর দেওয়া, কুকুরের মত বসা এবং শৃগালের মত ডানা বিছিয়ে দেওয়া।

আবূ যার (রা.) বর্ণিত এর অর্থ উভয় নিতম্ব মাটিতে রেখে উভয় হাটু খাড়া করে রাখা। এ-ই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা।

আর মুখে সালামের জবাব দিবে না। কেননা তা কথা বলা; এবং হাতেও না। কেননা, এ-ও পরোক্ষভাবে সালাম। এমন কি কেউ যদি সালামের নিয়্যতে মুছাফাহা করে, তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।

কোন ওযর ছাড়া আসন করে বসবে না। কেননা, তাতে বসার সুন্নত তরক হয়।

আর চুল ঝুটি করবে না। ঝুটি করা মানে চুলগুলো মাথার উপরে একত্র করে সুতা দিয়ে কিংবা রাবার দিয়ে বাধা, যাতে চুল স্থির থাকে। কেননা,রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চুল ঝুটি করা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

আর কাপড় গুটাবে না। কেননা, এটা এক ধরনের অহংকার।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর কাপড় ঝুলিয়ে দেবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। সাদল অর্থ মাথায় ও কাধে কাপড় রেখে প্রান্তগুলো দু'দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া।

আর পানাহার করবে না। কেননা এটা সালাতভূক্ত কাজ নয়।

যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলে পানাহার করে তবে তার সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা এটা আমলে কাছীর (বা অতিমাত্রার কাজ) আর সালাতের অবস্থা হলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অবস্থা।

ইমামের দাড়ানোর স্থান মসজিদে আর সাজদার স্থান মেহরাবে হওয়াতে অসুবিধা নেই। তবে মেহরাবে দাড়ানো মাকরূহ। কেননা, এটা ইমামের জন্য আলাদা স্থান নির্ধারণের দিক থেকে আহলে কিতাবের আচরণ সদৃশ। তবে (পদদ্বয় মসজিদে থাকে অবস্থায়) মেহরাবে সাজদা দেওয়ার বিষয়টি আলাদা।

ইমামের একা উচু স্থানে দাড়ানো মাকরূহ। কারণ হলো, যা আমরা বলে এসেছি।

তদ্রুপ জাহিরী বর্ণনা মুতাবিক (বিপরীত অবস্থাটিও) মাকরূহ হবে। কেননা, এতে ইমামের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়।

বসা, আলাপরত কোন মানুষের পিঠ সামনে রেখে সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, ইবন উমর (রা.) কোন কোন সফরে (আপন আযাদকৃত দাস) 'নাফি'কে সুতরাহ বানিয়ে সালাত আদায় করতেন।

সামনে ঝুলন্ত কুরআন শরীফ বা ঝুলন্ত তলোয়ার রেখে সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এ দু'টো ইবাদতযোগ্য বস্তু নয়। আর সে হিসাবেই মাকরূহ হওয়া সাব্যস্ত হয়।

ছবি সম্বলিত বিছানায় সালাত আদায়ে অসুবিধা নেই। কেননা, এতে ছবিকে তুচ্ছই করা হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ছবিগুলোর উপর সাজদা করবে না। কেননা, এটা ছবি পূজার সদৃশ। মাবসূত কিতাবে (মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি) নিঃশর্ত করা হয়েছে। কেননা, অন্যান্য বিছানার মুকাবিলায় মুছল্লাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়।

মাথার উপরে ছাদে কিংবা সামনে কিংবা বরাবরে ছবি থাকা কিংবা ঝুলন্ত ছবি রাখা মাকরূহ। কেননা (হযরত) জিবরাঈল কথিত হাদীছে রয়েছে- যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না। ছবি যদি এতো ছোট হয়, মানুষের চোখে পড়ে না তবে মাকরূহ হবে না। কেননা খুব ছোট ছবি পূজ্য নয়।

আর মূর্তি যদি কর্তিত মস্তক হয়। অর্থাত্ যদি মাথা ফেলে দেওয়া হয় তবে তা মূর্তি নয়। কেননা, মস্তকহীন অবস্থায় মূর্তিপুজা করা হয় না। সুতরাং তা প্রদীপ বা মোমবাতি সামনে রেখে সালাত আদায় করার মত হলো। যেমন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন।

যদি মাটিতে পড়ে থাকা বালিশ কিংবা বিছিয়ে রাখা বিছানায় ছবি থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় তো তা পায়ে মাড়ানো হয়। পক্ষান্তরে বালিশ খাড়া করে রাখা অবস্থায় কিংবা ঝুলন্ত পর্দায় ছবি থাকলে ভিন্ন হুকুম হবে। কেননা, এতে ছবির সম্মান প্রকাশ পায়। কঠিততম মাকরূহ হলো ছবি মুসল্লীর সামনে থাকা, অতঃপর মাথার উপরে থাকা এরপর ডান দিকে থাকা, এরপর বাম দিকে থাকা অতঃপর পিছন থাকা । আর যদি ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে তবে মাকরূহ হবে।

কেননা, সে মূর্তি বহনকারীর সদৃশ হবে। তবে এ অবস্থার সালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেননা, সালাতের যাবতীয় শর্ত পাওয়া গিয়েছে। তবে মাকরূহমুক্ত অবস্থায় তা দোহরাতে হবে। মাকরূহসহ আদায়কৃত সমস্ত সালাতের একই হুকুম।

তবে অপ্রাণীর ছবি মাকরূহ হবে না। কেননা সেগুলোর পূজা করা হয় না।

সালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু হত্যা করায় কোন অসুবিধা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমরা দুই 'কালো' (সাপ ও বিচ্ছু) মেরে ফেলবে, এমন কি তোমরা যদি সালাতের মধ্যেও থাক।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাছাড়া এদ্বারা সালাতে বিঘ্নকারী দূর করা হয়। সুতরাং তা সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে রোধ করার সমতুল্য।

সবরকম সাপেরই সমান হুকুম। এটাই সহীহ মত। কেননা বর্ণিত হাদীছটি নিঃশর্ত।

আর সালাতের মধ্যে যাতে আয়াত ও তসবীহ সংখ্যা তদ্রুপ সূরা গণনা করাও মাকরূহ হবে। কেননা তা সালাতের কার্যভুক্ত নয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কিরাতের সুন্নত পরিমাণ রক্ষা করার জন্য এবং হাদীছে যে সংখ্যা বর্ণিত আছে, তা রক্ষা করার জন্য গণনা করা মাকরূহ হবে না।

(উত্তরে) আমরা বলি, সালাত শুরু করার আগেই তো তা গণনা করে নিতে পারে যাতে পরে গণনা করার প্রয়োজন না হয়। আল্লাহই উত্তম জানেন।

পরিচ্ছেদঃ পায়খানায় কিবলামুখী বসা

পায়খানায় লজ্জাস্থান কিবলামুখী করে বসা মাকরূহ। কেননা, নবী করিম (সা.) তা নিষেধ করেছেন। এক বর্ণনা মতে কিবলার দিকে পিছন দিয়ে বসা মাকরূহ। কেননা তাতে সম্মান তরক করা হয়। অন্য বর্ণনা মতে তা মাকরূহ হয় না। কেননা, যে ব্যক্তি (কিবলার দিকে) পিছন দিয়ে বসেছে, তার লজ্জাস্থান কেবলার দিকে নয়।

আর যে নাজাসাত তার থেকে বের হয়, তা ভূমির দিকে পড়ে। আর যে কিবলামূখী হয়ে বসে, তার লজ্জাস্থান কেবলামুখী হয়ে থাকে। আর তা থেকে যা নির্গত হয়, তা সে মুখী হয়ে মাটিতে পড়ে।

মসজিদের উপরে স্ত্রী সহবাস করা, পেশাব করা এবং নির্জনে মিলিত হওয়া মাকরূহ। কেননা মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকুমভূক্ত। এইজন্য মসজিদে ছাদ

http://islaminonesite.wordpress.com/

থেকে ছাদের নীচে দাড়ানো ইমামের পিছনে ইকতিদা করা বৈধ। এবং ছাদে আরোহণের কারণে ই'তিকাফ বাতিল হয় নি। এবং জানাবাতের অবস্থায় সেখানে অবস্থান করা জাইয নয়।

ঐ ঘরের উপরে পেশাব করায় কোন অসুবিধা নেই, যার নীচে মসজিদ রয়েছে।

মসজিদ দ্বারা বাড়ীর ঐ অংশকে বোঝানো হয়েছে, যা সালাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা তা মসজিদের হুকুমের আওতায় পড়েনি। যদিও আমাদেরকে বাড়ীতে সালাতের জন্য নির্ধারিত স্থান রাখার আহবান জানানো হয়েছে।

আর মসজিদের চুনকাম করা, শালকাঠ দ্বারা এবং স্বর্ণের পানি দ্বারা কারুকার্য করাতে কোন অসুবিধা নেই।

'অসুবিধা নেই' দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, একাজে কোন সাওয়াব হবে না। তবে গুনাহও হবে না। কোন কোন মতে অবশ্য এটি সাওয়াবের কাজ। তবে এটি নিজস্ব তহবিল থেকে খরচ করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে মুতাওয়াল্লী ওয়াকফের মাল হতে ঐ সমস্ত কাজই শুধু করতে পারেন, যা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট; কারুকার্য সংশ্লিষ্ট নয়। যদি কিছু করেন তবে ব্যয়কৃত অর্থের দায় তাকেই বহন করতে হবে। আল্লাহই উত্তম জানেন।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

সালাতুল বিতর

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে সালাতুল বিতর হলো ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, এটি সুন্নত। কেননা,তাতে সুন্নতের

http://islaminonesite.wordpress.com/

আলামতসমূহ সুপ্রকাশিত রয়েছে। কারণ, বিতর অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না। এবং এর জন্য আলাদা আযান দেওয়া হয় না।

আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো হাদীছে-

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একটি সালাত বৃদ্ধি করেছেন। সেটা হলো বিতর। সুতরাং তা তোমরা ঈশা ও ফজর উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় কর।

এখানে 'আমর' বা আদেশবাচক শব্দ এসেছে। আর তা দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। এজন্যই সর্বসম্মতিক্রমে তা কাযা করা ওয়াজিব।

তবে বিতর অস্বীকারকারীকে কাফির আখ্যায়িত না করার কারণ এই যে, তার ওয়াজিব হওয়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবূ হানীফা (র.) থেকে বিতর সুন্নত হওয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, তার অর্থ এই যে, তা সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। আর যেহেতু তা 'ঈশার সময় আদায় করা হয়, সেহেতু 'ঈশার আযান ও ইকামাতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন। বিতর হলো তিন রাকাআত, যার মাঝে সালাম দ্বারা ব্যবধান করা হবে না। কেননা, 'আইশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) তিন রাকাআতের বিতর আদায় করতেন। তদুপরি হাসান বসরী (র.) বিতরের তিন রাকাআতের ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা বর্ণনা করেছেন।

এতে ইমাম শাফিঈ (র.) ও এক মত। অন্যমতে বিতর দুই সালামে আদায় করার কথা রয়েছে। ইমাম মালিক (র.) এর এই মত। আমাদের বর্ণিত হাদীছ তাদের বিপক্ষে প্রমাণ।

আর তৃতীয় রাকাআতে 'রুকু এর পূর্বে কুনূত পড়বে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রুকুর পরে পড়বে। কেননা, বর্ণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিতরের শেষে কুনূত পড়েছেন। আর তা রুকুর পরেই হবে।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করিম (সা.) রুকুর পূর্বে কুনূত পড়েছেন। আর যা অর্ধেকের বেশী, তাকে শেষাংশ বলা যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সারা বছরই কুনূত পড়া হবে। রমযানের শেষার্ধ ছাড়া অন্য সময়ের ব্যাপারে শাফিঈ (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা, হাসান ইবন আলী (রা.) কে কুনূতের দু'আ শিক্ষা দেয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাধারণতঃ বলেছেন-এটা তোমার বিতর-এর মধ্যে পড়ো।

বিতরের প্রত্যেক রাকাআতে সূরাতুল ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- কুরআনের যে অংশ তোমাদের জন্য সহজ হয় পড়ো।

আর যখন কুনূত পড়ার ইচ্ছা করবে তখন তাকবীর বলবে। কেননা, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

আর উভয় হাত উঠাবে এবং কুনূত পড়বে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কেবল সাতটি ক্ষেত্র ব্যতীত হাত উঠানো হবে না। তন্মধ্যে কুনূতের কথাও তিনি বলেছেন। এছাড়া অন্য কোন সালাতে কুনূত পড়বে না।

ফজরের ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের সালাতে কুনূত পড়েছেন। পরে তা ছেড়ে দিয়েছেন।

ইমাম যদি ফজরের সালাতে কুনূত পড়েন তবে আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে তার মুকতাদীরা নীরব থাকবে। আর আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, মুকতাদী ইমামের অনুসরণ করবে (অর্থাৎ কুনুত পড়বে)। কেননা, সে তার ইমামের অনুগত। আর ফজরে কুনূত পড়ার বিষয় ইজতিহাদ নির্ভর।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর যুক্তি এই যে, ফজরের কুনূত রহিত হয়ে গেছে। আর যা রহিত হয়ে গেছে, তা অনুসরণযোগ্য নয়।

তবে কথিত আছে যে, সে দাঁড়িয়ে থাকবে। যেন যে বিষয়ে ইমামের অনুসরণ আবশ্যক, সে বিষয়ে যথাসম্ভব ইমামের অনুসরণ বজায় থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

অন্য মতে মতভিন্নতা সাব্যস্ত করার জন্য বসা অবস্থায় থাকবে। কেননা নীরবতা অবলম্বনকারী আহবানকারীর সাথে শরীক বলেই গণ্য হয়ে থাকে। তবে প্রথম মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত।

এই মাসআলাটি শাফিঈ মাযহাব অনুসারীদের পিছনে ইকতিদার বৈধতা এবং বিতরে কুনূত পড়ার ক্ষেত্রে অনুসরণের বৈধতা প্রমাণ করে।

মুকতাদী যদি ইমামের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখতে পায়, যাতে সে ইমামের সালাত ফাসিদ মনে করে; যেমন, রক্ত মোক্ষণ করানো, ইত্যাদি তাহলে তার পিছনে ইকতিদা করা জাইয নয়।

কুনূতের ক্ষেত্রে পছন্দনীয় হলো নীরবে পড়া, কেননা এটা দু'আ।

নবম অনুচ্ছেদ

নফল সালাত

ফজরের পূর্বে দু-রাকাআত, যুহরের পূর্বে চার রাকাআত এবং তারপরে দু'রাকাআত এবং আসরের পূর্বে চার রাকাআত, তবে ইচ্ছা করলে দুই রাকাআত এবং মাগরিবের পরে দুই রাকাআত এবং 'ঈশার পূর্বে চার রাকাআত এবং ঈশার পরে চার রাকাআত, তবে ইচ্ছা করলে দুই রাকাআত সুন্নাত।

এ সম্পর্কে মূল সূত্র হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীছ-

যে ব্যক্তি দিনে ও রাত্রে বার রাকাআত (সুন্নাত সালাত) নিষ্ঠার সাথে আদায় করবে আল্লাহ্ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ ভাবেই তাফসীর করেছেন, যেভাবে (মাবসূত) কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে আসরের পূর্ববর্তী চার রাকাআতের কথা হাদীছে নেই। এ কারণে (মুহাম্মদ ইবনূল হাসান (র.) আল-আসল কিতাবে এটাকে (সুন্নতের

http://islaminonesite.wordpress.com/

পরিবর্তে) 'উত্তম' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এবং (চার রাকাআত) পড়া না পড়ায় ইখতিয়ার দিয়েছেন। কেননা এ সম্পর্কে হাদীছ বিভিন্ন রকমের রয়েছে। তবে চার রাকাআতই উত্তম। ঈশার পূর্ববর্তী চার রাকাআতের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এজন্যই নিয়মিতি না থাকার কারণে এটাকে মুসতাহাব ধরা হয়েছে। তদ্রুপ আলোচ্য হাদীছে ' ঈশার পরে দুই রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্য হাদীছে চার রাকাআতের কথা বলা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম কুদূরী 'ইচ্ছা করলে' বলেছেন। তবে চার রাকাআতই উত্তম। বিশেষতঃ আবূ হানীফা (র.) এর সুপরিচিত মত অনুসারে। (কেননা তার মতে রাত্রে এক সালামে চার রাকাআত আদায় উত্তম)।

আর যুহরের পূর্বের চার রাকাআত আমাদের মতে এক সালামে আদায় উত্তম। যেমন (আবূ দাঊদ বর্ণিত হাদীছে) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) (আবূ আইয়ুব আনসারী (রা.) কে বলেছেন। এ বিষয়ে শাফিঈ (র.) এর দ্বিমত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী বলেন, দিনের ইচ্ছা করলে এক সালামে দুই রাকাআত আদায় করবে আর ইচ্ছা করলে চার রাকাআত আদায় করবে। এর বেশী আদায় করা মাকরূহ হবে। আর রাত্রের নফল সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, এক সালামে আট রাকাআত পর্যন্ত আদায় করা জাইয। কিন্তু এর বেশী মাকরূহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন- রাত্রে এক সালামে দুই রাকাআতের বেশী আদায় করবে না।

জামেউস সগীর কিতাবে রাত্রের নফলের ক্ষেত্রে আট রাকাআতের উল্লেখ নেই। ছয় রাকা্আতের কথা আছে। মাকরূহ হওয়ার দলীল এই যে, নবী করিম (সা.) এর বেশী আদায় করেননি। যদি মাকরূহ না হতো তাহলে বৈধতার বিষয়টি শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই তিনি বেশী আদায় করতেন।

আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে রাত্রে দুই রাকাআত করে পড়া আর দিনে চার রাকাআত করে আদায় করা উত্তম। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই দুই রাকাআত করে আদায় করা উত্তম। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে উভয় ক্ষেত্রেই চার রাকাআত করে আদায় করা উত্তম।

http://islaminonesite.wordpress.com/

শাফিঈ (র.) এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীছ- রাত্র ও দিনের সালাত দুই রাকাআত করে।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) তারাবীহের উপর কিয়াস করেন। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর প্রমাণ এই যে, নবী (সা.) 'ঈশার পর চার রাকাআত পড়তেন। 'আঈশা (রা.) এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ) তাছাড়া চাশতের সময় নিয়মিত চার রাকাআত পড়তেন।

তাছাড়া এতে তাহরীমা দীর্ঘতর হয়। সুতরাং তা অধিক কষ্টকর হবে এবং অধিক ফযীলতপূর্ণ হবে। এ কারণেই কেউ যদি এক সালাতে চার রাকাআত নামায পড়ার মান্নত করে থাকে তবে দুই সালামে নামায পড়া দ্বারা মান্নত থেকে মুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে বিপরীত ক্ষেত্রে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে।

(তারাবীহ –এর উপর সাধারণ নফলকে কিয়াস করা ঠিক নয়) কেননা তারাবীহ জামাআতের সাথে আদায় করা হয়। সুতরাং তাতে সহজ হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছের অর্থ হলো জোড় রাকাআত আদায় করতেন বেজোড় রাকাআত আদায় করতেন না। আল্লাহই উত্তম জানেন।

পরিচ্ছেদঃ কিরাত সংক্রান্ত

ফরয সালাতের দুই রাকাআতে কিরাআত ওয়াজিব

ইমাম শাফিঈ (র.) সকল রাকাআতে ওয়াজিব বলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- কিরাত ছাড়া সালাত শুদ্ধ নয়। আর প্রতিটি রাকাআতই সালাত। ইমাম মালিক (র.) তিন রাকাআতে কিরাত ফরয বলেন। সহজ করার নিমিত্ত অধিকাংশকে সমগ্রের তুল্য মনে করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- কুরআনের যতটুকু সহজ হয় পাঠ কর। আর কোন কাজের আগে পুনরাবৃত্তির দাবী রাখে না। তবে দ্বিতীয় রাকাআতে আমরা কিরাত ওয়াজিব করেছি প্রথম রাকাআতের সাথে তুলনা করে। কেননা উভয় রাকাআত সকল দিক থেকে সদৃশ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দুই রাকাআতের পার্থক্য রয়েছে প্রথম দুই রাকাআত থেকে। সফর বাইর হওয়ার এবং কিরাতের গুণে (উচ্চৈস্বরে নীরব পড়ার ব্যাপারে) এবং কিরাতের পরিমাণের ব্যাপারে।দ্বিতীয় দুই রাকাআত প্রথম দুই রাকাআতের সাথে মিলিত হবে না।

আর শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছে সালাত শব্দটি সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ণ সালাতের উপর প্রযোজ্য হবে। আর তা সাধারণ ব্যবহারে দুই রাকাআতই হয়। যেমন কেউ কোন সালাত আদায় করবেন বলে শপথ করল (এতে দুই রাকাআত পড়লেই শপথ ভঙ্গ হবে)। পক্ষান্তরে যদি শপথ করে যে, সে 'সালাত' আদায় করবে না (এতে এক রাকাআত পড়লেও সে শপথভঙ্গকারী হবে)।

শেষ দুই রাকাআতে সে তার ইচ্ছার উপর ন্যস্ত। অর্থাত্ ইচ্ছা করলে সে নীরব থাকবে। ইচ্ছা করলে কিরাত পড়বে। আবার ইচ্ছা করলে তাসবীহ পাঠ করবে। আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আলী (রা.) ইবন মাসঊদ ও 'আইশা (রা.) থেকে এ-ই বর্ণিত হয়েছে। তবে কিরাত পড়াই উত্তম। কেননা নবী করিম (সা.) (প্রায় সর্বদাই এরূপ করেছেন) একারণেই জাহিরী রিওয়ায়াত মতে তা তরক করার কারণে সাজদা সাহু ওয়াজিব হয় না।

নকলের সকল রাকাআতে এবং বিতরের সকল রাকাআতে কিরাত ওয়াজিব।

নফলে ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, নফলের প্রতি দুই রাকাআত আলাদা সালাত বিশিষ্ট। এবং তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাড়ানো নতুন তাহরীমা বাধার সমতুল্য। একারণেই আমাদের ইমামদের প্রসিদ্ধ মতে প্রথম তাহরীমা দ্বারা দুই রাকাআতই শুধু ওয়াজিব হয়। তাই ফকীহগণ বলেছেন যে, তৃতীয় রাকাআতে (প্রথম রাকাআতের ন্যায়) ছানা পড়বে। অর্থাত্ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা পড়বে। আর বিতরে ওয়াজিব করা হয়েছে সতর্কতার দৃষ্টিকো্ণে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি নফল শুরু করে তা ভেঙ্গে ফেলে, তবে তা কাযা করবে। আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কাযা ওয়াজিব নয়। কেননা, সে তা স্বেচ্ছায় আরম্ভ করেছে। আর সে স্বেচ্ছায় কিছু করে, তার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না। আমাদের দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু ইবাদতে গণ্য হয়েছে। সুতরাং তা পূর্ন করা অনিবার্য। যেহেতু আমলকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা জরুরী।

যদি চার রাকাআত সালাত শূরু করে এবং প্রথম দুই রাক্আতে কিরাত পড়ে ও বৈঠক করে, এরপর শেষ দুই রাকাআত নষ্ট করে ফেলে তবে দুই রাকাআত কাযা করবে। কেননা, প্রথম দু'রাকাআত পূর্ণ হয়ে গেছে। আর তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাড়ানো নতুনভাবে তাহরীমা করার সমতুল্য। সুতরাং তা সে ওয়াজিব করে নিয়েছে।

এ হুকুম তখনকার জন্য, যখন শেষ দুই রাকাআত শুরু করার পর নষ্ট করে। আর যদি দ্বিতীয় দু'রাকাআত শুরু করার আগেই নষ্ট করে ফেলে তবে শেষ দু'রাকাআত কাযা করবে না।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সালাত শুরু করাকে মান্নতের উপর কিয়াস করে চার রাকাআত কাযা করবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, আরম্ভ অবশ্য পালনীয় করে ঐ অংশকে, যা আরম্ভ করা হয়েছে এবং যে অংশ ছাড়া ঐ কর্ম শূদ্ধ হয় না। আর প্রথম দুই রাকাআতের শুদ্ধতা দ্বিতীয় অংশের সাথে সম্পৃক্ত নয়। দ্বিতীয় রাকাআতের বিষয়টি এর বিপরীত। যুহরের সুন্নত সম্পর্কেও একই মতভিন্নতা। কেননা, মূলতঃ এটা নফল কোন কোন মতে সতর্কতা হিসাবে চার রাকাআতই কাযা করবে। কেননা তা সম্পূর্ণ একই সালাত হিসাবে গণ্য।

আর যদি কেউ চার রাকাআত (নফল সালাত) আদায় করলেন আর তাতে কোন কিরাত পড়ল না, তবে সে দুই রাকাআতই দোহরাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.)এর মতে চার রাকাআত কাযা করবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এ মাসআলা আট প্রকারের। মাসাআলার মূল কথা এই যে, মুহাম্মদ (র.) এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিংবা দুই রাকাআতের যে কোন একটিতে কিরাআত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয়। কেননা তাহরীমা বাধা হয় কর্ম সম্পাদনের জন্য।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিরাতে তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে না, বরং সালাত আদায় হওয়াকে ফাসিদ করে। কেননা কিরাত হলো সালাতের অতিরিক্ত রুকন। দেখূন না কিরাত ছাড়াও সালাতের অস্তিত্ব হয়ে যায়। যেমন (বোবা মানুষের) তবে কিরাতে ছাড়া সালাত আদায় বিশুদ্ধ নয়। আ আদায় ফাসিদ হওয়া রুকন তরক করার চেয়ে গুরুতর নয়। সুতরাং তাহরীমা বাতিল হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত তরক করা তাহরীমাকে বাতিল করে দেয় কিন্তু দুই রাকাআতের শুধু এক রাকাআতে তরক করা বাতিল করে না। কেননা প্রতি দুই রাকাআত স্বতন্ত্র নামায। আর এক রাকাআতে কিরাত তরফ করার কারণে নামায নষ্ট হওয়া বিতর্কিত বিষয়। তাই সতর্কতা অবলম্বনে আমরা কাযা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে নামায নষ্ট হওয়ার রায় দিয়েছি। আর দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে তাহরীমা অব্যাহত থাকার রায় দিয়েছি।

এই মূলনীতি সাব্যস্ত হওয়ার পর আমাদের বক্তব্য হলো; কোন রাকাআতেই যকি কিরাত না পড়ে থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে দুই রাকাআত কাযা করবে। কেননা প্রথম রাকাআতদ্বয়ে কিরাত তরক করার কারণে তাদের মতে তাহরীমা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় শুরূ করা শূদ্ধ হয়নি। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তাহরীমা অব্যাহত আছে। সুতরাং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয় শুরু করা শূদ্ধ হয়েছে। অতঃপর যেহেতু কিরাত তরফ করার কারণে পুরা নামায ফাসিদ হয়ে গেছে, সেহেতু তার মতে চার রাকাআতই কাযা করতে হবে।

যদি শূধু প্রথম দুই রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শেষ দুই রাকাআত কাযা করবে। কেননা তাহরীমা বাতিল হয়নি। সুতরাং দ্বিতীয়

http://islaminonesite.wordpress.com/

রাকাআতদ্বয় শুরু করা শূদ্ধ হয়েছে। অতঃপর কিরাত তরক করার কারণে তা ফাসিদ হওয়া প্রথম রাকাআদ্বয়ের ফাসিদ হওয়াকে সাব্যস্ত করে না।

যদি শুধু শেষ দুই রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দুই রাকাআত কাযা করা ওয়াজিব হবে। কেননা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে দ্বিতীয় অংশ করা শুদ্ধ হয়নি।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে শুরু যেহেতু শূদ্ধ হয়েছে, তেমনি তা আদায়ও হয়েছে।

যদি প্রথম দুই রাকাআত এবং দ্বিতীয় রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে শেষ দুই রাকাআত তাকে কাযা করতে হবে। আর যদি শেষ দুই রাকাআতে এবং রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম দুই রাকাআত কাযা করতে হবে। আর যদি উভয় অংশের এক রাকাআত কাযা করবে। আবূ হানীফা (র.)এর মতও তাই। কেননা তাহরীমা অব্যাহত রয়েছে। মুহাম্মদ (র.) এর মতে প্রথম দুই রাকাআত কাযা করতে হবে। কেননা (প্রথম রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত তরফ করার কারণে) তার মতে তাহরীমা রহিত হয়ে অস্বীকার করেছেন। (ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে সম্বোধন করে) তিনি বলেছেন, আমি তোমাকে আবূ হানীফা (র.) এর পক্ষ হতে এ বর্ণনা শূনিয়েছি যে, তাকে দুই রাকাআত কাযা করতে হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পক্ষ হতে তার এ বর্ণনা প্রত্যাহার করেন নি।

যদি শুধু প্রথম রাকাআতদ্বয়ের এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে বড় ইমামদ্বয়ের মতে চার রাক্আত কাযা করবে। আর মুহাম্মদ (র.) এর মতে দুই রাকাআত কাযা করবে। আর দ্বিতীয় এক রাকাআতে কিরাত পড়ে তাহলে আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে চার রাকাআত কাযা পড়বে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)এর মতে দুই রাকাআত কাযা করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীছ কোন সালাতের পর অনুরূপ সালাত পড়বে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এর অর্থ হলো, দুই রাক্আত কিরাতসহ পড়া এবং দুই রাকাআত কিরাত ছাড়া পড়া। সুতরাং এ হাদীছ দ্বারা নফলের সকল রাকাআতে কিরাত ফরয হওয়া বয়ান করা উদ্দেশ্য।

দাড়ানোর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বসে নফল পড়তে পারে। কেননা রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

বসা অবস্থায় নামাযের সাওয়াব দাড়ানো অবস্থার নামাযের অর্ধেক।

তাছাড়া নামায হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদত, যা সর্বসময়ে আদায়যোগ্য। অথচ মাঝেমধ্যে দাড়ানো তার জন্য কষ্টকর হতে পারে। তাই কিয়াম তরক করা তার জন্য জাইয হবে যাতে নামায পড়া থেকে (শূধূ এই কারণে) বিরত না হয়।

বসার ধরন সম্পর্কে আলিমগণ মতভিন্নতা পোষণ করেন। তবে পসন্দনীয় (ও ফাতওয়া রূপে গৃহীত) মত এই যে, তাশাহুদে যেভাবে বসা হয় সেভাবে বসবে। কেননা এটা নামাযে বসার সুন্নত তরীকা রূপে পরিচিত।

যদি দাড়ানো অবস্থায় সালাত শূরু করে তারপর ওযর ছাড়া বসে পড়ে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে জাইয হবে।

এটা হলো সূক্ষ কিয়াস। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে জাইয হবে না। এটা হলো সাধারণ কিয়াস। কেননা আরম্ভ করা মান্নতের সাথে তুলনীয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর যুক্তি এই যে, অবশিষ্ট নামাযে তো সে কিয়াম গ্রহণ করেনি। আর নামাযের যতটুকু অংশ সে আদায় করেছে কিয়াম ছাড়াই তার বিশুদ্ধতা রয়েছে। নযর বা মান্নতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা স্পষ্ট ভাষায় এই বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। এমন কি যদি কিয়ামের বিষয়টি স্পষ্ট না বলে থাকে তবে কোন কোন মাশায়েখের মতে তার জন্য কিয়াস জরুরী হবে না।

যে ব্যক্তি শহরের বাইরে রয়েছে সে তার সাওয়ারির জন্তুর ইশারা করে নফল পড়তে পারে, সওয়ারি যে দিকেই অভিমুখী হোক। কেননা বর্ণিত আছে যে, ইবন উমর (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আমি খায়বার অভিমুখী গাধার পিঠে ইশারা করে নামায পড়তে দেখেছি (মুসলিম)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাছাড়া নফল বিশেষ কোন ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমতাবস্থায় যদি আমরা সওয়ারি হতে নামা এবং কিবলামুখী হওয়া তার জন্য বাধ্যতামুলক করে দেই তবে হয় সে নফল ছেড়ে দেবে অথবা কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে ফরয নামাযগুলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। নিয়মিত সুন্নত নামাযগুলো নফলের অন্তর্ভূক্ত। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণিত এক রিওয়ায়াত মতে ফজরের সুন্নাতের জন্য সওয়ারি হতে নামতে হবে। কেননা এটা অন্যান্য সুন্নতের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শহরে বাইরে হওয়ার শর্ত দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে নিয়মিত সফর হওয়া শর্ত নহে। তদ্রুপ শহরের ভিতরে এরুপ আদায় করা জাইয হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত এক মতে শহরেও জাইয আছে। জাহিরী রিওয়ায়াতের কারণ এই যে, হাদীছ শহরের বাইরে সম্পর্কেই রয়েছে। আর সওয়ারির প্রয়োজনীয়তা শহরের বাইরেই বেশী।

যদি নফল নামায সওয়ার অবস্থায় শূরু করে এরপর সওয়ারি থেকে নেমে যায় তাহলে 'বিনা' করবে। আর যদি নামা অবস্থায় এক রাকাআত পড়ে তারপর আরোহণ করে তবে নতুন ভাবে শূরু করবে। কেননা নামতে সক্ষম হওয়ার কারণে আরোহীর তাহরীমা সংগঠিত হয়েছে, রুকু-সাজদার বৈধতা সহকারে। সুতরাং যখন সে নেমে রুকু-সাজদা করবে তখন তা জাইয হবে। পক্ষান্তরে অবতরণকারীর তাহরীমা রুকু সাজদা ওয়াজিবকারী রূপে সংগঠিত হয়েছে। সুতরাং যা তার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে গিয়েছে, তা সে বিনা ওযরে তরক করতে পারে না।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে একটি বর্ণনা আছে যে, সওয়ারি হতে নামলেও নতুন করে শুরু করবে। তদ্রুপ মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, এক রাকাআত পড়ার পর অবতরণ করলে নতুন করে শূরু করবে। তবে উপরোক্ত জাহিরী রিওয়ায়াতই হলো অধিকতর বিশুদ্ধ।

পরিচ্ছেদঃ কিয়ামে রমাযান

http://islaminonesite.wordpress.com/

মুসতাহাব এই যে, মানুষ রমাযান মাসে ‘ঈশার পরে একত্র হবে এবং ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে পাচ তারাবীহা (অর্থাত্ চার চার রাকাআতী সালাত) পড়বেন। প্রতিটি তারাবীহা (চার রাকাআত) দুই সালামে হবে। এবং প্রতিটি তারবীহার পরে এক তারাবীহা পরিমাণ সময় বসবে। এরপর ইমাম সাহেব তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়বেন।

(ইমাম কুদূরী) মুসতাহাব শব্দটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকতর বিশুদ্ধ মত এই যে, তা সুন্নত। হাসান ইবন যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে তাই বর্ণনা করেছেন। কেননা উমর (রা.), উছমান (রা.) ও ‘আলী (রা.) এই তিন} খূলাফায়ে বাশিদীন তা নিয়মিত আদায় করেছেন। আর নবী (সা.) নিজে নিয়মিত আদায় বর্জন করার কারণ বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো আমাদের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা।

তারাবীতে জামা’আতে করা সুন্নাত। তবে তা সুন্নত (মুয়াক্কাদা) কিফায়া। সুতরাং কোন মসজিদের মুসল্লীরা যদি তারাবীর জামাআতি কায়েম করা হতে বিরত থাকে তবে সকলেই গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে যদি একাংশ তা কায়েম করে তবে অন্যরা শুধু জামাআতের ফযীলত তরককারী হবে। কেননা কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা.) হতে তারাবীর জামাআতে হাযির না হওয়া বর্ণিত আছে।

দুই তারাবীহার মধ্যে এক তারাবীহা পরিমাণ সময় বসা মুসতাহাব। তদ্রূপ পঞ্চম তারাবীহা ও বিতরের মাঝেও (ঐ পরিমাণ বসা মুসতাহাব)। কেননা হারমায়নের অধিবাসীদের মধ্যে এরূপ চলে আসছে। আবার কেউ কেউ পাচ সালামের পর বিশ্রাম নেয়া উত্তম বলেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) এর বক্তব্য ‘ এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়বেন’ এদিকে ইংগিত করে যে, তারাবীর সময় হলো ‘ঈশার নামাযের পর বিতরের আগে। সাধারণ মাশায়েখগণ এ মতই পোষণ করেন। এটা বিতরের পূর্বেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, কেননা তারাবীহ হলো নফল বিশেষ, যা ‘ঈশার পরে আদায় করার জন্য সুন্নত হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) কিরাতের পরিমাণ উল্লেখ করেন নি। তবে অধিকাংশ মাশায়েখের মতে সুন্নত হলো তারাবীর সালাতে একবার কুরআন খতম করা। সুতরাং মুসল্লীদের অলসতার কারণে তা বাদ দেওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে তাশাহুদের পরে দু'আগুলো বাদ দেয়া যেতে পারে। কেননা এগুলো সুন্নত নয়।

রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময় জামা'আতের সাথে বিতর পড়বে না। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। আল্লাহই উত্তম জানেন।

দশম অনুচ্ছেদ

জামা'আত পাওয়া

যে ব্যক্তি যুহরের এক রাকাআত পড়ার পর ইকামাত হলো সে আরেক রাকাআত পড়ে নেবে। আদায়কৃত অংশকে বাতিল হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

এরপর লোকদের সাথে (জামাআতে) শামিল হবে। জামাআতের ফযীলত হাসিল করার জন্য।

যদি প্রথম রাকাআতের সাজদা না দিয়ে থাকে তবে সালাত ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে শূরু করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা সে ছেড়ে দেয়ার স্থান রয়েছে। আর আমল ভংগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণাংগ রূপে আদায় করা। নফলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্নরূপ। কেননা তা ভংগ করা পূর্ণাংগ রূপে আদায় করার জন্য নয়।

যদি যুহর বা জুমুআ পূর্ববর্তী সুন্নত নামাযে রত থাকে আর এমন সময় ইকামত বা খুতবা শূরু হয়, তাহলে (জামাআতের ফযীলত হাছিল করার জন্য) দুই রাকাআতের মাথায় নামায শেষ করে দেবে। এটা ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) হতে বর্ণিত। কোন কোন চার রাকাআত পূর্ণ করবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি যুহরের তিন রাকাআত পড়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করবে। কেননা অধিকাংশের প্রতি সকলের হুকুম আরোপিত হয়। সুতরাং তা ভংগ করার অবকাশ রাখে না। পক্ষান্তরে যদি সে তৃতীয় রাকাআতে রত থাকে এবং এখনও এর সাথে সাজদা মিলিত করে নেই, তবে এক্ষেত্রে তা ভংগ করে ফেলবে। কেননা সে ভংগ করার অবস্থানে আছে।

এমতাবস্থায় তার অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে ফিরে এসে বসবে এবং সালাম ফিরাবে আর ইচ্ছা করলে দাড়ানো অবস্থায় ইমামের সালাতে শরীক হওয়ার নিয়্যতে তাকবীর বলবে। আর যখন যুহরের নামায পূর্ণ করে ফেলবে তখন জামাআতে শামিল হয়ে যাবে।

আর জামাআতের সাথে যা পড়বে তা নফল হবে। কেননা নামাযের ওয়াক্ত ফরযের পুনরাবৃত্তি হয় না।

যদি ফজরের এক রাকাআত পড়ার পর ইকামাত হয় তবে তা ভংগ করে জামা্আতে শামিল হয়ে যাবে। কেননা যদি তার সাথে আরেক রাকাআত যুক্ত করে, তবে তার জামাআত ফউত হয়ে যাবে। তেমনি যদি দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাড়িয়ে যায় তবে তার সাথে সাজদা মিলানোর পূর্ব পর্যন্ত এই হুকুম হবে। আর (ফজরের) নামায পূর্ণ করার পর ইমামের নামাযে মাগরিবের পরও একই হুকুম, কেননা তিন রাকাআত নফল পড়া মাকরূহ। জাহিরে বিওয়ায়াত অনুযায়ী চার রাকাআতে রূপান্তরিত করলে ইমামের বিরোধিতা হয়।

‘আযান হয়ে গেছে’ এমন সময় মসজিদে যে ব্যক্তি প্রবেশ করল, তার জন্য সালাত না পড়ে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

আযান হয়ে যাওয়ার পর মসজিদ থেকে ঐ ব্যক্তি ছাড়া কেউ বের হয় না, যে মুনাফিক কিংবা ঐ ব্যক্তি, যে ফিরে আসার ইচ্ছা নিয়ে মসজিদ থেকে বের হল।

ইমাম কুদূরী বলেন, তবে যদি তার উপর কোন জামা’আতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে। কেননা এটা বাহ্যতঃ বর্জন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা পূর্ণাংগতা দানের শামিল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যুহর ও ‘ঈশার ক্ষেত্রে যদি কেউ নামায পড়ে ফেলে থাকে তবে (আযানের পরও মসজিদ থেকে) বের হওয়াতে দোষ নেই। কেননা আল্লাহর আহবানকারীর বিরোধিতার কারণে।

আর আসর, মাগরিব ও ফজরের সময় মুআযযিম ইকামাত শূরু করে দিলেও বের হয়ে যাবে। কেননা এ সকল সালাতের পরে নফল মাকরূহ।

যে ব্যক্তি ফজরের নামাযে এমন সময় পৌছল যে, ইমাম সালাত শুরু করেছেন, কিন্তু সে ফজরের দু’রাকাআত সুন্নত পড়েনি। এমতাবস্থায় যদি তার আশংকা হয় যে এক রাকাআত ফউত হয়ে যাবে এবং এক রাকাআত পাবে, তাহলে মসজিদের দরজার সামনে ফজরের দু’রাকাআত সুন্নত পড়ে নেবে, তারপর ইমামের সাথে শরীক হবে। কেননা এভাবে তার জন্য সুন্নত ও জামা’আতের উভয় ফযীলত হাসিল করা সম্ভব।

যদি দ্বিতীয় রাকাআতও ফউত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে। কেননা জামাআতের সাওয়াব অতিবেশী এবং জামা’আত তরকের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

যুহরের সুন্নতের হুকুম হল ভিন্ন। অর্থাত্ উভয় অবস্থায়ই তা ছেড়ে দিবে। কেননা ওয়াক্তের ভিতরে ফরযের পরে তা আদায় করা সম্ভব। এটাই বিশূদ্ধ মত। অবশ্য আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এরা মাঝে মতপার্থক্য শূধূ এই যে, উক্ত চার রাকাআতে সুন্নতকে দুই রাকাআতের আগে পড়বে, না পরে পড়বে। কিন্তু ফজরের সুন্নতের বেলায় এ সুযোগ নেই। ইনশাল্লাহ্ পরবর্তীতে তা আলোচনা করা হবে।

মসজিদের দরজার সামনে আদায় করার শর্তারোপ দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমাম নামাযরত থাকা অবস্থায় মসজিদের ভিতরে (সুন্নত আদায় করা) মাকরূহ।

সাধারণ সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে আদায় করাই উত্তম। এটাই নবী (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

যদি ফজরের দুই রাকাআত ফউত হয়ে যায়, তবে সূর্যোদয়ের পূর্বে তা কাযা করবে না। কেননা তা কেবল নফল হয়ে যায়। আর ফজরের পর নফল পড়া মাকরূহ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার পরেও তা আদায় করবেনা। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার কাছে পসন্দনীয় হলো সূর্য হেলে পড়া পর্যন্ত তা কাযা করে নিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শেষ রাত্রে যাত্রা বিরতির' ঘটনায় পরবর্তী সকালে সূর্য উপরে উঠার পরে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নত কাযা করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ ইমামদ্বয়ের দলীল এই যে, সুন্নতের ক্ষেত্রে কাযা না করাই হলো আসল হুকুম। কেননা কাযার বিষয়টি ওয়াজিব এর সাথে সম্পৃক্ত। আর হাদীছের ঘটনায় এ দু'রাকাআত কাযা করার কথা এসেছে ফরযের অনুসরণে। সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে হুকুম মূলনীতি হিসাবে বহাল থাকবে। ফরয জামা'আতের সাথে আদায় করা হোক কিংবা একা, সুন্নতকে ফরযের অনুসরণে কাযা করা হবে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। আর সূর্য ঢলে যাওয়ার পর কাযা করা সম্পর্কে মাশায়েখগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ফজর ছাড়া অন্য সকল সুন্নত ওয়াক্তের পরে এককভাবে করা হবে না। আর ফরযের অনুসরণে কাযা করা হবে কিনা, সে সম্পর্কে মাশায়েখগণের মতভেদ রয়েছে।

যে ব্যক্তি যুহরের সালাতো এক রাকাআতে পেল তিন রাকাআত পায়নি, সে যুহরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেনি। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে জামা'আতের ফযীলত সে লাভ করবে। কেননা কোন কিছুর শেষাংশ যে পায়, সে যেন ঐ বস্তুটি পেয়ে গেছে। সুতরাং সে জামা'আতের সাওয়াব অর্জনকারী হবে। তবে প্রকৃতপক্ষে সে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করেনি। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে জামা'আতের ফযীলত সে লাভ করবে। কেননা কোন কিছুর শেষাংশ যে পায়, সে যেন ঐ বস্তুটি পেয়ে গেছে। সুতরাং সে জামা'আতের সাওয়াব অর্জনকারী হবে। প্রকৃতপক্ষে সে জামা'আতের সাথে আদায় করেনি। একারণেই যদি কেউ কসম খায় যে, সে কখনো

জামা'আত ধরবে না, তবে শেষ রাকাআতে জামা'আতে শরীক হওয়া দ্বারা সে কসমভংগকারী হবে। কিন্তু যুহরের সালাত জামা'আতের সাথে পড়বে না, এই কসম করলে সে কসমভংগকারী হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি জামা'আতে হয়ে গেছে এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হলো, সে ফরয আদায় করার পূর্বে ওয়াক্তের ভিতরে যতক্ষণ ইচ্ছা নফল পড়তে পারে।

ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্য হল ঐ ক্ষেত্রে, যখন সময়ের মধ্যে অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়লে নফল ও সুন্নাত পড়া ছেড়ে দিবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন (নফল ছেড়ে দেয়ার) এ হুকুম হলো যুহর ও ফজরের সুন্নত ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে। কেননা এ দু'টি সুন্নতের অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। সুন্নত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- 'অশদ্বল' তোমাকে তাড়া করলেও তোমরা তা পড়ো। অপর সুন্নতটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন- যুহরের পূর্ববর্তী চার রাকাআত যে ছেড়ে দেবে, সে আমার শাফাআত লাভ করবে না।

আর কেউ কেউ বলেছেন এটা সকল সুন্নতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জামা'আতের সাথে ফরয আদায় করার সময় নির্ধারিত সুন্নতগুলো নিয়মিত আদায় করেছেন। আরে 'নিয়মিত' ছাড়া সুন্নত হওয়া সাব্যস্ত হয় না। তবে সর্বাবস্থাতেই তা তরক না করাই উত্তম। কেননা সুন্নতগুলো হচ্ছে ফরযসমূহের সম্পূরক। তবে ওয়াক্ত ফউত হওয়ার আশংকা থাকলে ছেড়ে দেবে।

কেউ যদি এসে ইমামকে রুকুতে পায় তবে তাকবীর বলে দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় ইমাম মাথা তুলে ফেললেন, তাহলে সে ঐ রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে না।

এ বিষয়ে ইমাম যুফার (র.) এর মত ভিন্ন রয়েছে। তিনি বলেন ইমামকে সে এমন অবস্থায় পেয়েছে, যা কিয়ামের হুকুমভূক্ত।

আমাদের দলীল এই যে, নামাযের কার্যসমূহ (ইমামের সাথে) অংশ গ্রহণ করা হলো শর্ত। আর তা এখানে পাওয়া যায়নি, কিয়ামের অবস্থায়ও না এবং রুকুর অবস্থায়ও না।

মুক্তাদী যদি ইমামের আগে রুকুতে চলে যায় আর ইমাম তাকে রুকুতে গিয়ে পান, তবে সালাত জাইয হয়ে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম যুফার (র.) বলেন, এটা তার জন্য জাইয হবে না। কেননা ইমামের আগে যা সে করেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এর উপর যা বিনা করা হয়েছে, তাও শুদ্ধ হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, শর্ত হলো কোন এক অংশে (ইমামের সাথে) শরীক হয়ে যাওয়া। যেমন প্রথমাংশে (শরীক হলে তা গণ্য হয়)। আল্লাহই উত্তম জানেন।

একাদশ অনুচ্ছেদ

কাযা সালাত

কারো যদি কোন নামায কাযা হয়ে যায়, তবে যখনই স্মরণ হবে তখন তা পড়ে নেবে এবং ওয়াক্তিয়া নামাযের উপর তাকে অগ্রবর্তী করবে।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, ওয়াক্তিয়া ফরয় নামায ও কাযা নামাযসমূহের মাঝে তারবীত বা ক্রমে রক্ষা করা আমাদের ওয়াজিব। আর ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে তা মুসতাহাব। কেননা প্রতিটি ফরয নামায নিজস্ব ভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং অন্য ফরযের জন্য তা শর্ত হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী-

যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে যায় অথবা নামাযের কথা ভুলে যায় আর তা ইমামের সাথে নামাযে শরীক হওয়ার পরই শুধু মনে পড়ে, সে যেন নামায আরম্ভ করেছে তা পড়ে নেয়। এরপর যে নামাযের কথা মনে পড়েছে, তা পড়ে নেবে এরপর ইমামের সাথে যে নামায আদায় করেছে, তা পুনরায় পড়ে নেবে।

যদি ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে ওয়াক্তিয়া নামায আগে পড়ে নেবে এরপর কাযা নামায আদায় করবে। কেননা সময় সংকীর্ণতার কারণে, তেমনি

http://islaminonesite.wordpress.com/

ভুলে যাওয়ার কারণে এবং কাযা নামায বেশী হওয়ার কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়, যাতে ওয়াক্তিয়া নামায ফউত হয়ে যাওয়ার উপক্রম না হয়ে পড়ে।

যদি কাযা নামাযকে আগে পড়ে নেয় তবে তা দুরস্ত হবে। কেননা তা আগে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে অন্যের কারণে। (কাযা নামাযের নিজস্ব কোন কারণে নয়) পক্ষান্তরে যদি সময়ের মধ্যে প্রশস্ততা থাকে এবং ওয়াক্তিয়া নামাযকে অগ্রবর্তী করে তবে তা জাইয হবে না। কেননা হাদীছ দ্বারা উক্ত নামাযের জন্য যে ওয়াক্ত সাব্যস্ত হয়েছে, তার পূর্বে সে তা আদায় করেছে।

যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায ফউত হয় তবে মুলতঃ নামায যে তারতীবে ওয়াজিব ছিল, কাযা নামাযও সে তারতীবে আদায় করবে। কেননা খন্দকের যুদ্ধে নবী (সা.) এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছিলো, তখন তিনি সেগুলো তারতীবের সাথে কাযা করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন- আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছো, সেভাবে তোমারও সালাত পড়ো।

তবে যদি কাযা সালাত হয় ছয় ওয়াক্তের বেশী হয়ে যায়। কেননা কাযা সালাত বেশী পরিমাণে হয়ে গেছে; সুতরাং কাযা সালাতগুলোর মাঝেও তারতীব রহিত হয়ে যাবে, যেমন কাযা সালাত ও ওয়াক্তিয়া সালাতের মাঝে রহিত হয়ে যায়।

আধিক্যের পরিমাণ হলো কাযা নামায ছয় ওয়াক্ত হয়ে যাওয়া। অর্থাত্‍ ষষ্ঠ নামাযের ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়া। জামেউস সাগীব কিতাবের নিম্নোক্ত ইবারতের অর্থ এটাই।

যদি একদিন একরাত্রের অধিক নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে যে ওয়াক্তের নামায প্রথমে কাযা করে তা জাইয হবে। কেননা একদিন একরাত্রের অধিক হলে নামাযের সংখ্যা ছয় হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি ষষ্ঠ ওয়াক্ত দাখিল হওয়ার বিষয় বিবেচনা করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা পুনঃ আরোপিত হওয়ার সীমায় উপনীত হওয়া দ্বারা আধিক্য সাব্যস্ত হয়। আর তা প্রথমোক্ত সুরতে রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি পূর্বের ও সাম্প্রতিক কাযা সালাত একত্র হয়ে যায়, তবে কোন কোন মতে সাম্প্রতিক কাযা সালাত স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্তিয়া সালাত আদায় করা জাইয হবে। কেননা কাযা সালাত অধিক হয়ে গেছে।

কোন কোন মতে জাইয হবে না এবং বিগত কাযা নামাযগুলোকে 'যেন তা নেই' ধরে নেয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে সে এ ধরনের অলসতা থেকে সতর্ক হয়।

যদি কিছু কাযা সালাত আদায় করে ফেলে এবং অল্প পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, তবে কোন কোন ইমামের মতে 'তারতীব' পুনঃ আরোপিত হবে।

এই মতই অধিক প্রবল। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ একদিন ও এক রাত্রের নামায তরক করে আর পরবর্তী দিন প্রতি ওয়াক্তিয়া সালাতের সাথে এক ওয়াক্তের কাযা সালাত আদায় করতে থাকে, তবে কাযা সালাতগুলো সর্বাবস্থায় জাইয হবে। পক্ষান্তরে ওয়াক্তিয়া সালাত যদি (কাযা সালাতের) আগে আদায় করে, তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, কাযা নামাযগুলো অল্প এর গণ্ডিতে এসে গেছে। আর যদি ওয়াক্তিয়াকে (কাযা নামাযের) পরে আদায় করে, তবে একই হুকুম হবে। কিন্তু পরবর্তী 'ঈশার নামাযের হুকুম ভিন্ন (অর্থাত্ আদায় হয়ে যাবে)। কেননা তার ধারণা মতে তো 'ঈশার সালাত আদায় করার সময় তার যিম্মায় কোন কাযা সালাত নেই।

যুহর আদায় করেনি, একথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কেউ যদি আসরের সালাত পড়ে, তবে তা ফাসিদ হবে। কিন্তু একেবারে শেষ ওয়াক্ত স্মরণ থাকা অবস্থায় পড়ে থাকলে ফাসিদ হবে না। এটা তারতীব সংক্রান্ত মাসআলা।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে (উক্ত আসরের নামাযের) ফরযগুণ নষ্ট হয়ে গেলেও মূল নামায বাতিল হবে না)। বরং নফল রূপে গণ্য হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে মূল নামাযও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা 'ফরযিয়াতের' জন্যই তাহরীমা বাধা হয়েছিল। সুতরাং ফরযিয়াত যখন বাতিল হয়ে গেল, তখন মূল তাহরীমাও বাতিল হয়ে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর দলীল এই যে, তাহরীমা বাধা হয়েছে মূলতঃ সালাতের জন্য ফারযিয়াতের গুণ সহকারে, সুতরাং ফরযিয়াতের গুণ বিনষ্ট হওয়ার কারণে মূল সালাত বিনষ্ট হওয়া জরুরী নয়।

তবে আসর ফাসিদ হবে স্থগিতাবস্থায়, অতএব যদি যুহরের কাযা আদায় না করে ধারাবাহিক ছয় ওয়াক্ত নামায পড়ে ফেলে তবে সব ক'টি ওয়াক্তের নামাযই জাইয রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে চূড়ান্ত ভাবেই তা ফাসিদ হয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই তা পুনঃবৈধতা পাবে না। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

'বিতর পড়েনি' একথা স্মরণে থাকা অবস্থায় কেউ যদি ফজরের নামায আদায় করে, তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে।

এটা আবূ হানীফা (র.) এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

এ মতভিন্নতার ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে বিতর হল ওয়াজিব। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে তা সুন্নত। আর সুন্নত ও ফরয নামাযসমূহের মাঝে তারতীব জরুরী নয়।

বিতরের ব্যাপারে এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতেই (এ মাসআলা রয়েছে)। কেউ যদি 'ঈশার নামায পড়ার পর পুনরায় উযূ করে সুন্নত ও বিতর আদায় করেন।

অতঃপর প্রকাশ পেল যে, 'ঈশার সালাত সে বিনা উযূতে পড়েছে, তবে আবূ হানীফা (র.) এর মতে শূধু 'ঈশা ও সুন্নত পুনঃআদায় করবে, বিতর নয়। কেননা তার মতে বিতর স্বতন্ত্র ফরয আর সাহেবাইনের মতে বিতরও পুনঃ আদায় করতে হবে। কেননা তা 'ঈশা' এর অনুবর্তী। আল্লাহই উত্তম জানেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

সাজদায়ে সাহও

(নামাযে) কম বা বেশী করার কারণে (শেষ বৈঠকে) সালামের পর দু'টি সাজদায়ে সাহও করবে। অতঃপর তাশাহুদ পাঠ করবে এবং সালাম ফিরাবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে সালামের আগে সাজদা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এর আগেই সাজদা সাহও করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) এর এ উক্তি-

প্রতিটি সাহও (বা ভুল) এর জন্য সালামের পর দু'টি সিজদা (আবূ দাউদ)।

আরো বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এর পর দুটি সাজদা সাহও করেছেন (মুসলিম ও অন্যান্য)।

এখানে তার আমল সংক্রান্ত বর্ণনা দু'টি পরস্পর বিপরীত রয়েছে। সুতরাং প্রমাণ রূপে তার বাণী গ্রহণ করা অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে।

আর একারণেও যে, সাজদায়ে সাহও এক সালাতে বারংবার হয় না। সুতরাং তাকে সালাম থেকে বিলম্বিত করতে হবে, যাতে সালামের ব্যাপারে ভুল হলে সাজদায়ে সাহও দ্বারা তা পূরণ হতে পারে।

(ইমাম শাফিঈ (র.) ও আমাদের মাঝে) এই মতভিন্নতা কেবল কোনটি উত্তম এ ব্যাপারে (বৈধতার প্রশ্নে নয়)।

(সাজাদায়ে সাহও এর) উল্লেখিত সালামকে (নামাযের) পরিচালিত সালামের সদৃশ হিসাবে দুই সালাম সহ সাজাদা করবে। এটাই বিশূদ্ধ মত।

নবী (সা.) এর উপর দুরূদ এবং দু'আ 'সাজদায়ে সাহও' পরবর্তী বৈঠকে পড়বে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা নামাযের শেষাংশই হল দু'আর প্রকৃত স্থান।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সালাতের মধ্যে যদি এমন কোন কাজ অতিরিক্ত করে ফেলে, যা সালাত জাতীয় কিন্তু সালাতভূক্ত নয়, তবে সে ক্ষেত্রে সাজদায়ে সাহও আবশ্যক হবে।

আবশ্যক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাজদায়ে সাহও ওয়াজিব, এটাই বিশূদ্ধ মত। কেননা সাজদায়ে সাহও ওয়াজিব হয় ইবাদতে সৃষ্ট কোন ত্রুটি পূরণ করার জন্য। সুতরাং সেটা ওয়াজিব হবে। যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে দম দেওয়া ওয়াজিব। যখন এটা ওয়াজিব সাব্যস্ত হল, তখন ভুলে কোন ওয়াজিব তরক করা কিংবা বিলম্বিত করা কিংবা কোন রুকন বিলম্বিত করার কারণেই শূধু সাজদায়ে সাহও ওয়াজিব। সাজদায়ে সাহও ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, তা কোন রুকন বিলম্বিত হওয়া বা কোন ওয়াজিব তরক হ্ওয়া থেকে মুক্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যদি কোন 'মাসনুন' আমল তরক করে তবে সাজদা সাহও ওয়াজিব হবে।

সম্ভবতঃ 'মাসনূন' দ্বারা ওয়াজিব আমল বুঝানো হয়েছে। তবে 'মাসনূন' বলার কারণ এই যে, তা ওয়াজিব হওয়া 'সুন্নাহ্' বা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

ইমাম কুদূরী বলেন, অথবা যদি সূরাতুল ফাতিহা পড়া তরফ করে। কেননা তা ওয়াজিব।

অথবা কূনুত, তাশাহ্হুদ বা দুই ঈদের তাকবীরসমূহ যদি তরক করে। কেননা এই গুলো ওয়াজিব। এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একবারও তরক না করে এগুলো অব্যাহত ভাবে পালন করেছেন। আর এটা ওয়াজিব হওয়ার আলামত।

তাছাড়া এ সমস্ত আমলকে পুরা নামাযের সাথে সম্বন্ধ করা হয়। আর এ সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে, এগুলো নামাযের সাথে বিশিষ্ট আর বিশিষ্টতা সাব্যস্ত হয় ওয়াজিব হওয়ার মাধ্যমে।

তাশাহ্হুদ শব্দের উল্লেখ দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠও উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা এ সবই ওয়াজিব এবং তাতে সাজদায়ে সাহ্ও আবশ্যক। এটাই বিশূদ্ধ মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর চুপেচুপে কিরাতের ক্ষেত্রে ইমামের যদি উচ্চৈস্বরে কিরাত পড়েন, অথবা উচ্চৈস্বরে কিরাতের ক্ষেত্রে যদি চুপেচুপে পড়েন, তবে এ অবস্থায় সাজদায়ে সাহ্ও ওয়াজিব হবে।

উচ্চৈস্বরের কিরাতের স্থানে উচ্চৈস্বরে কিরাত পড়া এবং চুপেচুপে কিরাত স্থানে চুপে চুপে পড়া ওয়াজিবসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। বিশূদ্ধতম মত এই যে, যে পরিমাণ কিরাত দ্বারা সালাত শূদ্ধ হয়, উভয় ক্ষেত্রে সে পরিমাণই বিবেচ্য। কেননা সামান্য পরিমাণ উচ্চৈস্বরে বা চুপেচুপে পাঠ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু অধিক পরিমাণ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। সেটা হল এক আয়াত আর সাহেবাইনের মতে তিন আয়াত। এটা হল ইমামের ক্ষেত্রে। একা নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা উচ্চৈস্বরে কিরাত পাঠ ও চুপেচুপে কিরাত পাঠ জামাআতে নামাযের বৈশিষ্ট্য।

ইমাম কুদূরী বলেন, ইমামের ভূল মুক্তাদীর উপর সাজদা ওয়াজিব করে। কেননা যার উপর নামাযের নির্ভর (ইমাম) তার উপর সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এ জন্যই মুক্তাদীর উপর মুকীম হওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হয়ে যায় ইমামেরে নিয়্যতের কারণে।

আর ইমাম যদি সাজদা না করে তবে মুক্তাদিও সাজদা করবে না। কেননা এমতাবস্থায় সে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হয়ে যাবে। অথচ সে ইমামের অনুসারী হিসাবে আদায় করার দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

আর মুক্তাদী যদি ভূল করে তবে ইমাম ও সেই মুক্তাদীর উপরই সাজদা ওয়াজিব হবে না। কেননা যদি সে একা সাজদা করে তবে ইমামের বিরুদ্ধাচারণকারী হবে। পক্ষান্তরে ইমাম যদি মুক্তাদীর অনুসরণ করে তবে, যে অনুসরণীয়, সে অনুসরণকারীতে পরিণত হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি প্রথম বৈঠকে ভুলে যায়, পরে বসার অধিকতর নিকটবর্তী থাকা অবস্থায় তা স্মরণ হয়, তবে সে ফিরে বসে যাবে এবং তাশাহ্হুদ পড়বে। কেননা যা কোন নিকটবর্তী, তা ঐ জিনিসেরই অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কারো কারো মতে এমতাবস্থায় বিলম্বজনিত কারণে সাজদায়ে সাহ্ও করবে। কিন্তু বিশূদ্ধতম মত এই যে, সাজদা করবে না, যেমন না্ দাঁড়ালে সাজদা করতে হয় না।

পক্ষান্তরে যদি দাঁড়ানো অবস্থার অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তবে (বৈঠকের দিকে) ফিরে আসবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে দাড়ানো ব্যক্তির মতই। আর সে সাজদায়ে সাহ্ও করবে। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে।

আর যদি শেষ বৈঠক ভূলে যায়, এমন কি পঁচম রাকাআতে দাড়িয়েঁ যায়, তবে সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে। কেননা এই ফিরে আসার মধ্যে তার নামাযের সংশোধন রয়েছে। আর তার জন্য এটা সম্ভব। কেননা এক রাকাআতের কম যা, তা পরিহারযোগ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পঁচম রাকাআত বাতিল করে দেবে। কেননা সে এমন বিষয়ের দিকে ফিরে এসেছে, যার স্থান উক্ত রাকাআতের পূর্বে। সুতরাং তা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে।

আর সাজদা সাহ্ও করবে। কেননা সে ওয়াজিব বিলম্বিত করেছে।

আর যদি পঁচম রাকাআতের এক সাজদাও আদায় করে ফেলে তবে আমাদের মতে তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে।

শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, ফরয নামাযের রুকনসমূহ পূর্ণ করার পূর্বেই সে তার নফল নামাযের আরম্ভ পোক্ত করে ফেলেছে। আর এটার অবশ্যম্ভাবী দাবী হল ফরয থেকে বের হয়ে আসা।

এর কারণ এই যে, এক সাজদাসহ রাকাআত আদায়কে প্রকৃত অর্থেই নামায গণ্য হয়। তাই নামায পড়বে না এমন কসমের বেলায় এক সাজদা এক রাকাআত আদায় করলে কসম ভংগ হয়ে যাবে।

আর তার এই নামায নফলে পরিণত হয়ে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কাযা নামায অধ্যায়ে এটা আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং উক্ত রাকাআতের সাথে ষষ্ঠ রাকাআত যুক্ত করবে। যদি কোন রাকাআত যুক্ত না করে তবে তার উপর (সাজদা সাহ্ও বা কাযা) কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা ধারণা বশীভূত।

আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে মাটিতে কপাল রাখা মাত্র তার ফরয বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটাই পূর্ণ সাজদা। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে মাথা উঠানোর পর তা বাতিল হবে। কেননা কোন কিছুর পূর্ণতা লাভ করে তার শেষাংশের মাধ্যমে। আর তা হল মাথা উঠানো। অতএব হাদাছ অবস্থায় মাথা উঠানো বিশূদ্ধ হয় না, মত ভিন্নতার ফলাফল প্রকাশ পাবে, সাজদার মাঝে হাদাছ দেখা দেবে। মুহাম্মদ (র.) এর মতে 'বিনা' করবে আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে বিনা করতে পারবে না।

আর যদি চতুর্থ রাকাআতে বৈঠকের পর সালাম না করে দাড়িয়েঁ যায়, তবে পঁচম রাকাআতের সাজদা না করা পর্যন্ত বৈঠকে ফিরে আসবে এবং সালাম ফিরাবে। কেননা দাঁড়ানো অবস্থায় সালাম করা বিধিসম্মত নয়। আর বৈঠকে ফিরে এসে বিধিসম্মতভাবে সালাম ফেরানো তার পক্ষে সম্ভব। কেননা এক রাকাআতের কম যা তা বর্জনীয়।

আর যদি পঁচম রাকাআতের সাজদা করার পর তার স্মরণ হয় (এবং বুঝতে পারে যে, সে পঁচম রাকাআত অতিরিক্ত যোগ করেছে,তবে তার সাথে আরেক রাকাআত যোগ করবে। আর তার ফরয পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা শূধু সালাম করা বাকী ছিল, আর তা ওয়াজিব।

অন্য রাকাআত যোগ করার কারণ হল, যাতে দুই রাকাআত মিলে নফল হয়ে যায়। কেননা এক রাকাআত নফল হিসাবে যথেষ্ট নয়। নবী (সা.) বিচ্ছিন্ন এক রাকাআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তবে এ দু'রাক্আত যুহর পরবর্তী সুন্নত দু'রাকাআতের স্থলবর্তী হবে না। এ-ই বিশূদ্ধ মত। কেননা (নবী সা.) থেকে নতুন তাহরীমা দ্বারা এর উপর নিয়মিত আমল রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ভুলের জন্য সাজদা করবে।

এটা সূক্ষ কিয়াসের দাবী। কেননা সুন্নত তরীকার বিপরীতে (ফরয হতে) বের হওয়ার কারণে ফরযে ত্রুটি এসে গেছে। আর সুন্নত তরীকার বিপরীত (নফল সালাতে) প্রবেশের কারণে নফল সালাতেও ত্রুটি এসেছে। আর যদি এই নফল সালাত ছেড়ে দেয় তবে তার উপর কাযা আবশ্যক হবে না। কেননা এ রাকাআতটা ধারণা বশীভূত।

এ রাকাদ্বয়ের কেউ যদি তার সাথে ইকতিদা করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে সে ছয় রাকাআত পড়বে। কারণ এ তাহরীমা দ্বারা ছয় রাকাআত আদায় করা হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে দু'রাকাআত আদায় করবে। কেননা ফরয হতে তার বের হয়ে আসা পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুক্তাদী যদি এ সালাত ফাসিদ করে ফেলে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে ইমামের উপর কিয়াস করে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না।

তা সত্ত্বেও যদি

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে (মুক্তাদীকে) দু'রাকাআত কাযা করতে হবে। কেননা কাযা রহিত হওয়ার কারণ ইমামের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।

জামেউস-সগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি দু'রাকাআত নফল পড়ল আর তাতে কোন ভূল করল এবং সাজদায়ে সাহ্‌ও করল, অতঃপর (একই তাহরীমার মাধ্যমে) আরও দু'রাকাআত পড়ার ইচ্ছা করল সে (পূর্ববর্তী রাকাআতদ্বয়ের উপর) 'বিনা' করতে পারবে না। কেননা তখন সালাতের মধ্যবর্তী স্থানে হওয়ার কারণে সাজদায়ে সাহ্‌ও বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুসাফির যদি সাজদায়ে সাহ্‌ও করার পর মুকীম হওয়ার নিয়্যত করে তবে সে (পূর্ববর্তী রাকাআতদ্বয়ের উপর পরবর্তী রাকাআতের) 'বিনা' করতে পারবে। কেননা মুসাফির যদি 'বিনা' না করে তবে তার সম্পূর্ণ সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তা সত্ত্বেও যদি সে (পরবর্তী দু'রাকাআত নফল) আদায় করে তবে তাহরীমা বাকি থাকার কারণে তা সহীহ্ হবে। কিন্তু সাজদায়ে সাহ্ও বাতিল হয়ে যাবে। এ-ই বিশূদ্ধ মত। (সুতরাং শেষে পুনঃসাজদা সাহ্ও করে নিবে)।

কেউ (সালাতের মাঝে) সালাম ফেরাল, অথচ তার যিম্মায় সাজদায়ে সাহ্ও রয়ে গেছে; এমন সময় সালামের পর কোন লোক (ইকতিদার মাধ্যমে) তার সালাতে দাখিল হল, তবে ইমাম যদি সাজদায় যায় তাহলে মুক্তাদী সালাতে শামিল গণ্য হবে। অন্যথায় সালাতে শামিল গণ্য হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ইমাম সাজদা করুন বা না করুন, মুক্তাদী সালাতে দাখিল গণ্য হবে। কেননা তাঁর মতে যার যিম্মায় সাজদায়ে সাহ্ও রয়েছে, তার সালাম মূলতঃ তাকে সালাতে থেকে বের করে না। কারণ এ সাজদা ওয়াজিব হয়েছে ক্ষতি পূরণের জন্য। সুতরাং সালাতের ইহরামে থাকা তার জন্য অপরিহার্য।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে সালাম তাকে স্থগিতাবস্থায় সালাত থেকে বের করে। কেননা বস্তুতঃ সালাম হল সালাত থেকে বহিস্কারকারী। কিন্তু সাজদা আদায়ে প্রয়োজনে এখানে তা কার্যকর হচ্ছে না। সুতরাং সাজদা ছাড়া এই 'স্থগিত হওয়া' প্রকাশ পাবে না। আর সাজদায়ে ফিরে না আসার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনের কার্যকারিতা নেই।

এ মতপার্থক্যের ফলাফল আলোচ্য মাসআলায় যেমন প্রকাশ পাচ্ছে তেমনি প্রকাশ পাবে এ অবস্থায় উচ্চহাস্য দ্বারা উযূ ভংগ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মুকীম হওয়ার নিয়্যতি দ্বারা ফরয পরিবর্তন হওয়ার ক্ষেত্রে।

যে ব্যক্তি সালাত শেষ করার নিয়্যতে সালাম করল অথচ তার যিম্মায় সাজদায়ে 'সাহ্ও রয়ে গেছে, তার কর্তব্য হল সাজদায়ে সাহ্ও করা। কেননা এ সালাম সালাত সমাপ্তকারী নয়। আর তার নিয়্যতের লক্ষ্য হচ্ছে শরীআত অনুমোদিত বিষয়ের পরিবর্তন। সুতরাং এ নিয়্যত বাতিল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি সালাত রত অবস্থায় সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে তিন রাকাআত পড়েছে না চার রাকাআত, তা বলতে পারে না, আর এই প্রথম সে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সে পুনরায় সালাত আদায় করবে। কেননা রাসূলূল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

তোমাদের কেউ যদি তার সালাতে সন্দিহান হয়ে পড় যে, কত রাকাআত পড়েছে? তাহলে সে যেন পুনরায় সালাত আদায় করে।

আর যদি এ অবস্থা তার বহুবার হয়ে থাকে, তাহলে সে নিজের প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যে ব্যক্তি তার সালাতে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে যেন চিন্তার মাধ্যমে কোন্‌টি সঠিক তা সাব্যস্ত করে।

আর যদি তার কোন ধারণা না থাকে তবে নিশ্চিত (সংখ্যার) উপর নির্ভর করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যে ব্যক্তি আপন সালাতে সন্দিহান হয়ে পড়ে ফলে সে বলতে পারে না যে, তিন রাকাআত পড়েছে, না চার রাকাআত সে ‘কম’ এর উপর নির্ভর করবে।

আর সালাম দ্বারা (সন্দেহগ্রস্ত সালাত শেষ করে) নতুন সালাত শুরু করা উত্তম। কেননা সালামই সালাত সমাপ্তকারী রূপে পরিচিত। কথাবার্তা দ্বারা নয়। সালাত কর্তন করার ‘নিছক নিয়্যত’ বাতিল গণ্য হবে। আর কম সংখ্যার উপর নির্ভর করার সুরতে সালাত শেষ রাকাআত হিসাবে ধারণা হয়, এমন প্রত্যেক স্থান বসবে, যেন সে ফরয বৈঠকে তরককারী না হয়। আল্লাহ্-ই উত্তম জানেন।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

অসুস্থ ব্যক্তির সালাত

অসুস্থ ব্যক্তি যখন দাঁড়াতে অক্ষম হয় তখন সে বসে রুকু-সাজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমরান ইবন হাসীণ (রা.) কে বলেছেন

http://islaminonesite.wordpress.com/

তুমি দাড়িয়ে সালাত আদায় কর। যদি তা না পার তবে বসে (পড়)। যদি তা না পায় তবে পার্শ্বে শয়ন করে ইংগিতের মাধ্যমে।

তাছাড়া কুদূরী (র.) বলেন, যদি রুকু-সাজদা করতে না পারে তাহলে ইশারায় তা আদায় করবে। অর্থাত্ বসা অবস্থায় (ইশারায় রুকু-সাজদা করবে) কেননা এতটুকু করার সামর্থ্য তার রয়েছে। তবে সাজদার ইশারাকে রুকুর ইশারার তুলনায় অধিক অবনমিত করবে। কেননা ইশারা হল রুকু-সাজদার স্থলবর্তীতা রুকু-সাজদার হুকুম গ্রহণ করবে।

কপালের কাছে কোন কিছু উঁচু করে তার উপর সাজদা করবে না। সাজদা করার জন্য কিছু তার কপালের সামনে উঁচু করে ধরা হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যদি তুমি ভূমিতে সাজদা করতে পার তবে সাজদা কর। অন্যথায় মাথা দিয়ে ইশারা কর।

আর যদি কিছু তুলে ধরা হয় এবং সেই সাথে আপন মাথাও কিণ্চিত অবনত করে, তবে ইশারা পাওয়া যাওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে। আর যদি উক্ত উত্তোলিত বস্তুকে কপালের উপর শুধু স্থাপন করে তবে ইশারা না হওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে না।

আর যদি বসতে না পারে তবে পিঠের উপর চিত হয়ে শোবে এবং দু'পা কেবলামুখী করবে। এবং ইশারায় রুকু-সাজদা করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- অসুস্থ ব্যক্তি দাড়িয়েঁ সালাত আদায় করবে। যদি তা না পারে তাহলে বসে (আদায় করবে)। যদি তা না পারে তাহলে চিত হয়ে ইশারায় আদায় করবে। যদি তাও না পারে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাই তার ওযর কবূল করার অধিক হকদার।

যদি পার্শ্বে শয়ন করে আর তার চেহারা কেবলামুখী থাকে তবে তা জাইয হবে। প্রমাণ হল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত (ইমরান ইব্ন হাসীনের) হাদীছ। কিন্তু আমাদের মতে প্রথম সুরতটি উত্তম। ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা চিত হয়ে শয়নকারী ব্যক্তিরা ইশারা কা'বা শরীফের অভিমুখী হয়। পক্ষান্তরে পার্শ্ব শয়নকারী ব্যক্তির ইশারা তার পদদ্বয় অভিমুখী হয়। অবশ্য তা দ্বারা সালাত আদায় হয়ে যাবে।

যদি মাথা দিয়ে ইশারা করতে সক্ষম না হয় তবে তার সালাত বিলম্বিত হবে। কিন্তু চোখ দ্বারা, অন্তর দ্বারা বা চোখের দ্বারা ইশারা করা যাবে না।

ইমাম যুফার (এবং আহমদ, শাফিঈ ও মালিক (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। আমাদের প্রমাণ হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। তাছাড়া যুক্তি এই যে, নিজস্ব মত দ্বারা স্থলবর্তী নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আর মাথা দিয়ে ইশারা এর উপর কিয়াস করা সংগত নয়। কেননা মাথা দ্বারা সালাতের রুকন আদায় করা হয় অথচ চোখ বা অপর দু'টি দ্বারা তা করা হয় না।

যদি সালাত বিলম্বিত করা হবে-ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্যে ইংগিত রয়েছে যে, সালাতের ফরয তার থেকে রহিত হবে না। যদিও অক্ষমতা একদিন এক রাত্রের বেশী হয় আর সে সজ্ঞানে থাকে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা সে শরীআতের সম্বোধন উপলদ্ধি করতে পারে। অজ্ঞান লোকের বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয় কিন্তু রুকু-সাজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কিয়াম করা জরুরী নয়, বরং বসে ইশারায় (রুকু-সাজদা করে) সালাত আদায় করবে। কেননা, কিয়াম রুকন হয়েছে সাজদায় যাওয়ার মাধ্যম হিসাবে। কারণ, কিয়াম থেকে সাজদায় যাওয়ার মধ্যে চূড়ান্ত তাযীম প্রকাশ পায়, সুতরাং কিয়ামের পরে সাজদা না হলে তা রুকন রূপে গণ্য হবে না। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তিকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। তবে উত্তম হল বসা অবস্থায় ইশারা করা। কেননা তা সাজদার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুস্থ ব্যক্তি দাড়িয়েঁ আংশিক সালাত আদায় করার পর যদি অসুস্থতা দেখা দেয় তাহলে বসে রুকু-সাজদা করে সালাত পূর্ণ করবে। আর সক্ষম না হলে ইশারা দ্বারা আদায় করবে। আর (বসতে) সক্ষম না হলে চিত হয়ে শোয়ে আদায় করবে। কেননা, নিম্নস্তরকে উচ্চস্তরের উপর 'বিনা' করেছে। সুতরাং এটা ইকতিদার মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কোন ব্যক্তি অসুস্থতাবশতঃ বসে রুকু-সাজদা করে সালাত শূরু করল। এরপর (স্‌লাতের মাঝেই) সুস্থ হয়ে গেল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে সে তার পূর্ববর্তী সালাতের উপরই বিনা করে দাড়িয়ে আদায় করবে। আর মুহাম্মদ (র.) এর মতে নতুন করে সালাত শুরু করবে।

এ মতপার্থক্যের ভিত্তি হল তাদের ইকতিদা সংক্রান্ত মতপার্থক্য। পূর্বে এর বিবরণ (ইমামাত অনুচ্ছেদ) বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি আংশিক সালাত ইশারা দ্বারা আদায় করার পর রুকু-সাজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে সকলের মতেই নতুন করে সালাত শুরু করতে হবে। কেননা, ইশারা দ্বারা আদায়কারীর পিছনে রুকু-সাজদাকারীর ইকতিদা করা জাইয নয়। সুতরাং 'বিনা' ও জাইয হবে না।

যে ব্যক্তি দাড়ানো অবস্থায় নফল সালাত শুরু করে পরবর্তীতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে লাঠিতে বা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়াতে পরে কিংবা বসেও আদায় করতে পারে। কেননা, এটা ওযর। বিনা ওযরে হেলান দেওয়া অবশ্যা মাকরূহ। কারণ তা আদবের খেলাফ। কেউ কেউ বলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)এর নিকট তা মাকরূহ। কেননা তার মতে বিনা ওযরে বসা জাইয আছে। সুতরাং হেলান দেয়া মাকরূহ হতে পারে না। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে যেহেতু (বিনা ওযরে) বসা জা্‌ইয নেই, সেহেতু হেলান দেয়াও মাকরূহ হবে।

যদি (দাড়িয়ে সালাত শুরু করার পর) বিনা ওযরে বসে পড়ে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তা মাকরূহ হবে। তবে আবূ হানীফা (র.) এর মতে সালাত দুরস্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে দুরস্ত হবে না। নফল অনুচ্ছেদ এ আলোচনা বিগত হয়েছে।

কোন ব্যক্তি 'জলযানে' 'বিনা ওযরে' বসে সালাত পড়লে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তা জাইয হবে। তবে দাড়িয়ে আদায় করা উত্তম। আর সাহেবাইন বলেন যে, ওযর ছাড়া তা জা্‌ইয হবে না। কেননা সামর্থ্য তার আছে। সুতরাং তা পরিত্যাগ করা যাবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর যুক্তি এই যে, সেখানে মাথা ঘুরানোর সম্ভাবনাই প্রবল সুতরাং সেটা বাস্তবতূল্য। তবে দাড়িয়ে পড়া হল উত্তম। কেননা তা মতপার্থক্যের সংশয় মুক্ত। আর যতটা সম্ভব মতপার্থক্য থেকে দূরে থাকাই উত্তম। কেননা তা অন্তরের জন্য অধিক প্রশান্তিকর। এ মতপার্থক্য নোংগরহীন নৌকার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে বাধা নৌকা নদীর তীরের (ভূমির) মতই। এটাই বিশুদ্ধ মত।

যে ব্যক্তি পাচ ওয়াক্ত সালাত কিংবা তার কম সময় বেহুশ ছিল, সে কাযা আদায় করবে। আর যদি পাচ ওয়াক্তের বেশী বেহুশ থাকে, তাহলে কাযা আদায় করবে না। এটা সূক্ষ কিয়াসের সিদ্ধান্ত, সাধারণ কিয়াস অনুযায়ী অজ্ঞনতা যদি একপূর্ণ সালাতের ওয়াক্ত স্থায়ী হয়, তাহলে কাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তা পাগল হওয়ার সমতুল্য।

সূক্ষ কিয়াসের ব্যাখ্যা এই যে, সময় দীর্ঘ হলে কাযা সালাতের সংখ্যা বেড়ে যায় ফলে আদায় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে সময় সংক্ষিপ্ত হলে কাযা সালাতের সংখ্যা কম হয়; ফলে তাতে কোন কষ্ট হবে না। আর বেশীর পরিমাণ হল কাযা সালাত একদিন ও একরাত্র দাড়িয়ে যাওয়া। কেননা তখন তা পুনরাবৃত্তির গণ্ডিতে প্রবেশ করে যায়। আর পাগল হওয়ার হুকুম অজ্ঞান হওয়ার মত। আবূ সুলায়মান (র.) এরূপই উল্লেখ করেছেন।

ঘুমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ঘূম এত দীর্ঘ হওয়া বিরল। সুতরাং সেটা সংক্ষিপ্ত ঘুমের পর্যায়ভূক্ত বলেই গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে বেশীর পরিমাণ হিসাব করা হবে সালাতের ওয়াক্ত হিসাবে। কেননা সেটা দ্বারাই পুনরাবৃত্তি সাব্যস্ত হয়। আর ইমাম আবূ মালিক ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে সময় হিসাবে। ‘আলী (রা.) ও ইবন উমর (রা.) থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে। নির্ভূল সম্পর্কে আল্লাহ্ই উত্তম জানেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

তিলাওয়াতের সাজদা

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কুরআন শরীফে মোট চৌদ্দটি সাজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে। (১) সূরাতুল ‘আরাফের শেষে, (২) সূরাতুল রা’দ, (৩) সূরাতুন-নাহল, (৪) সূরা বনী ইসরাইল, (৫) সূরা মারয়াম, (৬) সূরাতুল হাজ্জ-এর প্রথমটি, (৭) সূরাতুল ফুরকান, (৮) সূরা আন্-নামল, (৯) আলিফ-লাম-মীম তানযীল, (১০) সূরা সা’দ, (১১) সূরা হামীম সাজদা, (১২) সূরাতুন-নাজম, (১৩) সূরা ইযাস-সামাউন শাক্কাত ও (১৪) সূরা ইকরা। মাসহাবে উছমানে এভাবেই লিখিত হয়েছে এবং এ-ই নির্ভরযোগ্য। সূরাতুল হাজ্জ-এর সাজদার দ্বিতীয় আয়াতটি আমাদের মতে সালাতের সাজদা সংক্রান্ত। আর হামীম আস-সাজদা এর সাজদাস্থল হল আয়াতটি। এটা উমর (রা.) এর মত। এবং সতর্কতা অবলম্বনে এই গ্রহণীয়।

এ সকল স্থানে পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের উপর সাজদা ওয়াজিব। কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা থাকুক কিংবা ইচ্ছা না থাকুক। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- সাজদার আয়াত যে শ্রবণ করেছে এবং যে তিলাওয়াত করেছে উভয়ের উপর সাজদা ওয়াজিব।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম যখন সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন তখন তিনি সাজদা করবেন এবং মুক্তাদীও তার সঙ্গে সাজদা করবে। কেননা সে ইমামের অনুসরণ নিজ কর্তব্যরূপে গ্রহণ করেছে।

মুক্তাদী তিলাওয়াত করলে ইমাম ও মুক্তাদী কেউ সাজদা করবে না। সালাতের মধ্যেও না, সালাতের পরেও না। এটা আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মত। মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, সালাত শেষ করার পর সকলেই সাজদা করবে। কেননা সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ সাব্যস্ত হয়েছে এবং কোন প্রতিবন্ধকতাও নেই। সালাতের অবস্থা অবশ্য এর বিপরীত। কেননা সালাতের ভিতরে সাজদা করা ইমামতির অথবা তিলাওয়াতের অবস্থার বৈপরীত্যের দিকে নিয়ে যায়। শায়খাইনের যুক্তি এই যে, মুক্তাদীর উপর ইমামের কর্মকাণ্ড আরোপিত হওয়ার কারণে সে কিরাত পড়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্মের উপর কোন হুকুম আরোপিত হয় না।

জুনুবী ও হায়যগ্রস্ত নারীর অবস্থা এর বিপরীত। কেননা তাদের কিরাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে হায়যগ্রস্ত নারীর উপর তিলাওয়াতের কারণে সাজদা ওয়াজিব হবে না। তদ্রূপ শ্রবণের কারণেও ওয়াজিব হবে না। কেননা তার সালাত আদায়ের যোগ্যতাই নাই। জুনুবী ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি উক্ত সালাত বহির্ভূত কোন ব্যক্তি উক্ত আয়াত শ্রবণ করে তবে সে সাজদা করবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা (শরীআত কর্তৃক) প্রতিবন্ধকতা মুক্তাদীর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত ছিল। সুতরাং তাদের অতিক্রম করে অন্যদের উপর তা আরোপিত হবে না।

যদি সালাতের ভিতরে থেকে তারা এমন লোকের তিলাওয়াত শ্রবণ করে, যে সালাতে তাদের সাথে (শরীক) নেই, তাহলে তারা সালাতে ঐ তিলাওয়াতের সাজদা করবে না। কেননা, এটি সালাতভুক্ত সাজদায়ে তিলাওয়াত নয়। কারণ তাদের এই সাজদার আয়াত শ্রবণ সালাতের কোন আমল নয়। তবে সালাতের পরে এর জন্য তারা সাজদা করবে। কেননা, সাজদার কারণ পাওয়া গেছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি তারা সালাতের মাঝেই সাজদা করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তা নিম্নমানের সাজদা। সুতরাং তা দ্বারা পূর্ণমানের সাজদা আদায় হতে পারে না।

গ্রন্থকার বলেন, পুনরায় তারা এ সাজদা করবে। কেননা সাজদার কারণ পাওয়া গেছে। তবে সালাত দোহরাতে হবে না। কেননা, কেবলমাত্র সাজদা সালাতের তাহরীমার পরিপন্থী নয়।

'নাওয়াদির' এর বর্ণনা মতে সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা সালাতে তারা এমন 'কাজ' বৃদ্ধি করেছে যা সালাতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা মুহাম্মদ (র.) এর মত।

ইমাম যদি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করেন আর তা এমন কোন ব্যক্তি শুনতে পায়, যে সালাতে ইমামের সাথে শরীক নয়। এরপর ইমাম সাজদা করার পর সে ইমামের সাথে সালাতে শরীক হল, তাহলে ঐ সাজদা করা তার জন্য জরুরী নয়। কেননা ঐ রাকাআতে শরীক হওয়ার দ্বারা ঐ সাজদাতেও সে শরীক বলে গণ্য হয়েছে।

আর যদি ঐ সাজদা করার আগেই সে ইমামের সঙ্গে শরীক হয়ে যায়, তাহলে ইমামের সঙ্গে সেও ঐ সাজদা করবে। কেননা, ঐ আয়াতটি যদি সে শ্রবণ নাও করতো, তবু ইমামের সঙ্গে তাকে সাজদা করতে হত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাজদা করা অধিকতর সংগত হবে।

আর যদি ইমামের সঙ্গে সালাতে মোটেই শরীক না হয়, তাহলে সে সাজদা করে নেবে। কেননা, সাজদার কারণ পাওয়া গেছে।

যে সাজদা সালাতের মধ্যে ওয়াজিব হল কিন্তু সে সালাতের মধ্যে আদায় করল না, তবে সালাতের বাইরে আর কাযা করবে না। কেননা, এ হল সালাতের মধ্যকার সাজদা। তার সালাতভিত্তিক অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং নিম্নমানের সাজদা দ্বারা তা আদায় হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করল, এরপর সাজদা না করেই সালাত শুরু করে উক্ত আয়াত পুনঃপাঠ করল এবং সাজদা করল, তার দুই বারের তিলাওয়াতের জন্য এ সাজদাই যথেষ্ট হবে। কেননা, দ্বিতীয় সাজদাটি সালাতভূক্ত হওয়ার কারণে অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং তা প্রথম সাজাদাকে অন্তর্ভূক্ত করে নিবে।

তবে ‘নাওয়াদির’ এর বর্ণনা মতে সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পার আর এক সাজদা করে নিবে। কেননা, প্রথম সাজদাটির অগ্রগামিতার প্রাধান্য রাখে। সুতরাং উভয়টি সমমানের হয়ে গেল।

আমাদের বক্তব্য এই যে, উদ্দেশ্যের সাথে (আদায় নিজে সংযুক্ত হওয়ার কারণে) এর অতিরিক্ত মর্যাদা রয়েছে, সুতরাং এদিক থেকে তা অগ্রগণ্য হবে।

আর যদি সাজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর সাজদা করে, এরপর সালাতে দাখিল হয়ে পুনরায় উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এর জন্য আবার সাজদা করবে। কেননা দ্বিতীয় বার আয়াতে সাজদা তার পশ্চাতে এসেছে। অতএব এটিকে প্রথমটির সাথে যুক্ত করার কোন যুক্তি নেই। কেননা, এমতাবস্থায় ‘কারণ’ এর উপর কার্য অগ্রবর্তী হয়ে পড়বে।

যদি কোন ব্যক্তি একই মজলিসে একটিমাত্র সাজদার আয়াত পুনরাবৃত্তি করল তাহলে একই সাজদা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি নিজ স্থানে আয়াত তিলাওয়াত পূর্বক সাজদা করে এরপর অন্যত্র গিয়ে (পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে এসে) উক্ত আয়াত আবার তিলাওয়াত করল, তবে দ্বিতীয়বার সাজদা করতে হবে। আর প্রথম তিলাওয়াতের জন্যা সাজদা না করে থাকলে তার উপর দু’টি সাজদাই ওয়াজিব হবে।

মূল নিয়ম এই যে, কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতি সাজদার ভিত্তি হল একত্রীকরণের উপর আর এ একত্রীকরণ ও সাধিত হবে (সাজদার) কারণ (অর্থাত্ তিলাওয়াত) এর ক্ষেত্রে, হুকুম বা বিধানের ক্ষেত্রে নয়। ইবাদতে ব্যাপারে এটাই মুনাসিব। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি শাস্তি বিষয়ক ক্ষেত্রে অধিক যুক্তিযুক্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর একত্রীকরণ তখনই সম্ভব, যখন মজলিস অভিন্ন হবে। কেননা মজলিসই হল বিক্ষিপ্তগুলোকে একত্রীকারী। সুতরাং মজলিস যখন বিভিন্ন হবে তখন হুকুম বা বিধান মূল অবস্থায় ফিরে যাবে। শূধু দাড়ানো দ্বারা মজলিস ভিন্ন হয় না। তালাকের ইখতিয়ারপ্রাপ্ত নারীর বিষয়টি এ থেকে ভিন্ন। কেননা এক্ষেত্রে দাড়ানো গ্রহণ না করার ইঙ্গিত বহন করে। আর তা ইখতিয়ারকে বাতিল করে দেয়।

কাপড়ের সূতা তানা করার সময় আসা-যাওয়াতে ওয়াজিব পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে। বিশুদ্ধতম মত অনুসারে গাছের এক ডাল থেকে আরেক ডালে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই বিধান। তেমনি শস্য মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতার খাতিরে একই বিধান হবে।

যদি পাঠকারীর মজলিস অভিন্ন থেকে শ্রোতার মজলিসে ভিন্ন হয় তাহলে শ্রোতার উপর ওয়াজিব সাজদা পুনরাবৃত্ত হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে শ্রবণই হল সাজদা ওয়াজিব হওয়ার কারণ।

তদ্রুপ যদি শ্রোতার মজলিস অপরিবর্তিত থাকে আর পাঠকারীর মজলিস পরিবর্তিত হয়। এরূপই বলা হয়েছে। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, শ্রোতার উপর ওয়াজিব সাজদার হুকুম পুনরায় বর্তিবে না। কারণ আমরা (আগে) বলেছি।

যে ব্যক্তি সাজদা করার ইচ্ছা করবে, সে উভয় হাত না তুলে তাকবীর বলবে এবং সাজদায় যাবে। এরপর তাকবীর বলে মাথা উঠাবে।

সালাতের সাজদার অনুসরণে ইব্ন মাস'উদ (রা.) থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে। আর তার উপর তাশাহুদ বা সালাম ওয়াজিব নয়, কেননা তাতো করা হয় হালাল হওয়ার জন্য আর তার চাহিদা হল পূর্ববর্তী তাহরীমার উপস্থিতি, যা এখানে নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, আমার কাছে পসন্দনীয় সাজদার আয়াতের পূর্বে এক বা দু'আয়াতে পড়ে নেওয়া। যাতে ভূল ধারণা না হয় যে, আয়াতে সাজদার ফযীলত অধিক রয়েছে।

শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে ফকীহ্গণ সাজদার আয়াত চুপি চুপি পড়া উত্তম মনে করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

পঞ্চদশ অনুচ্ছেদ

মুসাফিরের সালাত

যে সফর দ্বারা শরীআতের আহকাম পরিবর্তিত হয়, তা হল তিন দিন তিন রাত্রি পরিমাণ দূরত্বে যাওয়ার ইচ্ছা করা উটের গতি বা হেটে চলার গতি হিসাবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- মুকীম পূর্ণ একদিন একরাত্র মাস্হ করবে, আর মুসাফির করবে তিন দিন তিন রাত্র।

মাস্হ্র অবকাশ মুসাফির সম্প্রদায়কে সামগ্রিকভাবে শামিল করেছে। আর তার অনিবার্য প্রয়োজন হবে (সফরের) সময়সীমা সম্প্রসারণ। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) তা নির্ধারণ করেছেন দুই দিন এবং তৃতীয় দিনের অধিকাংশ সময় পরিমাণ দ্বারা। আর ইমাম শাফিঈ (র.) নির্ধারণ করেছেন একদিন একরাত্র পরিমাণ দ্বারা। আর উভয়ের বিপরীতে প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য হাদীছই যথেষ্ট।

আর উল্লেখিত পথচলা দ্বারা মধ্যমগতির পথ চলা উদ্দেশ্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মনজীল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ করেছেন। আর এ মত হল প্রথমোক্ত দূরত্ব পরিমাণের নিকটবর্তী। ফরসখ মাইল দ্বারা দূরত্ব নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

আর নৌপথের চলার গতিকে পরিমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হবে না। অর্থাত্ স্থল পথের জন্য নৌপথের যাত্রাকে পরিমাপ হিসাবে গণ্য করা হবে না। আর সমুদ্রে তার উপযোগী যাত্রা পরিমাপ বিবেচ্য, যেমন পার্বত্য পথের হুকুম।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে মুসাফিরের জন্য ফরয হল দুই রাকাআত। এর অধিক আদায় করবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, মুসাফিরের (মূল) ফরয চার রাকাআত। তবে কসর করা্ হল রুখছত, সাওমের উপর কিয়াস করে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, দ্বিতীয়ার্থ দুই রাকাআত কাযা করতে হয় না এবং তা তরক করার কারণে গুণাহ্ হয় না। আর এ হল নফল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে সাওমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা কাযা করতে হয়।

আর যদি চার রাকাআত পড়ে নেয় এবং দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক করে, তাহলে প্রথম দুই রাকাআত ফরয হিসাবে আদায় হয়ে যাবে এবং শেষ দুই রাকাআত নফল হবে।

ফজরের সালাতের উপর কিয়াস করে। অবশ্য সালাম বিলম্ব করার কারণে গুণাহ্গার হবে।

আর যদি দ্বিতীয় রাকাআতে তাশাহ্হুদ পরিমাণ বৈঠক না করে তাহলে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, ফরযের রুকনসমূহ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নফল তার সাথে মিলে গেছে।

মুসাফির যখন বস্তির আবাদী ত্যাগ করবে তখন থেকেই দু'রাকাআত আদায় করবে। কেননা, বস্তিতে প্রবেশের সাথে মুকীম হওয়া সম্পৃক্ত। সুতরাং সফরের সম্পর্ক হবে বস্তি থেকে বের হওয়ার সাথে। এ সম্পর্কে আলী (রা.) থেকে নিম্নোক্ত বানী বর্ণিত আছে। যদি আমরা বস্তির গৃহসমূহ অতিক্রম করি তখনই অবশ্য সালাত কসর করব।

সফরের হুকুম অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ না কোন শহরে বা বস্তিতে পনের দিন বা তার বেশী থাকার নিয়্যত করে। যদি এর কম সময় থাকার নিয়্যত করে তাহলে কসর করবে। কারণ সফরের একটি মিয়াদ নির্ধারণ করা জরুরী। কেননা সফরে স্বভাবতঃ বিরতি ঘটে থাকে। তাই আমরা সফরের মিয়াদ নির্ধারণ করেছি (দুই হায়যের মধ্যবর্তী) তুহরের মিয়াদ দ্বারা। কেননা উভয় মিয়াদই কিছু আহকাম আরোপ করে।

আর এটি ইব্ন 'আব্বাস ও ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ ধরণের ক্ষেত্রে সাহাবীর বাণী হাদীছের মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

শহর বা বস্তির শর্ত এ দিকে ইংগিত করে যে, মাঠে প্রান্তরে ইকামতের নিয়্যত করা সহীহ্ নয়। এ-ই জাহির রিওয়ায়াত।

যদি এমন সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে কোন শহরে প্রবেশ করে যে, আগামীকাল অথবা পরশু এখান থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে মুকীম হওয়ার নির্ধারিত মেয়াদের নিয়্যত করল না; এমন কি এভাবে সে কয়েক বছর অবস্থান করল, তাহলে সে কসর করতে থাকবে। কেননা, ইব্ন ‘উমর (রা.) আজারবাইজান শহরে ছয়মাস অবস্থান করেছেন এবং তিনি এ সময় কসর করতে থাকেন। আরও বহু সাহাবায়ে কিরাম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

সৈন্যবাহিনী যখন শত্রু এলাকায় প্রবেশ করে এবং ইকামতের নিয়্যত করে তখন তারা কসরই পড়বে। তদ্রুপ যদি শত্রু দেশের কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করে। কেননা শত্রুভূমিতে প্রবেশকারীর অবস্থা দোদুল্যমান; হয়ত পরাজিত হয়ে স্থান ত্যাগ করবে, নয়ত (শত্রুভূমিকে) পরাস্ত করে তথায় স্থায়ী হবে। সুতরাং তা ইকামাতের স্থান হতে পারে না।

অনুরূপভাবে (কসর আদায় করবে) যদি (মুসলিম) বাহিনী দারুল ইসলামের বিদ্রোহীদের শহর বহির্ভূত কোন এলাকায় অবরোধ করে কিংবা সমুদ্রে তাদের অবরোধ করে। কেননা তাদের অবস্থা তাদের নিয়্যতের দৃঢ়তা বাতিল করে।

যুফার (র.) এর মতে উভয় অবস্থায় (ইকামাতের নিয়্যত) গ্রহণযোগ্য হবে, যদি মুসলিম বাহিনীর শক্তিতে প্রাধান্য থাকে। কেননা, সে অবস্থায় বাহ্যতঃ তারা অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে যদি তারা বস্তি এলাকায় থাকে তবে (নিয়্যত) গ্রহণযোগ্য হবে; কেননা বস্তি এলাকা ইকামত করার স্থান।

আর তাঁবুবাসীদের সম্পর্কে ইকামতের নিয়্যত কারো কারো মতে দুরস্ত নয়। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, তারা মুকীম বিবেচিত হবে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। কেননা ইকামত হলো (মানুষের জীবনের) আসল অবস্থা। সুতরাং এক চারণভূমিতে যাওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি মুসাফির যদি ওয়াক্তিয়া সালাতের ক্ষেত্রে মুকীমের পিছনে ইক্‌তিদা করে তাহলে চার রাকাআত পুরা করবে। কেননা তখন অনুসরণের বাধ্যবাধকতায় তার ফরয চার রাকাআতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন তার নিজের ইকামতের নিয়্যত দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ, পরিবর্তনকারী বিষয় (অর্থাত্‍ ইকতিদা) 'সবব' এর সাথে (অর্থাত্‍ ওয়াক্‌তের সাথে) যুক্ত হয়েছে।

যদি মুকীম ইমামের সঙ্গে কাযা সালাতে শামিল হয়, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, ফরয পরিবর্তিত হয় না ওয়াকতের পর সবব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে; যেমন ইকামতের নিয়্যত দ্বারা পরিবর্তিথ হয় না। এমতাবস্থায় এটা বৈঠক ও কিরাতের ক্ষেত্রে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতিদার মত হয়ে যাবে, যা দুরস্ত নয়।

মুসাফির যদি দুই রাকাআতে মুকীমদের ইমামতি করে তবে সে (দুই রাকাআত শেষে) সালাম ফিরাবে আর মুকীমগণ তাদের সালাত পূর্ণ করে নিবে। কেননা, মুকতাদীরা দুই রাকাআতের ক্ষেত্রে (মুসাফির ইমামের) অনুসরণে বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে। সুতরাং অবশিষ্ট সালাতের ক্ষেত্রে তারা মাসবূকের মত একাকী হয়ে পড়বে। তবে বিশুদ্ধ মতে সে কিরাত পড়বে না। কেননা তারা তাহরীমার বেলায় মুকতাদী, অন্যান্য কাজের বেলায় নয়। আর ফরয (কিরাত) আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং সতর্কতা হিসাবে কিরাত তরক করবে। মাসবূকের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সে নফল কিরাত পেয়েছে। সুতরাং (কিরাতের) ফরয বিরতি আদায় হয়নি। সুতরাং (তার ক্ষেত্রে) কিরাত পড়াই উত্তম।

সালাম ফিরানোর পর (মুসাফির) ইমামের পক্ষে একথা বলে দেওয়া মুসতাহাব যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করে নাও। আমরা মুসাফির কাফেলা। কেননা, মুসাফির অবস্থায় মক্কাবাসীদের ইমামতি করার সময় রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এরূপ বলেছিলেন।

মুসাফির যখন আপন শহরে প্রবেশ করবে তখন সালাত পূর্ণ করবে। যদিও সেখানে সে ইকামতের নিয়্যথ না করে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম

http://islaminonesite.wordpress.com/

সফর করতেন। অতঃপর ইকামাতের নতুন নিয়্যত ব্যতীত ওয়াতানের দিকে ফিরে এসে মুকীম হিসাবে অবস্থান করতেন।

যদিও কারও নিজস্ব আবাসভূমি থাকে অতঃপর সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে অন্য স্থানকে আবাসভূমি রূপে গ্রহণ করে, তবে অতঃপর সফর করে প্রথম আবাসভূমিতে প্রবেশ করে, তবে সে কসর পড়বে। কেননা প্রথমটি তার আবাসভূমি থাকে না। একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেকে মক্কায় মুসাফির গণ্য করেছিলেন।

এর কারণ এই যে, নীতি হল, স্থায়ী আবাসভূমি অনুরূপ আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, সফর দ্বারা হয় না। পক্ষান্তরে অস্থায়ী অবস্থান স্থল দ্বারা, সফর দ্বারা এবং স্থায়ী আবাসভূমি দ্বারা বাতিল হয়ে যায়।

মুসাফির যদি মক্কায় ও মীনায় পনের দিন থাকার নিয়্যত করে তবে সে কসর পড়বে। কেননা দুই স্থানে ইকামতের নিয়্যত যদি এ' তেবার করা হয়, তাহলে বিভিন্ন জায়গার ইকামতের নিয়্যতকেও মিলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা নিষিদ্ধ। কেননা, সফর তো বিভিন্ন স্থানে অবস্থান থেকে মুক্ত নয়। তবে যদি উভয়ের মধ্যে একটিতে রাত্রিযাপন করার নিয়্যত করে থাক তবে সে সে স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে মুকীম হয়ে যাবে। কেননা, লোকের ইকামতের বিষয়টি তার রাত্রি যাপনের স্থানের সাথে সম্পৃক্ত।

খলীফা কিংবা হিজাযের আমীরের সাথে বিষয়টিকে শর্তযুক্ত করার কারণ এই যে, ক্ষমতা তাদেরই রয়েছে। হজ্জ মওসুমের আমীর তো শুধু হজ্জ সংশ্লিষ্ট বিষয়ই তদারক করে থাকেন।

শাসক কিংবা শাসক নির্ধারিত লোক ছাড়া অন্য কারো জন্য জুমুআ জামা'আত কায়েম করা জাইয নয়। কেননা জুমুআ বিশাল সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়। আর সেখানে ইমাম হওয়া কিংবা অন্যকে ইমাম করা এছাড়া অন্যান্য কারণে কোন কোন সময় ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং জুমুআর সালাত সূষ্ঠভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য তা জরুরী।

http://islaminonesite.wordpress.com/

জুমুআর আরেকটি শর্ত হল সময়। সুতরাং তা যুহরের সময় সহীহ্ হবে, তার পরে দুরস্ত নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সূর্য হেলে পড়ে তখন তুমি লোকদের নিয়ে জুমুআর সালাত আদায় কর।

যদি জুমুআর সালাতে থাকা অবস্থায় ওয়াক্ত চলে যায় তবে পুনরায় যুহর শুরু করবে।

জুমুআর উপর যুহরের বিনা করবে না। কেননা উভয়টি ভিন্ন সালাত।

জুমুআর সালাতের জন্য আরেকটি শর্ত হলো খুতবা। কেননা নবী (সা.) জীবনে কখনো খুতবা ছাড়া জুমুআর সালাত আদায় করেননি।

আর এই খুতবা হবে সূর্য হেলে যাওয়ার পরে সালাতের পূর্বে। হাদীছে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন এবং উভয় খুতবার মাঝে একটি বৈঠকে ব্যবধান করবেন। এর উপরই আমল চলে এসেছে।

তাহরাত অবস্থায় দাড়িয়ে খূতবা দিবেন। কেননা দাড়িয়ে খুতবা একটি সর্বকালীন আমল। অতঃপর যেহেতু খুতবা হলো সালাতের শর্ত। এত তাহারাত মুসতাহাব, যেমন আযানের ধ্বনি।

যদি বসে কিংবা তাহারাত ছাড়া খুতবা পাঠ করে তবে তা জা্ইয হবে। কেননা খুতবার উদ্দেশ্য তার দ্বারা হাসিল হয়ে যায়।

তবে তা মাকরূহ হবে।

সর্বকালীন আমলের বিরুদ্ধাচারণ এবং সালাত ও খুতবার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টির কারণে।

যদি শূধু আল্লাহ্র যিকিরের উপর শেষ করে দেয়, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তা জা্ইয আর সাহেবাইনদের মতে এই পরিমাণ দীর্ঘ যিকির আবশ্যক, যাকে খুতবা বলা যায়। কেননা, খুতবা হল ওয়াজিব। শূধূ তাসবীহ এবং শুধু হামদ্‌কে খুতবা বলা হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) প্রচলিত রীতির উপর ভিত্তি করে বলেন, দু'টি খুতবা পাঠ ছাড়া জা্ইয হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের দিকে ধাবিত হও। এতে কোন বিশ্লেষণ করা হয়নি। উছমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি শূধু আল্হামদুলিল্লাহ্ বলার পর তার কথা থেমে গেলে তখন তিনি (মিম্বর থেকে) নেমে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে জামা'আতে সর্ব নিম্ন সংখ্যা হল ইমাম ছাড়া তিনজন। সাহেবাইনের মতে ইমাম ছাড়া দুইজন হতে হবে।

গ্রন্থকার বলেন, বিশুদ্ধতম কথা এই যে, এটি ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর একার মত। তার দলীল এই যে, দুইয়ের মাঝে সমাবেশের অর্থ রয়েছে।

তরফাইনের দলীল এই যে, প্রকৃতপক্ষে এটি হল তিন। কেননা, এটিই নাম ও অর্থ উভয় দিক থেকেই জামাআ জামাআত আলাদা শর্ত। তদ্রুপ ইমামও শর্ত। সুতরাং ইমাম জামা'আতের মধ্যে গণ্য হবে না।

ইমাম রুকু ও সাজদা করার পূর্বেই যদি লোকেরা চলে যায়, শূধু নারী ও শিশূরা থেকে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে ইমাম পুনরায় যুহর শূরু করবেন। সাহেবাইন বলেন, ইমাম সালাত শূরু করার পর তারা যদি তাকে ছেড়ে চলে যায় তবু তারা চলে যায় তবে (সকলের মতে) তিনি জুমুআই অব্যাহত রাখবেন।

এতে ইমাম যুফার (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু এটা শর্ত সেহেতু এর স্থায়িত্ব আবশ্যক। যেমন ওয়াক্তের বিষয়টি।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, জামা'আত হল জুমুআ অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হবে না। যেমন খূতবার বিষয়টি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, জুমুআ অনুষ্ঠিত হওয়া সাব্যস্ত হবে সালাত শূরু হওয়ার মাধ্যমে। আর এক রাকাআত পূর্ণ হওয়া ছাড়া সালাতের শূরু পূর্ণতা লাভ করে না। কেননা, এক রাকাআতের কম পরিমাণ সালাত নয়। সুতরাং

http://islaminonesite.wordpress.com/

এক রাকাআত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত জামা'আতের স্থায়িত্ব জরুরী। খূতবার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা সালাতের সাথে সামঞ্জস্যহীন। সুতরাং তার স্থায়িত্ব শর্ত হতে পারে না। নারী তেমনি ছেলেদের থেকে যাওয়া ধর্তব্য নয়। কেননা তাদের দ্বারা জুমুআ অনুষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তাদের দ্বারা জামা'আতের পূর্ণতা সাধিত হবে না।

মুসাফির, নারী, রোগী, দাস ও অন্ধের উপর জুমুআ ওয়াজিব নয়। কেননা, জুমুআর উপস্থিতিতে মুসাফিরের অসুবিধা হবে। রোগী ও অন্ধ সম্পর্কেও একই কথা। তদ্রুপ দাস তার মনিবের খিদমতে এবং স্ত্রী তার স্বামীর খিদমতে ব্যস্ত থাকে। তাই ক্ষতি ও অসুবিধার জন্য তাদের 'মাযূর' গণ্য করা হয়েছে।

তবে যদি তারা উপস্থিত হয়ে লোকদের সাথে জুমুআর সালাত আদায় করে তাহলে ওয়াক্তিয়া ফরযের পরিবর্তে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, তারা নিজেই তা বরদাশত করেছে। সুতরাং তারা ঐ মুসাফিরের মত হয়ে যাবে, যে সফরে সিয়াম পালন করল।

মুসাফির, দাস ও অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে জুমুআর ইমামতি করা জাইয আছে।

যুফার (র.) বলেন, তা জাইয নেই। কেননা তাদের উপর (জুমুআর) ফরযিয়াত নেই। সুতরাং তারা বালক ও স্ত্রী লোকের সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল এই যে, এ হল তাদের জন্য অবকাশ (প্রদত্ত সুবিধা)। সুতরাং যখন তারা উপস্থিত হয়ে থাকে তখন ফরয হিসাবেই আদায় হবে। যেমন, (ইতোপূর্বে) আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

পক্ষান্তরে বালকের তো যোগ্যতাই নেই। আর স্ত্রী লোক, পুরুষদের ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়।

মুসাফির, দাস ও অসুস্থদের দ্বারা জুমুআ অনুষ্ঠিত হবে। কেননা তারা যখন জুমুআর ইমামতিরই যোগ্য, তখন তাদের মধ্যে মুকতাদি হওয়ার যোগ্যতা আরও অধিক রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

জুমুআর দিন যে ব্যক্তি ইমামের জুমুআ আদায়ের আগে আপন গৃহে যুহরের সালাত আদায় করে ফেলল, অথচ তার কোন ওযর নেই, তার জন্য তা মাকরূহ হবে। তবে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে।

যুফার (র.) বলেন, তার এই সালাত আদায়ই হবে না। কেননা, তার মতে জুমুআ মূল ফরয আর যুহর হল তার বিকল্প। আর মূলের উপর সামর্থ্য থাকা অবস্থায় বিকল্পের অভিমুখী হওয়ার অবকাশ নেই।

আমাদের দলীল এই যে, সকলের ক্ষেত্রেই মূল ফরয হল যুহর এই যাহিরে মাযহাবে অভিমত। তবে জুমুআ আদায়ের মাধ্যমে ঐ ফরয নিরসন করার জন্য সে আদিষ্ট।

এ মত এ কারণে যে, সে নিজেই যুহর আদায় করতে সক্ষম রয়েছে, জুমুআ আদায় করতে সক্ষম নয়। কেননা, তা এমন কতিপয় শর্তের উপর নির্ভরশীল, যা তার একার মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। আর নিজ সামর্থ্যের উপরই শরীআতের দায়িত্ব নির্ভরশীল।

এরপর যদি তার জুমুআর জামা'আতে হাযির হওয়ার ইচ্ছা হয় এবং জুমুআর জামা'আতে অভিমুখী হয় আর ইমাম জুমুআর সালাতরত থাকেন তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে গমনের দ্বারাই তার যুহর বাতিল হয়ে যাবে।

আর সাহেবাইনের মতে ইমামের সাথে সালাতে দাখিল হওয়া পর্যন্ত যুহর বাতিল হবে না। কেননা সাঈ যুহরের চেয়ে নিম্নমানের। সুতরাং যুহর সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সাঈ তা বাতিল করবে না। আর জুমুআ হল যুহরের চেয়ে উচু পর্যায়ের। সুতরাং তা যুহরকে বাতিল করে দেবে।

আর এটা জুমুআ থেকে ইমামের ফারেগ হওয়ার পর জুমুআ অভিমুখী হওয়ার মত হল।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, জুমুআ অভিমুখে সাঈ করা জুমুআর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সতর্কতার খাতিরে যুহর বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে এটাকে

http://islaminonesite.wordpress.com/

জুমুআর স্থলবর্তী করা হবে। জুমুআ থেকে (ইমামের) ফারেগ হয়ে যাওয়ার পরবর্তী বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে সেটা জুমুআ অভিমুখে সাঈ নয়।

জুমুআর দিন শহরে জামা'আতের সাথে যুহর আদায় করা মা'যূর লোকদের জন্য মাকরূহ। জেলখানায় কয়েদীরও এ হুকুম। কেননা, তাতে জুমুআর ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। কারণ জুমুআ হল সমস্ত জামা'আতকে একত্রকারী। আর মা'যূরদের সাথে কোন কোন সময় অন্যেরাও ইকতিদা করে ফেলে। গ্রামবাসীদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাদের উপর তো জুমুআ নেই।

তবে একদল লোক যদি যুহর জামা'আতে পড়েই ফেলে তাহলে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা, যুহর জাইয হওয়ার যাবতীয় শর্ত পাওয়া গেছে।

যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামকে সালাতের মধ্যে পাবে সে ইমামের সাথে ঐ পরিমাণ সালাত পড়বে, যা সে পেয়েছে, অতঃপর তার উপর জুমুআ 'বিনা' করবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যে পরিমাণ সালাত তোমরা পেয়েছ, তা পড়ে নাও, আর যে পরিমাণ ফউত হয়েছে, তা কাযা করে নাও।

যদি ইমামকে তাশাহ্হুদের মাঝে কিংবা সাজদায়ে সাহ্ও এর মাঝে পায়। তবে শায়খাইনের মতে সে এর উপর জুমুআর বিনা করবে।

মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকা'আতের অধিকাংশ পায়, তবে তার উপর জুমুআার বিনা করবে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় রাকাআতের কম অংশ পায় তবে তার উপর যুহর এর বিনা করবে। কেননা, একদিক থেকে তা জুমুআ আবার অন্যদিকে তার থেকে কতিপয় শর্ত ফউত হওয়ার কারণে তা যুহর। সুতরাং যুহর বিবেচনায় সে চার রাকাআত পড়বে। এবং জুমুআর বিবেচনায় দুই রাকাআতের মাথায় অবশ্যই বসবে। আবার নফল হওয়ার সম্ভাবনার কারণে শেষ দুই রাকাআতে কিরাতও পড়বে।

শায়খাইনের দলীল এই যে, এই অবস্থাতেও সে জুমুআর সালাত তো পেয়েছে। এ কারণেই জুমুআর নিয়্যত করা শর্ত। আর জুমুআর তো দুই রাকাআত। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর পক্ষ থেকে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার কোন কারণ নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা উভয় সালাত ভিন্ন। সুতরাং একটির তাহরীমার উপর অন্যটির বিনা্ করা যাবে না।

জুমুআর দিন ইমাম যখন (খুতবা দানের উদ্দেশ্যে) বের হন তখন লোকেরা খুতবা থেকে তার ফারেগ হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় ও কথা বলা বন্ধ রাখবে।

গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, ইমামের বাহির হওয়ার পর খুতবা শূরু করার পূর্ব পর্যন্ত এবং মিম্বর থেকে নামার পর তাকবীর বলার পূর্ব পর্যন্ত কথা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, মাকরূহ হওয়ার কারণ হল মনোযোগের সাথে শ্রবণের ফরযে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। অথচ এ্ই সময়ে শ্রবণের কিছু নোই। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সালাত তো দীর্ঘায়িত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হল, রাসূলুল্লহ্ (সা.) বলেছেন- ইমাম যখন বের হন (খুতবার উদ্দেশ্যে) তখন সালাত নেই, কথাও নেই। এতে কোন পার্থক্য করা হয়নি। তাছাড়া কথাবার্তা স্বভাবতঃ কখনো দীর্ঘায়িত হয়। তাই তা সালাতের সদৃশ।

মুআযযিনগণ যখন প্রথম আযান দিবেন, তখন লোকদের কর্তব্য হল বেচা কেনা ছেড়ে দেওয়া এবং জুমুআ অভিমুখী হওয়া। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তোমরা আল্লাহ্র যিকির অভিমুখে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও।

ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করেন, তখন তিনি বসবেন এবং মুআযযিনগণ মিম্বরের সামনে দাড়িয়ে আযান দিবেন। এর পর যুগ পরম্পরায় আমল চলে এসেছে।

রাসূলূল্লাহ্ (সা.) এর যামানায় এই আযানই শুধু প্রচলিত ছিল। একারণেই কেউ কেউ বলেন, সাঈ ওয়াজিব হওয়া এবং বেচা-কেনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে এই আযানই ধর্তব্য। তবে বিশূদ্ধতম মত এই যে, প্রথম আযান ধর্তব্য, যদি সূর্য ঢলে পড়ার পরে হয়। কেননা, তা দ্বারাই জুমুআর অবহিতি অর্জিত হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সপ্তদশ অনুচ্ছেদ

দুই ঈদের বিধান

যাদের উপর জুমুআর সালাত ওয়াজিব, তাদের সকলের উপর ঈদের সালাত ওয়াজিব।

আল-জামেউস সাগীর কিতাবে বলা হয়েছে, একই দিনে দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। প্রথমটি হল সুন্নত আর দ্বিতীয়টি হল ফরয। তবে দু'টির কোন একটিকেও তরক করা যাবে না।

গ্রন্থকার বলেন, এতে স্পষ্টভাবে সুন্নত বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথমটি ওয়াজিব হওয়ার সুস্পষ্ট উক্তি। আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত।

প্রথমোক্ত বর্ণনার দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়মিত ভাবে তা পালন করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ণনার দলীল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উক্তি, যা এক গ্রাম্য সাহাবীর এ প্রশ্নে আমার উপর এ ছাড়াও কোন সালাত ওয়াজিব আছে কি এর উত্তরে বলেন, না নেই, তবে যদি নফল আ্দায় কর (তবে তোমার ইচ্ছা)। প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। আর তাকে সুন্নত বলার কারণ এই যে, তা সুন্নাহ্ বা হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে।

আর মুস্তাহাব হল ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগায় যাওয়ার পূর্বে কিছু (মিষ্টি) খাবার গ্রহণ করা, গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং খুশবু ব্যবহার করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগায় যাওয়ার পূর্বে আহার করতেন এবং দুই ঈদেই গোসল করতেন।

কেননা এ হল সমাবেশের দিন। সুতরাং তাতে গোসল করা্ ও খুশবু ব্যবহার করা সুন্নত হবে। যেমন জুমুআর জন্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর নিজের সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করবে। কেননা, নবী (সা.) এর একটি পুস্তিনের বা পশমের জুব্বা ছিল, যা তিনি ঈদে পরিধান করতেন।

আর সাদকাতুল ফিতর আাদায় করবে। যাতে দরিদ্র ব্যক্তি সচ্ছলতা লাভ করতে পারে এবং তার অন্তর সালাতের জন্য একাগ্র হতে পারে।

অতঃপর ঈদগাহ অভিমুখে গমন করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে ঈদগায় যাওয়ার পথে উচ্চৈস্বরে তাকবীর বলবে না। আর সাহবাইনের মতে তাকবীর বলবে। তারা ঈদুল আযহার উপর কিয়াস করেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, সানা ও যিকির এর ব্যাপারে আসল হল গোপনীয়তা। কিন্তু ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে শরীআত প্রকাশ্য যিকিরের আদেশ দিয়েছে। কেননা, তা তাকবীর দিবস। কিন্তু ঈদুল ফিতর সেরূপ নয়।

ঈদের সালাতের পূর্বে ঈদগায় নফল পড়বে না। কেননা সালাতের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও নবী (সা.) তা করেননি। এরপর কেউ কেউ বলেন, এই মাকরূহ হওয়া ঈদগাহের জন্য নির্দিষ্ট।

আবার কেউ কেউ বলেন, সাধারণভাবে ঈদগাহ্ ও সব স্থানের জন্য ব্যাপক। কেননা নবী (সা.) তা করেননি। যখন সূর্য উপরে উঠে আসার মাধ্যমে সালাত আদায় করা জা্ইয হয়ে যায়, তখন থেকে যাওয়াল পর্যন্ত ঈদের সালাতের সময় থাকে। যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। কেননা নবী (সা.) সূর্য এক বা দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠতে ঈদের সালাত আদায় করতেন। আর (একবার) যখন সাহাবায়ে কিরাম যাওয়ালের পর চাদ দেখার সাক্ষ্য দিলেন, তখন তিনি পরবর্তী দিন ঈদগায় যাওয়ার আদেশ করলেন।

ইমাম লোকদের নিয়ে দুই রাকাআত সালাত আদায় করবেন। প্রথম রাকাআতে এক তাকবীর বলবেন তাহরীমার জন্য। তারপর তিনবার তাকবীর বলবেন। এরপর ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বেন এবং তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন। এরপর দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাত দিয়ে শুরু করবেন। তারপরে তিনবার তাকবীর বলবেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এ হল ইব্ন মাস'ঊদ (রা.) এর মত এবং তা আমাদের মাযহাব। ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, প্রথম রাকাআতে তাহরীমা তাকবীর বলে তার পর পাচটি তাকবীর বলবেন এবং দ্বিতীয় রাকাআতেও পাচবার তাকবীর বলার পর কিরাত পড়বে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, (দ্বিতীয় রাকাআতে) চারবার তাকবীর বলবেন। বর্তমানে ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর বংশধর খলীফাদের শাসনের যুগ হওয়ার কারণে সাধারণ লোকের আমল তার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মাযহাব হল প্রথমোক্ত মত। কেননা, (অতিরিক্ত) তাকবীর এবং হাত উঠানো সালাতের নির্ধারিত প্রকৃতির বিপরীত। সুতরাং নিম্নতর সংখ্যাই গ্রহণ করা শ্রেয়।

আর (ঈদের) তাকবীরসমূহ হল দীনের প্রতীক। এ জন্য তা উচ্চৈস্বরে আদায় করা হয়। সুতরাং এর প্রকৃত চাহিদা হলো মিলিতভাবে পাঠ করা। প্রথম রাকাআতে এই তাকবীরগুলোকে তাকবীরে তাহরীমার সাথে যুক্ত করা ওয়াজিব। যেহেতু এ তাকবীর ফরয এবং প্র্রথমে হওয়ার প্রেক্ষিতে এটার শক্তি বেশী। আর দ্বিতীয় রাকাআতে রুকুর তাকবীর ছাড়া অন্য কোন তাকবীর নেই। সুতরাং (ঈদের তাকবীরগুলো) তার সাথে যুক্ত করাই ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর মতামত গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি বর্ণিত সব ক'টি তাকবীরকে অতিরিক্ত হিসাব গ্রহণ করেছেন। ফলে (তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর দুই তাকবীরসহ) মোট তাকবীর তার মতে পনেরটি কিংবা ষোলটি হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দুই ঈদের তাকবীরগুলোতে উভয় হাত উপরে উঠাবে।

এটা দ্বারা ইমাম কুদূরী (র.) রুকুর তাকবীর ছাড়া অন্যান্য তাকবীর বুঝিয়েছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সাতটি স্থান ছাড়া অন্য কোথাও হাত তোলা হবে না। তন্মোধ্যো ঈদের তাকবীরসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত যে, হাত তোলা হবে না।আমাদের বর্ণিত এ হাদীছ এর বিপরীতে দলীল।

সালাতের পর (ইমাম) দু'টি খুতবা দিবেন। এ সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাতে লোকদের সাদকাতুল ফিত্র এর আহকাম শিক্ষা দিবস। কেননা এ খুতবা এ উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে।

যে ব্যক্তির ইমামের সাথে সালাতুল ঈদ ফউত হয়ে গেছে, সে তা কাযা পড়বে না। কেননা এই প্রকৃতির সালাত এমন কিছু শর্তসাপেক্ষেই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে, যা মুনফারিদ দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না।

যদি চাদ মেঘাবৃত হয়ে যায় আর লোকেরা শাওয়ালের পর শাসক (বা তার নিযুক্ত ব্যক্তির) নিকট চাদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ইমাম আগামী দিন ঈদের সালাত আদায় করবেন। কেননা এ বিলম্ব ওযরের কারণে। এ অনুযায়ী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

যদি কোন ওযরবশত আগামী দিনও সালাত আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে এর পরে আর তা পড়বে না। কেননা জুমুআর ন্যায় এ ক্ষেত্রেও মূলনীতি হল কাযা না করা। তবে আমরা বর্ণিত হাদীছের কারণে তা বর্জন করেছি। আর হাদীছে ওযরবশত দ্বিতীয় দিন পর্যন্তই বিলম্বিত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। ঈদুল আযহার দিনও গোসল করা এবং খুশবু ব্যবহার করা মুসতাহাব। এর দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর সালাত থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত আহার বিলম্বিত করবে। কেননা হাদী্ছে আছে যে, নবী (সা.) কুরবানীর দিন (ঈদগাহ থেকে) ফিরে আসার আগে কিছু খেতেন না। এরপর আপন কুরবানীর গোশত থেকে খেতেন।

আর তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে। কেননা নবী করিম (সা.) পথে তাকবীর বলতেন।

আর ঈদুল ফিতরের মত দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। (সাহাবায়ে কিরাম থেকে) এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন। কেননা নবী করীম (সা.) এরূপ করেছেন।

তাতে লোকদের কুরবানী (আহকাম) এবং তাকবীরে তাশরীক শিক্ষা দিবেন। কেননা এ হল সেই সময়ের আহকাম, আর তা শিক্ষা দানের জন্যই খুতবার বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি কোন ওযরবশতঃ ঈদুল আযহার দিন সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে পরের দিন এবং (সেদিন সম্ভব না হলে) তার পরের দিন সালাত আদায় করবে। এরপরে তা আদায় করবে না। কেননা, এ সালাত কুরবানীর সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরবানীর দিনগুলোর সাথে সীমিত থাকবে। তবে বিনা ওযরে বিলম্ব করলে বর্ণিত আমলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে গুনাহ্গার হবে।

আর আরাফা পালন নামে মানুষ যা পালন করে থাকে, তার কোন (শরীআতী) ভিত্তি নেই।

'আরাফা পালন' অর্থ আরাফা মাঠে অবস্থানকারীদের সাথে সাদৃশ্যের উদ্দেশ্যে আরাফা দিবসে (যিলহজ্জরে নয় তারিখে) কোন স্থানের মানুষের সমবেত হওয়া। কেননা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করাই ইবাদত রূপে স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং ঐ স্থান ছাড়া অন্যত্র তা ইবাদত (বলে গণ্য) হবে না। যেমন হজ্জের অন্যান্য আমল।

পরিচ্ছেদঃ তাকবীরে তাশরীক

আরাফা দিবসের ফজরের সালাতের পর থেকে তাকবীরে তাশরীক শুরু করবে এবং কুরবানী দিবসের আসরের সালাতের পর তা শেষ করবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন আসরের সালাতের পর তা শেষ করবে।

বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই সাহেবাইন আলী (রা.) এর মত গ্রহণ করেছেন, দিবসের সংখ্যাধিক্যের উপর প্রেক্ষিতে। কেননা, ইবাদতের ব্যাপারে এতেই সতর্কতা রয়েছে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিম্নতর সংখ্যার উপর আমল করার উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এর মত গ্রহণ করেছেন। কেননা উচ্চৈস্বরে তাকবীর বলার মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে (তাই নিশ্চিতের উপর আমল করা শ্রেয়ঃ)।

আর তাকবীর হল একবার বলবেঃ

কেননা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলায়হিস সালাম থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর এইটি ফরয সালাতসমূহের পর ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফার মতে শহরে মুস্তাহাব জামা'আতে সালাত আদায়কারী মুকীমদের উপর। সুতরাং স্ত্রী লোকদের জামা'আতের ক্ষেত্রে যেখানে কোন পুরুষ নেই, এবং মুসাফিরদের জামা'আতের বেলায় যাদের সঙ্গে কোন মুকীম নেই, সেখানে তা ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন বলেন, তা ওয়াজিব ফরয সালাত আদায়কারী প্রত্যেকের উপর। কেননা এ তাকবীর ফরয সালাতের অনুগামী ।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হল ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

তাশরীক অর্থ উচ্চৈস্বরে তাকবীর বলা। খলীল ইব্ন আহমদ থেকে এটি বর্ণিত। তাছাড়া উচ্চৈস্বরে তাকবীর বলা সুন্নতের খিলাফ। আর শরীআতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় উপরোক্ত শর্তসমূহ একত্র হওয়ার বেলায়। অবশ্য স্ত্রী লোকেরা পুরুষের পিছনে ইকতিদা করলে এবং মুসাফিরগণ মুকীমের পিছনে ইকতিদা করলে অনুগামী হিসেবে তাদের উপরও (তাকবীরে তাশরীক) ওয়াজিব হবে।

ইমাম (আবূ ইউসূফ) ইয়া'কূব(র.) বলেন, আরাফা দিবসে মাগরিবের সালাতে আমি ইমামতি করলাম এবং তাকবীর বলতে ভুলে গেলাম। তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাকবীর বললেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম তাকবীর তরক করলেও মুক্তাদী তা তরক করবে না। কেননা এটা সালাতের তাহরীমার মধ্যে আদায় করা হয় না। সুতরাং তাতে ইমাম অপরিহার্য নন। বরং ইমামের অনুরণ মুস্তাহাব মাত্র।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ

সালাতুল কুসূফ

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন সূর্যগ্রহণ হবে তখন ইমাম নফলের অনুরূপ দু'রাকাআত সালাত আদায় করবেন। প্রতি রাকাআতে একটি রুকই হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, (প্রতি রাকাআতে) দু'টি রুকু হবে। তার দলীল হল 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছ।

আমাদের দলীল হল ইব্ন উমার (রা.) বর্ণিত হাদীছ। আর যেহেতু (ইমামের সংগে) নৈকট্যের কারণে বিষয়টি পুরুষদের কাছেই অধিকতর প্রকাশিত সেহেতু ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

উভয় রাকাআতে (ইমাম) কিরাত দীর্ঘ করবেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে (ইমাম) নীরবে কিরাত পড়বেন। আর সাহেবাইনের মতে উচ্চৈস্বরে পড়বেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অনুরূপ মতও বর্ণিত হয়েছে।

কিরাত দীর্ঘ করার বক্তব্যটি উত্তম হিসাবে গণ্য। সুতরাং ইচ্ছা করলে ইমাম কিরাত সংক্ষিপ্ত করতে পারেন। কেননা, সুন্নাত হল গ্রহণের সময়টিকে সালাত ও দু'আ দ্বারা পরিপূর্ণ করা। সুতরাং একটিকে সংক্ষিপ্ত করলে অন্যটিকে দীর্ঘ করবে। নীরবে এবং উচ্চৈস্বরে কিরাত পড়ার ব্যাপারে সাহেবাইনের দলীল হল 'আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাতে উচ্চৈস্বরে কিরাত পড়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হল ইব্ন 'আব্বাস ও সমুরাহ ইব্ন জুন্দুর (রা.) এর রিওয়ায়াত। আর অগ্রাধিকারের প্রদানের কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর কেন হবে না? এটা তো দিনের সালাত, আর দিনের সালাত হল নিশব্দ।

সালাতের পর সূর্য গ্রহণ মুক্ত হওয়া পর্যন্ত দু'আ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যখন তোমরা এ ধরনের ভয়াবহ কোন অবস্থা দেখতে পাবে, তখন তোমরা দু'আর মাধ্যেমে আল্লাহর অভিমুখী হবে।

আর দু'আসমূহের ক্ষেত্রে নিয়ম হল তা সালাতের পরে হওয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ইমাম জুমুআর সালাত পড়ান, তিনিই সালাতুল কুসুফ পড়াবেন। তিনি উপস্থিত না হলে লোকেরা একা একা সালাত আদায় করবে।

(ইমামতির জন্য কে অগ্রবর্তী হবে, এই) ফিতনা হতে বাচার জন্য।

চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে জামা'আত নেই। কেননা রাত্রিকালে সমবেত হওয়া কষ্টকর। কিংবা সংকট সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। আর প্রত্যেকে একা একা সালাত আদায় করবে।কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যখন তোমরা এই ধরনের ভয়ংকর কিছু দেখতে পাবে, তখন তোমরা সালাতের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

সূর্য গ্রহণের সালাত (জুমু'আর মত) কোন খুতবা নেই। কেননা তা হাদীছে বর্ণিত হয়নি।

ঊনবিংশ অনুচ্ছেদ

ইসতিসকার সালাত

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, ইসতিসকার এর জন্য জামা'আতসহ সালাত আদায় করা সুন্নত নয়। তবে লোকেরা যদি একা একা সালাত পড়ে নেয় তবে তা জাইয। আসলে ইসতিসকা হল দু'আ ও ইসতিগফার।

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- তখন আমি বললাম, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাও। নিসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইসতিসকা করেছেন. কিন্তু তার থেকে সালাত আদায় করা বর্ণিত হয়নি।

সাহেবাইনের বলেন, ইমাম দু'রাকআত সালাত আদায় করবেন। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সা.) দুই রাকাআত ইসতিসকার সালাত আদায় করেছেন, ঈদের সালাতের মত। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) একথা বর্ণনা করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি সালাত আদায় করেছেন, আবার কখনো পড়েননি। সুতরাং এটি সুন্নত নয়।

মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এককভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উভয় রাকাআতে কিরাত উচ্চৈস্বরে পড়বে। ঈদের সালাতের উপর কিয়াস করে।

অতপর (ইমাম) খুতবা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) খুতবা দিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তা হবে ঈদের খুতবার মত (দুই খুতবা বিশিষ্ট)। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তা খুতবা একটিই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে (ইসতিসকার জন্য) কোন খুতবা নেই। কেননা, খুতবা হল জামা'আতের অনুগামী। আর তার মতে (ইসতিসকার সালাতে) জামা'আত নেই।

দু'আর সময় কিবলামুখী হবে। কেননা, হাদীছে আছে যে, নবী করিম (সা.) কিবলামূখী হয়েছেন এবং আপন চাদর উলটিয়েছেন।

আর ইমাম সাহেব আপন চাদর উলটাবেন।

এর দলীল আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

গ্রন্থকার বলেন, এ হল ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে চাদর উলটাবে না। কেননা এ তো দুআ। সুতরাং অন্যান্য দু'আর সাথেই একে বিবেচনা করতে হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা ছিল সুলক্ষণ গ্রহণ হিসাবে।

তবে মুকতাদীরা তাদের চাদর উল্টাবে না। কেননা এমন বর্ণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে তা করার আদেশ করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যিম্মী অধিবাসীগণ ইসতিসকার সালাতে হাযির হবে না। কেননা ইসতিসকার হল রহমত নাযিলের প্রার্থনা করার জন্য, অথচ তাদের উপর তো গযব নাযিল হওয়ার কথা।

বিংশ অনুচ্ছেদ

ভয়কালীন সালাত

যখন (শত্রুর) ভয় তীব্র হয়, তখন ইমাম লোকদের দুই দলে ভাগ করবেন। একদলকে শত্রুর মুখোমুখি রাখবেন আবার দ্বিতীয় দলকে নিজের পিছনে দাড় করাবেন।

এরপর এই দলকে নিয়ে এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবেন। যখন তিনি দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা তুলবেন, তখন এই দলটি শত্রুর সামনে অবস্থান নিতে চলে যাবে। এবং (শত্রু মুখোমুখি অবস্থানকারী) ঐ দলটি চলে আসবে। আর ইমাম তাদের নিয়ে এক রাকআত ও দুই সাজদা আদায় করবেন এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু পিছনে ইকতিদাকারী দলটি সালাম ফেরাবে না বরং শত্রুর সামনে (অবস্থান গ্রহণ করতে) চলে যাবে। এবং প্রথম দলটি এসে একা একা ও কিরাত ছাড়া এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবে।

(কিরাত না পড়ার) কারণ এই যে, তারা হল 'লাহিক' আর তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুখোমুখি চলে যাবে। আর অপর দলটি ফিরে এসে কিরাত সহ এক রাকাআত ও দুই সাজদা আদায় করবে। কেননা তারা হল মাসবূক (আর মাসবূকের উপর কিরাত পড়া ওয়াজিব)।

এবং তারা তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। এ বিষয়ে মূল হল ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করিম (সা.) উপরে বর্ণিত নিয়মে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন সালাত আদায় করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) যদিও আমাদের যামানায় এর শরীআত সম্মত হওয়া অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তার বিপরীতে দলীল রয়েছে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম যদি মুকীম হন তবে প্রথম দলটির সংগে দুই রাকাআত এবং দ্বিতীয় দলের সংগে দুই রাকাআত পড়বেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যুহরের সালাত উভয় দলের সংগে দুই দুই রাকাআত করে পড়েছেন।

সালাতের অবস্থায় তারা লড়াই করবে না। যদি করে তবে তাদের সালাত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা খন্দক যুদ্ধের দিন নবী করিম (সা.) ব্যস্ততার কারণে চার ওয়াক্ত সালাত আদায় করেননি। যদি লড়াই করা অবস্থায়ও আদায় করা জাইয হতো, তবে কিছুতেই তিনি তা তরক করতেন না।

যদি ভয়ভীতি আরো তীব্র হয় তবে লোকেরা সওয়ার অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করবে আর যদি কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না হয় তবে যেদিকে সম্ভব সেদিকে অভিমুখী হয়ে ইশারার মাধ্যমে রুকু-সাজদা আদায় করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- যদি তোমরা ভীত হয়ে পড় তবে হাটা অবস্থায় কিংবা সওয়ার অবস্থায় (সালাত আদায় করবে)।

আর কিবলামূখী হওয়ার হুকুম প্রয়োজনের কারণে রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, (সেই অবস্থায়ও) তারা জামা'আতের সাথে সালাত পড়বে। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ মত নয়। কেননা (জামাআতের জন্য) অভিন্ন স্থান বিদ্যমান নেই।

একবিংশ অনুচ্ছেদ

সালাতুল জানাযা

যখন কোন লোকের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাকে ডান পার্শ্বের উপর কিবলামূখী করে শোয়াবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

(এটা করা হবে) তার কবরের অবস্থানের অবস্থা সামঞ্জস্য রেখে। কেননা সে তো কবরের নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে চিত করে শোয়ানোই প্রচলিত। কেননা, এ হল রুহ বের হওয়ার জন্য অধিকতর সহজ। তবে প্রথম সুরত হল সুন্নত। এবং তাকে উভয় শাহাদাতের তালকীন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমরা তোমাদের মৃতদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই কালিমার সাক্ষ্য দানের তালকীন কর। মৃত দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যার মৃত্যু আসন্ন।

যখন সে মারা যায় তখন তার চোয়াল বেধে দিবে এবং চোখ দুটো বন্ধ করে এরূপ করাই উত্তম ।

পরিচ্ছেদ গোসল

যখন তাকে গোসল দেয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তাকে একটি খাটে শোয়াবে।

যাতে পানি তার থেকে নীচের দিকে সরে যায়। আর তার সতরের স্থানে এক খন্ড বস্ত্র রেখে দেবে।

এরূপ করা হবে সতরের ওয়াজিব রক্ষা করার জন্য। তবে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গোসলের কাজ সহজ করার জন্য মূল লজ্জাস্থান ঢাকাই যথেষ্ট।

আর (গোসলদানকারীরা) তার সমস্ত কাপড় খুলে ফেলবে, যাতে তাদের পক্ষে তাকে পরিস্কার করা সহজসাধ্য হয়। এবং তারা তাকে কুলি ও নাকে পানি দেয়া ছাড়া উযূ করাবে। কেননা উযূ হল গোসলের সুন্নত। তবে যেহেতু তার (মুখ ও নাক) থেকে পানি বের করা কঠিন, সেহেতু কুলি ও নাকে পানি দেয়া তরক করবে।

তারপর সারাশরীরে পানি প্রবাহিত করবে। জীবদ্দশার গোসলের কথা অনুসরণে। অতপর তার খাটিয়ায় ধুনী দেওয়া হবে বে-জোড় সংখ্যায়। কেননা এত মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। বে-জোড় করার কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ বে-জোড়, তাই তিনি বে-জোড় সংখ্যা পসন্দ করেন। আর যদি বড়ই পাতা কিংবা 'উশনান' দ্বারা পানি সিদ্ধ করবে অধিকতর পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে।

যদি তা না পাওয়া যায়, তবে শুধু পানিই যথেষ্ট। কেননা তা দ্বারা মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর তার মাথা ও দাড়ি খিতমী (এক প্রকার তৃণ) দ্বারা ধৌত করবে। যাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়।

আর যদি তার মাথা ও দাড়ি খিতমী (এক প্রকার তৃণ) দ্বারা ধৌত করবে। যাতে অধিক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়।

এরপর তাকে বামপ্বার্শে শয়ন করবে এবং বড়ই পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা তাকে গোসল দেবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নীচ পর্যন্ত পৌছে গেছে। অতপর তাকে ডান পার্শ্বে শয়ন করাবে এবং ধুইবে যতক্ষণ না দেখা যায় যে, পানি তার নীচ পর্যন্ত পৌছে গেছে। কেননা ডান দিক থেকে শুরু করাই সুন্নত। এরপর তাকে বসাবে এবং নিজের দিকে তাকে হেলান দিয়ে তার পেট হালকাভাবে মুছবে। যাতে পরে কাফন নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়। যদি তার পেট থেকে কিছু বের হয় তবে তা ধুয়ে ফেলবে। গোসল বা উযূ দোহরাবে না। কেননা, গোসলের দেওয়া আমরা জেনেছি শরীআতের নির্দেশ। আর তা একবার পালিত হয়ে গেছে।

এরপর একটি কাপড় দ্বারা তার শরীরে চুষে ফেলবে। যাতে তার কাফন ভিজে না যায়।

এরপর মাইয়েতকে তার কাফনে রাখবে। এরপর তার মাথায় ও দাড়িতে সুগন্ধি মাখবে এবং সাজদার অংগগুলোতে কর্পুর মাখবে। কেননা, সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নত, আর সাজদার অংগগুলো অধিক সম্মানযোগ্য।

মাইয়েতের চুল বা দাড়ী আচড়াবে না এবং তার লম্বা চুল কাটবে না। কেননা ‘আইশা (রা.) বলেছেন- কেন তোমরা তোমাদের মুর্দারের মাথার চুল পরিপাটি করছ? কেননা, এই সব কাজ হল সৌন্দর্যের জন্য। আর মাইয়েতের জন্য এগুলোর প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে জীবিত ব্যক্তির জন্য এগুলো হল পরিচ্ছন্নতার বিষয়। যেহেতু এগুলোর নীচে ময়লা জমে থাকে। সুতরাং তা খাতনার মত হয়ে গেল।

পরিচ্ছেদ কাফন পরান

http://islaminonesite.wordpress.com/

সুন্নত এই যে, পুরুষকে ইযার, কামীছ ও চাদর এই তিন কাপড়ে কাফন দিবে। কেননা বর্ণিত রয়েছে যে, নবী (সা.) কে সাহূলিয়া'র তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল।

তাছাড়া এই হল স্বভাবত তার জীবদ্দশায় সাধারণ পরিধেয় পোশাক। সুতরাং তার মৃত্যুর পরেও একই রকম হবে।

অবশ্য যদি দুই কাপড়ে সীমিত রাখা হয় তবুও তা জাইয আছে। আর এ দুই কাপড় হল ইযার ও চাদর। হল ন্যূনতম কাফন। কেননা আবূ বকর(রা.) বলেছেন, আমার এ কাপড় দু'টি ধুয়ে দিও এবং তাতেই আমাকে কাফন দিও।

তাছাড়া এটা হল জীবিতদের ন্যূনতম পোশাক। ইযারের পরিমাণ হল মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চাদরও অনুরূপ। আর কামীছ হল গলা থেকে পা পর্যন্ত।

যখন কাফন পেচানোর ইচ্ছা করবে তখন মাইয়েতের বাম দিক থেকে শুরু করবে।এবং সেদিক থেকে তার উপর লেপটিয়ে দিবে। অতপর ডান দিক। যেমন জীবিত অবস্থায় করা হয়। কাফন বিছানোর সুরত এই যে, প্রথমে চাদর বিছাবে, তারপর তার উপর ইযার বিছাবে, তারপর মাইয়েতের কুর্তা পরানো হবে। তারপর তাকে ইযারের উপর রাখা হবে। অতপর প্রথমে বাম থেকে এরপর ডান থেকে ইযার পেচানো হবে। অতপর একই ভাবে চাদর পেচানো হবে।

যদি কাফন সরে যাওয়ার আশংকা হয় তবে একটি বস্ত্রখন্ড দ্বারা তা বেধে দিবে, যাতে অনাবৃত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

স্ত্রীলোককে পাচটি কাপড়ে কাফন দিবে। যথা, কোর্তা, ইযার, ওড়না, চাদর ও পট্টি যা দ্বারা তার সিনা বেধে রাখা হবে। কেননা উম্মু আতিয়্যাহ্ (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, নবী (সা.) তার কন্যাকে গোসলদানকারিণী স্ত্রী লোকদেরকে পাচটি কাপড় দিয়েছিলেন। এবং এ কারণে যে, জীবদ্দশায় সাধারণত এই পাচ কাপড়ে সে বের হয়ে থাকে। সুতরাং মৃত্যুর পরেও অনুরূপ হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর এটা হল সুন্নত কাফনের বয়ান। যদি তিনটি কাপড়ের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে যথা ইযার চাদর ও ওড়না, তবে জাইয হবে। এটা হল (মেয়েদের জন্য) ন্যূনতম কাফন।

এর চেয়ে কম করা মাকরূহ হবে। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে এক কাপড়ের উপর সীমিত করা মাকরূহ হবে- জরুরী অবস্থা ছাড়া। কেননা মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা.) যখন শহীদ হলেন, তখন তাকে এক বস্ত্রে কাফন দেওয়া হয়েছিল। এ হল জরুরী অবস্থার কাফন।

স্ত্রীলোককে প্রথমে কুর্তা পরানো হবে। তারপর তার চুলগুলো দুই ভাগ করে তার বুকে কোর্তার উপর রাখতে হবে। তারপর তার উপরে ওড়ানো পরানো হবে। তারপর ইযার দেয়া হবে –চাদরের নীচে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফনের কাপড়ের মাঝে মাইয়েতকে স্থাপনের পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় ধুনী দেওয়া হবে। কেননা নবী করীম (সা.) তার কন্যার কাফনকে বেজোড় সংখ্যায় ধুপ দিতে আদেশ করেছিলেন। আর ধুনী দেওয়া হল সুরভিত করা। কাফন থেকে ফারেগ হয়ে মাইয়েতের উপর জানাযার সালাত পড়বে। কেননা এ হল ফরয।

পরিচ্ছেদ মাইয়েতের উপর সালাত আদায়

সুলতান যদি উপস্থিত থাকেন তবে মাইয়েতের উপর সালাত আদায়ের ব্যাপারে তিনিই সব চেয়ে বেশী হকদার। কেননা, তার উপর অন্যকে, অগ্রগামী করাতে তার অবমাননা রয়েছে।

যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে কাযী (অধিক হকদার) কেননা তিনিও কর্তৃত্বের অধিকারী।

আর যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তবে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দান করা মুস্তাহাব। কেননা, মাইয়েত তার জীবদ্দশায় তার ইমামতিতে সন্তুষ্ট ছিল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন- তারপর মাইয়েতের অভিভাবক অধিক হকদার। আর ওয়ালী বা অভিভাবকদের ক্রম সেই অনুসারেই হবে, যা নিকাহ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যদি ওয়ালী ও সুলতান ছাড়া অন্য কেউ জানাযা পড়িয়ে থাকে তবে ওয়ালী তা পুনরায় পড়তে পারেন, যদি ইচ্ছা করেন। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, অধিকার বা হক হল ওয়ালীদের।

যদি ওয়ালী জানাযা পড়ে থাকেন তাহলে তার পরে অন্য কারো জানাযার সালাত আদায় করা জা্ইয নয়। কেননা ফরয তো প্রথমবার পড়া দ্বারাই আদায় হয়ে গেছে। আর নফল হিসাবে জানাযা পড়া শরীআত স্বীকৃত নয়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, সকল স্তরের লোকেরা নবী করিম (সা.) এর রওযা শরীফে জানাযা পড়া থেকে বিরত রয়েছেন। অথচ যেভাবে কবরে রাখা হয়েছে, সেভাবেই তার পবিত্র দেহ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।

যদি জানাযা না পড়েই মাইয়েতকে দাফন করা হয়ে থাকে তবে তার কবরেই জানাযা পড়বে। কেননা নবী করিম (সা.) জনৈক আনসারী স্ত্রীলোকের কবরে জানাযা পড়েছিলেন।

তবে লাশ গলিত হওয়ার পূর্বেই তার জানাযা পড়বে। আর তা বোঝার ব্যাপার প্রবল মতের উপর নির্ভরশীল। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা, অবস্থা, সময় ও স্থান বিভিন্ন রকম রয়েছে।

জানাযার সালাত এই যে, প্রথমে এক তাকবীর বলবে। অতপর ‘সানা’ পড়বে। অতপর আরেক তাকবীর বলে নবী করিম (সা.) এর উপর দরূদ পড়বে। অতপর আরেক তাকবীর বলে নিজের জন্য, মাইয়েতের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য দু’আ করবে। অতপর চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শেষ যে দিয়েছে। ইমাম যদি পঞ্চম তাকবীর বলেন, তবে মুক্তাদী তাকে অনুসরণ করবে না। ইমাম যুফার (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, পঞ্চম তাকবীরের হাদীছটি আমাদের পূর্ব বর্ণনার প্রেক্ষিতে রহিত হয়ে গেছে। তবে এক বর্ণনা মতে মুক্তাদী ইমামের সালাম ফেরানোর অপেক্ষা করবে। এ মতই গ্রহণীয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর দু'আসমূহ পাঠ করার উদ্দেশ্য হল মাইয়েতের জন্য ইসতিগফার করা। আর প্রথমে সানা এরপর দরূদ পাঠ হল দু'আর সুন্নত। বাচ্চার জন্য ইসতিগফার করবে না, বরং একথা বলবে- হে আল্লাহ্!তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী করুন এবং আমাদের জন্য তাকে দাওয়াত লাভের মাধ্যম এবং আখেরাতের সঞ্চয় বানিয়ে দিন এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ গ্রহণকৃত বানিয়ে দিন।

ইমাম যদি এক তাকবীর বা দুই তাকবীর দিয়ে সেরে থাকেন, তবে (পরে) আগত ব্যক্তি তার উপস্থিতির পর ইমামের আরেক তাকবীর বলার পূর্বে তাকবীর বলবে না।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.) এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে উপস্থিতির সময়েই তাকবীর বলবে। কেননা প্রথম তাকবীর হল সালাত শুরু করার তাকবীর। আর মাসবূককে এ তাকবীর বলতে হয়।

উভয় ইমামের দলীল হল (জানাযার) প্রতিটি তাকবীর একেক রাকাআতের স্থলবর্তী। আর মাস্‌বূক, সালাতের যে অংশ ফউত হয়ে যায়, তা দিয়ে সালাত শুরু করে না। কেননা এরূপ করা রহিত হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে যদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও ইমামের সংগে তাকবীর না বলে থাকে, তবে সকলেরই মতে সে দ্বিতীয় তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা সে মুদরিকের সমপর্যায়ভূক্ত।

যে (ইমাম) পুরুষ বা স্ত্রীলোকের উপর সালাত পড়বে সে বুক বরাবর দাড়াবে। কেননা, তা কলবের স্থান এবং তাতেই ঈমানের নূর বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সেই বরাবর দাড়ানোর অর্থ এই দিকে ইংগিত করা যে, তার ঈমানের কারণে শাফাআতে দু'আয়ে মাগফিরাত করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরো বর্ণনায় রয়েছে যে, ইমাম পুরূষের মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মাঝামাঝি দাড়াবে। কেননা, আনাস (রা.) এরূপ করেছেন এবং বলেছেন যে, এটাই সুন্নত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আনাস (রা.) সম্পর্কিত হাদীছের ব্যখ্যায় আমরা বলি যে, উক্ত মহিলার জানাযার উপর অতিরিক্ত আবরণ ছিল না। কাজেই তিনি স্ত্রীলোকটির জানাযা এবং লোকদের সাথে আড়াল হয়ে দাড়িয়েছিলেন।

যদি লোকেরা সওয়ার অবস্থায় জানাযা পড়ে তবে তা জাইয হবে-সাধারণ কিয়াস মুতাবিক। কেননা, ইহা মূলত দু'আ। কিন্তু সূক্ষ কিয়াস মুতাবিক জাইয হবে না। কেননা তাহরীমা বিদ্যমান থাকার কারণে এক দিক থেকে তা সালাত। সুতরাং সতর্কতার খাতিরে বিনা ওযরে কিয়াম তরক করা জাইয হবে না।

জানাযার সালাতের ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান অবৈধ নয়। কেননা অগ্রবর্তিতা হল ওয়াজিব হক। সুতরাং অন্যকে অগ্রবর্তী করে নিজের হক বাতিল করার তিনি অধিকার রাখেন। কোন কোন নুসখা বা অনুলিপিতে (অনুমতি) এর পরিবর্তে শব্দটি রয়েছে। এর অর্থ হল লোকদের জানিয়ে দেওয়া অর্থাত্ একে অন্যকে অবহিত করবে, যাতে তারা মাইয়েতের হক আদায় করতে পারে।

জামা'আত হয় এমন মসজিদের ভিতরে জানাযা পড়বে না। কেননা নবী করিম (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযার সালাত পড়বে তার কোন সাওয়াব নেই।

তাছাড়া, এই জন্যও যে, মসজিদ তো তৈরী হয়েছে ফরয সালাত আদায় করার জন্য। তদুপরি মসজিদ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর মাইয়েত যদি মসজিদের বাইরে রক্ষিত হয় সে ক্ষেত্রে মাশায়েখগণের মধ্যে মত ভিন্নতা রয়েছে।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে শিশু কেদে ওঠে, তার নাম রাখা ও তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে। কেননা নবী (সা.) বলেছেন- নবজাতক যদি কেদে ওঠে তবে তার জানাযা পড়া হবে। আর যদি না কাদে তবে তার উপর জানাযা পড়া হবে না। যেহেতু কেদে ওঠা হল প্রাণের অস্তিত্বের প্রমাণ। সুতরাং না কাদলে তার ক্ষেত্রে মৃতদের নিয়ম-কানুন কার্যকর হবে।

যে শিশু যদি তার (অমুসলিম) মা-বাবার কোন একজনের সংগে বন্দী হয় এবং মৃত্যুবরণ করে তবে তার জানাযা পড়া হবে না। কেননা (ধর্মের দিক থেকে) সে পিতা-মাতার অনুবর্তী।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তবে যদি সে ইসলাম স্বীকার করে নেয় এবং তার বোধশক্তি থেকে থাকে কেননা সূক্ষ কিয়াস মতে তার ইসলাম গ্রহণ শুদ্ধ। কিংবা যদি পিতা –মাতার কোন একজন ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কেননা, ধর্ম হিসাবে সে পিতা-মাতার উত্তম জনের অনুগামী হবে।

যদি পিতা-মাতার একজনও তার সংগে বন্দী না হয় তবে জানাযা পড়া হবে। কেননা তখন তার ক্ষেত্রে দারুল ইসলামের অনুবর্তিতা প্রকাশ পাবে। ফলে তাকে মুসলমান বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, যেমন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ক্ষেত্রে।

যদি কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে আর তার কোন মুসলমান অভিভাবক থাকে তবে সে তার গোসল দিবে, কাফন পরাবে এবং তাকে দাফন করবে।

হযরত আলী (রা.) কে তার পিতা আবূ তালিব সম্পর্কে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছিল। তবে তাকে গোসল দিবে নাপাক কাপড় ধোয়ার মত। আর বস্ত্রখন্ডে পেচানো হবে এবং একটি গর্ত খোড়া হবে। কাফন ও কবরের বেলায় সুন্নত তরীকা অনুসরণ করা হবে না এবং যত্নের সাথে কবরে নামানো হবে না। বরং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পরিচ্ছেদ জানাযা বহন

মাইয়েতকে খাটিয়ায় রাখার পর লোকেরা চার পায়া ধরে উঠাবে।

হাদীছে এমনই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এতে হবে জানাযার সহযাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিকতর সম্মান ও হিফাজত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, সুন্নত এই যে, জানাযা দু'জন লোক বহন করবে। সামনের জন (খাটিয়ার হাতল) কাধে স্থাপন করবে। দ্বিতীয় জন বুক বরাবর ধারণ করবে। কেননা হযরত সা'আদ ইব্ন মু'আয (রা.) এর জানাযা এভাবে বহন করা হয়েছিল। এর জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, তা করা হয়েছিল সা'আদ (রা.) এর জানাযার উপর ফেরেশতাগণের ভিড়ের কারণে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে চলবে। তবে দৌড়ে নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যখন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন- দৌড়ের চেয়ে কম গতিতে। যখন মাইয়েতের কবর পর্যন্ত পৌছে যাবে তখন মাইয়েতকে কাধ থেকে নামানোর পূর্বে উপস্থিত লোকদের বসে পড়া মাকরূহ। কেননা কখনো সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে। আর দাড়ানো অবস্থায় তা অধিক সম্ভবপর।

আর জানাযা বহনের নিয়ম এই যে, প্রথমে জানাযার সামনের অংশ তোমার ডান কাধে রাখবে। অতপর জানাযার পিছনের অংশ তোমার ডান কাধে রাখবে। অতপর জানাযার সামনের অংশ তোমার বাম কাধে রাখবে এরপর পিছনের অংশ তোমার বাম কাধে রাখবে। এটা করা হবে ডান দিককে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য। এ নিয়ম হল পালাক্রমে বহনের ক্ষেত্রে।

পরিচ্ছেদ দাফন

কবরকে লাহদ রূপে খনন করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, লাহদ হল আমাদের জন্য। আর খাড়া কবর হল অন্য জাতির জন্য। মাইয়েতকে কেবলার দিক থেকে (গ্রহণ করে) দাখিল করা হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে মাইয়েতকে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হবে। কেননা, নবী করিম (সা.) কে পায়ের দিক থেকে নিয়ে দাখিল করা হয়েছিল।

আমাদের দলীল এই যে, কেবলার দিক হল সম্মানিত। সুতরাং সেদিক থেকে প্রবেশ করানোই মুস্তাহাব হবে। আর নবী করিম (সা.) কে কবরে প্রবেশ করানো সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী।

মাইয়েতকে যখন কবরে রাখা হবে তখন অবতরণকারী আল্লাহ্র নামে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মিল্লাতের উপর রাখছি। বলবে । রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবূ দুজানা (রা.) কে কবরে নামানোর সময় এ দু'আ বলেছিলেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর তাকে কেবলামুখী করবে। রাসূলুল্লাহ(সা.) এরূপ্ই আদেশ করেছেন।

আর কাফনের গিঠ খুলে দিবে। কেননা এখন আর সরে যাওয়ার ভয় নেই।

আর 'লাহ্দ' এর মুখে কাচা ইট সমান করে বসিয়ে দিবে। কেননা নবী করিম (সা.) এর কবর শরীফে কাচা ইট বসানো হয়েছিল।

লাহদের মুখে ইট বসানো পর্যন্ত স্ত্রীলোকের কবর কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখবে। তবে পুরুষের কবর কাপড় দ্বারা ঢাকতে হবে না। কেননা, স্ত্রীলোকের অবস্থার ভিত্তি হল পর্দার উপর আর পুরূষের অবস্থার ভিত্তি হল উন্মুক্ত থাকার উপর।

পোড়া ইট বা কাঠ ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা এগুলো হল ঘর মজবুত করার জন্য। অথচ কবর হল জীর্ণ হয়ে নিঃশেষ হওয়ার স্থান। তাছাড়া পোড়া ইটে আগুনের আছর রয়েছে। সুতরাং কুলক্ষণ গ্রহণ হিসাবে তা মাকরূহ হবে।

আর বাশ ব্যবহারে অসুবিধা নেই। এর ভাষ্য মতে কাচা ইট ও বাশ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কেননা নবী (সা.) এর কবর শরীফে এক আটি বাশ ব্যবহার করা হয়েছিল।

অতঃপর কবরে মাটি ঢেলে দেওয়া হবে। আর কবরকে কুজের মত করা হবে। সমতলও করা হবে না এবং চতুষ্কোণও করা হবে না। কেননা নবী করীম (সা.) কবর চতুষ্কোণ করতে নিষধ করেছেন। আর যারা নবী করীম (সা.) এর কবর শরীফ দেখেছেন, তারা বর্ণনা করেছেন, তা কুজ সদৃশ।

দ্বাবিংশ অনুচ্ছেদ

শহীদ

শহীদ ঐ ব্যক্তি, যাকে মুশরিকরা হত্যা করেছে কিংবা যুদ্ধের মাঠে (মৃত) পাওয়া গেছে আর তার দেহে চিহ্ন রয়েছে। কিংবা মুসলমানরা তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং তাকে হত্যা করার কারণে দিয়াতে ওয়াজিব হয়নি। এমন ব্যক্তিকে কাফন দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে কিন্তু গোসল দেওয়া হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা সে উহুদের শহীদের শ্রেণীভূক্ত। আর তাদের সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তাদেরকে তাদের জখম ও রক্তসহ আবৃত কর। গোসল দিও না।

সুতরাং যে কেউ লৌহাস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে নিহত হয় আর সে পবিত্র ও প্রাপ্তবয়স্ক এবং হত্যার বিনিময়ে কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ হয় না, সে উহুদের শহীদদের শ্রেণীভূক্ত। সুতরাং তাকে তাদের সংগে যুক্ত করা হবে।

'চিহ্ন' দ্বারা যখম উদ্দেশ্য। কেননা যখম নিহত হওয়ার পরিচায়ক। তেমনি অস্বাভাবিক স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া। যেমন, চোখ বা এরূপ কোন স্থান থেকে।

শাফিঈ (র.) জানাযার সালাতের ক্ষেত্রে আমাদের সাথে মতভেদ করেছেন। তিনি বলেন, তরবারির আঘাত গুনাহ্ মুছে ফেলে। সুতরাং (জানাযার নামাযের মাধ্যমে) দু'আ –ইসতিগফারের প্রয়োজন নেই।

আমরা এর জবাবে বলি, মাইয়েতের জানাযা পড়া হয় তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য। আর শহীদ তো সম্মানের যোগ্য। তাছাড়া পাপ থেকে পবিত্র ব্যক্তিও দু'আর প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়; যেমন নবী ও শিশু।

হারবী, যুদ্ধাবস্থায় কাফির কিংবা বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত যাকে হত্যা করবে তাকে যে জিনিস দ্বারাই হত্যা করুক, গোসল দেওয়া হবে না। কেননা উহুদের শহীদানের সকলেই তরবারি বা লৌহাস্ত্র দ্বারা নিহত ছিলেন না।

জানাবাত অবস্থায় কেউ যদি শহীদ হয়, তাহলে আবূ হানীফা (র.) এর মতে তাকে গোসল দেওয়া হবে।

সাহেবাইন বলেন যে, তাকে গোসল দেওয়া হবে না। কেননা, জানাবাত দ্বারা যে গোসল ওয়াজিব হয়েছিল, তা মৃত্যু দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। আর মৃত্যুর দরুন দ্বিতীয় গোসলটি শাহাদাতের কারনে ওয়াজিব হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, শাহাদাত গোসল রোধকারী হিসাবে স্বীকৃত, লোপকারী নয়। সুতরাং তা জানাবাতকে লোপ করবে না। আর বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে যে, হানযালা (রা.) যখন জানাবাতগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে গোসল দান করেছিলেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

হায়িয ও নিফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যখন পবিত্র হয়ে (শাহাদাত বরণ করে) তখন তার সম্পর্কে একই মতভিন্নতা রয়েছে। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হায়িয বা নিফাস শেষ হওয়ার আগে শাহাদাত বরণ করলেও তার সম্পর্কে একই মতভিন্নতা রয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু সম্পকেও অনুরূপ মতভেদ।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, শিশু তো এই মর্যাদা লাভের অধিকতর উপযুক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর জবাব এই যে, পবিত্র অবস্থায় থাকা হিসাবে উহুদের শহীদানের ক্ষেত্রে তরবারির আঘাত গোসলের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর তো গুনাহ নেই। সুতরাং সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভূক্ত হবে না।

শহীদের রক্ত ধোয়া হবে না এবং তার কাপড়-চোপড় খোলা হবে না। এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। তবে চর্মের বা তুলভর্তি পরিধেয় অস্ত্র–শস্ত্র ও মোজা খুলে নেওয়া হবে। কেননা এগুলো কাফন জাতীয় নয়।

আর কাফনের কাপড় পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে (প্রয়োজন অনুযায়ী) ইচ্ছামত বাড়াবে কিংবা কমাবে। যে ব্যক্তি জীবনের কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের পর মারা যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে।

অর্থাত্ যে ব্যক্তি জীবনের আরাম ও সুবিধা গ্রহণের কারণে শাহাদাতের হুকুম লাভের ক্ষেত্রে (কিছুটা সময় ক্ষেপন করে) পুরনো হয়ে গেছে। কেননা এ কারণে জুলুমের চিহ্ন কিছুটা লঘু হয়ে গেছে। ফলে সে উহুদের শহীদানের শ্রেণীভূক্ত হল না।

‘সুযোগ সুবিধা গ্রহণের অর্থ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা, নিদ্রা যাওয়া, ঔষধ (ও চিকিৎসা) গ্রহণ করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে (নিরাপদ স্থানে) স্থানান্তরিত হওয়া। কেননা এভাবে সে জীবনের কিছু সুবিধা ভোগ করল। আর উহুদের শহীদগণ পানির পেয়ালা তাদের সামনে তুলে ধরা সত্ত্বেও পিপাসার্ত অবস্থায় মারা গেছেন। কিন্তু শাহাদাতের মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকায় তারা (পানিটুকু) গ্রহণ করেননি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কিন্তু যদি কোন আহত ব্যাক্তি এ কারণে আহত হওয়ার স্থান থেকে তুলে আনা হয়, যাতে ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট না হয় (তবে তা সুযোগ গ্রহণ বলে গণ্য হবে না। কেননা সে কোন প্রকার আরাম লাভ করেনি। আর যদি কোন শিবিরে বা তাবুতে এনে রাখা হয় তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সে সুবিধা গ্রহণকারী গণ্য হবে।

আর যদি এক ওয়াক্ত সালাত অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সজ্ঞানে সে বেচে থাকে তবে সে সুবিধা গ্রহণকারী হল। কেননা উক্ত সালাত তার যিম্মায় ঋৃণ হয়ে গেল। আর তা জীবিতদের সাথে সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্ভূক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত।

যদি আখিরাত সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ওসীয়ত করে তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে সেও সুবিধাগ্রহণকারী বলে গণ্য হবে।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে সে সুবিধা গ্রহণকারী হবে না। কেননা ওসীয়ত করা তো মাইয়েতের আহকামভূক্ত বিষয়।

যাকে নগরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাকে গোসল দেওয়া হবে। কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল কাসামাহ ও দিয়্যত। সুতরাং এতে করে তার জুলুমের প্রতিক্রিয়া হালকা হয়ে যায়।

তবে যদি জানা যায় যে, তাকে লৌহার অস্ত্র দ্বারা অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। (এমতাবস্থায় গোসল দেয়া হবে না) কেননা তার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল কিয়াস, যা একটি শাস্তি। আর হত্যাকারী বাহ্যতঃ কোনক্রমেই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে না, দুনিয়াতে কিংবা আখিরাতে।

আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে যে অস্ত্রে প্রাণ সংহার বিলম্বিত হয় না, তা তলোয়ারের হুকুমভূক্ত। ইনশাল্লাহ্ (অপরাধসমূহ) অধ্যায়ে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

যাকে হদ বা কিসাস হিসাবে কতল করা হয়েছে, তাকে গোসল দেওয়া হবে এবং তার উপর জানাযা পড়া হবে । কেননা সে তার উপর সাব্যস্ত হক আদায় করার জন্য আপন প্রাণ ব্যয় করেছে। অথচ উহুদের শহীদগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের

জন্য নিজেদের জান উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং তাকে তাদের সংগে যুক্ত করা যাবে না।

সে সকল বিদ্রোহী কিংবা ডাকাত নিহত হয়, তাদের উপর জানাযা পড়া হবে না।কেননা আলী (রা.) বিদ্রোহীদের উপর জানাযা পড়েননি।

ত্রয়োবিংশ অনুচ্ছেদ

কা'বার অভ্যন্তরে সালাত

কা'বার অভ্যন্তরে ফরয ও নফল সালাত আদায় জাইয। উভয় বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) এর ভিন্ন মত রয়েছে। আর শূধু ফরযের ব্যাপারে মালিক (র.) এর ভিন্ন মত রয়েছে।

আমাদের দলীল রাসূলূল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন।

আর এ কারণে যে, অভ্যন্তরীণ সালাতের যাবতীয় শর্ত সম্পন্ন হয়েছে। এতে কেবলামুখী হওয়াও পালিত হয়েছে। কেননা সমগ্র কা'বা সম্মুখে রাখা শর্ত নয়।

ইমাম যদি কা'বার ভিতরে জামা'আতের ইমামতি করেন, আর তখন মুক্তাদীদের কেউ ইমামের পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে দাড়ায় তবুও জাইয হবে। কেননা সে কেবলামুখী রয়েছে আপন ইমামকে ভুলের উপর রয়েছে বলেও সে মনে করে না। চিন্তা করে কিবলা নির্ধারণের বিষয়টি এর বিপরীত।

আর তাদের মাঝে যে ইমামের দিকে পিঠ দিয়ে দাড়াবে, তার নামায জাইয হবে না। কেননা যে তার ইমামের চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাড়াবে, তার নামায জাইয হবে না। কেননা সে তার ইমামের অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। ইমাম যদি মাসজিদুল হারামে সালাত পড়ান আর লোকেরা কা'বার চারপাশে হালকা করে দাড়ায় এবং ইমামের সালাতে ইকতিদা করে সালাত পড়ে তা হলে তাদের মধ্যে যে কাবা'র

http://islaminonesite.wordpress.com/

দিকে ইমামের চেয়ে অধিক নিকটবর্তী হয়, তারও সালাত জাইয হবে, যদি সে পাশে না দাড়িয়ে থাকে, যে পাশে ইমাম আছেন। কেননা একই পার্শ্বে হওয়ার বেলায়ই অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতা প্রকাশ পাবে।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কারণ, আমাদের মতে কা'বা হল আসমান পর্যন্ত খোলা স্থল ও শূন্য স্থান, ভবন নয়। আর ভবন তো স্থানান্তরিতও হতে পারে। এ জন্যই তো কেউ জাবালে আবূ কূবায়স এর চূড়ায় উঠে সালাত আদায় করলে তার সালাত জাইয হবে। অথচ ভবন তো তার সম্মুখে বিদ্যমান নেই। অবশ্য কা'বার পাশে আদায় মাকরূহ। কেননা এতে কা'বার প্রতি অসম্মান করা হয় এবং এ সম্পর্কে নবী (সা.) থেকে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

অধ্যায়ঃ যাকাত

স্বাধীন জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ব্যাক্তি ‘নিসাব’ পরিমাণ পূর্ণ মালিক হল এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন ঐ ব্যক্তি (সম্পদের) উপর যাকাত ওয়াজিব (অর্থাত্ ফরয) হয়।

ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী আর তোমরা যাকাত প্রদান কর।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর। তদুপরি এ সিদ্ধান্তের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত। ওয়াজিব শব্দে ফরয বুঝান হয়েছে। কেননা (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে দলীল) তাতে 'সন্দেহের' কোন অবকাশ নেই।

স্বাধীন হওয়ার জন্য যে শর্ত তা দ্বারা মালিকানার পূর্ণতা অর্জিত হয়। আর 'জ্ঞান সম্পন্ন' ও প্রাপ্ত বয়স্কতার শর্ত আরোপ করার কারণ একটু পরেই উল্লেখ করছি।

মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, যাকাত হল একটি ইবাদত। আর কাফিরের পক্ষ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত হতে পারে না।

নিসাব পরিমাণ মালের মালিকানা জরুরী, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ পরিমাণকে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণরূপে নির্ধারণ করেছেন।

এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া জরূরী। কেননা এমন একটা সময়কাল অপরিহার্য যাতে (মালের) বৃদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। আর শরীআত তার সীমা নির্ধারণ করেছে 'এক বছর ' দ্বারা। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন মালে যাকাত নেই। তাছাড়া এ সময়ের অবকাশে মাল বর্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এতে বিভিন্ন মৌসুম সমূহ শামিল রয়েছে। আর সাধারণতঃ তাতে মূল্যের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং হুকুম ও সিদ্ধান্তটি তারই উপর আবর্তিত করা হয়েছে।

আর কোন কোন মতে যাকাত হলো তাৎক্ষনিক ওয়াজিব। কেননা এ-ই 'নিঃশর্ত' আদেশের চাহিদা।

আর কারো কারো মতে এটি বিলম্বিত ওয়াজিব। কেননা সমগ্র জীবনই হল এটি আদায় করার সময়। এ কারণেই আদায়ে ত্রুটির পর নিসাব বিনিষ্ট হয়ে গেলে তার উপর আদায়ের যিম্মাদারী থাকে না।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যাক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যাকাত হল আর্থিক দায়-দায়িত্ব। সুতরাং এটা অন্যান্য আর্থিক দায়-দায়িত্বের সমতুল্য। যেমন স্ত্রীদের ভরণ পোষন। আর এটি উশর ও খিরাজের অনুরূপ হয়ে যায় (যা বাচ্চা ও পাগলের মাল থেকেও নেয়া হয়)।

আমাদের যুক্তি এই যে, যাকাত হল ইবাদত। সুতরাং স্ব-ইচ্ছা ছাড়া তা আদায় হবে না, যাতে 'পরীক্ষা' এর দিকটি সাব্যস্ত হতে পারে। আর 'আকল' না থাকার কারণে এ দু'জনের 'স্ব-ইচ্ছা' বলতে কিছু নেই।

'খারাজ' এর বিপরীত। কেননা খারাজ হল ভূমি কর। জমির আর্থিক 'দায়' তদ্রুপ উশরের ক্ষেত্রে 'আর্থিক দায়' এর একটিই প্রধান। পক্ষান্তরে 'ইবাদত' এর দিকটি আনুসঙ্গিক।

পাগল যদি বছরের কোন অংশে সুস্থত্য লাভ করে তবে সেটা রোযার ক্ষেত্রে মাসের কোন অংশে সুস্থতা লাভ করার সমতুল্য হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে বছরের অধিকাংশ সময় ধর্তব্য। আর পাগলের বেলায় স্থায়ী কোন পার্থক্য নেই।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবালক যদি পাগল অবস্থায় বালেগ হয় তবে সুস্থতা লাভের সময় থেকে বছর পূর্ণ হওয়া বিবেচনা করা হবে। যেমন নাবালগের জন্য সাবালক হওয়ার সময় থেকে।

'মুকাতাব' এর উপর যাকাত নেই। কেননা সে পূর্ণভাবে মালের মালিক নয়। কারণ তার মধ্য্য মালিকানার পরিপন্থি দাসত্ব বিদ্যমান। এ কারনেই সে আপন গোলামকে আযাদ করার অধিকারী নয়।

যার উপর তার সম্পদকে বেষ্টনকারী ঋণ রয়েছে, তার উপর যাকাত নেই।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যাকাত ওয়াজিব হবে। যেহেতু যাকাতের সব বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হল পূর্ণ নিসাবের মালিক হওয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, তার মাল তার মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। সুতরাং সেটাকে অস্তিত্বহীন গণ্য করা হবে। যেমন পিপাসা নিবৃতির জন্য রক্ষিত পানি এবং ব্যবহারিক ও কর্তব্য সম্পাদনের কাপড়।

যদি তার সম্পদ ঋৃণ থেকে অধিক হয় তবে উদ্বৃত্ত অংশ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিবে। কেননা তা প্রয়োজন মুক্ত। আর ঋৃণ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ঋৃণ, মানুষের পক্ষ থেকে যার তাগাদাকারী রয়েছে। সুতরাং মান্নত ও কাফ্‌ফারার ঋৃণ যাকাতকে বাধা দিবে না। আর যাকাতের ঋৃণ নিসাব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যাকাতকে বাধা দেয়। কেননা ঐ ঋৃণের কারণে নিসাব কমে যাবে। তদ্রুপ মাল নষ্ট করার পরও একই হুকুম।

উভয় ক্ষেত্রে যুফার (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। আর কথিত বণনা মতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। কেননা আমাদের দলীল হল (মানুষের পক্ষ হতে) এই মালের তাগাদাকারী রয়েছে। গবাদি পশুর ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তা। পক্ষান্তরে ব্যবসা দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাগাদাকারী হলেন শাসনকর্তার নায়েব। কেননা মালিকগণ তার পক্ষে নায়েব বিবেচিত হয়ে থাকেন।

বসবাসের ঘরে, ব্যবহারের কাপড় চোপড়, ঘরের আসবাবপত্রে, সওয়ারির পশুর ক্ষেত্রে, খিদমতের গোলামদের ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারের অস্ত্রাদির ক্ষেত্রে যাকাত নেই। কেননা তা মৌলিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত । তাছাড়া তা ‘বর্ধন-গুণ’ সম্পন্ন নয়। জ্ঞানসেবীদের জ্ঞানচর্চায় ব্যবহৃত কিতাবাদি এবং পেশাদার লোকদের উপকরণাদি সম্পর্কেও একই হুকুম। এই কারণে যা আমরা (এইমাত্র) বলেছি।

যার অন্য কারো উপর কোন ঋৃণ রয়েছে, কিন্তু সে কয়েক বছর ধরে তা অস্বীকার করে এসেছে, অতঃপর ঋৃণসংক্রান্ত প্রমাণ তার হাতে এল, তখন সে উক্ত মালের বিগত বছরগুলোর যাকাত প্রদান করবে না।

এর অর্থ এই যে, ঋৃণ গ্রহীতা মানুষের নিকট স্বীকারোক্তির করার কারণে তার পক্ষে প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এটা ‘মালে যিমার’ এর মাসআলার অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

হারিয়ে যাওয়া মাল, পলাতক বা পথহারা গোলাম, ছিনিয়ে নেওয়া মাল, যার পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, সমুদ্র (অর্থাত্ অথৈ পানিতে) পড়ে যাওয়া মাল, খোলা মাঠে পুতে রাখা মাল, যার স্থান এখন মনে নেই এবং শাসক যে মাল বাজেয়াপ্ত করেছেন-এ সবই 'মালে যিমারের' অন্তর্ভূক্ত।

পলাতক, পথহারা ও ছিনিয়ে নেওয়া গোলামের পক্ষ থেকে সাদকাতুল ফিত্র ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ের ব্যাপারেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

ইমাম যুফার (র.) ও শাফিঈ (র.) এর দলীল এই যে, (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণ, বিদ্যমান। আর হস্তচ্যুত হওয়া (যাকাত) ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। যেমন, মুসাফিরের (বাড়ীতে রক্ষিত) মাল।

আমাদের দলীল হল আলী (রা.) এর বাণী – মালে যিমারের উপর যাকাত নেই। তাছাড়া (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ) হল বর্ধন-গুণ সম্পন্ন মাল। আর হস্তক্ষেপ ও পরিচালনার সক্ষমতা ছাড়া বর্ধন সম্ভব নয়। আর উপস্থিত ক্ষেত্রে তার সক্ষমতা নেই। পক্ষান্তরে মুসাফির তার স্থলবর্তীর মাধ্যমে পরিচালনা করতে সক্ষম। (সুতরাং এর উপর সেগুলোকে কিয়াস করা ঠিক নয়)।

ঘরে পুতে রাখা মাল নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে। কেননা তা হস্তগত করা সহজ। আর জমিতে বা বাগানে পুতে রাখা মাল সম্পর্কে (যদি স্থান ভূলে যায়) তবে মাশায়েখগণের মতভেদ রয়েছে।

ঋণের কথা স্বীকার করে এমন কোন লোকের নিকট যদি ঋণ থাকে, তবে সে স্বচ্ছল হোক কিংবা অস্বচ্ছল, ঐ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা (সচ্ছলের ক্ষেত্রে) সরাসরি কিংবা (অসচ্ছলের ক্ষেত্রে উপার্জনের পর) উক্ত ঋণ উদ্ধার করা সম্ভব।

তদ্রূপ (যাকাত ওয়াজিব হবে) যদি ঋণ এমন অস্বীকারকারী ব্যক্তির নিকট থাকে যার অনকূলে প্রমাণ রয়েছে কিংবা কাযী সে বিষয়ে অবগত থাকেন। কারণ আমরা আগেই উল্লেক করেছি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ঋণ যদি এমন ব্যক্তির নিকট থাকে, যাকে দেউলিয়া করা হয়েছে আর সে ঋণের কথা স্বীকার করে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে উক্ত মাল নিসাব রূপে গণ্য হবে। কেননা, তার মতে কাযীর পক্ষ থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা শুদ্ধ নয়।

পক্ষান্তরে, ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা দেউলিয়া ঘোষণা করা দ্বারা তার মতে দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) দেউলিয়াত্ব সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে মুহাম্মদ (র.) এর সাথে একমত। পক্ষান্তরে গরীব লোকদের প্রতি সুবিবেচনার লক্ষ্যে যাকাতের হুকুম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সঙ্গে একমত।

কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে দাসী খরিদ করলে, তারপর তাকে খিদমতে নিয়োজিত করার নিয়্যত করলে, তাহলে ঐ দাসী থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা, নিয়্যত কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে। অর্থাত্ ব্যবসা বর্জন করা।

আর যদি পুনরায় ব্যবসায় নিয়্যত করে তবে তাকে বিক্রি করার পূর্ব পর্যন্ত তা ব্যবসায়ের জন্য বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং (বিক্রির পরে) তার মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, এখানে নিয়্যত কর্মের সংগে যুক্ত হয়নি। কারণ সে তো (এখনও) ব্যবসা করেনি। সুতরাং নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। এ কারণেই তো মুসাফির শুধু নিয়্যতের দ্বারাই মুকীম হয়ে যায়। কিন্তু মুকীম সফর ছাড়া শুধু নিয়্যত দ্বারা মুসাফির হয় না।

যদি কোন জিনিস খরিদ করে আর ব্যবসার নিয়্যত করে তবে সেটা ব্যবসার জন্যই গণ্য হবে। কেননা, নিয়্যত কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবসার নিয়্যত করে, তা হলে ব্যবসার জন্য গণ্য হবে না। কেননা তার পক্ষে থেকে কোন কর্ম পাওয়া যায় নি।

আর যদি দানের মাধ্যমে, ওসীয়তের মাধ্যমে, বিবাহের মাধ্যমে, ‘খোলা’ এর মাধ্যমে অথবা কিয়াসের উপর সন্ধির মাধ্যমে বস্তুটির মালিক হয় এবং সেটাকে ব্যবসার জন্য নিয়্যত করে, তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তা ব্যবসার জন্য হয়ে যাবে। কেননা নিয়্যতটি কর্মের সংগে যুক্ত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তা ব্যবসার মধ্য গণ্য হবে না। কেননা নিয়্যতটি ‘ব্যবসা কর্মের’ সংগে যুক্ত হয়নি। কারো কারো মতে মতভেদটি এর বিপরীত।

যাকাত আদায় করার সংগে যুক্ত নিয়্যত কিংবা যাকাত পরিমাণ অর্থ আলাদা করার সংগে নিয়্যত ছাড়া আদায় করা সহীহ্ হবে না। কেননা যাকাত একটি ইবাদত। সুতরাং তার জন্য নিয়্যত শর্ত হবে। আর নিয়্যতের ক্ষেত্রে আসল হল কর্মের সংগে যুক্ত হওয়া। তবে যেহেতু ‘যাকাত প্রদান’ (সাধারণত) বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে। তাই সহজতার লক্ষ্যে যাকাতের অর্থ আলাদা করার সময় নিয়্যতের উপস্থিতিই যথেষ্ট। যেমন সিয়ামের ক্ষেত্রে নিয়্যতকে অগ্রবর্তী করার বিষয়টি।

যে ব্যক্তি যাকাতের নিয়্যত ব্যতীত সমস্ত মাল দান করে ফেলে, তার যাকাতের ফরয আদায় হয়ে যাবে।

এটা হল সূক্ষ কিয়াসের ভিত্তিতে। কেননা তার উপর ওয়াজিব ছিল মালের একটা অংশ দান করা। সুতরাং সমগ্র মালের মাঝেই তা নির্ধারিত আছে। অতএব নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই।

যদি আংশিক নিসাব দান করে থাকে তবে দানকৃত অংশের যাকাত রহিত হয়ে যাবে। এটি মুহাম্মদ (র.) এর মত। কেননা ওয়াজিব অংশটি সমগ্র মালের মাঝে বিস্তৃত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তা রহিত হবে না। কেননা অবশিষ্ট মাল ওয়াজিব যাকাতের ক্ষেত্র হতে পারার কারণে দানকৃত অংশ নির্ধারিত হয়নি। প্রথম সুরতটি এর বিপরীত। নির্ভুল বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

প্রথম অনুচ্ছেদ

গবাদি পশুর যাকাত

পরিচ্ছেদ উটের যাকাত

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পাচটি উটের কমে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন মুক্ত মাঠে বিচরণকারী উটের সংখ্যা পাচটি হয়, এবং তার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয় তখন পর্যন্ত উটের ক্ষেত্রে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা দশ হবে তখন চৌদ্দ পর্যন্ত তাতে দু'টি বকরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা বিশটি হবে তখন উনিশ পর্যন্ত তাতে তিনটি বকরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা বিশটি হবে তখন চব্বিশটি পর্যন্ত তাতে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা পচিশে উপনীত হবে তখন পয়ত্রিশ পর্যন্ত তাতে একটি 'বিনতে মাখায' অর্থাত্ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পনকারী উটনী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা ছয়ত্রিশ হবে তখন পয়তাল্লিশ পর্যন্ত তাতে একটি 'বিনতে লাবূন' অর্থাত্ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণকারী উটনী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা ছয়চল্লিশ হবে তখন ষাট পর্যন্ত তাতে একটি হিক্কা অর্থাত্ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণকারী উটনী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা একষট্টিতে উপনীত হবে তখন পচাত্তর পর্যন্ত তাতে একটি জাযা'আ অর্থাত্ পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী উটনী ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা ছিয়াত্তরটি হবে তখন নব্বই পর্যন্ত তাতে দু'টি 'বিনতে লাবূন' ওয়াজিব হবে। যখন উটের সংখ্যা একানব্বইয়ে উপনীত হবে তখন একশ' বিশ পর্যন্ত তাতে দু'টি 'হিক্কা' ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যাকাত সংক্রান্ত ফরমানসমূহ এভাবেই খ্যাতি লাভ করেছে।

অতঃপর যখন উটের সংখ্যা একশ বিশের অধিক হবে তখন (নিসাবের) 'বিধান' নতুন করে শুরু হবে। অর্থাত পাচটি উটে দুই হিক্কা সহ একটি বকরী ওয়াজিব হবে। এবং দশটিতে দু'টি বকরী এবং পনেরটিতে তিনটি বকরী এবং বিশটিতে চারটি বকরী ওয়াজিব হবে। এবং পচিশ থেকে একশ পঞ্চাশ পর্যন্ত একটি 'বিনতে মাখায' ওয়াজিব হবে। একশ' পঞ্চাশে গিয়ে তিনটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। অতঃপর নিসাবের বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে। অর্থাত্ পাচটিতে একটি বকরী এবং দশটিতে দুইটি বকরী এবং পনেরটিতে তিনটি বকরী এবং বিশটিতে চারটি বকরী আর পাচটিতে একটি বিনতে মাখায এবং ছত্রিশটিতে একটি 'বিনতে লাবূন' এবং যখন উট একশ' ছিয়ানব্বইটিতে উপনীত হবে তখন দু'শ পর্যন্ত চারটি হিক্কা ওয়াজিব হবে। অতঃপর একশ' পঞ্চাশের পরবর্তী যেভাবে পুনরাবৃত্তি হয়েছে, অনুরূপ বিধানের পুনরাবৃত্তি হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এ হল আমাদের মাযহাব। আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, একশ' বিশের উপর যখন একটি অতিরিক্ত হবে তখন তাতে তিনটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। যখন উট একশ' ত্রিশটি হবে তখন তাতে একটি হিক্কা ও দুইটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে। অতঃপর চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝে হিসাব আবর্তিত হতে থাকবে। অর্থাত্ চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন এবং প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা ওয়াজিব হতে থাকবে।

কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) এ মর্মে ফরমান জারি করেছিলেন যে, উটের সংখ্যা যখন একশ' বিশেষ অধিক হবে তখন প্রতি পঞ্চাশে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশে একটি বিনতে লাবূন ওয়াজিব হবে।

উক্ত ফরমানে বিনতে লাবূনের নিম্নবর্তী বিধান পুনঃআরোপ করার শর্ত উল্লেখ করা হয়নি।

আমাদের দলীল এই যে, আমর ইব্ন হাযমের পত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উপরোক্ত বক্তব্যের শেষে কথাও লিখেছেন- এর চেয়ে কম যা হবে, তাতে প্রতি পাচটিতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। সুতরাং এই অতিরিক্ত অংশ টুকুর উপরও আমল করতে হবে।

(যাকাতের ক্ষেত্রে) অনারব ও আরব উট একই রকম। কেননা সাধারণ শব্দে উভয় প্রকারই অন্তর্ভূক্ত। বিশুদ্ধ বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ গরুর যাকাত

গরুর ক্ষেত্রে ত্রিশের নীচে কোন যাকাত নেই। সুতরাং গরুর সংখ্যা যখন মুক্ত মাঠে বিচরণকারী গরু ত্রিশ হবে এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হবে, তখন তাতে একটি তাবী বা তাবী'আ অর্থাত্ দ্বিতীয় বছরে পদার্পনকারী নর বা মাদী বাছুর ওয়াজিব হবে। এবং চল্লিশটিতে একটি 'মুসিন' বা 'মুসিন্না' অর্থাত্ তৃতীয় বছরে পদার্পনকারী নয় নর বা মাদী বাছুর ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.) কে এরূপই আদেশ করেছিলেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যখন গরুর সংখ্যা চল্লিশের অধিক হবে তখন ষাট পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যাগুলোতে সেই পরিমাণ ওয়াজিব হবে।

এটি আবূ হানীফা (রা.) এর মত। সুতরাং অতিরিক্ত একটিতে একটি মুসিন্না এর চল্লিশ ভাগের একভাগ এবং দু'টিতে চল্লিশ ভাগের দুইভাগ এবং তিনটিতে একটি মুসিন্না এর চল্লিশ ভাগের তিন ভাগ ওয়াজিব হবে। এটা হল (মবসূতের কিতাবের) বর্ণনা।

কেননা (মধ্যবর্তী সংখ্যার ক্ষেত্রে) যাকাত মা'ফ হওয়া কিয়াসের বিপরীতে নাস (শরীআতের বাণী) দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আর এক্ষেত্রে কোন 'নাস' নেই। আর হাসান ইব্‌ন যিয়াদ (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পঞ্চাশে পৌছা পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যায় কিছুই ওয়াজিব হবে না। অতঃপর তাতে একটি 'মুসিন্না' এবং এক মুসিন্না' এর চতুর্থাংশ কিংবা এক 'তাবী' এর তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে।

কেননা এই (গরুর যাকাতের) নিসাবের ভিত্তি হল এই যে, প্রতি দু'টি দশকের মাঝে 'ছাড়' রয়েছে। এবং প্রতিটি দশকে ওয়াজিব আরোপিত। ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে ষাট উপনীত হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত সংখ্যায় কোন কিছু ওয়াজিব নেই। এটাও ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত।

কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.) কে বলেছেন- গরুর 'মধ্যবর্তী' সংখ্যাগুলো থেকে কিছু গ্রহণ করো না। আলিমগণ 'মধ্যবর্তী' সংখ্যার ব্যাখ্যা করেছেন চল্লিশ ও ষাটের মধ্যবর্তী দ্বারা।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এমনও বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত সংখ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গরুর বাছুর সমূহ।

অতঃপর ষাটটি গরুর ক্ষেত্রে দুইটি তাবী কিংবা তাবী'আ এবং সত্তরের ক্ষেত্রে একপি মুসিন্না ও একটি তাবী, এবং আশিটির ক্ষেত্রে দুটি মুসিন্না এবং নব্বইটির ক্ষেত্রে তিনটি তাবী এবং একশটির ক্ষেত্রে দু'টি তাবী ও একটি মুসিন্না ওয়াজিব হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

অনুরূপভাবে প্রতি দশে বিধান তাবী থেকে মুসিন্না তে এবং মুসিন্না থেকে তাবী এ রূপান্তরিত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি তাবী কিংবা তাবী'আ এবং প্রতি চল্লিশটি গরুতে একটি মুসিন কিংবা ওয়াজিব হবে।

মহিষ ও গরু (যাকাতের হুকুমের ক্ষেত্রে) সমান। কেননা শব্দটি উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। কারণ তা এরই শ্রেণী বিশেষ। তবে আমাদের দেশে সংখ্যাল্পতার কারণে মানুষের চিন্তা শব্দ দ্বারা সেদিকে ধাবিত হয় না। এ কারণেই কেউ যদি কসম করে যে, গরুর গোশত খাবে না তবে মহিষের গোশত খেলে কসম ভংগ হবে না। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ বকরীর যাকাত

মুক্ত মাঠে খাদ্য সংগ্রহকারী বকরী চল্লিশের নীচে হলে তার যাকাত নেই। যখন মাঠে বিচরণকারী সংখ্যা চল্লিশ হয় এবং সেগুলোর উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তখন তাতে একশ' বিশ পর্যন্ত একটি বকরী ওয়াজিব। যখন সংখ্যা একটি বাড়বে তখন দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী ওয়াজিব। অতঃপর যখন সংখ্যা একটি বাড়বে তখন তিনশ' পর্যন্ত তাতে তিনটি বকরী ওয়াজিব। যখন সংখ্যা চারশ' হবে তখন তাতে চারটি বকরী ওয়াজিব। অতঃপর প্রতি একশতে একটি বকরী ওয়াজিব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ফরমানে অতঃপর আবূ বকর (রা.) এর ফরমানে এরূপ বিবরণই এসেছে। আর এর উপর উম্মাতের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভেড়া ও ছাগল (নিসাবের ক্ষেত্রে) সমান। কেননা, শব্দটি সবগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করে। আর 'নাস' বা শরীআতের বাণীতে শব্দটি এসেছে।

বকরীর যাকাতে 'ছানী' (পূর্ণ এক বছরের) গ্রহণ করা হবে। ভেড়ার ক্ষেত্রে 'জাযা' গ্রহণ করা হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে হাসান ইব্ন যিয়াদ বর্ণিত রিওয়ায়াত মতে গ্রহণ করা হবে। বকীর মধ্যে 'ছানী' বলা হয়, যার এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। আর 'জাযা' বলা হয় যার বয়স ছ'মাসের উপরে হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে এবং সাহেবাইনেরও এ মত যে, 'জাযা' গ্রহণ করা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- আমাদের হক হল 'জাযা' ও ছানী' । তা ছাড়া জাযার দ্বারা কুরবানী আদায় হয়ে যায়। সুতরাং যাকাতও আদায় হবে।

জাহেরী বর্ণনার প্রমাণ হল আলী (রা.) থেকে মাওকুফ ও মারফূ রূপে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছ- যাকাতের ক্ষেত্রে এক বছরের এবং তদুর্ধ্বেরই শুধু গ্রহণ করা হবে।

তাছাড়া যাকাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হল মাঝারি, 'জাযা' তো ছোটর মধ্যেই গণ্য। এ কারণেই তো 'জাযা' ছাগলের মধ্য থেকে জাইয হয় না। তবে 'জাযা' দ্বারা কুরবানী জাইয হওয়ার বিষয়টি 'নাস' দ্বারা জানা গেছে।

আর উপরে বর্ণিত হাদীছে এর যে কথা বলা হয়েছে, সেটা দ্বারা কুরবানী জাইয হওয়ার বিষয়টি 'নাস' দ্বারা জানা গেছে।

আর উপরে বর্ণিত হাদীছে এর যে কথা বলা হয়েছে, সেটা দ্বারা উদ্দেশ্য হল উটের 'জাযা'।

বকরীর যাকাতের ক্ষেত্রে নর ও মাদী উভয় প্রকারই গ্রহণ করা হবে। কেননা শব্দটি উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- চল্লিশটি ছাগলে একটি ছাগল। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ ঘোড়ার যাকাত

ঘোড়া যদি মুক্ত মাঠে বিচরণকারী হয় এবং নর ও মাদী উভয় প্রকার মিশ্রিত থাকে তবে ঘোড়ার মালিকের ইখতিয়ার। তিনি ইচ্ছা করলে ঘোড়া প্রতি এক দীনার প্রদান করবেন কিংবা ঘোড়াগুলোর মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দু'শ দিরহাম থেকে পাচ দিরহাম প্রদান করবেন।

ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। যুফার (র.) ও এ মত পোষণ করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাহেবাইন বলেন, ঘোড়ার কোন যাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- নিজ গোলামের ক্ষেত্রে এবং নিজ অশ্বের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর কোন যাকাত নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- মুক্তভাবে বিচরণকারী প্রতিটি ঘোড়ায় এক দীনার কিংবা দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে।

সাহেবাইন যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন,তার উদ্দেশ্য হল মুজাহিদের ব্যবহৃত ঘোড়া।

যায়দ ইব্‌ন সাবিত(রা.) থেকে এ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এক দীনার প্রদান কিংবা মূল্য নির্ধারণ করার মাঝে ইচ্ছা প্রদানের বিষয়টি উমর(রা.) থেকে বর্ণিত।

আলাদা পুরুষ অশ্বের ক্ষেত্রে যাকাত নেই। কেননা তার বংশ বৃদ্ধি হয় না।

(সেরূপ আলাদা স্ত্রী অশ্বের ক্ষেত্রেও যাকাত নেই) এটা এক বর্ণনা মুতাবিক। ইমাম দ্বারা তার বংশবৃদ্ধিতে হতে পারে। কিন্তু পুরুষ অশ্বের বিষয়টি এর বিপরীত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য বর্ণনা অনুযায়ী আলাদা পুরুষ অশ্বের ক্ষেত্রেও যাকাত ওয়াজিব।

খচ্চর ও গর্দভের ক্ষেত্রে কোন যাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- এ দু'টি সম্পর্কে আমার উপর কোন বিধান নাযিল হয়নি।

আর যাকাতের 'পরিমাণ'সমূহ সাব্যস্ত হয়। [শারে'আ) এর নিকট থেকে] শ্রবণের মাধ্যমে। তবে যদি সেগুলো ব্যবসার জন্য হয় (তখন যাকাত ওয়াজিব হবে)। কেননা, তখন যাকাত সম্পর্কিত হবে মূল্যের দিক থেকে, যেমন অন্যান্য ব্যবসায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে।

পরিচ্ছেদঃ যে সব পশুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই।

উট-শাবক, গো-শাবক ও মেষ-শাবকের ক্ষেত্রে যাকাতে নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে। তবে যদি সেগুলোর সংগে বয়স্কও থাকে (তখন সেগুলো অনুবর্তী হিসাবে শাবকগুলোর উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।) এ ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সর্বশেষ মত। এবং এ-ই ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মত।

প্রথমে তিনি বলতেন যে, বয়স্কদের উপর যা ওয়াজিব হয়, ছোটগুলোর উপরও তাই ওয়াজিব হবে। এ-ই হলো ইমাম যুফার ও ইমাম মালিকের মাযহাব। এরপর এ মত প্রত্যাহার করে তিনি বলেছেন যে, শাবকগুলোর মধ্য থেকে তাদেরই একটি ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সর্বশেষ মত।

আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম শাফিঈ (র.) এরও এ মত।

তার প্রথম মতামতের দলীল এই যে, (শরীআতের) নির্দেশ উল্লেখিত নাম ছোট ও বড় উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে।

দ্বিতীয় মতের দলীল হল উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা নিশ্চিত করা। যেমন শুধু শীর্ণ পশুর ক্ষেত্রে তা থেকে একটি ওয়াজিব হয়।

শেষ মতের দলীল এই যে, পরিমাণসমূহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিয়াস ব্যবহার হতে পারে না। সুতরাং শরীআত প্রবর্তিত পরিমাণ ওয়াজিব করা যখন সম্ভব নয়, তখন সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু ছোটগুলোর সংগে একটিও যদি বয়স্ক থাকে তবে নিসাব পূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে সবগুলোকে বয়স্কটির অনুবর্তী ধরা হবে। কিন্তু যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে অনুবর্তী ধরা হবে না(বরং বয়স্কই আদায় করতে হবে।)

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে মেষ-শাবকের ক্ষেত্রে চল্লিশটির নীচে এবং গো-শাবকের ক্ষেত্রে ত্রিশটির নীচে যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর উট-শাবকের ক্ষেত্রে পচিশটির জন্য ওয়াজিব হবে। অতঃপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয়, যেখানে বয়স্ক উটের ক্ষেত্রে ওয়াজিব দুইটি হয়। অতঃপর আর কিছু ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না ঐ সংখ্যায় উপনীত হয় যেখানে বয়স্ক উটের ক্্েরে ওয়াজিব তিনটি হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এক বর্ণনা মুতাবিক পচিশের নীচে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তার পক্ষ থেকে অন্য একটি বর্ণনা মতে পচিশটিতে একটি শাবকের পঞ্চমাংশ এবং দশটিতে দুই-পঞ্চমাংশ এবং পরবর্তী প্রতি পাচে এই হিসাবে ওয়াজিব হবে।

তার পক্ষ থেকে আরেকটি বর্ণনা এই যে, পাচটি শাবকের ক্ষেত্রে এক শাবকের মূল্যের পঞ্চমাংশ এবং একটি মধ্যম বকরীর মূল্য বিচার করা হবে। এবং উভয়ের মধ্যে নিম্নতর মূল্যটি ওয়াজিব হবে। তদ্রুপ দশটির ক্ষেত্রে দু'টি বকরীর মূল্য এবং একটি উট শাবকের দুই-পঞ্চমাংশের মূল্য বিচার করা হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই হিসাবে চলবে।

ইমাম কুদূরী বলেন- যার উপর বিশেষ বয়সের কোন উট ওয়াজিব হয়েছে, কিন্তু তা পাওয়া গেল না, তখন যাকাত উশুলকারী তা থেকে বেশী বয়সেরটি গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত মূল্য ফেরত দিবে। কিংবা তার চেয়ে কম বয়সেরটি গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত মূল্যও উশুল করে নিবে।

এ মাসআ ভিত্তি এই যে, আমাদের নিকট যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ জাইয রয়েছে। বিষয়টি সামনে ইনশা'আল্লাহ্ আলোচনা করবো। তবে প্রথম সূরতে যাকাত সংগ্রহকারীর অধিকার রয়েছে উচ্চতর পশু গ্রহণ না করে যে পশু ওয়াজিব হয়েছে, হুবহু সেটা কিংবা তার মূল্য দাবী করার। কেননা এটা মূলতঃ ক্রয়।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যাকাত সংগ্রহকারীকে (নিম্নতর পশু গ্রহণে) বাধ্য করা হবে। কেননা,এখানে (ক্রয় ও) বিক্রয় নেই বরং এটা হল মূল্য দ্বারা যাকাত প্রদান।

আমাদের মতে যাকাতের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করা জাইয। কাফ্ফারাসমূহ এবং সাদকাতুল ফিতর, উশর ও নযরের ক্ষেত্রে একই হুকুম।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, 'নাস' এর অনুসরণ কল্পে মূল্য প্রদান জাইয নয়। যেমন হজ্জের হাদীছ ও কুরবাণীর পশুর ক্ষেত্রে।

আমাদের দলীল এই যে, যাকাত দরিদ্রকে প্রদানের আদেশ দানের উদ্দেশ্য হল তার নিকট প্রতিশ্রুত রিযিক পৌছানো। সুতরাং এ বিষয়টি (নাস-এ বর্ণিত) বকরীর শর্তকে বাতিল করে দেয়। তাই এটা 'জিযয়া' এর মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

হাদী (ও কুরবানীর) বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেখানে রক্ত প্রবাহিত করাই হল ইবাদত। আর তা যুক্তিনির্ভর নয়। (সুতরাং এ ক্ষেত্রে 'নাস' এর গন্ডিতে আবদ্ধ থাকা অপরিহার্য)। পক্ষান্তরে বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে ইবাদতের দিক হল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন মিটানো। আর এটা হল যুক্তিসঙ্গত।

কাজে নিয়োজিত ভারবহনে নিযুক্ত এবং সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত পশুর উপর যাকাত নেই।

(এ বিষয়ে) ইমাম মালিক (র.) এর ভিন্ন মত রয়েছে। তার দলীল হল প্রকাশ্য 'নাস'সমূহ।

আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- ভার বহনে এবং কাজে নিযুক্ত পশুর ক্ষেত্রে এবং চাষাবাদে নিযুক্ত গরুর ক্ষেত্রে যাকাত নেই।

তাছাড়া যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ হল বর্ধনশীল সম্পদ। আর বর্ধনশীলতার প্রমাণ হল মুক্ত মাঠে চরিয়ে পালিত কিংবা ব্যবসায় খাটানো। এখানে এর কোনটিই পাওয়া যায়নি।

তাছাড়া সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে ব্যয় বর্ধিত হয়। ফলে প্রকৃতপক্ষে সম্পদের 'বর্ধনশীলতা' লোপ পায়। চরণ শীল অর্থ ঐ সকল পশু, যারা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খায়। সুতরাং যদি মালিক অর্ধেক বছরে কিংবা তার বেশী সময় পশুপালকে সংগৃহীত খাদ্য খাওয়ায় তা হলে সেটা (সংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালিত) বলে গণ্য হবে। কেননা অল্প অধিকের অনুবর্তী বলে গণ্য হয়।

যাকাত সংগ্রহকারী উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না আর নিকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না, বরং মধ্যম মানের গ্রহণ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- লোকদের উৎকৃষ্ট মাল থেকে গ্রহণ করো না; বরং তাদের মধ্যম মাল থেকে গ্রহণ কর। আর এ জন্য যে, তাতে উভয় পক্ষের প্রতি সুবিবেচনা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী বলেন, যে ব্যক্তি নিসাবের অধিকারী হয় এবং বছরের মাঝে একই জাতীয় মাল লাভ করে, সে উক্ত পূর্ববর্তী নিসাবের সংগে যুক্ত করবে এবং উহার সাথে তারও যাকাত আদায় করবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, যুক্ত করা হবে না। কেননা, মালিকানা স্বত্বের দিক দিক থেকে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং তৎসম্পৃক্ত বিধানের ক্ষেত্রেও তা স্বতন্ত্র হবে। অর্জিত মুনাফা এবং ভূমিষ্ঠ বাচ্চার বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা তা মালিকানার ক্ষেত্রে (পুর্ববর্তী সম্পদের) অনুবর্তী। তাই মূল সম্পদের মালিকানায়ই এর মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, বাচ্চা ও মুনাফা যুক্ত করার কারণ কম সমজাতি হওয়া। কেননা, এ অবস্থায় পৃথকভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। সুতরাং প্রতিটি অর্জিত সম্পদের জন্য আলাদা বর্ষ গণনা করা কষ্টকর হবে। অথচ সহজ করার জন্যই বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

গ্রন্থকার বলেন , ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে যাকাত আরোপিত হয় নিসাবের উপর, (স্তরের পর) বাড়তি অংশের উপর নয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র) বলেন, নিসাব ও বাড়তি উভয় অংশের উপর যাকাত আরোপিত হয়। সুতরাং যদি স্তরের পর বাড়তি অংশ নষ্ট হয়ে যায় আর নিসাব অক্ষত থেকে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম ইউসূফ (র.) এর মতে ওয়াজিব পুরোপুরি থেকে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) এর মতে যে পরিমাণ মাল হালাক হয়েছে, ওয়াজিবও সেই অনুপাতে রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফার (র.) এর দলীল এই যে, যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সম্পদ রূপ নিয়ামতের শোকর হিসাবে। সমগ্র সম্পদই নিয়ামত।

আর শায়খাইন (র.) এর দলীল হল, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- পাচটি সায়মা উটের ক্ষেত্রে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। বাড়তির উপর কিছুই ওয়াজিব নয় সংখ্যা দশে উপনীত হওয়া পর্যন্ত। প্রতিটি নিসাবের ক্ষেত্রেই তিনি অনুরূপ বলেছেন। তিনি বাড়তির উপর ওয়াজিব হবে না বলেছেন।

তাছাড়া বাড়তি অংশটি হল নিসাবের অনুবর্তী। সুতরাং নষ্ট হওয়ার বিষয়টি প্রথমে বাড়তির উপর প্রযোজ্য হবে। যেমন মুযারাবার মালের মুনাফার উপর প্রযোজ্য নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, সম্পদের বাড়তি অংশের পর হালাক হওয়ার বিষয়টি শেষ নিসাবের দিকে ফেরানো হবে। এরপর তৎসংলগ্ন নিসাবের প্রতি; এভাবে শেষ পর্যন্ত চলবে। কেননা প্রথম নিসাবই হল মূল। তারপরে যা কিছু বাড়বে, তা উক্ত নিসাবের অনুবর্তী হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে প্রথমে বাড়তি অংশের দিকে ফেরানো হবে। অতঃপর সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ নিসাবের দিকে ফেরানো হবে।

বিদ্রোহীর যদি খারাজ ও গবাদিপশুর যাকাত উশুল করে নিয়ে থাকে তবে তাদের উপর দ্বিতীয়বার যাকাত ধার্য করা হবে না। কেননা শাসক তাদের রক্ষা করেননি। আর রাজস্ব উশুলের অধিকার হয় রক্ষা করার বিনিময়ে।

তবে তাদের এই ফাতওয়া দেওয়া হবে যেন তারা যাকাত নিজেই পুনঃ আদায় করে, খারাজ নয়।

তবে এটা শুধু তাদের ও আল্লাহ্‌র মাঝের বিষয়। কেননা, বিদ্রোহীরা যোদ্ধা হিসাবে বিদ্রোহীদের উপর খারাজ ব্যয় হতে পারে। আর যাকাত ব্যয়ের ক্ষেত্র হল দরিদ্ররা। আর বিদ্রোহীগণ দরিদ্রদের মধ্যে যাকাত প্রদান করবে না।

তবে কারো কারো মতে যদি তাদের প্রদানের সময় তাদের উপরই সাদকা করার নিয়্যত করে নেয় তাহলে তার উপর থেকে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। তদ্রুপ যে কোন যালিম হাকিমকে প্রদত্ত মালের একই হুকুম। কেননা তাদের উপর (মানুষের যত (আর্থিক) হক ও দায় দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলোর প্রেক্ষিতে তারা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র। তবে প্রথম হুকুম (অর্থাত পুনঃআদায়) অধিক সতর্কতাপূর্ণ।

বনী তাগলিব গোত্রের শিশুদের ‘সায়মার’ উপর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে তাদের স্ত্রীলোকদের উপর পুরুষদের সমপরিমাণ ওয়াজিব হবে। কেননা (তাদের ব্যাপারে) এই সমঝোতা হয়েছে যে, মুসলমানদের থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তাদের নিকট থেকে তার দ্বিগুণ গ্রহণ করা হবে। আর মুসলমানদের স্ত্রীলোকদের থেকে তো যাকাত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তাদের শিশুদের থেকে গ্রহণ করা হয় না।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর যদি মাল নষ্ট হয়ে যায় তবে যাকাত রহিত হয়ে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আদায়ের পর যদি হালাক হয়ে যায় তাহলে তার যিম্মায় যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা যাকাত যিম্মার উপর ওয়াজিব। সুতরাং এটা সাদকাতুল ফিতরের মত হল।

তাছাড়া তলব করার পরও সে আদায় করেনি। সুতরাং তা এমন হয়ে গেল, যেন নিজেই মাল ধ্বংস করেছে।

আমাদের দলীল এই যে, ওয়াজিব হল নিসাবের-ই একটি অংশ, সহজসাধ্য হওয়ার প্রতি বিবেচনা করে। সুতরাং ওয়াজিবের ক্ষেত্রে হওয়ার কারণে ওয়াজিবও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন অপরাধকারী গোলাম মারা গেলে অপরাধের কারণে তাকে সমর্পণ করার দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়।

আর যাকাতের হকদার হল সেই দরিদ্র, যাকে নিসাবের মালিক নিজে নির্বাচন করবে। সুতরাং এখানে তা নির্বাচিত দরিদ্র থেকে তলব পাওয়া যায়নি।

যাকাত উশুলকারীর তলব করার পরে হালাক হলে কোন কোন মতে যিম্মায় ওয়াজিব হবে। আর কোন মতে যিম্মায় ওয়াজিব থাকবে না, কেননা, সে নিজে হালাক করেনি।

আর স্বেচ্ছায় হালাক করার ক্ষেত্রে তার থেকে সীমালংঘন পাওয়া গেছে। (সুতরাং শাস্তি স্বরূপ ওয়াজিবের ক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে বলে গণ্য করা হবে।)

আংশিক মাল হালাক হলে সেই অনুপাতে যাকাত রহিত হবে। আংশিক-কে সময়ের উপর কিয়াস করে।

যদি নিসাবের মালিক হওয়া অবস্থায় বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করে তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কারণ তথা নিসাব বিদ্যমান হওয়ার পরে সে যাকাত আদায় করেছে। সুতরাং তা জাইয হবে। যেমন; (ভুলবশতঃ) জখম করার পরই কাফ্ফারা দিয়ে দিলে (আদায় হয়ে যায়)।

এ বিষয়ে ইমাম মালিক (র.) এর ভিন্ন মত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

একাধিক বছরের যাকাত অগ্রিম প্রদান করা জাইয আছে। কেননা (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার) কারণ (তথা নিসাব) বিদ্যমান রয়েছে।

যদি তার মালিকানায় একটি নিসাব বিদ্যমান থাকে তবে কয়েকটি নিসাবের যাকাতও প্রদান করতে পারে।

ইমাম যুফার (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দলীল এই যে, সরব বা কারণ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম নিসাবই হল আসল। এর উপর অতিরিক্ত হল তার অনুবর্তী। আল্লাহ্‌ই অধিক অবগত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

সম্পদের যাকাত

পরিচ্ছেদ : রূপার যাকাত

দু'শ দিরহামের নীচে কোন যাকাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পাচ আওকিয়ার নীচে কোন যাকাত নেই। আর এক আওকিয়ার পরিমাণ হলো চল্লিশ দিরহাম(বুখারী)।

দিরহাম যখন দু'শ হবে এবং তার উপর বর্ষপূর্তি হবে তখন তাতে পাচ দিরহাম ওয়াজিব হবে।। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) মু'আয (রা.) এর নামে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, প্রতি দু'শ দিরহাম হতে পাচ দিরহাম গ্রহণ করো এবং প্রতি বিশ মিছকাল স্বর্ণ হতে অর্ধ মিছকাল গ্রহণ কর। (দারা কুতনী)।

গ্রন্থকার বলেন, নিসাবের অতিরিক্তের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিরহাম না হওয়া পর্যন্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। চল্লিশে গিয়ে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এরপর প্রতি চল্লিশে এক দিরহাম। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত।

সাহেবাইন বলেন, দু'শর বেশী যা হবে, তার যাকাতেও সেই হিসাবে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এটি ইমাম শাফিঈ (র.) এর মত। কেননা আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছে দু'শর উপর যা অতিরিক্ত হবে, তার যাকাত সেই হিসাবে হবে।

তাছাড়া যাকাত তো ওয়াজিব হয়েছে নিআমতের মালের শোকর হিসাবে। তবে প্রারম্ভে নিসাব পরিমাণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, অভাব মুক্ত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। আর গবাদি পশুর ক্ষেত্রে (প্রারম্ভিক) নিসাবের পরেও বিশেষ স্তরে পৌছার শর্ত আরোপ করা হয়েছে খণ্ড খণ্ড করার অসুবিধা পরিহার করার জন্য।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো হাদীছে মু'আয (রা.) এর বর্ণিত নিম্নোক্ত বাক্যটি-

নিসাবের ভগ্নাংশ থেকে কিছু গ্রহণ করো না (দারা-কুতনী)। তদ্রূপ আমর ইব্‌নে হাযম (রা.)বর্ণিত হাদীছে রয়েছে চল্লিশ দিরহামের নীচে কোন যাকাত নেই। তাছাড়া অসুবিধার অবস্থা শরীআতে পরিহার্য। আর ভগ্নাংশের যাকাত ওয়াজিব করার মধ্যে অসুবিধা রয়েছে। কেননা, ভগ্নাংশের হিসাব কঠিন।

দিরহামের ক্ষেত্রে ওজনে সাবআ গ্রহণযোগ্য।অর্থাত্ প্রতি দশ দিরহামের ওজন হবে সাত মিছকাল। উমর(রা.) এর অর্থ দফতরের হিসাবে এই পরিমাণই প্রচলিত ছিলো এবং পরবর্তীতে এটিই স্থায়ী রূপ লাভ করে।

কোন রৌপ্য্ বস্তুতে রূপার পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে সবটুকুই রূপা হিসাবেই গন্য হবে। আর খাদ যদি বেশী হয় তবে তা পণ্যদ্রব্য রূপে গণ্য হবে। তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হওয়ার বিষয়টি বিবেচিত।

কারণ দিরহামে সামান্য খাদ থাকেই। কেননা তা খাদ ছাড়া জমাট বাধে না। তবে অধিক পরিমাণ খাদ থেকে (সাধারনত) মুক্ত থাকে। তাই পরিমাণের অধিক্যকে আমরা পার্থক্য রূপে গণ্য করেছি। আর আধিক্যের অর্থ হলো অর্ধেক থেকে বেশী হওয়া। বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রেখে ছারফ অধ্যায়ে এ প্রসংগ ইনশাল্লাহ্ আমরা আলোচনা করবো। তবে খাদ অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে (যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে) ব্যবসায়ের নিয়্যত থাকা অপরিহার্য, যেমন অন্যান্য বাণিজ্য-পণ্যের ক্ষেত্রে। তবে যদি তা থেকে রূপা পৃথক করে নেয়া হয় আর তা নিসাব পরিমাণ হয় (তবে ব্যবসায়ের নিয়্যত করা জরুরী নয়)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা, শুধু রূপার ক্ষেত্রে মূল্য কিংবা ব্যবসায়ের নিয়্যত ধর্তব্য নয়। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ: স্বর্ণের যাকাত

বিশ মিছকাল স্বর্ণের নীচে যাকাত ওয়াজিব নয়। যখন বিশ মিছকাল হবে তখন তাতে অর্ধ মিসকাল ওয়াজিব।

প্রমাণ হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। মিসকালের (দীনারের) পরিমাণ হল এর সাতটির ওজন দশ দিরহামের সমান হবে। এ-ই প্রচলিত।

এরপর প্রতি চার মিছকালে দুই কীরাত ওয়াজিব হবে। কেননা দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ (বা চল্লিশভাগের একভাগ) হলো যাকাতের ওয়াজিব পরিমাণ। আর তাহলো আমরা যা বলেছি(অর্থাত্ ২ কীরাত)। কারণ, প্রতি মিছকালের ওজন বিশ কীরাত।

বর্ধিত অংশ চার মিছকালের কম হলে যাকাত নেই।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। সাহেবাইনদের মতে সেই অনুপাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। এটা মূলত ভগ্নাংশের মাসআলা।

আর শরীআতের দৃষ্টিতে প্রতি দীনার দশ দিরহামের সমমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চার মিছকাল চল্লিশ দিরহামের সমমান হবে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্বর্ণ ও রৌপ্যের খন্ড, অলংকার ও বর্তন এসবে যাকাত ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, স্ত্রীলোকের অলংকার এবং পুরুষের রূপার আংটিতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা তা মুবাহ হিসাবে ব্যবহৃত। সুতরাং তা ব্যবহার্য কাপড়ের সদৃশ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সবাব (উপাদান) হলো বর্ধন সম্পন্ন সম্পদ। এখানে বর্ধনের প্রমাণ বিদ্যমান আর তা হলো সৃষ্টিগত ভাবেই এগুলো ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুতকৃত। আর এ ক্ষেত্রে প্রমাণের বিদ্যমানতাই বিবেচ্য। ব্যবহার্য বস্ত্রের বিষয়টি এর বিপরীত।

পরিচ্ছেদ পণ্যদ্রব্যের যাকাত

যেকোন ধরণের ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্য হোক তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে যদি তার মূল্য রূপার কিংবা স্বর্ণের নিসাব পরিমাণে পৌছে। কেননা পণ্যদ্রব্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এবং প্রতি দু'শ দিরহাম হতে পাচ দিরহাম আদায় করা হবে। কারণ এগুলো বান্দার পক্ষ থেকে বর্ধনের জন্য প্রস্তুতকৃত। সুতরাং তা শরীআতের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃতের সদৃশ।

ব্যবসায়ের নিয়্যতের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যাতে বান্দার পক্ষ থেকে প্রস্তুতকরণ সাব্যস্ত হয়।

অত:পর ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দরিদ্রদের জন্য অধিকতর লাভজনক যা তা দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রদের হক এর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনা মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মালিকের ইখতিয়ারের উপর ন্যস্ত করেছেন। কেননা বস্তুসমূহের মূল্য নিরূপনের ক্ষেত্রে উভয় (স্বর্ণ ও রৌপ্য) মুদ্রাই সমান।

অধিকতর লাভজনক হওয়ার ব্যাখ্যা এই যে, ঐ মুদ্রার দ্বারা মূল্য নিরূপণ করতে হবে, যা দ্বারা নিসাব অর্জিত হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পণ্যদ্রব্য যদি মুদ্রার দ্বারা খরিদ করা হয়ে থাকে তাহলে যে ধরনের মুদ্রা খরিদ করা হয়ে থাকে তাহলে যে ধরণের মুদ্রা দ্বারা খরিদ করা হয়েছে, তা দ্বারাই মূল্য নিরূপণ করা হবে। কেননা, মূল্যমান পরিচয়ের ক্ষেত্রে এটাই স্পষ্টতর।

পক্ষান্ততরে যদি মুদ্রা ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা খরিদ করে থাকে তবে দেশে প্রচলিত প্রধান মুদ্রা দ্বারা মূল্য নিরূপণ করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সর্বাবস্থায় প্রচলিত প্রধান মুদ্রা দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে, যেমন গসবকৃত ও ধ্বংসকৃত মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

বছরের উভয় প্রান্তে যদি নিসাব পূর্ণ থাকে, তবে মধ্যবর্তী সময়ে নিসাবের হ্রাস যাকাতকে রহিত করবে না। কেননা, মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ণতার সমীক্ষণ কঠিন। তবে শুরুতে নিসাবের পূর্ণতা আবশ্যকীয় হয়েছে, যাতে যাকাত সংঘটিত হয় এবং অভাবমুক্ত সাব্যস্ত হয়। তদ্রুপ বছরের শেষ প্রান্তেও (নিসাবের পূর্ণতা জরুরী) হলো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার হুকুমের জন্য। মধ্যবর্তী সময়টি অনুরূপ নয়। কেননা, সেটা হচ্ছে নিছক বিদ্যমান থাকার অবস্থা।

পক্ষান্তরে সমস্ত মাল হালাক হয়ে গেলে যাকাতের বছর পূর্তির হুকুমটি বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাত্ সার্বিক ভাবে নিসাব বিলুপ্ত হওয়ার কারণে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কিন্তু প্রথম মাসআলাটি এরূপ নয়। কেননা নিসাবের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যাকাতের উপাদানের সংঘটন অব্যাহত থাকবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, নিসাব পূর্ণ হওয়ার জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংগে যুক্ত করা হবে। কেননা পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্য সকলের ক্ষেত্রেই বাণিজ্য সত্তার হিসাবেই যাকাত ওয়াজিব হয়ে থাকে। যদিও ব্যবসায়ের জন্য প্রস্তুত করণের বিষয়টি ভিন্ন।

স্বর্ণকে রৌপ্যের সংগে যুক্ত করা হবে। কেননা মুদ্রা হওয়ার দিকে থেকে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। আর মূল্য হওয়ার দিক থেকেই তা যাকাতের সবব (পণ্য রূপে) গণ্য হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে এ সংযুক্তি থেকে মূল্যের মাধ্যমে, আর সাহেবাইনের মতে অংশ হিসাবে। এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এরূপ এক মত বর্ণিত আছে।

সুতরাং কারো নিকট যদি একশ' দিরহাম এবং পাচ মিছকাল স্বর্ণ থাকে, যার মূল্য একশ' দিরহাম পরিমাণ হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে ওয়াজিব হবে না।

তাদের বক্তব্য এই যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে পরিমাণই বিবেচ্য, মূল্য বিবেচ্য নয়। তাইতো যে স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রের ওজন দু'শ দিরহামের কম অথচ তার মূল্য দু'ম দিরহামের বেশী, তাতে (সর্ব সম্মতিক্রমে) যাকাত ওয়াজিব হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর যুক্তি এই যে, সাদৃশ্যের কারণেই একটাকে অন্যটার সংগে যুক্ত করা হয়। আর তা মূল্যের বিবেচনায়ই বাস্তবায়িত হয়, বস্তু আকৃতির দিক থেকে নয়। সুতরাং মূল্যের দ্বারাই মিলান হবে। আল্লাহই অধিক অবগত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

উশর উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী

কোন ব্যবসায়ী যখন পণ্যদ্রব্যসহ উশর উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে আর বলে যে, মাত্র কয়েক মাস হলো এ সম্পদ আমি লাভ করেছি, কিংবা আমার উপর ঋণের দায় রয়েছে, আর একথা সে শপথ করে বলে, তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে।

উশর উসূলকারী ঐ ব্যাক্তিকে বলা হয়, শাসক যাকে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে যাকাত উসূল করার জন্য রাস্তার উপর নিযুক্ত করেন। সুতরাং তাদের মধ্যে যারা বর্ষপূর্তির কথা কিংবা ঋণ হতে মুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করে, সে মূলত যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করল। আর কসমসহ অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণীয়।

তদ্রুপ যদি সে বলে যে, আমি অন্য কোন উসূলকারীর নিকট উশর আদায় করেছি। এটি এ ক্ষেত্রে, যদি ঐ বছর অন্য কোন উশর উসূলকারী থাকে। কেননা সে আমানত যথাস্থানে আদায় করার দাবী করছে। পক্ষান্তরে যদি এ বছর অন্য কোন উশর উসূলকারী নিযুক্ত হয়ে না থাকে (তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না)। কেননা, সুনিশ্চিত ভাবেই তার মিথ্যাবাদতা প্রকাশ পেয়ে গেছে।

তদ্রুপ যদি সে বলে যে, আমি নিজেই আদায় করে দিয়েছি। অর্থাত্ আমি শহরের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছি। কেননা শহরে থাকা অবস্থায় যাকাত আদায় করার বিষয়টি তার উপরই ন্যস্ত ছিলো। আর যাকাত উসূলের কর্তৃত্ব পথ অতিক্রমের কারণে। কেননা সে তখন তার হিফাযতে প্রবেশ করেছে।

গবাদি পশুর যাকাত সম্পর্কেও প্রথমোক্ত তিন ক্ষেত্রে একই হুকুম। কিন্তু চতুর্থ ক্ষেত্রে অর্থাত্ যদি সে বলে যে, আমি নিজেই শহরের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করেছি, তবে কসম করে বললেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বিশ্বাস করা হবে। কেননা সে হকদারের নিকট হক পৌছে দিয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, গবাদি পশুর যাকাত গ্রহণ করার অধিকার হলো রাষ্ট্র পরিচালকের। সুতরাং তা বাতিল করার অধিকার তার নেই। অপ্রকাশ্য সম্পদের হুকুম ভিন্ন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, প্রথমটিই যাকাতে গণ্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বার উসূল করা হচ্ছে শাসন ভিত্তিক।

আর কারো কারো মতে দ্বিতীয়টিই হলো যাকাত। এবং প্রথমটি নফলে রূপান্তরিত হবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

গবাদি পশু ও বানিজ্য-পণ্যের যে সকল ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হবে, সে ক্ষেত্রে জামেউস-সগীর এর বর্ণনার লিখিত সনদ বের করে দেখানোর শর্ত আরাপ করেননি। কিন্তু মাবসূত-এর বর্ণনায় এ শর্ত আরোপ করেছেন। আর তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পক্ষ হতে হাসান ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করেছেন। কেননা সে একটি

দাবী করেছে আর তার দাবীর সত্যতার সপক্ষে একটি প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং তা প্রদর্শন করা আবশ্যক হবে।

প্রথম মতের পক্ষে দলীল এই যে, হস্তান্তরের সংগে অন্য হস্তাক্ষরের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং তা প্রমাণ রূপে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র.) বলেন, যে ক্ষেত্রে মুসলমানের কথা সত্য বলে গ্রহণ করা হবে, সে ক্ষেত্রে যিম্মির কথাও সত্য বলে গ্রহণ করা হবে। কেননা মুসলমানদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়, তার কাছ থেকে নেওয়া হয় তার দ্বিগুণ। সুতরাং দ্বিগুণকে বাস্তবায়িত করার প্রেক্ষিতে (এ ক্ষেত্রেও) উপরোক্ত শর্তাবলী বিবেচনা করা হবে।

হারবী (ব্যবসায়ীর) এর দাবী সত্য বলে গ্রহণ করা হবে না, কিন্তু যদি দাসীদের ব্যাপারে বলে যে, এরা আমার উম্মু ওয়ালদ। কিংবা যদি সংগের বালকদের সম্পর্কে বলে যে, এরা আমার সন্তান। কেননা, হিফাযতের লক্ষ্যেই তার কাছ থেকে শুল্ক গ্রহণ করা হয়।আর তার মালিকানাধীন সম্পদই শুধু হিফাজতের মুখাপেক্ষী। তবে তার অধীনস্ত বালকের নসবের স্বীকৃত দান তার জন্য বৈধ। সুতরাং উম্মু ওয়ালাদের (মাতৃত্বের) স্বীকৃতি দানও বৈধ হবে। কেননা মাতৃত্ব নসবের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে সম্পদগুণ লুপ্ত হয়ে গেলো। আর শুল্ক গ্রহণ একমাত্র মালের উপরই ওয়াজিব।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, গ্রহণ করবে মুসলমানের নিকট থেকে দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ, যিম্মীর নিকট থেকে দশমাংশের অর্ধেক এবং হারবীর নিকট থেকে পূর্ণ দশমাংশ। হযরত উমর (রা.) তার শুল্ক আদায়কারীদের প্রতি এরূপ নির্দেশই জারী করেছিলেন।

হারবী যদি পঞ্চাশ দিরহাম সংগে নিয়ে পথ অতিক্রম করে তাহলে তার নিকট থেকে কিছুই গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু যদি তারা এ্ই পরিমাণের ক্ষেত্রে আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। (তখন আমরাও গ্রহণ করবো)। কেননা তাদের নিকট থেকে নেওয়া হয় মুলত পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে। মুসলিম ও যিম্মীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা (মুসলমানের ক্ষেত্রে) উশূলকৃত অর্থ হলো যাকাত কিংবা (যিম্মীর ক্ষেত্রে) যাকাতের দ্বিগুণ। সুতরাং নিসাব পূর্ণ হওয়া জরুরী। এটা জামেউস

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাগীর এর মাসআলা। পক্ষান্তরে (মাবসূত-এর) কিতাবুয যাকাত অধ্যায়ে রয়েছে যে, অল্প পরিমাণের ক্ষেত্রে তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা অনুরূপ পরিমাণ আমাদের নিকট হতে গ্রহণ করে থাকে। কেননা অল্প পরিমাণ সর্বদাই ছাড়যোগ্য। তাছাড়া তা নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, কোন হারবী যদি দু'শ দিরহাম সংগে নিয়ে পথ অতিক্রম করে আর তারা আমাদের নিকট হতে কি পরিমাণ গ্রহণ করে তা জানা না থাকে তবে তার নিকট থেকে দশমাংশ গ্রহণ করা হবে। কেননা উমর (রা.) বলেছেন, যদি তোমরা জানতে অক্ষম হও তবে দশমাংশ গ্রহণ কর।

আর যদি জানা যায় যে, তারা আমাদের নিকট থেকে উপরের এক-চতুর্থাংশ কিংবা উশরের অর্ধেক গ্রহণ করে, তাহলে তার নিকট হতে সেই পরিমাণই গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি তারা সবটুকু নিয়ে নেয় তবে সবটুকু নেয়া হবে না, কেননা তা গাদ্দারী (আর গাদ্দারী মুসলিমের জন্য শোভনীয় নয়)। আর যদি তারা কিছুই না নেয় তবে (আমাদের উশর উসূলকারীও) কিছু নেবে না।

যাতে আমাদের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শুল্ক নেয়া থেকে তারা বিরত থাকে।

তাছাড়া উত্তম চরিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে আমরাই অধিক হকদার।

ইমাম কুদূরী বলেন, হারবী যদি উসূলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে এবং সে তার কাছ থেকে উশর আদায় করে থাকে, অতঃপর যদি সে দ্বিতীয় বার অতিক্রম করে তবে বর্ষপূর্তির পূর্বে তার নিকট থেকে পুনঃউশর গ্রহণ করা হবে না। কেননা প্রতিবার অতিক্রমের সময় শুল্ক গ্রহণের পরিণাম হলো তার সম্পদ বিনাশ করা। অথচ শুল্ক গ্রহণের অধিকার হল তার সম্পদের হিফাজতের কারণে।

তাছাড়া প্রথম নিরাপত্তা দানের কার্যকারিতা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বর্ষপূর্তির পর নিরাপত্তার নবায়ন হবে। কেননা তাকে এক বছরের অধিক অবস্থানের অবকাশ দেওয়া হয় না। আর বর্ষপূর্তির পর পুনরায় শুল্ক গ্রহণ দ্বারা তার সম্পদ নিঃশেষিত হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

উশর আদায় করার পর যদি সে দারুল হারবে ফিরে গিয়ে একই দিনে ফিরে আসে তাহলে পুনরায় তার নিকট হতে উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা সে নতুন নিরাপত্তা নিয়ে ফিরে এসেছে। আর দারুল হারবে গিয়ে ফিরে আসায় শুল্ক গ্রহণ সম্পদ নিঃশেষে পরিণত হয় না।

কোন যিম্মী যদি শরাবে কিংবা শূকর নিয়ে পথ অতিক্রম করে তবে শরাবের উশর গ্রহণ করা হবে কিন্তু শূকরের উশর গ্রহণ করা হবে না।

শবারের উশর গ্রহণের অর্থো হলো তার মূল্যের উশর গ্রহণ করা।

ইমাশ শাফিঈ (র.) বলেন, উভয়টির উশর গ্রহণ করা হবে না। কেননা (মুসলমানের কাছে) এ দু'টির মূল্য নেই।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয়টিরই উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা সম্পদ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিকট উভয়টিই সমান।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, যদি উভয়টি এক সংগে নিয়ে অতিক্রম করে তাহলে উভয়টির উশর গ্রহণ করা হবে। সম্ভবতঃ তিনি শূকরকে শরাবের অনুগামী ধরেছেন। কিন্তু যদি উভয়টিকে আলাদা ভাবে নিয়ে যায় তবে শরাবের উশর নেয়া হবে কিন্তু শুকরের উশর নেয়া হবে না।

যাহিরী রিওয়ায়াত মুতাবিক এই পার্থক্যের কারণ এই যে, মূল্য নির্ভর বস্তু মুল বস্তুর হুকুম রাখে। আর শূকর এই শ্রেণীভূক্ত।

পক্ষান্তরে সমতুল্য বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্য মূল বস্তুর হুকুম রাখে না। আর শরাব এই শ্রেণীভূক্ত।

তাছাড়া শুল্ক গ্রহণের অধিকার বর্তে হেফাজতের জন্য। আর মুসলমান সিরকায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তার নিজস্ব সংরক্ষণ করতে পারে। সুতরাং অন্যের শরাবও সে সংরক্ষণ করতে পারবে। পক্ষান্তরে নিজস্ব মালিকানায় শূকর সে সংরক্ষণ করতে পারে না। বরং ইসলাম গ্রহণের সংগে সংগে তা ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং অন্যের শূকরও সে সংরক্ষণ করতে পারবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাগলাবী গোত্রের কোন শিশু বা স্ত্রীলোক যদি সম্পদ নিয়ে অতিক্রম করে, তবে শিশুর (সম্পদের) উপর ঐ পরিমাণ শুল্ক আরোপ করা হবে, যা তাদের পুরুষ লোকের উপর আরোপ করা হয়। এর কারণ আমরা গবাদি পশুর ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি।

যে ব্যক্তি উশর উশুলকারীর সম্মুখ দিয়ে একশ' দিরহাম নিয়ে অতিক্রম করলো এবং একথা জানালো যে, তার ঘরে আরও একশ' দিরহাম রয়েছে এবং সেটার বর্ষপূর্তি হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় যে একশ' দিরহাম নিয়ে যাচ্ছে, তার যাকাত উসূল করা হবে না। কেননা নিসাব পরিমাণ কম। আর তার ঘরে যা আছে, সেটা উশর আদায়কারীর নিরাপত্তাধীনে আসেনি।

যদি সে অন্যের প্রদত্ত পুজি রূপে দু'শ দিরহাম নিয়ে যায়, তবে তার নিকট থেকে উশর উসূল করা হবে না। কেননা সে যাকাত আদায় করার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, মুদারাবা-এর ক্ষেত্রেও একই হুকুম। অর্থাত্ মুদারাবা ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি যদি উশর উশলকারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে (তবে উক্ত মাল থেকে উশর উসূল করা হবে না)

ইমাম আবূ হানীফা (র.) প্রথমে বলতেন যে, উশর উসূলকারীর মুদারাবার মাল থেকে উশর উসূল করবে। কেননা (পুজির উপর) মুদারিব-এর হক অধিক দৃঢ়। এ জন্যই পুজিদাতা ব্যবসার কোন ক্ষেত্রে তাকে বাধা দিতে পারে না। যখন পুজির অর্থ ব্যবসায়ের পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সুতরাং সে মালিকের স্থলবর্তী হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে তিনি কুদূরীতে উল্লেখিত মতামতের দিকে রুজু করেছেন, আর এ-ই সাহেবাইনেরও মত।

কেননা প্রকৃত পক্ষে সে উক্ত পুজির মালিক নয়। এবং যাকাত আদায়ের ব্যাপারে মালিকের নায়েব বা স্থলবর্তীও নয়। কিন্তু যদি পুজির সংগে এই পরিমাণ মুনাফা থেকে থাকে, যাতে তার অংশ নিসাব পরিমাণ পৌছে, তবে তার নিকট হতে যাকাত গ্রহণ করা হবে। কেননা সে তা তার মালিক।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত কোন দাস যদি দু'শ দিরহাম নিয়ে অতিক্রম করে এবং তার উপর ঋণের কোন দায় না থাকে, তবে তার নিকট থেকে উশর গ্রহণ করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, আমি জানি না ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ সিদ্ধান্ত থেকে রুজু করেছেন কিনা। তবে মুদারাবা-এর ক্ষেত্রে তার দ্বিতীয় বক্তব্যের কিয়াস তো এই যে, তার নিকট থেকে উশর গ্রহণ করা হবে না। আর এ-ই সাহেবাইনের মত। কেননা,তার অধীনে যে সম্পদ রয়েছে, তার মালিক তার মনিব। তার শুধু ব্যবসা পরিচালনার অধিকার রয়েছে। সুতরাং সে মুদারিবের মত হয়ে গেল।

আর উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, দাস নিজের জন্যই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ কারণেই কোন দায়িত্ব মনিবের দিকে রুজু হয় না। সুতরাং সে নিজেই নিরাপত্তা লাভের মুখাপেক্ষী। পক্ষান্তরে মুদারিব নায়েব বা স্থলবর্তী রূপে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই দা্য়-দায়িত্ব পুজিদাতার দিকে রুজু হয়। তাই পুজি দাতাই হচ্ছে নিরাপত্তার মুখাপেক্ষী। সুতরাং মুদারবের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের অর্থ অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

তবে অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের সংগে তার মনিবও যদি উপস্থিত থাকে তাহলে মনিবের নিকট হতে উশর গ্রহণ করা হবে। কেননা (আসলে) মালিকানা তো তারই। কিন্তু দাসের উপর যদি তার সম্পদ বেষ্টনকারী ঋণের দায় থাকে, তাহলে উশর নেয়া হবে না। কেননা তার মালিকানা নেই কিংবা তার সম্পদ দায়বদ্ধ।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার কেউ যদি তাদের নিয়োগকৃত এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে আর সে তার কাছ থেকে উশর গ্রহণ করে থাকে, তবে বৈধ সরকারের আশের তার কাছ থেকে দ্বিতীয় বার যাকাত উসূল করবে।

অর্থাত্ যখন সে বৈধ শাসকের নিয়োগকৃত এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করবে। কেননা, ত্রুটি তার পক্ষ থেকেই হয়েছে, যেহেতু সে খারিজী এর সম্মুখ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

খনিজ-সম্পদ ও প্রোথিত-সম্পদ

খারাজী কিংবা উশরী ভূমিতে প্রাপ্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, কিংবা তামা জাতীয় খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেলে তাতে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ওয়াজিব।

এ আমাদের মাযহাব। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, এ সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রাপকের উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

কেননা,তা মালিকানা মুক্ত সম্পদ, সে সর্বাগ্রে তার অধিকার লাভ করেছে, যেমন শিকারের হুকুম। তবে খনিজদ্রব্য যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য হয় তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু এক মত অনুযায়ী তিনি এ ক্ষেত্রে বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করেননি। কেননা এতো সম্পূর্ণ বর্ধিত সম্পদ। আর বর্ষপূর্তির শর্তারোপ করা হয় সম্পদ বর্ধিত হওয়ার জন্য।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণীঃ ভু-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

হাদীছে ব্যবহৃত শব্দটি ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ স্থাপিত সম্পদ। সুতরাং খনিজদ্রব্যের উপরও শব্দটি প্রযুক্ত হবে।

তাছাড়া এই কারণেও যে, খনি-অঞ্চলটি কাফিরদের দখলে ছিলো, তা বিজিত রূপে আমাদের হাতে এসেছে। সুতরাং সেটা গনীমতে গণ্য হবে। আর গনীমতের মধ্যে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

শিকারের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা কখনো কারো দখলে ছিলো না।

অবশ্য তাতে মুজাহিদের কবজা হলো নীতিগত। কেননা, তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের উপর। আর প্রকৃত পক্ষে কবজা হাসিল হয়েছে খনিজ উত্তোলনকারীর। তাই পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমরা নীতিগত অবস্থার

http://islaminonesite.wordpress.com/

বিষয়টি বিবেচনা করেছি আর অবশিষ্ট চারভাগের ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করেছি। অতএব এতে উত্তোলনকারী-এর মালিক হবে।

যদি নিজের বাড়ীর সীমানার ভিতরে কোন খনিজ-সম্পদ পায় তাহলে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। সাহেবাইন বলেন, তাতে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কেননা আমরা যে হাদীছ বর্ণনা করেছি, তা ব্যাপক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলীল এই যে, এটা ভূমির সংগে যুক্ত অংশ বিশেষ। আর ভূমির অন্যান্য অংশের উপর কোন কিছু ধার্য নেই। সুতরাং এটার উপরও কিছু ধার্য হবে না। কেননা (হুকুম ও বিধানের ক্ষেত্রে) এক অংশ সমষ্টির বিপরীত হয় না।

মাটিতে পুতে রাখা সম্পদের হুকুম এর বিপরীত। কেননা তা ভুমির সংগে যুক্ত ও মিশ্রিত নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি নিজের জমিতে পেয়ে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে।

একটি বর্ণনা হিসাবে অর্থাত্ জামেউস-সাগীরের বর্ণনা হিসাবে (বাড়ী ও সাধারণ জমির মাঝে) পার্থক্যের কারণ এই যে, বাড়ীর মালিকানা আর্থিক দায়মুক্ত। কিন্তু জমির মালিকানা তদ্রুপ নয়। এ কারণেই জমির উপর উশর বা খারাজ ওয়াজিব হয় কিন্তু বাড়ীর উপর হয় না।

যদি জমিতে অবস্থিত অর্থাত্ প্রোথিত কোন সম্পদ লাভ করে তবে সকলের মতেই তাতে খুমুস ওয়াজিব হবে।

আমাদের ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীছটি হলো এর দলীল। কেননা হাদীছে উল্লেখিত শব্দটি প্রোথিত সম্পদের উপরও প্রযোজ্য হয়। কেননা তাতে বা স্থায়িত্বের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তবে যদি তাতে ইসলামী আমলের ছাপ থাকে, যেমন কালিমা শাহাদাত উৎকীর্ণ থাকলো, তাহলে তা লুকতাহ (হারানো জিনিসের) পর্যায়ভুক্ত হবে। আর তার বিধান যথাস্থানে বর্নিত হয়েছে। আর যদি তাতে জাহিলী যুগের ছাপ থাকে, যেমন তাতে মুর্তি ইত্যাদি উৎকীর্ণ থাকলো, তবে পূর্ব বর্ণিত কারণে সর্বাবস্থায় তাতে খুমুস ওয়াজিব হবে।

যদি জাহিলী যুগের প্রোথিত সম্পদ মালিকানামুক্ত (পতিত) ভূমিতে পেয়ে থাকে তাহলে এক-পঞ্চমাংশের অবশিষ্ট চার ভাগের প্রাপকের হবে। কারণ, তারপক্ষ থেকে সংরক্ষণ পূর্ণ হয়েছে। কেননা, যোদ্ধাদের তো এর উপস্থিতি সম্পর্কে জানা ছিলো না। সুতরাং সে-ই এটার নিরংকুশ মালিকানা লাভ করবে। অর্থাত্ নিজের জমিতে হোক কিংবা অন্যের জমিতে।

আর যদি মালিকানাধীন ভূমিতে পেয়ে থাকে,তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা অধিকার লাভ হয় পূর্ণ সংরক্ষনের মাধ্যমে। আর তা তার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে শাসকের পক্ষ হতে জমিটি প্রথমে যার নামে দেশ জয়ের শুরুতে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে, সে-ই এর মালিক হবে। কেননা প্রথমে তারই কবজা এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তা হলো নির্দিষ্ট কবজা। সুতরাং এই কবজার কারণে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের মালিক হবে। যদিও তার কবজা ভূ-পৃষ্ঠের উপরে সম্পন্ন হয়েছে। যেমন কেউ একটি মাছ শিকার করল আর তার পেটে একটি মুক্তা পাওয়া গেলো।

অতঃপর ঐ জমি অন্যের কাছে বিক্রি করার কারণে প্রোথিত সম্পদ তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে না। কেননা তা মাটির নীচে রক্ষিত আমানত। খনিজ দ্রব্যের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা যমীনের অংশ বিশেষ। সুতরাং তা ক্রেতার মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

প্রথমে যার নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যদি তার পরিচয় না পাওয়া যায়, তাহলে ইসলামী আমলের যে দূরতম মালিকের সন্ধান পাওয়া যায়, তার হাতেই এর মালিকানা সোপর্দ করা হবে। ফকীহগণ এ মত-ই ব্যক্ত করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি ছাপ অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে যাহেরী মাযহাব অনুসারে সেটাকে জাহিলী যুগের বলে ধরা হবে। কেননা তা-ই মূল অবস্থা।

আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের যুগে সেটি ইসলামী আমলেরই ধরা হবে। কেননা ইসলামী যুগও প্রবীণ হয়ে গিয়েছে। (সুতরাং দৃশ্যতঃ তা ইসলামী যুগেরই প্রোথিত।)

যে ব্যক্তি দারুল হারবে নিরাপত্তা নিয়ে বৈধভাবে প্রবেশ করলো এবং তাদের কারো বাড়ীতে ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ লাভ করলো, সে তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে।

এটা করবে 'বিশ্বাস ঘাতকতা' থেকে বাচার জন্য। কেননা, বাড়ীতে যা কিছু আছে তা বাড়ীর মালিকের জন্যই নির্ধারিত।

আর যদি মালিকানামুক্ত মাঠে পেয়ে থাকে তবে সেটা তারই। কেননা, তা কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন নয়। সুতরাং তা হস্তগত করা বিশ্বাস ভংগ বলে গণ্য হবে না। আর তাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা সে গোপনে হস্তগতকারীর ন্যায়, মুজাহিদের মত হস্তগতকারীর ন্যায় নয়।

ফিরোযা পাথর যা পাহাড়ে পাওয়া যায়, তাতে খুমস ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, পাথরের উপর খুমুস নেই।

পারদের ক্ষেত্রে খুমুস ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর পরবর্তী মত। এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এরও এই মত। এতে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে।

মুক্তা ও আম্বরের উপর খুমুস নেই।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, এ দু'টিতে এবং সমুদ্র থেকে আহরিত সকল ভুষণের উপর খুমুস ওয়াজিব। কেননা উমর (রা.) আম্বর হতে খুমুস গ্রহণ করেছেন। সাহেবাইনের বক্তব্য এই যে, সমুদ্রের তলদেশে বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং তা থেকে লব্ধ বস্তু স্বর্ণ-রৌপ্য হলেও গনীমত রূপে গণ্য হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের ক্ষেত্র হলো সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত বস্তু। আর সে ক্ষেত্রে আমাদেরও এ মত।

মাটিতে পুতে রাখা সামানপত্র পাওয়া গেলে তা ঐ ব্যক্তিরই হবে, যে পেয়েছে। আর তাতে খুমুস ধার্য হবে। অর্থাত্ মালিকানামুক্ত পতিত ভূমিতে পাওয়া গেছে। কেননা স্বর্ণ-রৌপ্যের মত এটাও মালে গনীমতগ্রস্ত। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ফসল ও ফলের যাকাত

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, অল্প হোক কিংবা বেশী, ভূমি থেকে উৎপাদনের উপর উশর ওয়াজিব হবে-প্রবাহিত পানি দ্বারা সিঞ্চিত হোক, কিংবা বৃষ্টির পানি দ্বারা। কিন্তু বাশ, জ্বালানী কাষ্ঠ ও ঘাসের উপর উশর নেই।

সাহেবাইন বলেন, যে সকল ফল দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে সেগুলো পাচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে তাতে শুধু উশর ওয়াজিব হবে।

এক ওয়াসাক হলো নবী করীম (সা.) এর যুগে প্রচলিত সা'আ-এর পরিমাণে ষাট সা'আ। মোটকথা, দু'ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছেঃ প্রথমতঃ নিসাবের শর্ত আরোপে, দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘস্থায়িত্বের শর্তারোপে।

প্রথম বিষয়ে সাহেবাইনের দলীল হল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীছ- পাচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব নয়। তাছাড়া যেহেতু এ-ও যাকাত, সুতরাং স্বচ্ছলতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এ ক্ষেত্রেও 'নিসাব'-এর শর্ত আরোপ করা হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বাণী- ভূমি যা উৎপন্ন করে, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। এতে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাহেবাইনের বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা এই যে, তাতে বাণিজ্য দ্রব্যের যাকাতের কথা বলা হয়েছে। কেননা, তারা ওয়াসাকের মাপে বেচা-কেনা করতো, আর এক ওয়াসাকের মূল্য সাধারণতঃ চল্লিশ দিরহাম হতো।

আর উশরের ক্ষেত্রে তো ভূমির মালিক হওয়ারই শর্ত নেই। সুতরাং মালিকের অবস্থা তথা সচ্ছলতার শর্ত আরোপের তো প্রশ্নই আসে না।

এ কারণেই বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয় না। কেননা এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো বৃদ্ধির সুযোগ। অথচ এটা তো সম্পূর্ণই বর্ধিত সম্পদ।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাহেবাইনের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর হাদীছ- সবজী জাতীয় দ্রব্যের উপরে সাদকা নেই। এখানে সর্বসম্মতিক্রমেই সাদাকা দ্বারা যাকাত নিষেধ করা উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং উশরই উদ্দেশ্য হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

সাহেবাইনের বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা হলো ঐ সাদাকা, যা শুল্ক আদায়কারী গ্রহণ করে থাকে। সেক্ষেত্রে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও এ হাদীছের উপর আমল করে থাকেন।

তাছাড়া যৌক্তিক প্রমাণ এই যে, ভূমি এমন ফসলও উৎপন্ন করে, যা দীর্ঘসময় সংরক্ষিত থাকে না। আর উশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভূমির ফলনশীলতা। এ কারণেই তো এ ধরনের ভূমিতে খারাজ ওয়াজিব হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে বাশ, জ্বালানী কাষ্ঠ ও ঘাস সাধারণতঃ বাগানে উৎপন্ন করা হয় না, বরং এগুলো থেকে বাগানকে পরিস্কার রাখা হয়। এমন কি যদি কেউ বাশঝাড় কিংবা জ্বালানী বৃক্ষ কিংবা ঘাসের ক্ষেত লাগায়, তাহলে তাতে উশর ওয়াজিব হবে।

উল্লেখিত বাশ দ্বারা সাধারণ বাশ উদ্দেশ্য; তবে ইক্ষু কিংবা জোয়ারের উশর ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলোর জন্য ভূমিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করা হয়।

খেজুর শাখা ও খড়ের হুকুম এর বিপরীত। কেননা এ গুলোর ক্ষেত্রে শস্য ও ফলই হলো উদ্দেশ্য, বৃক্ষ বা খড় উদ্দেশ্য নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী বলেন, বালতি দ্বারা (কুয়া থেকে) এবং পানি তোলার চর্কি দ্বারা কিংবা উটনীর পিঠে বয়ে আনা পানি দ্বারা যে ক্ষেতে সেচ দেয়া হয়েছে, তাতে উভয় মত অনুসারে অর্ধেক উশর ওয়াজিব হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যয় অধিক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টির পানি কিংবা নালের পানি দ্বারা সেচ দেয়া জমিতে ব্যয় কম হয়ে থাকে।

যদি খালের পানি ও চর্কির পানি উভয় পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে বছরের অধিকাংশ সময়ের বিবেচনা করা হবে। যেমন ‘সামিয়া’ পশুর ক্ষেত্রে।

যে সকল জিনিস ওয়াসাক দ্বারা মাপা হয় না, যেমন জাফরান ও তুলা, এগুলো সম্পর্কে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, যখন এ গুলোর মূল্য ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপকৃত সর্বনিম্ন মূল্যের জিনিসের পাচ ওয়াসাক পরিমাণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে। যেমন আমাদের যুগে জোয়ার রয়েছে।

কেননা শরীআত নির্ধারিত পরিমাপ এখানে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, সুতরাং তার মূল্য বিবেচনা করা হবে। যেমন ‘সামিয়া’ পশুর ক্ষেত্রে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, উৎপন্ন দ্রব্য যখন ঐ জাতীয় বস্তু পরিমাপ করার সর্বোচ্চ পরিমাণের পাচগুণ হয়ে যাবে, তখন তাতে উশর ওয়াজিব হবে। সুতরাং তুলার ক্ষেত্রে পরিমাণ ধরা হবে পাচ গাট, প্রতি গাট হবে তিনশত তদ্রুপ জাফরানের ক্ষেত্রে হবে পাচ (প্রায় পাচ সের) কেননা ওয়াসাক দ্বারা পরিমাপ নির্ধারণের কারণ এই ছিলো যে, তা ছিলো ঐ জাতীয় দ্রব্য মাপের সর্বোচ্চ পরিমাণ।

মধু যদি উশরী যমীন থেকে আহরণ করা হয়, তাহলে তাতে উশর ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, উশর ওয়াজিব হবে না। কেননা তা প্রাণী থেকে উৎপন্ন। সুতরাং তা হল রেশমের সমতুল্য।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীছ- মধুতে উশর ওয়াজিব। তাছাড়া এ কা্রণে যে, মৌমাছি বিভিন্ন ফল ও ফুল থেকে আহরণ করে, আর সেগুলোতে

http://islaminonesite.wordpress.com/

যেহেতু উশর আছে, সেহেতু তা থেকে উৎপন্ন পদার্থের উশর হবে। রেশম কীটের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে পাতা ভক্ষণ করে আর তাতে উশর নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে মধু অল্প হোক বা বেশী, তাতে উশর ওয়াজিব হবে। কেননা, তিনি এতে কোন নিসাব ধার্য করেন না।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মধুর ক্ষেত্রে তার নীতি অনুযায়ী তিনি পাচ ওয়াসাকের মূল্য গণ্য করেন।

তার পক্ষ থেকে এমন মতও বর্নিত হয়েছে যে, মোশক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা বনূ শাবাবা গোত্র সম্পর্কিত হাদীছে বর্ণিত আছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট এই অনুপাতেই উশর আদায় করতো।

তার পক্ষ থেকে পাচ এর কথাও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে পাচ 'ফারাক' এর রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। প্রতি ফারাক হলো ৩৬ রতল। কেননা এটা হলো মধু মাপার সর্বোচ্চ পরিমাণ।

তদ্রূপ ইক্ষ সম্পর্কেও (ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে)।

পাহাড়ে যে সকল মধু বা ফলফলাদি পাওয়া যায়, তাতেও উশর ওয়াজিব।

আবূ ইউসূফ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে তাতে উশর ওয়াজিব হবে না। কেননা, তাতে উশর ওয়াজিব হওয়ার কারণ বিদ্যমান নেই। আর তা হলো ফলনশীল ভূমি।

জাহিরী রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, ফলনশীল ভূমির যা উদ্দেশ্য অর্থাত্ ফললাভ করা, তাতো অর্জিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ভূমির উৎপন্ন যে সকল ফসলে উশর ওয়াজিব হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক এবং হাল-বলদের খরচ হিসাব করা হবে না। কেননা নবী (সা.) ব্যয় ভারের তারতম্যের কারণে ওয়াজিব পরিমাণে তারতম্যের হুকুম দিয়েছেন। সুতরাং ব্যয়ভার বাদ দেয়ার কোন অর্থ নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কোন তাগলাবী যিম্মীর উশরী জমীন থাকলে তার উপর দ্বিগুণ উশর ধার্য করা হবে।

সাহাবায়ে কিরামের ইজমার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাগলাবী যিম্মী মুসলমানের নিকট হতে কোন জমি খরিদ করলে তাতে এক উশরই ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে মালিকের পরিবর্তনের কারণে জমির আর্থিক দায় পরিমাণে পরিবর্তিত হয় না।

অতঃপর কোন যিম্মী যদি তাগলাবীর নিকট থেকে উক্ত জমি খরিদ করে, তবে সকলের মতেই জমির আর্থিক দায় একই অবস্থায় থাকবে। কেননা কোন অবস্থায় যিম্মীর উপর দ্বিগুণ ধার্য করা যায়। যেমন, উশর উশুলকারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার সময় মুসলমানের নিকট থেকে যা নেয়া যায়, তার নিকট থেকে তার দ্বিগুণ নেয়া হয়।

তদ্রুপ একই হুকুম বহাল থাকবে যদি ঐ জমি কোন মুসলমান তার নিকট থেকে খরিদ করে কিংবা তাগলাবী নিজেই যদি ইসলাম গ্রহণ করে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত, চাই হুকুমের এই দ্বিগুণতা পূর্ব থেকে চলে আসুক, কিংবা নতুনভাবে আরোপিত হোক। কেননা দ্বিগুণতাই উক্ত জমির আর্থিত দায় রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং উক্ত জমি তার নিজস্ব আর্থিক দায় সহই মুসলমানের মালিকানা স্থানান্তরিত হবে, যেমন খারাজের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, পুনরায় এক উশরের দিকে ফিরে আসবে। কেননা দ্বিগুণ করণের কারণ দূরীভূত হয়ে গেছে।

মাবসূত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, বিশূদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এটাই মুহাম্মদ (র.) এর অভিমত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র .) এর মত বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুলিপির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, দ্বিগুণ তা বহাল রাখার ক্ষেত্রে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর সংগে একমত। তবে পূর্ব থেকে চলে আসার দ্বিগুণতার ক্ষেত্রেই শুধু তার মত প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা তার মাযহাব

http://islaminonesite.wordpress.com/

অনুযায়ী নতুন ভাবে আরোপিত দ্বিগুণতা সাব্যস্ত হতে পারে না। কারণ, এতে আর্থিক দায় পরিবর্তিত হয় না।

কোন মুসলমান যদি তার (উশরী) যমীন কোন খৃষ্টানের নিকট বিক্রি করে,

অর্থাত্ তাগলিবী ছাড়া অন্য কোন যিম্মীর নিকট, আর উক্ত খৃষ্টান বিক্রিত জমির দখল গ্রহণ করে, তাহলে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। কেননা, খারাজই কাফিরের অবস্থার উপযুক্ত।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তার উপর দ্বিগুণ উশর ওয়াজিব হবে। তবে খারাজের ব্যয় ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা হবে। এ সিদ্ধান্ত তিনি দিয়েছেন তাগলিবীর উপর কিয়াস করে।

কেননা, আমূল পরিবর্তনের চেয়ে এটিই হল সহজ ব্যবস্থা।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে এটি পূর্ব অবস্থার উপর উশরী থাকবে। কেননা, এটি জমির দায় রূপে সাব্যস্ত হয়ে গেছে, সুতরাং তা পরিবর্তিত হবে না, যেমন খারাজ পরিবর্তিত হয় না।

অবশ্য এক বর্ণনা মতে গৃহীত অর্থ যাকাত-সাদকা খাতে ব্যয় হবে। আর অন্য বর্ণনা মতে খারাজের খাতে ব্যয় হবে। উক্ত নাসরানীর নিকট হতে কোন মুসলমান যদি শোফ'আ বলে সে জমি লাভ করে কিংবা বিক্রি ফাসিদ হওয়ার কারণে তা বিক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়, তবে তা পূর্বের মতো উশরী হয়ে যাবে।

প্রথম সুরতে ক্রারণ এই যে, বিক্রয়ের ব্যাপারটি শুফার দাবীদারের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং সে যেন মুসলমানের নিকট থেকেই ক্রয় করেছে।

দ্বিতীয় সুরতে কারণ এই যে, ত্রুটির কারণে বিক্রয় প্রত্যাহার করা এবং বিক্রিত বস্তু ফেরত দানের মাধ্যমে ধরে নেয়া হবে যেন 'বিক্রয়' সংঘটিতই হয়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, যেহেতু (ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয়ের কারণে) বিক্রিত বস্তুটি ফেরত দান করা কর্তব্য, সেহেতু এই ক্রয়ের কারণে মুসলিম বিক্রেতার হক তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি কোন মুসলমানের শাসক কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাড়ী থাকে আর সে সেটিকে বাগানে পরিণত করে ফেলে, তাহলে তার উপর উশর ওয়াজিব হবে।

অর্থাত্ যদি উশরী পানি দ্বারা বাগান সেচ দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি খারাজী পানি দ্বারা বাগানে সেচ দিয়ে থাকে তাহলে তার উপর খারাজ ধার্য হবে। কেননা এ ধরনের ক্ষেত্রে পানি সেচের সাথে আর্থিক দায় সম্পৃক্ত।

নিজস্ব বাস ভবনের জন্য মাজুসীর (অগ্নিপূজকের) উপর কোন কর নেই। কেননা উমর (রা.) বাসভবন সমূহকে করমুক্ত রেখেছেন।

যদি সে তার বাড়ী বাগানে পরিণত করে, তবে তাতে খারাজ ধার্য হবে।

এমন কি উশরী পানি দ্বারা সেচ দান করলেও। কেননা উশরের মাঝে ইবাদতের দিক বিদ্যমান থাকার কারণে তার উপর উশর ওয়াজিব করা সম্ভব নয়। তাই খারাজই নির্ধারিত হবে। আর খারাজ এক প্রকার শাস্তি, যা তার উপর অবস্থার উপযোগী।

সাহেবাইনের নীতির উপর কিয়াসের চাহিদা হল উশরী পানির সেচের ক্ষেত্রে উশরই ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে একটি উশর ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে দু'টি উশর ওয়াজিব হবে। পূর্বে এর কারণ বর্ণিত হয়েছে।

উশরী পানি অর্থ বৃষ্টির পানি, কুয়া, ঝনার ও ঐ সকল নদনদীর পানি, যা কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আর খারাজী পানি অর্থ যে সকল খাল আজমীয়া খনন করেছে জায়হূন, সাযহূন, দজলা ও ফুরাতের পানি ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে উশরী। কেননা এগুলো কারো রক্ষণাবেক্ষণে নেই। যেমন, সমুদ্রের পানি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে এগুলো খারাজী পানি। কেননা এর উপর নৌকা ইত্যাদি দ্বারা পুল তৈরী করা হয়, যা তার উপর নিয়ন্ত্রণের প্রমাণ।

তাগলিবী পুরুষের জমিতে যা ধার্য হয়, তাগলিবী শিশু ও স্ত্রীলোকের জমিতেও তা ধার্য হবে। অর্থাত্ উশরী জমিতে দ্বিগুণ উশর এবং খারাজী জমিতে একটি খারাজ। কেননা তাদের সংগে (এই মর্মে) সমঝোতা হয়েছিল যে, সাদাকা দ্বিগুণ করা হবে। নিছক আর্থিক দায় দ্বিগুণ করা হবে না।

সুতরাং যেহেতু মুসলিম শিশু ও নারীর উপর উশর ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাই তাগলিবী শিশু ও নারীর উপরও তা দ্বিগুণ রূপে ধার্য হবে।

উশরী জমিতে প্রাপ্ত আলকাতরা বা তেলের কূপে কিছু ধার্য করা হবে না। এটা তখনই হবে, যখন আলকাতরা ও তৈল কূপের চারপার্শ্ব চাষোপযোগী হয়। কেননা, খারাজের সম্পর্ক জমির চাষোপযোগিতার সংগে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

যাকাত-সাদাদা কাকে দেয়া জাইয বা জাইয নয়

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এ সম্পর্কে মূল হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণীঃ

সাদাকা হলো দরিদ্রদের জন্য, নিঃস্বদের জন্য সাদাকা উশুলের কাজে নিয়োজিতদের জন্য, ঐ লোকদের জন্য যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়। দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র রাস্তায় নিয়োজিতদের জন্যে এবং মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে ফরযকৃত । আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান(৯ জ ৬০)।

এই হল আট প্রকার। তার মধ্য থেকে 'যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয়' সে শ্রেণীটি বাদ পড়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদরে থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। এর উপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ফকীর ঐ ব্যক্তি, যার সামান্য পরিমাণ জিনিস রয়েছে। আর মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যার কিছুই নেই। এ ব্যাখ্যা ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। কেউ কেউ এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

উভয়টি যুক্তি রয়েছে। আবার এরা স্বতন্ত্র দুই শ্রেনী কিংবা একই শ্রেণী। ওসীয়ত অধ্যায়ে ইনশাল্লাহ্ এ বিষয়ে আলোচনা করবো।

যাকাত উসূলের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তিকে শাসক তার কাজের পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। এবং এই পরিমাণ দান করবেন, যা তার ও তার অধীনস্তদের (জীবিকার) জন্য যথেষ্ট হয়। তা অষ্টমাংশে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

কারণ সে যাকাতের হকদার হয়েছে দায়িত্ব পালনের সূত্রে। এ জন্যই নিয়োজিত ব্যক্তি ধনী হলেও তা গ্রহণ করতে পারে। তবে যেহেতু তাত যাকাত কিঞ্চিত ছাপ রয়েছে, সেহেতু রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর খান্দানকে ময়লার সন্দেহ থেকেও পবিত্র রাখার জন্য হাশেমী পরিবারের কোন নিয়োজিত ব্যক্তি যাকাতের অর্থ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে মর্যাদার যোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তি হাশেমীর সমতুল্য নয়। সুতরাং তার ক্ষেত্রে সামান্য সন্দেহ বিবেচ্য নয়।

দাসমুক্তির অর্থ এই যে, মুকাতাবেক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের জন্য সাহায্য করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে।

ঋণগ্রস্ত হলো ঐ ব্যক্তি, যার উপর ঋণ রয়েছে এবং সে ঋণের পরিমাণ থেকে বেশী নিসাবের মালিক নয়।

ইমাম শাফিঈ(র.)-এর মতে হলো ঐ ব্যক্তি, যে দু'জনের মাঝে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কিংবা দুই গোত্রের মাঝে শত্রুতা বিদূরিত করতে গিয়ে আর্থিক দায় বহন করছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আল্লা্হ্র রাস্তায় নিয়োজিত ব্যক্তি ইমাম আবূ ইউসূফের মতে ঐ মুজাহিদ, যে সম্পদহীন হয়ে পড়ে। কেননা নিঃশর্তভাবে ব্যবহার করলে সাধারণতঃ মুজাহিদকেই বুঝায়।

ইমাম মুহাম্মদ(র.)এর মতে, এর অর্থ হজ্জের সফরে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। কেননা, বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার উট আল্লাহর রাস্তায় দান করায় নিয়ত করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উপর তাকে কোন হজ্জ যাত্রীকে আরোহণ করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ধণী মুজাহিদকে দান করা যাবে না। কেননা দরিদ্ররাই হলো যাকাতের হকদার।

(মুসাফির) অর্থ ঐ ব্যক্তি, নিজের আবাসস্থলে যার অর্থ রয়েছে; কিন্তু সে অন্য স্থানে রয়েছে, যেখানে তার হাতে কিছুই নেই।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এই (আটটি) শ্রেণীগুলো যাকাতের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র। সুতরাং মালিকের ইখতিয়ার আছে যাকাতের অর্থ প্রতিটি শ্রেণীতে প্রদান করার কিংবা্ যে কোন একটি শ্রেণীর মধ্যে দান করার।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, প্রত্যেক শ্রেণীর (অন্ততঃ) তিনজনকে প্রদান না করলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা অব্যয়ের দ্বারা সম্বন্ধের মাধ্যমে অধিকার সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, এই সম্বন্ধ নিছক এ কথা বর্ণনা করার জন্য যে, এরা হলো যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে হয়েছে। সুতরাং ক্ষেত্রের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। আর আমরা যে মত গ্রহণ করেছি, তা উমর ও ইব্ন আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত।

কোন যিম্মীর যাকাত প্রদান করা জাইয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মু'আয (রা.) কে বলেছেনঃ যাকাত মুসলমানদের ধণীদের কাছ থেকে গ্রহণ করো এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে ফিরিয়ে দাও।

যাকাত ছাড়া অন্যান্য সাদাকা তাকে দেয়া যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যাকাতের উপর কিয়াস করে ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, (অন্যান্য সাদাকাও যিম্মীকে) দেয়া যাবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীছ- সকল ধর্মের লোককে সাদাকা প্রদান করো।

মু'আয (রা.) এর হাদীছ না হলে যাকাত প্রদানও আমরা জাইয বলতাম।

যাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ তৈরী করা যাবে না এবং তা দ্বারা মাইয়েতের কাফন দেওয়া যাবে না। কেননা এখানে মালিক বানানো অনুপস্থিত। অথচ এটাই যাকাত আদায়ের রুকন।

যাকাতের অর্থ দ্বারা কোন মাইয়েতের ঋণ আদায় করা যাবে না। কেননা অন্যের ঋণ আদায় করা ঋণী ব্যক্তিকে মালিক বানানো প্রমাণ করে না, বিশেষতঃ ঋণী মাইয়েতের ক্ষেত্রে।

যাকাতরে অর্থ দ্বারা আযাদ করার জন্য কোন দাস ক্রয় করা যাবে না।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আল্লাহ্র বাণী – গোলাম আযাদ করানো। এর ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, এরূপ আযাদ করার দ্বারা (গোলাম থেকে) মালিকানা রহিত হয় (গোলামকে) মালিক বানানো হয় না। (অথচ মালিক বানানো যাকাতের রুকন)।

ধনীকে যাকাত দেয়া যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- কোন ধণীর জন্য সাদাকা হালাল নয়।

এ নির্দেশ ব্যাপক হওয়ার কারণে এ হাদীছ মালদার মুজাহিদের ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিপক্ষে আমাদের দলীল। তদ্রুপ আমাদের বর্ণিত মু'আয (রা.) এর হাদীছও (তার বিপক্ষে দলীল)।

ইমাম কুদূরী বলেন, যাকাত আদায়কারী তার পিতা ও পিতামহকে যত উর্ধ্বতনই হোক, তদ্রুপ আপন পুত্র এবং পুত্রের পুত্রকে যত অবঃস্তনই হোক, যাকাত দিতে

http://islaminonesite.wordpress.com/

পারবে না। কেননা, মালিকানার লাভালাভ তাদের মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পূর্ণরূপে। সুতরাং মালিক বানানো সাব্যস্ত হবে না।

আপন স্ত্রীকেও দিতে পারবে না। কেননা সাধারণতঃ উপকার গ্রহণে (তাদের মাঝে) অংশীদারিত্ব রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না, উল্লেখিত কারণে।

আর সাহেবাইন বলেন, তাকে দিতে পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- তোমার জন্য রয়েছে দু'টি প্রতিদান ঃ সাদাকার প্রতিদান এবং স্বজনের সহানুভূতির প্রতিদান।

ইবন মাস'উদ (রা.) এর স্ত্রী ইব্ন মাস'উদ (রা.) কে সাদাকা প্রদান সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি একথা বলেছিলেন।

আমরা এর উত্তরে বলি, আলোচ্য হাদীছ নফল সাদাকার উপর প্রযোজ্য।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আপন মুদাব্বার, মুকাতাব এবং উম্মু ওয়ালাকে যাকাত দিতে পারবে না। কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে তামলীক (বা মালিক বানানো) অনুপস্থিত। যেহেতু দাসদাসীর যাবতীয় উপার্জন তার মনিবের মুকাতারেব উপার্জনেও মনিবের অধিকার রয়েছে। সুতরাং পূর্ণ রূপে তাতে মালিক বানানো হয় না।

আর এমন গোলামকেও দিতে পারবে না, যার একাংশ আযাদ করা হয়েছে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। কেননা, তার বিবেচনায় উক্ত গোলাম মুকাতাবের পর্যায়ভূক্ত।

আর সাহেবাইনের বলেন, তাকে দেওয়া যাবে। কেননা, তাদের মতে স্বাধীন ঋণগ্রস্ত।

কোন ধনীর দাসকে যাকাত দিবে না। কেননা, মালিকানা তার মনিবের জন্যই সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর কোন ধনীর নাবালেগ সন্তানকে দিবে না। কেননা, তাকে তার পিতার সম্পদের কারণে ধণী গণ্য করা হয়। তবে সাবালক দরিদ্র সন্তানকে দেওয়া যাবে। কেননা, পিতার সচ্ছলতার কারণে তাকে মালদার গণ্য করা হয় না। যাদিও (বিশেষ কারণে) তার ভরণ-পোষণ তার পিতার যিম্মায় থাকে। আর ধনী লোকের স্ত্রীর হুকুম এর বিপরীত। কেননা সে নিজে দরিদ্র হলে স্বামীর সচ্ছলতার কারণে তাকে ধনী বিবেচনা করা হয় না। আর ভরণ পোষণের পরিমাণ দ্বারা সে মালদার গণ্য হবে না।

আর হাশিমী বংশের কাউকে যাকাত দিবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

হে হাশিমীগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য মানুষের এটো পানি এবং তাদের ময়লা হারাম করেছেন এবং তার বিনিময়ে তোমাদেরকে পঞ্চম ভাগের পঞ্চমাংশ দান করেছেন।

তবে নফল দান তাদের দেয়া যাবে । কেননা এ ক্ষেত্রে সম্পদ হলো পানির মতো। ফরয আদায় করার কারণে তা ময়লা হয়ে যায়। আর নফল দান হলো শীতলতা লাভ করার জন্য পানি ব্যবহার করার মতো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, হাশিমীগণ হলেন আলী (রা.) 'আব্বাস (রা.) জা'ফর (রা.) আকীল (রা.) ও হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর পরিবারগণ এবং তাদের আযাদকৃত গোলামগণ। কেননা এরা সকলে হাশিম ইব্নে আবদে মুনাফ এর সংগে সম্পৃক্ত। আর হাশিম গোত্রের পরিচয়ও তার সাথেই সম্পৃক্ত। তাদের আযাদকৃত গোলামদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আযাদকৃত গোলাম (আবূ রাফে) একবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্য কি সাদাকা হালাল হবে? তিনি বললেন, না, তুমি তো আমাদের মাওলা(আযাদকৃত)।

পক্ষান্তরে কোন কুরায়শী যদি কোন নাসরানী গোলামকে আযাদ করে তবে তার নিকট হতে জিয্যা গ্রহণ করা হবে। এবং এ ক্ষেত্রে আযাদকৃত ব্যক্তির অবস্থায়ই বিবেচনা করা হবে। কেননা এটাই কিয়াস ও যুক্তির দাবী। পক্ষান্তরে মনিবের সংগে যুক্ত করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে হাদীছ দ্বারা আর হাদীছে বিশেষভাবে সাদাকাকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ(র.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তিকে দরিদ্র মনে করে যাকাত দিয়ে থাকে এবং পরে প্রকাশ পায় যে, সে সচ্ছল ব্যক্তি বা হাশিমী পরিবারের লোক বা কাফির, কিংবা অন্ধকারে যাকাত প্রদান রয়েছে, কিন্তু পরে প্রকাশ পেল যে, লোকটি তার পিতা কিংবা ভাই, তাহলে তার জন্য পুনঃ যাকাত প্রদান জরুরী নয়। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, তার জন্য পুনঃ যাকাত প্রদান জরুরী। কেননা, সুনিশ্চিত ভাবে তার ভুল প্রকাশ পেয়েছে। অথচ এ বিষয়গুলো জেনে নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিলো। বিষয়টি পাত্র ও বস্ত্রের হুকুমের অনুরূপ হয়ে গেল।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) এর দলীল হলো মা'আন ইব্ন ইয়াযীদ এর হাদীছ।

কেননা, নবী করিম (সা.) এ প্রসংগে বলেছেন- হে ইয়াযীদ, তুমি যা নিয়্যত করেছো, তা তুমি পাবে। আর হে মা'আন, তুমি যা নিয়েছো তা তোমার।

ঘটনা ছিলো এই যে, মা'আন (রা.)-এর আব্বা ইয়াযীদ এর ওয়াকীল তার সাদাকার অর্থ তার পুত্র মা'আন কে প্রদান করেছিলেন।

তাছাড়া এ সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া ইজতিহাদ ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনার পর যা স্থিরীকৃত হয় তার উপরই বিষয়টি নির্ভরশীল হবে। যেমন যখন কিবলার দিক তার জন্য সন্দেহযুক্ত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালদার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্র গুলোতে প্রদত্ত যাকাত যথেষ্ট হবে না। (পুনরায় যাকাত প্রদান করতে হবে)।

তবে প্রথমোক্ত মতই হলো জাহিরী রিওয়ায়াত। এ সিদ্ধান্ত তখনই হবে, যখন সে চিন্তা-ভাবনা করে যাকাত প্রদান করে আর তার প্রবল ধারণা হয়ে থাকে যে, লোকটি যাকাতের উপযুক্ত পাত্র। পক্ষান্তরে যদি তার সন্দেহ হয়ে থাকে অথচ চিন্তা না করে থাকে, কিংবা চিন্তা করে প্রদান করেছে, অথচ তার প্রবল ধারণা হয়ে ছিলো যে, সে যাকাতের উপযুক্ত পাত্র নয়; তবে প্রদত্ত যাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে যদি পরে সে জানতে পারে যে, সে দরিদ্র। এটাই বিশুদ্ধ মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি কোন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের পর জানতে পারে যে, সে তার নিজের গোলাম কিংবা মুকাতাব ছিল, তাহলে প্রদত্ত যাকাত যথেষ্ট হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে মালিক বানানো অনুপস্থিত। কারণ (তাদের মধ্যে) মালিকানার যোগ্যতা নেই, অথচ পুর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মালিক বানানো হলো যাকাত আদায়ের রুকন।

যে ব্যক্তি যে কোন মালের নিসাব পরিমাণের মালিক হবে, তাকে যাকাত প্রদান করা জাইয নয়। কেননা শরীআতের পরিভাষায় মালদার হওয়া নিসাব দ্বারাই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শর্ত এই যে, এ নিসাব তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে।

সম্পদের বর্ধনশীলতার গুণটি হলো যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত।

নিসাবের কম পরিমাণ মালের অধিকারীকে যাকাত প্রদান করা জাইয, যদিও সে সুস্থ ও উপার্জণযোগ্য হয়ে থাকে। কেননা সে দরিদ্র, আর দরিদ্ররাই হলো যাকাতের ক্ষেত্র।

তাছাড়া যেহেতু প্রকৃত প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়, সেহেতু প্রয়োজনের প্রমাণের উপর হুকুম আবর্তিত হবে। আর প্রমাণ হলো নিসাব পরিমাণ মাল না থাকা।

এক ব্যক্তিকে দু'শ দিরহাম বা তার বেশী প্রদান করা মাকরূহ। তবে যদি প্রদান করে তবে জাইয হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, জাইয হবে না। কেননা তার সচ্ছলতা যাকাত প্রদানের সংগে যুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং মালদার ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া হয়ে গেল।

আমাদের যুক্তি এই যে, মালদার হওয়া যাকাত প্রদানের ফল, সুতরাং তা যাকাত প্রদানের পরেই সাব্যস্ত হবে, তবে সচ্ছলতাটা যাকাত আদায়ের অতি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তা মাকরূহ হবে।

যেমন কেউ নাজাসাতের পাশে দাড়িয়ে সালাত আদায় করল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যাকাত প্রদান করে এক ব্যক্তিকে সচ্ছল করে দেওয়া আমার নিকট পসন্দনীয়।

এর অর্থ হলো সওয়াল করার প্রয়োজন থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়া। কেননা একেবারেই মালদার করে দেওয়া মাকরূহ।

এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তরিত করা মাকরূহ। বরং প্রত্যেক সমাজের সাদাকা তাদের (দরিদ্রদের) মাঝেই বন্টন করা হবে।

দলীল হলো আমাদের পূর্ব বর্ণিত মু'আয (রা.) এর হাদীছ। তাছাড়া এতে প্রতিবেশতার হক রক্ষা হয়।

তবে মানুষ তার নিকটাত্মীয়দের কাছে যাকাত পাঠাতে পারে কিংবা এমন জনগোষ্ঠীর কাছে পাঠাতে পারে, যাদের প্রয়োজন তার শহরের লোকদের চেয়ে বেশী।

কেননা, এতে আত্মীয়তার হক রক্ষার কিংবা অধিক পরিমাণ প্রয়োজন দূর করার বিষয় রয়েছে। তবে এদের ব্যতীত অন্যদের নিকট স্থানান্তরিত করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যদিও তা মাকরূহ। কেননা শরীআতের বিধানে যাকাতের ক্ষেত্র নিঃশর্তভাবে যে কোন দরিদ্র। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

সপ্তম অনচ্ছেদ

সাদাকাতুল ফিতর

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সাদাকাতুল ফিত্র ওয়াজিব সে স্বাধীন মুসলমানের উপর, যে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় এবং তা তার বাসস্থান, বস্ত্র, ব্যবহারিক সামগ্রী, ঘোড়া, অস্ত্র ও দাসদাসীদের থেকে অতিরিক্ত হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ওয়াজিব হওয়ার দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্(সা.) তার খুতবায় বলেছেন- প্রত্যেক স্বাধীন ও ছোট বা বড় দাস ব্যক্তির পক্ষ হতে অর্ধ সা'আ গম কিংবা এক সা'আ যব আদায় করো।

ছা'আলাবা ইব্ন দু'আয়র আল-আদাবী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর এ ধরণের হাদীছ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। অকাট্য না হওয়ার কারণে(ফরয সাব্যস্ত হয় না)।

স্বাধীনতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য। আর ইসলামের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যেন কাজটি ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হয়। সচ্ছলতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- মালদার ছাড়া সাদাকা আরোপিত হয় না।

এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ(র.) এর বিপক্ষে দলীল। তার বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের এক দিনের আহার সামগ্রীর অতিরিক্ত মালের অধিকারী হবে তার উপর সাদাকায়ে ফিত্‌র ওয়াজিব হবে।

সচ্ছলতার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে নিসাব দ্বারা। কেননা শরীআতে নিসাব দ্বারাই মালদারী সাব্যস্ত হয়, যা উপরোক্ত জিনিসগুলো থেকে অতিরিক্ত থাকে। কেননা সেগুলো মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ। আর মৌলিক প্রয়োজনে দায়বদ্ধ জিনিসকে অস্তিত্বহীন ধরে নেয়া হয়।

এ হিসাবের বর্ধনশীলতার শর্ত নেই। আর এই নিসাবের সংগে সাদাকা গ্রহণের অযোগ্যতা এবং কুরবানী ও সাদকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, ছাদাকাতুল ফিত্‌র সে আদায় করবে নিজের পক্ষ থেকে। কেননা ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছে রয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্(সা.) স্ত্রী ও পুরুষের উপর সাদাকাতুল ফিত্‌র ফরয করেছেন।

আর আদায় করবে নিজে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে। কেননা, সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার (কারণ) হলো সে সব ব্যক্তি, যার সে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করে। কেননা সাদাকা ব্যক্তির সংগে সম্পর্কিত করা হয় এবং বলা হয় অর্থাত্ ব্যক্তির যাকাত। আর সম্বন্ধই হল সবব বা কারণ হওয়ার আলামত। তবে

http://islaminonesite.wordpress.com/

ঈদুল ফিত্‌র এর দিকে সম্বন্ধ করে সাদাকাতুল ফিত্‌র বলা হয় এই হিসাব যে, তা হলো সাদাকাতুল ফিতরের সময়।

যেহেতু ব্যক্তিই হলো সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার কারণ, সেহেতু দিন একটি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি বিভিন্ন হওয়ার কারণে সাদাকাতুল ফিত্‌র বিভিন্ন হয়ে থাকে।

তবে সাদাকা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে মূল হলো তার নিজ সত্তা। কেননা, নিজের সত্তার সে প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ করে থাকে। সুতরাং তার সংগে তারা যুক্ত হবে যারা তার পর্যায়ভূক্ত। যেমন তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণ। কেননা সে-ই তাদের প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ করে থাকে।

আর আদায় করবে আপন গোলামদের পক্ষ থেকে। কেননা (এদের ক্ষেত্রেও) ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন বিদ্যমান রয়েছে।

অবশ্য গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা তখনই ওয়াজিব হবে, যখন তারা খিদমতের জন্য হয়, এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে, যখন তাদের নিজস্ব সম্পদ না থাকে। আর যদি তাদের মাল থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে তাদের মাল থেকেই ফেতরা আদায় করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, শরীআত এটাকে আর্থিক দায়-দায়িত্বের পর্যায়ভূক্ত করেছেন। সুতরাং তা ভরন-পোষণের সদৃশ হলো।

আর তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না। কেননা অভিভাবক্ত ও আর্থিক দায়িত্ব অসম্পূর্ণ। কারণ বিবাহ সম্পর্কিত হকসমূহ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তার অভিভাবকত্বের অধিকারী নয়। এবং নির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে সে তার আর্থিক দায় বহন করে না। যেমন, ঔষধপত্রের ব্যয়।

তদ্রুপ তার প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে না, যদিও তারা তার পরিবারভুক্ত। কেননা তাদের ক্ষেত্রে ‘অভিভাবকত্ব’ নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তবে তাদের পক্ষ থেকে কিংবা তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের সম্মতি ছাড়া যদি সে আদায় করে দেয়, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। এটা সূক্ষ কিয়াসের দাবী। কেননা, তাদের সম্মতি থাকাটাই স্বাভাবিক।

তদ্রুপ আপন মুকাতাবের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে না। কেননা, অভিভাবকত্ব বিদ্যমান নেই।

মুকাতাব নিজেও তার পক্ষ হতে আদায় করবে না। কেননা, সে দরিদ্র।

মুদাব্বার ও উম্মু ওয়ালামাদের উপর মনিবের অভিভাবকত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তাই সে তাদের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করবে।

আর তার ব্যবসায়ের গোলামদের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হয়ে গোলামের উপর আর যাকাত ওয়াজিব হয় মনিবের উপর। সুতরাং একটি আর একটির প্রতিবন্ধক হবে না।

আমাদের মতে যাকাতের মত গোলামের কারণে সাদাকাতুল ফিত্‌রও মনিবের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। যাতে তার উপর দু'টি ওয়াজিব আরোপিত হয়ে যায়। (যা শরীআত বিধি বহির্ভূত)।

একটি গোলাম দ'জন মনিবের মাঝে শরীক হলে কারো উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের অভিভাবকত্ব ও ভরন-পোষণ অসম্পূর্ণ।

তদ্রুপ দু'জনের মাঝে বহু গোলাম শরীকানায় থাকলে (কারো উপরই ফিত্‌রা ওয়াজিব হবে না)।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা(র.)-এর মত।

আর সাহেবাইন বলেন, প্রত্যেকের হিস্‌সায় যে ক'টি পূর্ণ মাথা আসবে, প্রত্যেকের উপর সেগুলোর ফিতরা ওয়াজিব হবে, ভগ্নাংশটির উপর নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এই মতানৈক্যের ভিত্তি এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) গোলামদের ভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন না, আর সাহেবাইন তা ভাগের প্রতি লক্ষ্য করেন।

কোন কোন মতে এটা (কারো উপর ওয়াজিব না হওয়া) সর্বসম্মত মাযহাব। কেননা, তাকসীনের পূর্বে হিস্‌সা একত্র হয় না। সুতরাং দু'জনের কারোরই কোন গোলামের উপর মালিকানা পূর্ণ হলো না।

মুসলমান তার কাফির গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে। এর দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হিস্‌সা একত্র হয় না। সুতরাং দু'জনের কারোরই কোন গোলামের উপর মালিকানা পূর্ণ হলো না।

মুসলমান তার কাফির গোলামের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে। এর দলীল হল আমাদরে পূর্ব বর্ণিত মুতলক ও নিঃশর্ত হাদীছ।

তাছাড়া হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্‌(সা.) বলেছেন- প্রত্যেক স্বাধীন ও দাসের পক্ষ থেকে আদায় কর, সে দাস ইয়াহূদী থাক কিংবা নাসরানী কিংবা মাজুসী হোক।

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, সাদাকাতুল ফিতরের সবব সাব্যস্ত হয়ে গেছে আর মনিব ফিতরা আরোপের যোগ্য।

এক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তার মতে ফিতরা ওয়াজিব হয় গোলামের উপর। আর সে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া যোগ্য নয়। যদি বিষয়টি বিপরীত হয় তবে সর্ব সম্মতিক্রমেই ফিতরা ওয়াজিব হবে না।

গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ একটি গোলাম বিক্রি করে আর তা উভয়ের মধ্যে একজনের ইখতিয়ার থাকে, তবে গোলাম অবশেষে যার হবে, ফিতরা তার উপরই ওয়াজিব হবে।

অর্থাত্‌ যদি ইখতিয়ার বাকি থাকা অবস্থায় ঈদুল ফিতরের দিন অতিবাহিত হয়।

যুফার(র.) বলেন, যার অনুকূলে ইখতিয়ার থাকবে, তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা, তারই অধিকারভুক্ত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, মালিকানা যার জন্য সাব্যস্ত (অর্থাত্ ক্রেতা) তার উপরই ফিতরা ওয়াজিব। কেননা, এটা মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়। যেমন ভরন-পোষণের ব্যাপার। আমাদের যুক্তি এই যে, (এমতাবস্থায়) মালিকানা স্থগিত থাকে। কেননা যদি (ক্রেতা) ফিরিয়ে দেয় তবে তা বিক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসবে। পক্ষান্তরে বিক্রয় যদি বহাল রাখে, তবে চুক্তির সময় হতেই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মালিকানার উপর যে জিনিসের ভিত্তি-সেটাও স্থগিত থাকবে। ভরণ-পোষণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে আরোপিত, যা স্থগিত রাখা সম্ভব নয়।

ব্যবসায়ের যাকাত সম্পর্কেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদঃ সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ ও সময়

ফিতরার পরিমাণ হলো অর্ধ সা'আ গম, বা আটা, ছাতু বা কিশমিশ অথবা এক সা'আ খেজুর বা যব। সাহেবাইনের মতে কিশমিশ যবের পর্যায়ভূক্ত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকেও এ মত বর্ণিত আছে। প্রথম মতটি কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী।

ইমাম শাফিঈ(র.)-এর মতে উল্লেখিত সব ক'টি জিনিসের ক্ষেত্রেই এক সা'আ ওয়াজিব হবে । কেননা আবূ সাঈদ খুদরী(রা.) তার বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর যামানায় আমরা এই পরিমাণ আদায় করতাম।

আমাদের দলীল হলো সা'লাবা(রা.) বর্ণিত হাদীছ যা ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটা একদল সাহাবা ও মাযহাব, যাদের মাঝে খুলাফায়ে রাশেদীন(রা.) ও রয়েছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা নফল রূপে অতিরিক্ত দানের সংগে সম্পৃক্ত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কিশমিশ সম্পর্কে সাহেবাইনের বক্তব্য এই যে, কিশমিশ ও খেজুর উদ্দেশ্যের দিক থেকে নিকটবর্তী।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) –এর দলীল এই যে, কিশমিশ ও গম গুণগত দিকে থেকে নিকটবর্তী। কেননা উভয়টি সর্বাংশে ভক্ষণ করা হয়। অথচ খেজুরের বীচি এবং যবের খোসা ফেলে দিতে হয়। এখান থেকেই গম ও খেজুরের মাঝে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

মতনে উল্লেখিত আটা ও ছাতুর দ্বারা (ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর)উদ্দেশ্য হলো গমের আটা ও ছাতু। যবের ছাতু যবেরই শ্রেণীভূক্ত হবে। তবে সতর্কতার খাতিরে উভয়ের মধ্যে পরিমাণ ও মূল্য বিবেচনা করা উত্তম। যদিও কোন কোন বর্ণনায় ‘আটা’ কথাটা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় উপর নির্ভর করে কিতাবে বিষয়টি বর্ণনা করা হয়নি।

রুটির ক্ষেত্রে মূল্য বিবেচ্য হবে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে অর্ধ সা’আ গম পাল্লার ওযনে বিবেচনা করা হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর বর্ণনা মতে পাত্রের ধর্তব্য হবে।

গমের চেয়ে আটা দ্বারা পরিশোধ করাই উত্তম। আর দিরহাম দ্বারা আদায় করা আটার চেয়ে উত্তম। এ হল ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত মত। ফকীহ্ আবূ জাফর এ মতই গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ দ্বারা প্রয়োজনে অধিক ও ত্বরায় সম্পন্ন হয়।

ইমাম আবূ বকর আল আ’মাশ থেকে অবশ্য গমকে অগ্রাধিকার প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটা মতভেদ থেকে অধিক দূরবর্তী। কারণ আটা ও মূল্য দ্বারা ফিতরা আদায় হওয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (র.) এর ভিন্নমত রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.) এর মতে এক সা’আ এর পরিমাণ হচ্ছে আট ইরাকী ‘রতল’। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে পাচ রতল ও এক রতলের এক-তৃতীয়াংশ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এটা ইমাম শাফিঈ(র.) এরও মত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমাদের সা’আ হলো সকল সা’আ এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম।

আমাদের দলীল হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী (সা.) ‘মুদ্দ’ পাত্র দ্বারা উযূ করতেন যার পরিমাণ ছিলো দুই রতল এবং গোসল করতেন এক সা’আ দ্বারা, যার পরিমাণ ছিলো আট ‘রতল’। উমরা(রা.) এর সা’আও অনুরূপ ছিলো।

আর হাশেমী সা’আ-এর তুলনায় এটা ছোট আর তারা সাধারণত। হাশিমী সা’আ-ই ব্যবহার করতেন।

কুদূরী(র.) এর ভাষ্য, ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদয় হওয়ার সাথে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রমযানের শেষ দিন সূর্যাস্তের সংগে সম্পর্কিত। সুতরাং যে ঈদের রাতে ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা জন্মগ্রহণ করে, আমাদের মতে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে। কিন্তু তার মতে ওয়াজিব হবে না। আর ঈদের রাত্রে তার যে গোলাম কিংবা সন্তান মারা যাবে, তাদের ক্ষেত্রে মতামত হল বিপরীত।

তার যুক্তি এই যে, এটার সম্পর্ক হলো ‘ফিতর’ তথা রোযা ভংগের সংগে। আর এ-ই হলো তার সময়।

আমাদের দলীল এই যে, ফিতরের সাথে সাদাকার সম্পর্ক হল বিশেষত্ব প্রকাশের জন্য আর ফিতর (বা রোযা রাখা না রাখা) এর সম্পর্ক হলো দিনের সাথে, রাত্রের সাথে নয়।

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগায় রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিত্‌রা আদায় করা মুসতাহাব। কেননা নবী করীম (সা.) রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতেন।

তাছাড়া যুক্তিগত দলীল এই যে, সচ্ছল করে দেয়ার আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো, যেন গরীব লোকটি ব্যস্ততায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

এটা আগেভাগে আদায় করার মাধ্যমেই সম্ভব।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি ফিতরা ঈদুল ফিতরের আগেই আদায় করে দেয়, তবে জাইয হবে। কেননা সবব (রামাযান) আগমনের পরেই সে তা আদায় করেছে। সুতরাং আগে-ভাগে যাকাত আদায় করার অনুরূপ হবে।

আর সময়ের পরিমাণে কোন তারতম্য নেই। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

যদি ঈদুল ফিতরের দিন আদায় না করে বিলম্বিত করে, তবে ওয়াজিব রহিত হবে না। বরং তা আদায় করতেই হবে।

এটা ইবাদত হওয়ার কারণ যুক্তিসংগত। সুতরাং এ সাদাকার ক্ষেত্রে আদায় করার সময় সীমাবদ্ধ হবে না। কুরবানীর বিষয়টি এর বিপরীত।

আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

http://islaminonesite.wordpress.com/

http://islaminonesite.wordpress.com/

অধ্যায়-
সিয়াম

অধ্যায়-সিয়াম

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, রোযা দু'প্রকার। ওয়াজিব ও নফল। আবার ওয়াজিব দু'প্রকার। এক প্রকার হলো নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন রমযানের রোযা এবং নির্ধারিত দিনের মান্নাতের রোযা। এই প্রকার রোযা রাত্রে নিয়্যত করা দ্বারা জাইয হয়। আর যদি নিয়্যত না করে অথচ ভোর হয়ে যায়, তাহলে ভোর ও যাওয়াল এর মধ্যবর্তী সময়ে নিয়্যত করলেও যথেষ্ট হবে।

কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। জেনে রাখা কর্তব্য যে, রমযানের রোযা হলো ফরয। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তোমাদের উপর

রোযা ফরয করা হয়েছে। তাছাড়া রোযার ফরয হওয়া সম্পর্কে 'ইজমা' সংগঠিত হয়েছে। এ জন্যই রমাযানের রোযা অস্বীকারকারীকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়।

নযরের রোযা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তারা যেন তাদের মান্নতসমূহ পুরা করে। প্রথমটির সবব হলো (রমযান) মাসের উপস্থিতি। এ কারণেই উক্ত রোযাকে মাসের দিকে সম্বোধন করা হয় এবং মাসের পুনরাগমনে রোযারও পুনরাগমন ঘটে। আর রমাযানের প্রতিটি দিবস হচ্ছে সেই দিবসের রোযা ওয়াজিব হওয়ার সবব।

দ্বিতীয় প্রকার রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে মান্নত করা। আর নিয্ত হচ্ছে তার জন্য শর্ত। ইনশাল্লাহ্ এ বিষয়ে সামনে বিশদ আলোচনা করবো।

বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র.) এর বক্তব্যের প্রমাণ হলো নবী (সা.) এর বাণী- যে ব্যক্তি রাত্রে রোযার নিয়্যত করেনি, তার রোযা নেই।

তাছাড়া নিয়্যত না থাকার কারণে রোযার প্রথম অংশটুকু যখন ফাসিদ হয়ে গেলো তখন দ্বিতীয় অংশটুকুও অনিবার্যভাবে ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা (ফরয) রোযা বিভক্তিযোগ্য নয়। নফলের বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ নফল রোযা তার মতে বিভক্তিযোগ্য।

আমাদের দলীল এই যে, জনৈক বেদুঈন চাদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- শোন, যে ব্যক্তি পানাহার করে ফেলেছে, সে যেন অবশিষ্ট দিন পানাহার না করে। আর যে পানাহার করেনি, সে যেন রোযা রাখে।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি পূর্ণতা ও ফযীলত অর্জিত না হওয়ার উপর প্রযোজ্য। কিংবা এর অর্থ এই যে, সে এই নিয়্যত করেনি যে, তার রোযা রাত্র থেকে শুরু হবে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এটা হলো রোযার জন্য নির্ধারিত দিন। সুতরাং প্রথমাংশের পানাহার থেকে বিরত থাকাটা বিলম্বিত নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল হবে। যা উক্ত রোযার অধিকাংশের সংগে যুক্ত, যেমন নফলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

এই কারণ এই যে, রোযা হচ্ছে একটি দীর্ঘায়িত রুকন। আর নিয়্যতের প্রয়োজন হলো সেটাকে আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং আধিক্যের দ্বারা রোযার অস্তিত্বের দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

নামায ও হজ্জের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা নামায ও হজ্জ হচ্ছে কয়েকটি রুকন সমন্বিত। সুতরাং ইবাদত দুটি আদায়ের সংঘটনের সময়ের সংগে নিয়্যত যুক্ত হওয়া জরুরী।

কাযা রোযার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, তা ঐ দিনের রোযার উপর নির্ভরশীল। আর ঐ রোযাটি হলো নফল।

যাওয়ালের পরে নিয়্যত করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা, সেক্ষেত্রে রোযার নিয়্যতটি দিনের অধিকাংশের সংগে যুক্ত হয়নি। ফলে রোযা ফউত হওয়ার দিকটি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

মুখতাসারুল কুদূরীতে (নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে) ভোর ও যাওয়ালের মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছে। আর জামেউস্ সাগীর কিতাবেও অর্ধ দিবসের পূর্বের কথা বলা হয়েছে। এ-ই বিশুদ্ধ মত। কেননা দিবসের অধিকাংশ সময় নিয়্যত বিদ্যমান থাকা জরুরী। আর (শরীআত মতে) দিবসের অর্ধেক হলো ফজরের উদয় থেকে বৃহত্ পূর্বাহ্ন পর্যন্ত, যাওয়ালের সময় পর্যন্ত নয়। সুতরাং এর পূর্বেই নিয়্যত বিদ্যমান হওয়া জরুরী, যাতে নিয়্যত দিবসের অধিকাংশ বিদ্যমান থাকে।

(দিবসের নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে)মুসাফির-মুকীমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা আমাদের বর্ণিত দলীলে কোন 'পার্থক্য নির্দেশ' নেই। অবশ্য ইমাম যুফার ভিন্ন মত পোষণ করেন।

এই প্রকার রোযা সাধারণ নিয়্যত দ্বারা, নফলের নিয়্যত দ্বারা এবং অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যত দ্বারা আদায় হয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নফলের নিয়্যত করলে তা নিরর্থক হবে। (ফরযও হবে না, নফলও হবে না)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাধারণ নিয়্যত সম্পর্কে তার দু'টি মত রয়েছে। কেননা নফলের নিয়্যত দ্বারা সে ফরয রোযার উপেক্ষাকারী হলো। সুতরাং তার জন্য ফরয আদায় হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, সেই দিনটিতে ফরয নির্ধারিত রয়েছে। সুতরাং মূল নিয়্যত দ্বারাই তা হাছিল হয়ে যাবে। যেমন ঘরে একা বিদ্যমান ব্যক্তিকে তার জাতিবাচক নামে ডাকলেও উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যায়।

আর যদি নফল কিংবা অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করে থাকে, তাহলেও সে মূল রোযা এবং অন্য একটি অতিরিক্ত দিকের নিয়্যত করলো। সুতরাং যখন অতিরিক্ত দিকটি বাতিল হয়ে গেলো তখন মূল বিষয় (রোযা) অবশিষ্ট থাকলো। আর তা-ই রোযা আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে মুসাফির ও মুকীম এবং সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তির মাঝে এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। কেননা (রোযা না রাখার) অবকাশ দানের কারণ এই যে, 'মাযূর' ব্যক্তির যেন কষ্ট না হয়। কিন্তু যখন সে স্বেচ্ছায় কষ্ট গ্রহণ করে নিলো, তখন সে 'অ-মাযূর' ব্যক্তির সংগে যুক্ত হয়ে গেলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তি যখন অন্য ওয়াজিব রোযার নিয়্যতে রোযা রাখে, তখন সেই রোযাই সাব্যস্ত হবে।

কারণ 'সময়' কে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়োজিত করেছে। কেননা অন্য ওয়াজিবের কাযা এই মূহুর্তে তার উপর আরোপিত। পক্ষান্তরে রমাযানের রোযার ব্যাপারে পরবর্তীতে সময় লাভ করা পর্যন্ত সে ইখতিয়ার প্রাপ্ত।

নফলের নিয়্যত করার ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে।

একটি বর্ণনা (অর্থাত্ ফরয হিসাবে গণ্য হওয়ার) মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, এখানে সময়টিকে সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিযুক্ত করেনি।

দ্বিতীয় প্রকার হলো এমন রোযা, যা (অনির্ধারিত ভাবে) তার যিম্মায় ওয়াজিব। যেমন, রমাযান মাসের রোযা এবং কাফ্ফারার রোযা। সুতরাং রাত্রেকৃত নিয়্যত ছাড়া তা দুরস্ত হবে না। কেননা, তা নির্ধারিত নয়। অথচ প্রথম থেকে নির্ধারণ করা জরুরী।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সকল রোযা যাওয়ালের পূর্বে নিয়্যত করা দ্বারা জাইয।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি আমাদের উল্লেখিত হাদীছটি ব্যাপকতা প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন।

আমাদের প্রমাণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অ-রোযাদার অবস্থায় ভোর বেলা হওয়ার পরে বলেছেন- (এখন থেকে আমি রোযা রেখে নিলাম)।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, রমাযানের বাইরে নফল রোযা শরীআত অনুমোদিত ইবাদাত। সুতরাং দিবসের প্রথমাংশের পানাহার সংযমটি রোযা রূপে গৃহীত হওয়া নিয়্যতের উপর নির্ভর করবে। যেমন আমরা আগে উল্লেখ করে এসেছি। মতে রোযা বিভাজন গ্রহণ করে। কারণ নফলের ভিত্তি হচ্ছে মনের প্রফুল্লতার উপর। আর এমন হতে পারে যে, যাওয়ালের পর সে প্রফুল্লতা অনুভব করলো। তবে তার জন্য শর্ত এই যে, দিবসের শুরু থেকেই পানাহার থেকে বিরত থাকা।

আমাদের মতে দিবসের শুরু থেকেই সে রোযাদার গণ্য হবে। কেননা, এটা হলো আত্ম-দমনের বিশেষ ইবাদত। আর তা নির্ধারিত সময়ে রোযা বিরুদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং দিবসের অধিকাংশ সময়ের সংগে নিয়্যত যুক্ত হওয়া বিবেচ্য হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন, মানুষের কর্তব্য হলো শা'বান মাসের ঊনত্রিশ তারিখে চাদ অনুসন্ধান করা। যদি তারা চাদ দেখতে পায়, তাহলে রোযা রাখবে। আর যদি (মেঘের কারণে) চাদ তাদের অগোচরে থাকে তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। অতঃপর রোযা রাখবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- তোমরা চাদ দেখে রোযা রাখো এবং চাদ দেখে ইফতার করো। আর যদি চাদ তোমাদের অগোচরে থাকে তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

তাছাড়া এই কারণে যে, প্রকৃত অবস্থা হল মাস অব্যাহত থাকা। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া উক্ত মাস থেকে বের হওয়া যাবে না। আর এখানে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

(ত্রিশ তারিখের) সন্দেহ পূর্ণ দিনটিতে নফল ছাড়া অন্য কোন রোযা রাখবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যে দিনটি সম্পর্কে সন্দেহ হয় যে, তা রমাযান কিনা, সে দিনে নফল ছাড়া অন্য কোন রোযা রাখা যাবে না।

এই মাসাআলাটি কয়েক প্রকার।

০১) প্রথমতঃ রমাযানের নিয়্যত করে রোযা রাখা মাকরূহ। প্রমাণ হলো আমাদের উপর বর্নিত হাদীছ।

আরো এ কারণে যে, এতে আহলে কিতাবের সংগে সাদৃশ্য হয়। কেননা তারার তাদের রোযার পরিমাণে বর্ধিত করেছিল।

তবে রোযা রাখার পর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমাযানেরই দিন, তাহলে তা রমাযানের রোযা হিসাবে যথেষ্ট হবে। কেননা সে মাস পেয়েছে এবং তাতে রোযা রেখেছে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, দিনটি শা'বান মাসের ছিল, তাহলে তা নফল হয়ে যাবে। আর যদি রোযা ভংগ করে তাহলে তার কাযা করবে না। কেননা তা ধারণা পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত।

০২) দ্বিতীয় প্রকার এই যে, (রমাযান ছাড়া) অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করলো। সেটাও মাকরূহ। প্রমাণ ইতোপূর্বে উপরে বর্ণিত হাদীছ। তবে মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রথমটার তুলনায় গৌণ।

এরপর যদি দেখা যায় যে, দিনটি রমাযানের দিন ছিল, তাহলে রমাযানের রোযা হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, রোযার মূল নিয়্যত বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিন ছিল, তাহলে কারো কারো মতে তা নফল হবে। কেননা, এ রোযা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং তা ছাড়া ওয়াজিব রোযা আদায় হবে না।

কোন কোন মতে যে রোযার নিয়্যত করেছে, তা আদায় হয়ে যাবে। এটা শুদ্ধতম মত। কেননা যে রোযাকে নিষেধ করা হয়েছে,তা হল রমাযানের উপর রমাযানের রোযাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা হল রমাযানের উপর রমাযানের রোযাকে অগ্রবর্তী করা। অন্য রোযা দ্বারা তা বাস্তবায়িত হয় না। ঈদের দিনের বিষয়টি এর বিপরীত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা এখানে নিষিদ্ধ বিষয়টি অর্থাত্ আল্লাহ্র দাওয়াত গ্রহণকে বর্জন করা যে কোন রোযা দ্বারা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর সেখানে মাকরূহ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে নিষেধ রূপের কারণে।

০৩) তৃতীয় প্রকার এই যে, নফলের নিয়্যত করে। এটি মাকরূহ নয়। প্রমাণ ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর এই হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) এর বিপক্ষে প্রমাণ। তার মতে (পূর্ব অভ্যাস ছাড়া) নতুনভাবে ঐদিন রোযা রাখা মাকরূহ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিম্নোক্ত বাণী- (তোমরা একটি বা দুটি রোযা দ্বারা রমাযানের অগ্রগামী হয়ো না)। এর উদ্দেশ্য হলো রমাযানের রোযা রেখে অগ্রবর্তী হওয়া থেকে নিষেধ করা। কেননা এতে সময়ের পূর্বেই রমাযানের রোযা রাখা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি ঐ দিবসটি এমন কোন দিবস হয়, যা সে পূর্ব হতেই রোযা রেখে আসছে তাহলে সকলের ঐকমত্যেই রোযা রাখা উত্তম।

তদ্রুপ যদি এমন হয় যে, (শা’বান) মাসের (কিংবা প্রত্যেক মাসের) শেষ তিন দিন কিংবা ততোধিক দিন সে রোযা রেখে এসেছে, তা হলে রোযা রাখাই উত্তম। পক্ষান্তরে যদি শুধু ঐ একদিন রোযা রাখার অভ্যাস হয়ে থাকে, তাহলে কোন কোন মতে বাহ্যতঃ নিষেধ থেকে বেচে থাকার জন্য রোযা না রাখাই উত্তম। আর কোন কোন মতে ‘আলী ও ‘আইশা (রা.) –এর অনুসরণে রোযা রাখাই উত্তম। কেননা তারা ঐ দিন রোযা রাখতেন।

আর স্বীকৃত মত এই যে, মুফতী (ও অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিগণ) সতর্কতার খাতিরে নিজে তা রোযা রাখবেন কিন্তু সাধারণ লোকদের যাওয়াল পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর পানাহার করার ফাতওয়া দান করবেন। (নিজে গোপনে রোযা রাখবেন) অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য।

০৪) চুতর্থ প্রকার এই যে, মূল নিয়্যতের মধ্যে দোদুল্যমান হওয়া। অর্থাত্ এভাবে নিয়্যত করা যে, আগামীকাল রমাযান হলে রোযা রাখবে, আর শা’বান হলে রোযা রাখবে না। এইভাবে সে রোযাদার হবে না। কেননা তার নিয়্যতকে স্থির করেনি। সুতরাং এমনই হলো, যেন সে নিয়্যত করলো যে, আগামীকাল যদি সে খাবার পায় তাহলে রোযা রাখবে না, আর খাবার না পেলে রোযা রাখবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

০৫) পঞ্চম প্রকার এই যে, নিয়্যতের প্রকৃতির ক্ষেত্রে দ্বিধা পোষণ করে। অর্থাত্ এই নিয়্যত করে যে, আগামীকাল রমাযানের দিন হলে রমাযানের রোযা রাখবে। আর শা'বানের দিন হলে অন্য ওয়াজিব রোযা রাখবে। এটা মাকরূহ। কেননা সে দু'টি মাকরূহ বিষয়ের মাঝে দোদুল্যমান রয়েছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে, দিবসটি রমাযানের দিবস, তাহলে ঐ রোযাই যথেষ্ট হবে। কেননা মূল নিয়্যতের ক্ষেত্রে তো দ্বিধা নেই। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ পায় যে, তারা শা'বানের দিবস, তা হলে এ রোযা অন্য কোন ওয়াজিব রোযা রূপে যথেষ্ট হবে না। কেননা দ্বিধান্বিত থাকার কারণে দিক নির্ধারন হয়নি। আর মূল নিয়্যত তার জন্য যথেষ্ট নয়। তবে তা এমন নফল রোযায় রূপান্তরিত হবে, যা (ভঙ্গ করলে) কাযা যিম্মায় আসে না। কেননা তা সে শুরুই করেছে যিম্মা থেকে অব্যাহতির নিয়্যতে।

আর যদি সে এই নিয়্যত করে যে, আগামীকাল রমাযান হলে তার রোযা রমাযানের হবে; আর শা'বানের হলে নফল রোযা হবে, তাহলে তাও মাকরূহ। কেননা এক দিক থেকে সে (রমাযানের) ফরয রোযার নিয়্যত করছে। অতঃপর যদি প্রকাশ পায় যে দিবসটি রমাযানের দিবস, তাহলে তা রমাযানের রোযা হিসাবে যথেষ্ট হবে। কারণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি প্রকাশ পায় যে, তা শা'বানের দিবস, তাহলে নফল হিসাবে তা জাইয হবে। কেননা নফল মূল নিয়্যতের দ্বারা আদায় হয়ে যায়।

যদি তা ফাসিদ করে ফেলে তাহলে কাযা না হওয়াই উচিত। কেননা, তার নিয়্যতের মধ্যেই এক হিসাবে যিম্মা থেকে অব্যাহতির লক্ষ্য বিদ্যমান।

যে ব্যক্তি একা রমাযানের চাদ দেখলো, সে রোযা রাখবে। যদিও ইমাম তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- তোমরা চাদ দেখে রোযা রাখো এবং চাদ দেখে রোযা ইফতার কর।

আর সে তো স্পষ্টভাবে চাদ দেখেছে। যদি সে রোযা ভংগ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফরা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, স্ত্রী সহবাস দ্বারা রোযা ভংগ করে, তাহলে তার উপর কাফ্ফরাও ওয়াজিব হবে। কেননা সে রমাযান সম্পর্কে, নিশ্চিত ছিল। আর হুকুম

http://islaminonesite.wordpress.com/

হিসাবেও (সে রমাযানের রোযা ভংগ করেছে) কেননা, তার উপর রোযা ওয়াজিব ছিল।

আমাদের মতে কাযী শরীআত সম্মত দলীলের ভিত্তিতে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলীলটি হলো ভুল দেখার সম্ভাবনা। ফলে তা সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর এরূপ কাফ্ফরা সন্দেহের দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

ইমাম তার সাক্ষ্য প্রত্যাখান করার পূর্বেই যদি সে রোযা ভংগ করে ফেলে, তাহলে সে বিষয়ে মাশায়েখগণের মতভেদ রয়েছে।

(সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত) এই লোক যদি ত্রিশদিন রোযা পূর্ণ করে, তাহলেও সে ইমামের সংগে ছাড়া রোযা বর্জন করতে পারবে না। কেননা সতর্কতা হিসাবেই তার উপর রোযা ওয়াজিব হয়েছিলো। আর পরবর্তীতে সতর্কতা হলো 'রোযা' বর্জন বিলম্বিত করার মধ্যে।

তবে যদি রোযা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার ধারণা অনুযায়ী সাব্যস্ত প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে তার উপর কাফ্ফরা ওয়াজিব হবে না।

যদি আকাশ অপরিস্কার থাকে তাহলে চাদ দেখার ব্যাপারে ইমাম একজন 'আদিল' (সত্ ব্যক্তি) ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন, সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক, স্বাধীন হোক কিংবা দাস। কেননা, এটা দায়িনী বিষয়। সুতরাং তা হাদীছ বর্ণনার সদৃশ হলো। এ জন্য তা 'সাক্ষ্য' শব্দের উপর নির্ভরশীল নয়। ন্যায়-পরায়ণতার শর্ত আরোপ করার কারণ এই যে, দীনী বিষয়ে কাফিরের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম তাহাবীর বক্তব্য 'ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা ন্যায়পরায়ণ না হোক; তা এ অবস্থার উপর প্রযোজ্য, যখন তার ন্যায়পরায়ণতা অজানা থাকে।

আর আকাশ 'অপরিস্কার'- এর অর্থ মেঘ, ধুলিঝড় ইত্যাদি থাকা। ইমাম কুদূরীর নিঃশর্ত বিবরণে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত, যে যিনার অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তিপ্রাপ্তির পর তওবা করে নিয়েছে। এ হল জাহিরে রিওয়ায়াত। কেননা এটা হচ্ছে খবর প্রদান। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত এক মতে তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা একদিক থেকে এটি সাক্ষ্যের পর্যায়ের।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে বর্ণিত দু'টি মতের একটিতে দু'জনের শর্ত আরোপ করেছেন। তার বিপক্ষে আমাদের দলীল তাই, যা উপরে আমরা উল্লেখ করেছি।

তাছাড়া বিশুদ্ধ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) রমাযানের চাদ দেখার ব্যাপারে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।

এরপর ইমাম একজনের সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে যদি লোকেরা রোযা ত্রিশদিন পূর্ণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান (ইব্ন যিয়াদ) কর্তৃক বর্ণিত মতে সতর্কতা হিসাবে রোযা ত্যাগ করবে না। কেননা, রোযা ত্যাগ করার বৈধতা একজনের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সিয়াম ত্যাগ করে ফেলবে। কেননা রোযা ত্যাগ করার বৈধতা এই ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে যে, রমাযান এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছিলো। যদিও স্বতন্ত্রভাবে প্রথম অবস্থায় এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা সিয়াম ত্যাগ করার বৈধতা প্রমাণিত হয় না। যেমন ধাত্রীর সাক্ষ্য ছাড়া প্রমাণিত 'নসব'-এর উপর ভিত্তি করে মীরাসের অধিকার সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

আকাশ যদি অপরিষ্কার না থাকে তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না এমন একটা বড় দল তা দেখতে পায়, যাদের সংবাদে নিশ্চিত হওয়া যায়। কেননা, এমন অবস্থায় একা চাদ দেখার মধ্যে ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং একটা বড় দলের দেখা পর্যন্ত সে বিষয়ে অপেক্ষা করা কর্তব্য হবে। আকাশ পরিষ্কার থাকার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কখনো কখনো চাদের স্থান থেকে মেঘ কেটে যায়, ফলে কারো পক্ষে চাদ দেখে ফেলা সম্ভব হতে পারে। 'বড় দলের' সংজ্ঞা হিসাবে কেউ কেউ মহল্লাবাসী বুঝিয়েছেন।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে পঞ্চাশ জনের কথা বর্ণিত হয়েছে 'কাসামাহ' এর উপর কিয়াস করে।

শহরবাসী এবং শহরের বাহির থেকে আগত লোকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, শহরের বাহির থেকে আগত হলে এক জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা (তথায় ধুয়া-ধূলা ইত্যাদির) প্রতিবন্ধকতা কম। কিতাবুল ইসতিহসান' এ এ দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

যদি কেউ শহরের কোন উচু স্থান থেকে চাদ দেখে তবে তার হুকুম অনুরূপ। যে ব্যক্তি একা ঈদের চাদ দেখেছে সে সিয়াম ভঙ্গ করবে না। এর কারণ সতর্কতা অবলম্বন। আর সিয়ামের ক্ষেত্রে ওয়াজিব করার মধ্যেই হলো সতর্কতা।

যদি আকাশ অপরিষ্কার থাকে তাহলে ঈদের চাদ প্রমাণিত হবে না কমপক্ষে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রী লোকের সাক্ষ্য ব্যতীত। কেননা, এই চাদ দেখার সাথে বান্দার উপর সম্পর্কিত। আর তা হলো রোযা না রাখা। সুতরাং তার অন্যান্য হকসমূহের সদৃশ হয়ে গেলো। যাহিরে রিওয়ায়াত অনুযায়ী ঈদুল আযহা এ ক্ষেত্রে ঈদুল ফিতরের অনুরূপ। এ-ই বিশুদ্ধতম মত।

অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ভিন্নমত বর্ণিত আছে, এ জন্য যে, তা রমাযানের চাদ দেখার মতো।

(যাহিরে রিওয়ায়াতের দলীল এই যে) এর সাথে বান্দাদের উপকার সম্পর্কিত রয়েছে। আর তা হলো কুরবানীর গোশত আহারের সুযোগ গ্রহণ।

আর যদি আকাশ অপরিষ্কার না থাকে তাহলে এমন এক জামা'আতের সাক্ষ্য ব্যতীত চাদ প্রমাণিত হবে না, যাদের সংবাদ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়।

যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

রোযার সময় হলো ফজর ছানী (সুবহে সাদিক) এর উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

শুভ্র রেখা ফজরের কৃষ্ণরেখা হতে পৃথক হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করো। এরপর তোমরা রাত্র পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো(০২:১৮৭)।

আর উভয় রেখা দ্বারা দিবসের শুভ্রতা এবং রাত্রির কৃষ্ণতা উদ্দেশ্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সিয়াম হলো নিয়্যতসহ দিবসে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা- শরীআতের পরিভাষায়। কেননা, আভিধানিক অর্থে শুধু বিরত থাকার নামই সিয়াম। কারণ, এ অর্থে তার ব্যবহার রয়েছে। তবে শরীআত তার সংগে নিয়্যত যুক্ত করেছে, যাতে ইবাদত অভ্যাস হতে পৃথক হয়ে যায়।

দিবসের সংগে বিশিষ্ট হওয়ার কারণ হলো আমাদের বর্ণিত আয়াত।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, দিনরাতের একটানা রোযা রাখা যখন দুঃসাধ্য তখন দিবসের অংশকে নির্ধারণ করাই উত্তম। যাতে আমলটি অভ্যাসের বিপরীত হয়। আর ইবাদতের ভিত্তিই হলো অভ্যাসের বিপরীত করার উপর।

নারীদের ক্ষেত্রে রোযা আদায়ের বৈধতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য হায়িয ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত।

প্রথম অনুচ্ছেদ

যে কারণে কাযা ও কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়

রোযাদার যখন ভুলে পানাহার বা সহবাস করে ফেলে তখন তার রোযা ভংগ হয় না। আর কিয়াসের দাবী হলো ভংগ হয়ে যাওয়া। এটি ইমাম মালিক (র.) এর মত। কেননা রোযার বিপরীত কর্ম পাওয়া গেছে। সুতরাং এটা নামাযের মধ্যে ভুলে কথা বলার মতো হয়ে গেলো।

ইস্‌তিসসানের (সূক্ষ কিয়াসের) কারণ হলো ভুলে পানাহারকারী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বানী-তুমি তোমার সিয়াম পূর্ণ করো। কেননা আল্লাহ্ই তোমাকে আহার করিয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।

পানাহারের ক্ষেত্রে যখন এটি প্রমাণিত হলো তখন সহবাসের ক্ষেত্রেও তা প্রমাণিত হবে। আর রুকন হিসাবে সবগুলোই সমান। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা সালাতের অবস্থাই স্মরণকারী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভুল প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

ফরযা ও নফল সাওমের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেননা উক্ত হাদীছে কোন পার্থক্য করা হয়নি। আর যদি বিচ্যুতি কিংবা জবরদস্তির কারণে তা করে থাকে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তিনি এ দু'জনকে ভুলকারী ব্যক্তির উপর কিয়াস করেন। আমাদের দলীল এই যে, এ দু'টি অবস্থার অস্তিত্ব অধিক নয়। পক্ষান্তরে ভুলের ওযর অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে।

তাছাড়া বিস্মৃতি ঐ সত্তার পক্ষ থেকে ঘটে থাকে, যিনি রোযার হকদার। পক্ষান্তরে বল প্রয়োগ অন্যের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং এ দু'টি অবস্থার অস্তিত্ব অধিক নয়। পক্ষান্তরে ভুলের ওযর অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে।

তাছাড়া বিস্মৃতি ঐ সত্তার পক্ষ থেকে ঘটে থাকে, যিনি রোযার হকদার। পক্ষান্তরে বল প্রয়োগ অন্যের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং এ দু'টির হুকুমে পার্থক্য হবে।

যেমন, সালাত কাযা করার ক্ষেত্রে শৃংখলিত ও অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে (পার্থক্য) রয়েছে।

যদি ঘুমের মাঝে কারো স্বপ্নদোষ ঘটে তাহলে তার সাওম ভংগ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- তিনটি বিষয় সওম ভংগ করে না। যথা, বমি, শিংগা লাগানো স্বপ্নদোষ।

আর এই জন্য যে, এখানে প্রকৃত সহবাস পাওয়া যায়নি বাহ্যতঃ ও মর্মগতাভাবে। আর সহবাসের মর্মার্থ হলো সংগম যোগে উত্তেজনা সহকারে বীর্যপাত।

তদ্রুপ (সিয়াম ভংগ হবে না) যদি কোন স্ত্রী লোকের দিকে তাকানোর কারণে বীর্যস্খলিত হয়ে যায়।

আর যদি তৈল লাগায় তাহলে সাওম ভংগ হবে না। কেননা, এতে সাওম বিরোধী কিছু পাওয়া যায়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তদ্রূপ সিংগা লাগালেও সাওম ভংগ হবে না। উক্ত কারণে এবং ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী।

যদি সুরমা ব্যবহার করে তাহলে সাওম ভংগ হবে না। কেননা চক্ষু ও মস্তিষ্কের মাঝে কোন ছিদ্রপথে নেই। আর যে অশ্রুঘামের মতো চুইয়ে বের হয় এবং লোমকূপ দিয়ে যা প্রবেশ করে, তা সিয়ামের বিরোধী নয়। যেমন যদি কেউ ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করে তবে সিয়াম ভঙ্গ হয় না।

যদি স্ত্রীকে চুম্বন করে তবে সিয়াম ভংগ হবে না। অর্থাত্ যদি বীর্যস্খলন না হয়। কেননা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সিয়াম বিরোধী কোন কিছুই ঘটে নি। রুজু করা এবং মুছাহারাতের সম্পর্ক সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এখানে হুকুমটি সবব বা কার্যকারণের উপর আবর্তিত। যথাস্থানে ইনশাল্লাহ্ তা আলোচিত হবে।

তদ্রূপ কোন বেগানা স্ত্রী লোককে চুম্বন করলে তার উর্ধ্বতন (মা, নানী ইত্যাদি) অধঃস্তন সকল নারী (কন্যা, নাতনী ইত্যাদি) উক্ত লোকের জন্য হারাম হয়ে যায় এটাকে বলে। যদি চুম্বন কিংবা স্পর্শের কারণে বীর্যস্খলিত হয়ে যায়, তাহলে তার সিয়ামের কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, এতে সহবাসের মর্ম বিদ্যমান। আর সতর্কতার খাতিরে বাহ্যিক কিংবা আভ্যন্তরীণ যে কোন রূপে রোযা বিরোধী বিষয়ের অস্তিত্ব রোযার কাযা ওয়াজিব করার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য অপরাধ পূর্ণভাবে সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা তা হদসমূহের মত সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়।

যদি নিজের ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকে আর চুম্বন করাতে কোন দোষ নেই, যদি নিজের উপর নির্ভরতা থাকে। অর্থাত্ সহবাস কিংবা বীর্যস্খলনে গড়াবে না। যদি এই ভরসা না থাকে তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা মূল চুম্বন রোযা ভংগকারী নয়। বরং পরিণতির দিক থেকে হয়ত তা কখনো বা ভংগকারী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যদি নিজের উপর ভরসা থাকে তাহলে মূল চুম্বনের দিকটি বিবেচনা করে তা তার জন্য মুবাহ্ হবে। পক্ষান্তরে যদি নিজের উপর ভরসা না থাকে তা হলে চুম্বনের পরিণতির দিকটি বিবেচনা করে তার জন্য তা মাকরূহ হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

নগ্নদেহে পরস্পর জড়াজড়ি যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী চুম্বনেরই অনুরূপ। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নগ্নদেহে পরস্পর জড়াজড়ি মাকরূহ। কেননা এরূপ আচরণ খুব কমই অবৈধ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

সিয়াম স্মরণ থাকা অবস্থায় যদি তার গলার ভিতর মাছি প্রবেশ করে তাহলে রোযা ভংগ হবে না।

কিয়াস অনুযায়ী তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা রোযা ভংগকারী বস্তু তার উদরে পৌছে গেছে যদিও তা খাদ্যজাতীয় নয়, যেমন মাটি ও কংকর।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এ থেকে বেচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং তা ধুলো ও ধুয়ার সদৃশ হলো। বৃষ্টি ও বরফ সম্পর্কে মাশায়েখগণ মতভেদ করেছেন। তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, তাতে সিয়াম ভংগ হবে। কেননা তাবুতে বা ঘরে আশ্রয় নিয়ে তা থেকে বেচে থাকা সম্ভব।

যদি দাতের ফাকে আটকে থাকা গোশত 'ভক্ষণ' করে তবে কম হলে রোযা ভংগ হবে না। কিন্তু বেশী পরিমাণ হলে ভংগ হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই রোযা ভংগ হবে। কেননা মুখ বাইরের অংশ রূপে বিবেচিত। এ কারণেই কুলি করার কারণে তার রোযা নষ্ট হয় না।

আমাদের দলীল এই যে, অল্প পরিমাণ দাতের অনুগত যেমন তার থুথু।

পরিমাণের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, শেষ পর্যন্ত তা দাতের ফাকে বিদ্যমান থাকে না। কম ও বেশীর মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী হলো একটি বুটের পরিমাণ। এর চাইতে কম অল্প হিসাবে গণ্য।

যদি তা বের করে হাতে নেয় অতঃপর তা ভক্ষণ করে তাহলে রোযা ফাসিদ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যেমন- ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, কোন সিয়াম পালনকারী যদি দাতের ফাকে (আটকে থাকা) তিল গিলে ফেলে তবে সিয়াম নষ্ট হবে না। আর যদি সরাসরি তা মুখে নিয়ে খায় তাহলে তার সিয়াম ভংগ হবে। আর যদি তা শুধু চিবায় তাহলে ইউসূফ (র.) এর মতে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা তা

http://islaminonesite.wordpress.com/

বিকৃত খাদ্য। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর দলীল এই যে, মানুষের রুচি তা ঘৃণা করে।

যদি অনিচ্ছাকৃত বমি এসে পড়ে তাহলে তাতে রোযা ভংগ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি বমি করে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যে ইচ্ছাকৃত বমি করে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। অনিচ্ছাকৃত বমির ক্ষেত্রে মুখ ভরা বমি ও কম বমির হুকুম সমান।

যদি বমি ভিতরে ফেরত যায় আর তা মুখ ভরা থাকে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে তাতে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা তা বাইরের, এমনকি এত উযূ ভংগ হয়ে যায়। আর তা-ই ভিতরে প্রবেশ করেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা রোযা ভংগের বাহ্যরূপ অর্থাত্ গলাধঃকরণ পাওয়া যায়নি। তদ্রুপ রোযা ভংগ করার প্রকৃত মর্মও পাওয়া যায়নি। কেননা তা সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না।

যদি উক্ত বমি সে নিজে পালটিয়ে নেয় তাহলে সকলের মতেই রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে, কেননা বাহির হওয়ার পর প্রবেশ করানো পাওয়া গেছে। সুতরাং রোযা ভংগের বাহ্যরূপ বিদ্যমান হয়।

বমি যদি মুখভরা থেকে কম হয় আর নিজেই ফেরত যায় তাহলে তার রোযা ভংগ হবে না। কেননা এটা বাইরের নয় এবং এর প্রবেশের ব্যাপারে তার কোন প্রয়াস নেই।

যদি সে নিজে ইচ্ছা করে গিলে ফেলে তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা, বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে তার রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে তার প্রয়াস রয়েছে।

যদি রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় মুখ ভরে বমি করে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর এই হাদীছের কারণে কিয়াস বর্ণিত হয়। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না; কেননা (রোযা ভংগ হওয়ার) বাহ্য

http://islaminonesite.wordpress.com/

রূপ পাওয়া যায়নি। যদি উক্ত বমি ভরা মুখের কম হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে একই হুকুম হবে। কেননা হাদীছটি নিঃশর্ত।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা, শরী্আতের হুকুম মতে বাহির হওয়া সাব্যস্ত হয় নি।

অতঃপর যদি তা ফেরত যায়, তাহলে তার মতে রোযা ফাসিদ হবে না। কেননা ফেরত যাওয়ার পূর্বে বের হওয়া সাব্যস্ত হয়নি। যদি সে ই্চ্ছা করে ফেরত নেয় তবে তার পক্ষ হতে বর্ণিত একটি মতে পূর্ববর্ণিত কারণেই ফাসিদ হবে না। কিন্তু তার পক্ষ হতে বর্ণিত অন্য একটি মতে ফাসিদ হবে। কেননা, এটাকে তিনি মুখভরা বমির সাথে যুক্ত করেছেন। কারণ, তার ইচ্ছাকৃত কর্মের (ই্চ্ছাকৃত বমন ও গলাধঃকরণ) আধিক্যের কারণে।

যে ব্যক্তি কংকর কিংবা লোহা গিলে ফেলে তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে। কেননা, রোযা ভঙ্গের ‘বাহ্যরূপ’ পাওয়া গেছে।

তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কারণ (আহারের) প্রকৃত মর্ম পাওয়া যায়নি।

যে ব্যক্তি (রোযার) স্মরণ অবস্থায় দু’পথের কোন এক পথে সংগম করবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে।

কাযা ওয়াজিব রোযার বিনষ্ট উদ্দেশ্য পুনঃঅর্জনের জন্য। আর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে। উভয় সংগমের ক্ষেত্রেই বীর্যস্খলনের শর্ত নেই, এটাকে গোসলের উপর কিয়াস করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, বীর্যস্খলন ছাড়াই আনন্দ পাওয়া যায়। তা দ্বারা তো-তৃপ্তি লাভ হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে আরেক বর্ণনায় রয়েছে যে,ঘৃণিত স্থানে (গুহ্যদ্বারে) সংগম দ্বারা কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তার মতে কাফ্ফারা হদের সাথে বিবেচ্য।

আর বিশুদ্ধ মত এই যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা শাহওয়াত পূর্ণ হওয়ার কারণে অপরাধ পূর্ণতা লাভ করেছে। মৃতদেহের সাথে কিংবা জন্তুর সাথে সংগম করলে বীর্যস্খলন ঘটুক কিংবা না ঘটুক, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল) কেননা স্বাভাবিক আকর্ষণীয় স্থানে' বাসনা চরিতার্থ করা দ্বারা অপরাধপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু এখানে তা পাওয়া যায়নি।

অতঃপর আমাদের মতে সংগম দ্বারা পুরুষের উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব, তেমনি স্ত্রীলোকের উপরও ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর একটি মতে স্ত্রী লোকের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো সংগমের সাথে। আর এটা হলো পুরুষের কাজ, স্ত্রী লোকটি হলো সংগম ক্ষেত্র।

ইমাম শাফিঈ (র.) এর অন্য একটি মতে স্ত্রী লোকেরও উপরও ওয়জিব হবে। তবে (এ দায়) তার পক্ষ হতে পুরুস বহন করবে; পানির ব্যয় ভারের উপর কিয়াস করে।

আমাদের প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- যে রমাযানে রোযা ভংগ করবে তার উপর তাই ওয়াজিব হবে, যা যিহারকারীর উপর ওয়াজিব হয়।

(বা যে) শব্দটি পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। তাছাড়া এ জন্য যে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে রোযা নষ্ট করা। শুধু সহবাসই নয়। আর উক্ত অপরাধে সেও পুরুষের সাথে শরীক। আর দায় বহণের প্রশ্নই উঠে না। কেননা এ কাফ্ফারা হয় ইবাদত, না হয়ে শাস্তি। আর উভয়টির মধ্যে অন্যের বহন চলে না।

যদি এমন কিছু আহার করে বা পান করে, যা খাদ্যরূপে কিংবা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা দুটোই ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কেননা, সহবাসের ক্ষেত্রে শরীআত কিয়াসের বিরুদ্ধে কাফ্ফারা প্রবর্তন করেছে। কারণ পাপ তো তওবা দ্বারাই মোচন হয়ে যায়। এ কারণে (রোযাভংগের) অন্য ব্যাপারকে সহবাসের উপর কিয়াস করা যাবে না।

আমাদের দলীল এই যে, কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো রমাযান মাসে পূর্ণরূপে রোযা ভংগ করার সাথে। আর আলোচ্য অবস্থায় তা সাব্যস্ত হয়। আর কাফ্ফারা হিসাবে

http://islaminonesite.wordpress.com/

গোলাম আযাদ ওয়াজিব করার দ্বারা বোঝা যায় যে, এই অপরাধ তওবা দ্বারা মোচন হয় না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কাফ্‌ফারা যিহারের কাফ্‌ফারার অনুরূপ। প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ। এবং জনৈক বেদুঈন সাহাবীর ঘটনা সম্পর্কে হাদীছ। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে হালাক হয়েছি এবং (স্ত্রীকেও) হালাক করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি করেছো? সাহাবী আরয করলেন, রমাযানের দিবসে ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, একটি গোলাম আযাদ করো। তিনি আরয করলেন, নিজের এই গ্রীবা ছাড়া আমি কারো মালিক নই। তখন তিনি বললেন, তাহলে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখো। তিনি আরয করলেন, আমি যে বিপদে এসেছি তাতো এ রোযার কারণেই এসেছে। তখন তিনি বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। তিনি আরয করলেন, এ সামর্থ্যও আমার নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ফারাক খেজুর আনার হুকুম দিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি পনের সা'আ খেজুরে পূর্ণ একটি থলে আনার হুকুম দিলেন এবং বললেন, এগুলো মিসকীনদের মাঝে বন্টন করে দাও। তিনি আরয করলেন, আল্লাহ্‌র কসম, মদীনার দুই প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে আমার এবং আমার পরিজনের চেয়ে অভাবী কেউ নেই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি এবং তোমার পরিবার পরিজন তা খাও। তবে তোমার জন্যই এটা যথেষ্ট, কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য তা যথেষ্ট হবে না।

এ হাদীছ ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতামতের বিপক্ষে দলীল যে, তার জন্য এর মধ্যে যে কোন একটি করার অধিকার রয়েছে। কেননা হাদীছের দাবী হেলা (তিনটির মাঝে) তারতীব রক্ষা করা।

তদ্রূপ ইমাম মালিক (র.) এর বিপক্ষেও দলীল যে, রোযা লাগাতার করতে হবে না। কেননা হাদীছে লাগাতার করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।

যে ব্যক্তি স্ত্রীর লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যভাবে সংগম করে এবং বীর্যপাত ঘটে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা এতে সংগমের মর্ম বিদ্যমান।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সংগমের বাহ্যরূপ পাওয়া যায় নি।

রমাযান ছাড়া অন্য রোযা নষ্ট করার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা নেই। কেননা রমাযান মাসে রোযা ভংগ করা গুরুতর অপরাধ। সুতরাং অন্য রোযাকে তার সাথে যুক্ত করা যাবে না।

যে ব্যক্তি ঢুশ ব্যবহার করে কিংবা নাক দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করায় কিংবা কানে ঔষধের ফোটা দেয়, তার রোযা ভংগ হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- কিছু প্রবেশ করার কারণে রোযা ভংগ হয়। এই কারণে যে, রোযা ভংগের মর্ম পাওয়া গেছে, আর তা হল শরীরের উপকারী বস্তু ভিতরে প্রবেশ করা, তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা রোযা ভঙ্গের বাহ্যরূপ পাওয়া যায়নি।

যদি কানে পানির ফোটা ঢেলে দেয় কিংবা নিজে নিজেই প্রবেশ করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। কেননা, রোযা ভংগের মর্ম ও বাহ্যরূপ কোনটাই পাওয়া যায়নি। কিন্তু তেল প্রবেম করানোর বিষয়টি এর বিপরীত।

যদি পেটের ভিতর পর্যন্ত কিংবা মাথার ভিতর পর্যন্ত উপনীত ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসা করে আর ঔষধ পেটে কিংবা মস্তিষ্কে পৌছে যায়, তাহলে রোযা ভংগ হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। আর যে ঔষধ পৌছে, তা হলো তরল জাতীয়।

সাহেবাইন বলেন, রোযা ভংগ হবে না। কেননা ঔষধ পৌছার ব্যাপারে নিশ্চয়তা নেই। কারণ, ছিদ্রপথ কখনো প্রসারিত হয় আবার সংকুচিত হয়। যেমন শুষ্ক ঔষধের ক্ষেত্রে (রোযা ভংগ হয় না)।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, ঔষুধের তরলতা ক্ষতের তরলতার সাথে যুক্ত হয়ে নিম্নমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে তা ভিতরে পৌছে যাবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

শুষ্ক ঔষধের অবস্থায় বিষয়টি বিপরীত। কেননা, ঔষুধ ক্ষতের তরলতা শুষে নেয়। ফলে ক্ষতের মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

যদি পুরুষাংগের ছিদ্রপথে ফোটা ফোটা করে (ঔষুধ) ঢালে তাহলে তাতে রোযা ভংগ হবে না।

এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মাযহাব। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে রোযা ভংগ হয়ে যাবে। আর এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতামত স্ববিরোধী। ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) সম্ভবতঃ মনে করেছেন যে, পেট ও পুরুষাংগের মাঝে সংযোগ পথ রয়েছে। এ জন্যই পুরুষাংগ দিয়ে পেশাব নির্গত হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.) মনে করেছেন যে, অন্ডকোষ হলো উভয়ের মাঝে আড় স্বরূপ। আর পেশাব তা থেকে চুইয়ে পড়ে। এটি অবশ্য ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয় নয়।

যে ব্যক্তি মুখে কিছু চোখে দেখে তার রোযা ভংগ হবে না। কেননা রোযা ভংগের বাহ্যরূপ ও মর্ম কোনটাই বিদ্যমান নেই।

তবে তা মাকরূহ হবে। কেননা এতে রোযা ভংগ হওয়ার উপক্রম হয়।

স্ত্রীলোকের যদি বিকল্প উপায় না পায় তাহলে এতে কোন দোষ নেই। সন্তান রক্ষার নিমিত্ত। তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, সন্তানের জীবনাশংকা দেখা দিলে তার রোযা ভংগ করার অনুমতি রয়েছে। গদ চিবালে রোযাদারের রোযা ভংগ হয় না। কেননা তা তার উদরে পৌছে না। কোন কোন মতে যদি তা জমাট না হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তখন কিছু অংশ উদরে পৌছবে। কোন কোন মতে যদি তা কালো জাতীয় হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এমন কি জমাট হলেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তা ভেংগে ভেংগে যায়।

তবে রোযাদারের জন্য তা ব্যবহার মাকরূহ। কেননা, এতে রোযা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। তাছাড়া (মুখ নাড়ার কারণে) তার প্রতি রোযা না রাখার অভিযোগ আরোপিত হবে। তবে রোযাদার না হলে স্ত্রী লোকের জন্য তা মাকরূহ নয়। কেননা তাদের ক্ষেত্রে তা মিসওয়াকের স্থলবর্তী।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেউ কেউ বলেন, দন্তরোগের কারণে না হলে পুরুষদের জন্য তা মাকরূহ। আবার কেউ বলেন, তা পসন্দনীয় নয়। কেননা, এতে স্ত্রী লোকদের সংগে সাদৃশ রয়েছে।

সুরমা ব্যবহার করা এবং মোচে তেল দেওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা এটা হলো এক ধরণের উপকার লাভ। আর তা রোযার নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাছাড়া নবী করীম (সা.) আশুরা দিবসে সুরমা ব্যবহার করা ও রোযা রাখার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

যদি সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে না হয়ে চিকিৎসাগত উদ্দেশ্যে হয় তাহলে পুরুষদের জন্য সুরমা ব্যবহারে কোন দোষ নেই। তদ্রুপ সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে না হলে মোচে তেল দেওয়া উত্তম। কেননা এটা খেযাবের কাজ করে। তবে দাড়ি সুন্নাত পরিমাণ তথা একমুঠ পরিমাণ থাকলে তা লম্বা করার উদ্দেশ্যে এটা করবে না।

রোযাদারের পক্ষে সকালে ও বিকাল বেলায় কাচা মিসওয়াক ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- রোযাদারের সর্বোত্তম আমল হলো মিসওয়াক করা। এতে সময়ের কোন পার্থক্য করা হয়নি।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বিকেল বেলা মিসওয়াক করা মাকরূহ। কেননা তাতে একটি প্রশংসিত চিহ্ন দূর করা হয়। আর তা হলো রোযাদারের মুখের গন্ধ। সুতরাং তা শহীদের রক্তের সদৃশ।

আমাদের বক্তব্য এই যে, এটা হলো ইবাদতের চিহ্ন। আর এ ব্যাপারে গোপনীয়তাই হলো অধিক উপযুক্ত। শহীদের রক্তের অবস্থা ভিন্ন। কেননা, এটি হলো যুলমের চিহ্ন।

আমাদের বর্ণিত হাদীছের আলোকে কাচা আদ্র এবং পানি দ্বারা ভিজান মিসওয়াকের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

পরিচ্ছেদঃ রোযা ভংগ

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেউ যদি রমাযানে অসুস্থ থাকে এবং এই আশংকা করে যে, রোযা রাখলে তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে, তাহলে রোযা রাখবে না এবং কাযা করবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রোযা ভাঙবে না। তিনি তায়াম্মুমের মতো এখানেও প্রাণ-নাশের কিংবা অংগহানীর আশংকার কথা বিবেচনা করেন।

আমরা বলি রোগ-বৃদ্ধি ও রোগের দীর্ঘায়িত হওয়া কখনো প্রাণ-নাশের দিকে উপনীত করে। সুতরাং তা থেকেও বেচে থাকা জরুরী।

মুসাফিরের যদি রোযার কারণে কষ্ট না হয় তাহলে তার জন্য রোযা রাখাই উত্তম। তবে রোযা না রাখাও জাইয। কেননা সফর কষ্ট শূন্য হয় না। সুতরাং মূল সফরকেই ওযর রূপে গণ্য করা হয়েছে । অসুস্থতার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা কোন কোন অসুস্থতা রোযা দ্বারা উপশম হয়। সুতরাং রোযার ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রোযা না রাখাই উত্তম । কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সফরে রোযা রাকা নেকিতে গণ্য নয়। (বুখারী)

আমাদের দলীল এই যে, রমাযান হলো দুই সময়ের মধ্যে অধিকতর উত্তম সময়। সুতরাং তাতে আদায় করাই উত্তম হবে।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বর্ণিত হাদীছটি কষ্টের অবস্থার উপর প্রযুক্ত হবে।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি সুস্থতা লাভ করে এবং মুসাফির যদি মুকিম হয়ে যায় তারপর মারা যায়, তাহলে সুস্থ হওয়ার এবং মুকিম হওয়ার দিনের পরিমাণ কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে পরিমাণ সময় সে পেয়েছে।

কাযা ওয়াজিব হওয়ার ফল এই দাড়ায় যে, (কাযা আদায় না করে থাকলে রোযার ফলে) ফিদ্ইয়া দানের ওসীয়ত করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম তাহাবী (র.) এ বিষয়ে শায়খাইন এবং মুহাম্মদ (র.) এর মধ্যে মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। বরং মত পার্থক্য হলো মান্নতের ক্ষেত্রে শায়খাইনের মতে পার্থক্যের কারণ এই যে, নযর হল রোযা ওয়াজিব হওয়ার

http://islaminonesite.wordpress.com/

কারণে। সুতরাং (রোযার) স্থলবর্তীর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার কার্যকারিতা প্রকাশ পাবে। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসআলায় (রোযা ওয়াজিব হওয়ার) কারণ হলো নির্ধারিত সময় পাওয়া। সুতরাং যে পরিমাণ সময় সে পাবে, সেই পরিমাণ সময়ের সাথেই ওয়াজিব হওয়ার হুকুম সীমিত হবে।

রামযানের কাযা ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্নভাবে রাখবে আবার ইচ্ছা করলে লাগাতার রাখবে। কেননা নাস শর্ত মুক্ত। তবে ওয়াজিব দ্রুত আদায়ের লক্ষ্য লাগাতার রাখাই মুস্তাহাব।

আর যদি তা বিলম্বিত করে এমনকি অন্য রমাযান এসে পড়ে তাহলে দ্বিতীয় রমাযানের রোযা রাখবে। কেননা তা দ্বিতীয় রমাযানেরই সময়। আর প্রথম রোযার কাযা তার পরে করবে। কেননা রমাযান বহির্ভূত সময়ই হলো 'কাযা' এর সময় তবে তার উপর ফিদইয়া ওয়াজিব হবে না। কেননা বিলম্বের (অবকাশের) ভিত্তিতেই কাযা ওয়াজিব হয়। এজন্যই তো সে (কাযা আদায় না করে) নফল রোযা রাখতে পারে।

গর্ভবর্তী ও স্তন্যদানকারিণী যদি নিজেদের কিংবা তাদের শিশুর ক্ষতির আশংকা করে তাহলে রোযা পরিহার করতে পারে এবং পরে কাযা করবে। এ হুকুমের উদ্দেশ্য হলো অসুবিধা দূরীভূত করা।

আর তাদের উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এ রোযা ভংগ হলো ওজরের কারণে। তদ্রুপ তাদের উপর 'ফিদইয়া' ওয়াজিব হবে না। তবে (ফিদ্ইয়ার ব্যাপারে) ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন, যখন শিশুর ব্যাপারে আশংকা করে। তিনি 'শায়খে ফানী' বা অতি বৃদ্ধের উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, শায়খে ফানীর ক্ষেত্রে ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হয়েছে কিয়াসের বিপরীতে (নাই দ্বারা) । আর শিশুর আশংকার কারণে রোযা ভংগ করা তার সমপর্যায়ের নয়। কেননা শায়খে ফানী তার উপর রোযা ওয়াজিব হওয়ার পর অপরাগ হয়েছে। পক্ষান্তরে শিশুর উপর তো মূলতঃ ওয়াজিবই হয়নি (বরং তার মায়ের উপর, এবং সে পরবর্তীতে কাযা করবে।)

http://islaminonesite.wordpress.com/

শায়খে ফানী, যিনি রোযা রাখতে সক্ষম নন, তিনি প্রতিদিনের পরিবর্তে রোযা না রেখে একজন মিসকীনকে খাওয়াবেন, যেমনিভাবে কাফ্‌ফার ক্ষেত্রে খাওয়াতে হয়।

এ বিষয়ে দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তাদের উপর ফিদইয়া ওয়াজিব এক মিসকীনের আহার। কোন কোন তাফসীর মতে এর মানে হলো অর্থাত্ সক্ষম না হওয়া। ফিদ্ইয়া আদায় করার পর যদি রোযা রাখতে পুনঃসক্ষম হয় তাহলে ফিদ্ইয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। কেননা স্থলবর্তিতার জন্য শর্ত হলো অক্ষমতা অব্যাহত থাকা।

যে ব্যক্তি রমাযানের কাযা যিম্মায় থাকা অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখীন হয় আর সে ঐ বিষয়ে ওসীয়ত করে তাহলে তার ওয়ালী বা তত্ত্বাবধায়ক তার পক্ষ হতে প্রতিদিনের জন্য একজন মিসকীনের অর্ধ সা'আ গাম কিংবা এক সা'আ খেজুর বা যব দান করবে। কেননা জীবনের শেষ মুহূর্তে সে রোযা আদায় করতে অপরাগ হয়েগেছে। সুতরাং সে 'শায়খে ফানী'-এর অনুরূপ হয়ে যাবে।

তবে আমাদের মতে ওসীয়ত করে যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। যাকাতের ক্ষেত্রেও এই মতভিন্নতা রয়েছে। এটাকে তিনি বান্দাদের ঋণের উপর কিয়াস করেন। কেননা দু'টোই অর্থ সংক্রান্ত হক, যাতে স্থলবর্তিতা কার্যকর হবে।

আমাদের দলীল এই যে, এটা ইবাদত। আর তাতে ইচ্ছার প্রয়োগ অপরিহার্য। আর তা ওসীয়তের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, উত্তরাধিকার এর মাধ্যমে নয়। কেননা উত্তরাধিকারিতা তো বাধ্যতামূলক ব্যাপার। আর যেহেতু এই ওসীয়ত একটি নতুন দান, সুতরাং তা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকরী।

মাশায়েখগনের সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী নামায রোযার মতই এবং প্রতিটি নামায এক দিনের রোযার সমান। এটিই বিশুদ্ধ মত।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওয়ালী নিজে সিয়াম পালন করবে না বা সালাত আদায় করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- কেউ কারো পক্ষে থেকে সিয়াম পালন করবে না এবাং কেউ কারো পক্ষ থেকে সালাত আদায় করবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি নফল নামায কিংবা নফল রোযা শুরু করলো অতঃপর তা নষ্ট করে ফেললো, সে তা কাযা করবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু সে স্বেচ্ছায় করেছে। সুতরাং পরবর্তী যেটুকু সে স্বেচ্ছায় করেনি, তা তার উপর অনিবার্য হতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, আদায়কৃত অংশটুকু একটি আমল ও ইবাদত। সুতরাং অব্যাহত রাখার মাধ্যমে উক্ত আমলকে বাতিল হওয়া থেকে হিফাযত করা ওয়াজিব হবে। আর যখন পূর্ণ করা ওয়াজিব, তখন তা তরক করার কারণে কাযা করাও ওয়াজিব হবে।

আমাদের নিকট দু'টি বর্ণনার একটি বর্ণনা মতে বিনা ওযরে সিয়াম ভংগ করা জাইয নয়। এর কারণ ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য ওযরের কারণে জাইয হবে। মেহমানদারি গ্রহণ করাও একটি ওযর। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- রোযা ভংগ কর এবং তদস্থলে কাযা সিয়াম পালন কর।

বালক যদি রমাযানের দিবসে প্রাপ্তবয়স্ক হয় কিংবা কাফির যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে উভয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশ (পানাহার থেকে) বিরত থাকবে। যাতে (রোযাদারদের সংগে) সাদৃশ্যের মাধ্যমে সময়ের হক আদায় করা যায়।

তবে যদি দিনের অবশিষ্ট অংশে তারা পানাহার করে ফেলে তাহলে তাদের উপর কাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা ঐ দিনে তার সিয়াম ওয়াজিব ছিল না।

তার পরবর্তী দিনগুলোতে সিয়াম পালন করবে। কেননা সিয়ামের (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ এবং (তা আদায় করার) যোগ্যতা সাব্যস্ত হয়েছে।

আর সেই দিনটির এবং পূর্ববর্তী দিনগুলোর কাযা করবে না। কেনা (ঐ দিনগুলোতে তার প্রতি) সিয়ামের নির্দেশ ছিল না। এটি সালাতের বিপরীত।

কেননা সালাতের ক্ষেত্রে (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ হলো সময়ের আদায়ের নিকটবর্তী অংশটি। আর সেই মূহুর্তটিতে (উভয়ের মধ্যে সালাত আদায় করায়)

http://islaminonesite.wordpress.com/

যোগ্যতা পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে সিয়ামের ক্ষেত্রে (ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো) দিনের প্রথম অংশটি। আর সেই মুহুর্তে যোগ্যতা অনুপস্থিত ছিল।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে যদি যাওয়ালের পূর্বে কুফরি বা অপ্রাপ্তবয়স্কতা বিলুপ্ত হয় তাহলে তার উপর সাওমের কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা সে নিয়্যতের সময় পেয়েছে। যাহেরী রিওয়ায়াতের কারণ এই যে, ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে সাওম বিভাজ্য নয়। আর দিবসের প্রথমাংশে ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা ছিল না। তবে বালকের ক্ষেত্রে এই অবস্থায় নফল সিয়ামের নিয়্যত করা জাইয রয়েছে। কিন্তু কাফিরের ক্ষেত্র নেই, যেমন মাশায়েখগণ বলেছেন। কেননা কাফির (দিনের প্রথমাংশ) সিয়াম পালনের যোগ্য ছিল না। আর বালক নফলের যোগ্য ছিল।

মুসাফির যদি (রমাযান ছাড়া অন্য সময়ে) সিয়াম না রাখার নিয়্যত করে অতঃপর যাওয়ালের পূর্বে শহরে প্রবেশ করে সিয়ামের নিয়্যত করে নেয় তাহলে (সিয়াম বৈধ হওয়ার জন্য) তা যথেষ্ট হবে। কেননা সফর সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতার বিরোধী নয় এবং সিয়াম শুরু করার বৈধতাও বিরোধী নয়।

আর যদি বিষয়টি রমাযানের দিবসে হয় তা হলে সিয়াম পালন তার জন্য ওয়াজিব। কেননা নিয়্যতের সময় সীমার মাঝেই রুখসতের কারণের অবসান ঘটেছে।

দেখুন না যদি সে দিবসের প্রথমাংশে মুকীম থাকতো, অতঃপর সফরে বের হতো তাহলে মুকীম হওয়ার দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদানের প্রেক্ষিতে সিয়াম ভংগ করা তার জন্য বৈধ হতো না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বৈধ না হওয়াই অধিকতর সংগত। তবে উভয় ক্ষেত্রে যদি সিয়াম ভংগ করে ফেলে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা, বৈধতার সন্দেহ বিদ্যমান রয়েছে।

যে ব্যাক্তি রমাযানের দিবসে বেহুশ হয়ে গেল, সে সেদিনের সিয়ামের কাযা করবে না যেদিন বেহুশ হয়েছে। কেননা ঐ দিবসটিতে সিয়াম অর্থাত্ (পানাহার ও সংগম থেকে) বিরতি পাওয়া গেছে। কারণ, বাহ্যতঃ নিয়্যত বিদ্যমান থাকাটাই স্বাভাবিক।

পরবর্তী দিনগুলোর কাযা করতে হবে। কেননা নিয়্যত পাওয়া যায়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি রমাযানের প্রথম রাত্রেই বেহুশ হয়ে যায় তাহলে ঐ রাত্রের পরবর্তী দিবসটি ছাড়া পূর্ণ রমাযানের প্রথম রাত্রেই বেহুশ হয়ে যায় তাহলে ঐ রাত্রের পরবর্তী দিবসটি ছাড়া পূর্ণ রমাযানের কাযা করবে। এর কারণ আমরা ইতোপূর্বে বলেছি।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, পরবর্তী দিনগুলোর রোযাও কাযা করবে না। কেননা তার মতে ই'তিকাফের ন্যায় রমাযানের সিয়ামও একই নিয়্যতে আদায় হয়ে যায়।

আর আমাদের মতে প্রত্যেক দিনের জন্য স্বতন্ত্র নিয়্যত অপরিহার্য। কেননা এগুলো বিচ্ছিন্ন ইবাদত। কারণ প্রতি দুই দিনের মাঝে এমন সময়, যা উক্ত ইবাদতের সময়ভূক্ত নয়। ই'তিকাফের বিষয়টি এর বিপরীত।

যে ব্যক্তি পুরো রমাযান মাস বেহুশ অবস্থায় থাকে সে তা কাযা করবে। কেননা, সংজ্ঞাহীনতা হলো এক ধরনের অসুস্থতা, যা শক্তিকে দুর্বল করে দেয়, কিন্তু তা আকলকে বিলুপ্ত করে না। সুতরাং তা সাওমকে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে ওযর রূপে গণ্য হবে, রহিত করার ক্ষেত্রে নয়।

যে ব্যক্তি পুরো রমাযান পাগল থাকে, সে তার জন্য কাযা করবে না।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এটাকে বেহুশীর উপর কিয়াস করেন।

আমাদের দলীল এই যে, প্রকৃতপক্ষে রহিতকারী হলো কষ্টে-সাধ্য হওয়া; আর বেহুশী সাধারণতঃ মাস ব্যাপী হয় না। সুতরাং তা কষ্টসাধ্য নয়। পক্ষান্তরে মস্তিষ্ক বিকৃতি মাসব্যাপী হতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে অসুবিধা আপতিত হবে।

যদি বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি রমাযানের কোন অংশে সুস্থতা লাভ করে তাহলে সে বিগত দিনগুলোর কাযা করবে।

ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা উভয়ে বলেন, যোগ্যতা না থাকার কারণে তার উপর আদায় করা ওয়াজিব হয়নি। আর কাযা প্রবর্তিত হয় আদায় ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে। সুতরাং সে পূর্ণ রমাযানব্যাপী বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির মত হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ অর্থাত্ রমাযান মাস তো বিদ্যমান রয়েছে। আর যোগ্যতা দায়িত্ব পালনে সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত।

আর এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব হওয়ার ফলাফল রয়েছে। আর তা হলো (শরীআতের পক্ষ হতে) এমনভাবে দায়বদ্ধ হওয়া, যা আদায় করতে কোন অসুবিধা হবে না। মাসব্যাপী বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সে ক্ষেত্রে আদায়ে অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং ওয়াজিব হওয়ার কোন ফলাফল নেই। পূর্ণ আলোচনা মতপার্থক্য বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে রয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃতি থাকা এবং পরবর্তীতে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটা এ দুয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ বলেন, তা হল যাহেরী রিওয়ায়াত অনুসারে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা যদি সে বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে সে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সংগেই যুক্ত। তখন শরীআতের পক্ষ থেকে তার প্রতি নির্দেশ অনুপস্থিত। যদি সুস্থ অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হয় তারপর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, তার অবস্থা তার বিপরীত। আর এটা হল পরবর্তী কোন কোন মাশায়েখগণের কাছে গ্রহণীয়।

যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান (বিরতি পালন সত্ত্বেও) রোযা রাখার বা না রাখার কোন নিয়ত করেনি, তার উপর পূর্ণ রমাযানের কাযা ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, রমাযানের রোযা সুস্থ ও মুকীম ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিয়্যত ছাড়াই আদায় হয়ে যাবে। কেননা সংযম পালন তার উপর অপরিহার্যকৃত বিষয়। সুতরাং যেভাবেই সে তা আদায় করবে, তা তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যেমন (নিয়্যত ছাড়া) কেউ পূর্ণ নিসাব কোন ফকীরকে দান করে ছিল (তবে যাকাত আদায় হয়ে যায়)।

আমাদের দলীল এই যে, বান্দার উপর ফরযকৃত বিষয় হলো ইবাদত হিসাবে সংযম পালন করা। আর নিয়্যত ছাড়া ইবাদত হয় না। আর পুরা নিসাব দান করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সওয়াবের নিয়্যত বিদ্যমান রয়েছে। যাকাত অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি রোযার নিয়্যত না করেই ভোর করেছে, এরপর পানাহারও করেছে, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না-ইমাম আবূ হানীফা (র.) –এর মত। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে নিয়্যত ছাড়া রোযা আদায় হয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যাওয়ালের পূর্বে যদি পানাহার করে তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা সে ফরয আদায়ের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে গসবকারীর ন্যায় হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, কাফ্ফারার সম্পর্ক হলো ফাসিদ করার সাথে। কিন্তু এটা তো বিরত থাকা। কেননা নিয়্যত ছাড়া রোযাই নেই।

রোযা অবস্থায় যদি স্ত্রী লোকের ঋতুস্রাব হয় কিংবা সন্তান প্রসব করে তাহলে তার রোযা ভেংগে যাবে এবং তার কাযা করতে হবে। সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা (সংখ্যাধিক্যের কারণে) নামায কাযা করতে হলে সে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। সালাত অধ্যায়ে এ আলোচনা বিগত হয়েছে।

মুসাফির যদি রমাযানের দিবসের কোন অংশে (বাড়িতে) ফিরে আসে কিংবা ঋতুগ্রস্ত স্ত্রী লোক যদি পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে দিনের অবশিষ্ট অংশ তারা বিরতি পালন করবে।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, বিরতি পালন ওয়াজিব নয়। আর এই মতপার্থক্য রয়েছে ঐ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও, যারা রোযা ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য হয়ে যায়, অথচ দিবসের শুরুতে তাদের যোগ্যতা ছিল না। তিনি বলেন, সাদৃশ্যের অবলম্বন হলো মূলের স্থলবর্তী। সুতরাং এটি তার উপরই ওয়াজিব হবে, যার উপর মূল রোযা ওয়াজিব হয়েছিল, যেমন কেউ রোযা ভেংগে ফেলল ইচ্ছাকৃতভাবে বা বিভ্রান্তিতে।

আমাদের দলীল এই যে, তা ওয়াজিব হয়েছে সময়ের হক আদায়ের জন্য, স্থলবর্তী হিসাবে নয়। কেননা, এটি হলো মর্যাদাপূর্ণ সময়। ঋতুগ্রস্ত, নিফাসগ্রস্ত, অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তিগণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এ সকল ওযর বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদের উপর বিরতি পালন ওয়াজিব নয়। কেননা এগুলো রোযার ক্ষেত্রে যেমন প্রতিবন্ধক, তেমনি সাদৃশ্যের ক্ষেত্রেও।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, কেউ যদি এই মনে করে সাহরী খায় যে, এখনও ফজর হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেলো যে, আসলে তখন ফজর হয়ে গিয়েছিল, কিংবা কেউ একথা মনে করে ইফতার করলো যে, সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু পরে জানা গেলো যে, সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, তাহলে ঐ দিনের অবশিষ্ট সময় সে বিরতি পালন করবে।

উদ্দেশ্য হলো যথাসম্ভব সময়ের মর্যাদা রক্ষা করা কিংবা অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকা।

তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব। কেননা রোযা আদায় করার হুকুম এমন একটি হক, যা অনুরূপ আমলের মাধ্যমে আদায় করা তার যিম্মায় রয়েছে। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের ক্ষেত্রে। তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। কেননা, ইচ্ছা না থাকায় অপরাধ এখানে লঘু। এ প্রসংগে উমর (রা.) বলেছেন, গুনাহ করার মনোবৃত্তি আমাদের ছিল না। আর একদিনের রোযা কাযা করা আমাদের পক্ষে সহজ।

উল্লেখিত ফজর দ্বারা দ্বিতীয় ফজর (সুবিহ সাদিক) উদ্দেশ্য। সালাত অধ্যায়ে আমরা তা ব্যাখ্যা করে এসেছি।

আর সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমরা সাহরী খাও। কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে। তবে সাহরীকে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তিনটি বিষয় রাসূলগণের আচরণের অন্তর্ভূক্ত। ইফতার তরান্বিত করা, বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং মিসওয়াক করা।

তবে যদি ফজর উদয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, অর্থাত্ ফজর উদয় হয়েছে কি হয়নি, উভয়ের সম্ভাবনাই সমান।

তখন পানাহার করাই উত্তম, যাতে হারাম থেকে বাচা যায়। কিন্তু তার উপর তা ওয়াজিব হয়। সুতরাং যদি পানাহার করে তবে তার রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা রাত্র বিদ্যমান থাকা হলো মূল অবস্থা। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত। যদি সে এমন কোন স্থানে থাকে, যেখানে ফজর বোঝা যায় না, কিংবা পূর্ণিমার রাত হয় কিংবা মেঘাচ্ছন্ন রাত হয় কিংবা তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয় আর এই সকল কারণে

http://islaminonesite.wordpress.com/

তার সন্দেহ হয়, তাহলে পানাহার করবে না। যদি করে তাহলে সে গুনাহ্‌গার হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যা তোমাকে সন্দেহ ফেলে তা পরিহার করে ঐ বিষয়ে গ্রহণ করে, যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।

যদি তার প্রবল ধারণা এই হয় যে, সে ফজর উদয় হওয়া অবস্থায় পানাহার করেছে, তাহলে প্রবল ধারণার উপর আমল হিসাবে কাযা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। এতেই সতর্কতা রয়েছে।

তবে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী তার উপর কাযা নেই। কেননা, কোন নিশ্চিত বিষয় অনুরূপ নিশ্চিত বিষয় ছাড়া বিলুপ্ত হয় না।

যদি প্রকাশ পায় যে, ফজর উদিত হয়েছে, তাহলে তার উপর কাফ্‌ফারা্ ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে মূল অবস্থার উপর বিষয়টির ভিত্তি করেছে। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার সাব্যস্ত হয় না।

যদি সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে তার জন্য ইফতার করা জাইয হবে না। কেননা এখানে দিন অব্যাহত থাকাই হলো মূল অবস্থা।

যদি পানাহার করে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে মূল অবস্থা কার্যকর করার প্রেক্ষিতে।

আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে ফজরের সূর্যাস্তের পূর্বে পানাহার করেছে তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। বিষয়ে একই বর্ণনা রয়েছে (এতে কোন দ্বিমত নেই)। কেননা দিবস অব্যাহত থাকাই মূল অবস্থা। যদি এ বিষয়ে সন্দিহান হয় আর পরে প্রকাশ পায় যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে মূল অবস্থার অর্থাত্ দিবস অব্যাহত থাকার দিকে লক্ষ্য করে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়া উচিত।

যে ব্যক্তি রমাযানের দিবসে ভুলে পানাহার করে ফেললো এবং (অজ্ঞাতবশত) ধারণা করে বসলো যে, ভুলক্রমের পানাহার রোযা ভংগ করে, তাই অতঃপর সে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলো, তাহলে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা তার ধারণা কিয়াস নির্ভর ছিল। সুতরাং এখানে সন্দেহ

http://islaminonesite.wordpress.com/

সৃষ্টি হয়েছে। যদি এতদ্‌সংক্রান্ত হাদীছ তার গোচরে এসেও থাকে তবুও যাহেরী রিওয়ায়াত মতে একই হুকুম।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে চারটি মত বর্ণিত আছে যে, কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। কেননা এখানে অস্পষ্টতা নেই, সুতরাং সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

প্রথমোক্ত মতের দলীল এই যে, কিয়াসের দিকে লক্ষ্য করলে 'নীতিগত সংশয়' অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অবগতির কারণে তা রহিত হবে না। যেমন পুত্রের দাসীর সংগে পিতার সংগমের বিষয়।

যদি কেউ শিংগা লাগায় আর ধারণা করে যে তাতে রোযা ভংগ হয়ে যায়, এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফেলে তাহলে, তার উপর কাযা ও কাফ্‌ফারার দু'টোই ওয়াজিব হবে। কেননা এ ধারণা শরীআতী কোন দলীলের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে যদি কোন নির্ভরযোগ্য ফকীহ রোযা ফাসিদ হয়েছে বলে ফাতওয়া দান করে থাকেন। কেননা তার জন্য ফাতওয়া শরীআতী দলীল রূপে গন্য।

আর যদি তার নিকট এতদসংক্রান্ত হাদীছ পৌছে থাকে এবং তার উপর সে নির্ভর করে থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে একই হুকুম হবে। (অর্থাত্‌ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না) কারণ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর বাণী মুফতির ফাতওয়ার নিম্নে যেতে পারে না।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর নিকট থেকে এর বিপরীত মত (অর্থাত্‌ কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হওয়ার মত) বর্ণিত হয়েছে। কেননা সাধারণ লোকের পক্ষে যেহেতু হাদীছ জানা ও বোঝা সম্ভব নয়। সেহেতু ফকীহ্‌গণের ইকতিদা ও অনুসরণ করাই তার অবশ্য কর্তব্য।

যদি হাদীছের ব্যাখ্যা জেনে থাকে তাহলে সংশয় রহিত হওয়ার কারণে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর কিয়াসের বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম আওযায়ী (র.) এর মতামত সন্দেহ সৃষ্টিকারী বলে গণ্য হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

গীবত করার পর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে বসে তাহলে যে ভাবেই করে থাকুক কাযা ও কাফ্ফারা দু'টোই তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা গীবতের কারণে রোযা ভংগ হওয়া কিয়াসের বিপরীত। আর সংশ্লিষ্ট হাদীছ সর্বসম্মত ভাবেই অন্য (অর্থাত্ সাওয়াব না হওয়ার) অর্থে প্রযোজ্য।

যদি ঘুমন্ত কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক স্ত্রী লোকের সংগে সংগম করা হয় আর ঐ স্ত্রীলোক রোযাদার থাকে তাহলে স্ত্রীলোকটির উপর কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) বলেন, ঐ স্ত্রী লোকদ্বয়ের উপর কাযাও ওয়াজিব হবে না। এটা তারা বলেছেন ভুলে পানাহারকারীর উপর কিয়াস করে। বরং এদের ওযর আরো প্রবল। কেননা এখানে তাদের কোন ইচ্ছাই পাওয়া যায়নি।

আমাদের দলীল এই যে, ভুল সচরাচর হয়ে থাকে। আর উক্ত ঘটনাবলী বিরল। কাফ্ফারা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো (তার পক্ষ থেকে) অপরাধ না হওয়া।

পরিচ্ছেদঃ সে সিয়াম প্রসঙ্গে যা বান্দা নিজের উপর ওয়াজিব করে

কেউ যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে কুরবানীর দিনে আমার যিম্মায় সিয়াম, সে ঐ দিন সাওম পালন না করে কাযা করবে।

অর্থাত্ আমাদের নিকট এই মান্নত বিশুদ্ধ। ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাদের বক্তব্য এই যে, সে এমন বিষয়ের মান্নত করেছে, যা গুনাহ। কেননা এই দিনগুলোতে সাওম পালনের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (সুতরাং তার মান্নত সংঘটিত হবে না।)

আমাদের দলীল এই যে, সে শরীআত প্রমাণিত রোযার মান্নত করেছে। আর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ভিন্ন কারণে। সেটা হলো আল্লাহ্র দাওয়াতে সাড়াদান বর্জন করা। সুতরাং মান্নত তো শুদ্ধ হবে। তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুনাহ্ পরিহার করার উদ্দেশ্যে সিয়াম থেকে বিরত থাকবে। এরপর তা কাযা করবে যিম্মার ওয়াজিব আদায়ের জন্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি সে দিন রোযা রেখে ফেলে তাহলে সে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা সে যেভাবে নিজের উপর বাধ্যবাধকতা করেছিলো, সেভাবেই আদায় করেছে।

যদি উপরোক্ত বাক্য দ্বারা কসমের নিয়্যত করে থাকে, তাহলে তার উপর কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। যদি সে সেদিন রোযা না রেখে থাকে।

আলোচ্য মাসআলাটি মোট ছয় প্রকার। প্রথমতঃ (উক্ত বাক্য দ্বারা কসম বা নযর) কোনটারই নিয়্যত করল না। দ্বিতীয়তঃ শুধু নযরের নিয়্যত করলো, অন্য কিছু নিয়্যত করলো না। তৃতীয়তঃ নযরের নিয়্যত করলো এবং ইয়ামীন না হওয়ার নিয়্যত করলো, এই তিন অবস্থায় নযর হবে। কেননা বাক্যটি শব্দগত দিক থেকেই 'নযর' নির্দেশক। আর তা কেন হবে না। অথচ তার নিয়্যত দ্বারা নযরকে স্থির করেছে।

যদি সে উক্ত বাক্য দ্বারা কসমের নিয়্যত করে থাকে এবং নযর না হওয়ার নিয়্যত করে থাকে, তাহলে তা কসম হবে। কেননা, উক্ত বাক্যে কসমের সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা সে নিয়্যত দ্বারা নির্ধারিত করে নিয়েছে এবং অন্যটিকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।

যদি উভয়টির নিয়্যত করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে নযর ও কসম দুটোই হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে শুধু নযর হবে।

আর যদি কসমের নিয়্যত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মতে একই হুকুম হবে। (অর্থাত্‍ নযর ও ইয়ামীন দু'টোই হবে) । কিন্তু আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে শুধু কসম হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর দলীল এই যে, এ বাক্যের মৌলিক অর্থ হল নযর। আর কসমের অর্থ হলো রূপক। এ কারণেই প্রথমটি নিয়্যতের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু দ্বিতীয়টি নিয়্যতের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এ বাক্য একই সংগে উভয় অর্থ অন্তর্ভূক্ত করবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সুতরাং নিয়্যতের দ্বারা রূপক অর্থ নির্ধারিত হয়ে যাবে। আর উভয়টি নিয়্যত করার ক্ষেত্রে মূল অর্থই অগ্রাধিকার লাভ করবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, নযর ও কসম এ উভয়ের লক্ষ্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা উভয়টির চাহিদা হল ওয়াজিব হওয়া। তবে 'নযর' তা দাবী করে স্বকীয়ভাবে আর কসম তা দাবী করে ভিন্ন কারণে। সুতরাং উভয় দলীলকে কার্যকরী করার জন্য উভয় অর্থকে এখানে আমরা একত্র করেছি, যেমন বিনিময় শর্তে 'হেবা' এর ক্ষেত্রে দান ও বিনিময় এ উভয় দিক কে আমরা একত্র করেছি।

যদি সে বলে যে, আমার যিম্মায় আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এই বছরের রোযা। তাহলে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনগুলোতে রোযা হতে বিরত থাকবে এবং পরবর্তীতে সেগুলোর কাযা আদায় করে নিবে। কেননা নির্দিষ্ট বছরের নযরের মধ্যে অর্থ শর্ত আরোপ করে। কেননা লাগাতার হওয়া ঐ দিনগুলো থেকে মুক্ত হতে পারে না। তবে এই সুরতে সেই দিনগুলোর রোযা ধারাবাহিক কাযা করবে, যথাসম্ভব লাগাতারের মর্ম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে।

আর এখানেও ইমাম যুফার ও শাফিঈ (র.) এর ভিন্নমত প্রযুক্ত হবে। কেননা এই দিনগুলোতে রোযা নিষিদ্ধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- শোনো, এ দিনগুলোতে রোযা রেখো না, এগুলো হচ্ছে পানাহার ও সহবাসের দিন।

আমরা পূর্বে রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এবং হাদীছের ব্যাখ্যা বর্ণনা করে এসেছি।

আর যদি লাগাতার রাখার শর্ত না করে থাকে তাহলে এই দিনগুলোতে রোযা রাখা যথেষ্ট হবে না। কেননা যে রোযা সে নিজের যিম্মায় লাযিম করছে, তার পরিপূর্ণ হওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। আর এ দিনগুলোতে আদায়কৃত রোযা হবে ত্রুটিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে।

পক্ষান্তরে যদি বছর নির্ধারণ করে থাকে তাহলে এই দিনগুলোতে রোযা রাখা যথেষ্ট হবে। কেননা সে ত্রুটির গুণসহ নিজের যিম্মায় লাযিম করেছিল । সুতরাং নিজের উপর আরোপিত গুণ অনুযায়ী আদায় হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তবে যদি সে এই বাক্য দ্বারা কসমের নিয়্যত করে থাকে, তাহলে কসমের কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। এ বাক্যটির বিভিন্ন প্রকার পিছনে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি কুরবানীর দিন রোযা অবস্থায় সকাল যাপন করে অতঃপর রোযা ভংগ করে ফেলে, তার উপর (কাযা কাফ্‌ফারা) কিছুই ওয়াজিব হবে না।

তবে নাওয়াদির (বা অপ্রকাশিত বর্ণনা) মতে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। কেননা কোন আমল শুরু করা ঐ আমলকে লাযিম করে, যেমন নযর করা আমলকে লাযিম করে। এটা মাকরূহ ওয়াক্তে (নফল) সালাত শুরু করার মতো হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত অনুসারে-এটি যাহির রিওয়ায়াত পার্থক্যের কারণ এই যে, রোযা শুরু করা মাত্র লোকটিকে রোযাদার বলা হয়। এ কারণেই রোযা না রাখার কসমকারী ব্যক্তি এই দিন রোযা শুরু করা মাত্র ভংগকারী হয়ে যাবে। সুতরাং রোযা শুরু করা দ্বারা সে গুনাহে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে তাই তা বাতিল করা ওয়াজিব হবে, অতএব তা রক্ষা করা ওয়াজিব হবে না। আর এর উপরই কাযা ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে। কিন্তু শুধু 'নযর'-এর কারণে গুনাহে লিপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে না। আর নযরই হলো রোযাকে ওয়াজিবকারী।

তদ্রুপ শুধু সালাত শুরু করার দ্বারা গুনাহে লিপ্ত বলা যায় না। যতক্ষণ না এক রাকাআতে পূর্ণ করে। একারণেই নামায না পড়ার কসমকারী ব্যক্তি নামায শুরু করার কারণে কসম ভংগকারী বলে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আদায়কৃত অংশকে রক্ষা করা ওয়াজিব হবে। তাই কাযা করা তার যিম্মায় এসে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নামাযের ক্ষেত্রেও কাযা ওয়াজিব হবে না। তবে প্রথমোক্ত মতই অধিক প্রবল। সঠিক বিষয় আল্লাহ্‌ই অধিক অবগত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

http://islaminonesite.wordpress.com/

ই’তিকাফ

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, ই’তিকাফ হলো মুস্তাহাব। তবে শুদ্ধতম মত এই যে, তা সুন্নতে মুআক্কাদা। কেননা নবী করীম (সা.) এর শেষ দশদিন নিয়মিত ভাবে তা পালন করেছেন। আর নিয়মিত আমল সুন্নত প্রমাণ করে।

ই’তিকাফ অর্থ সায়েম অবস্থায় মসজিদে ই’তিকাফের নিয়্যতসহ অবস্থান করা। অবস্থান করাতো ই’তিকাফের রুকন। কেননা ই’তিকাফ শব্দটি অবস্থানের অর্থ প্রদান করে। সুতরাং অবস্থান দ্বারাই ই’তিকাফের অস্তিত্ব হবে। আমাদের নিকট সাওম হলো ইবাদতের শর্ত। তিনি বলেন, সাওম একটি ইবাদত এবং তা স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। সুতরাং তা অন্য ইবাদতের শর্ত হতে পারে না।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- ই’তিকাফ হয় না সাওম ব্যতীত।

আর বর্ণিত হাদীছের মুকাবিলায় কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সিয়াম ওয়াজিব ই’তিকাফে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। এ সম্পর্কে একটি মাত্র বর্ণনাই রয়েছে(অর্থাত্ দ্বিমত নেই)।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে হাসান (ইব্ন যিয়াদ) যে মত বর্ণনা করেছেন তাতে নফল ই’তিকাফ শুদ্ধ হওয়ার জন্যও সিয়াম শর্ত। আমাদের বর্ণিত হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের প্রেক্ষিতে।

এই বর্ণনা মুতাবিক ই’তিকাফ এক দিনের কমে হতে পারে না। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনা মতে- আর তা ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মত-নফল ই’তিকাফের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হলো এক মুহূর্ত। সুতরাং তা সিয়াম ছাড়া হতে পারে। কেননা, নফলের ভিত্তি হলো সহজতার উপর। তুমি কি জান না যে, দাড়ানোর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল সালাত বসে আদায় করা যায়। আর যদি নফল ই’তিকাফ শুরু করার পর ভংগ করে ফেলে তাহলে মাবসূতের বর্ণনা মতে তা কাযা করা জরুরী নয়। কেননা, তার সময় নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং তা ভংগ করার দ্বারা বাতিল করা নয়।

হাসান (রা.) এর বর্ণনা মতে কাযা করা জাইয হবে। কেননা তা সিয়ামের মত একদিন এর সাথে সীমাবদ্ধ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর জামা'আত হয় এমন মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ সহীহ্ নয়। কেননা হুযায়ফা (রা.) বলেছেন- জামা'আত অনুষ্ঠিত মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ হতে পারে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতে পাচ ওয়াক্ত সালাত হয়, এমন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ সহীহ্ নয়। কেননা ই'তিকাফ হলো সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ইবাদত। সুতরাং তা এমন স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হবে, যেখানে তা আদায় করা হয়।

অবশ্য স্ত্রী লোক তার ঘরের মসজিদে (অর্থাত্ সালাত আদায়ের নির্ধারিত স্থানে) ই'তিকাফ করবে। কেননা সেটাই হলো তার সালাতের স্থান। সুতরাং সালাতের জন্য তার অপেক্ষা সেখানেই বাস্তবায়িত হয়। যদি ঘরে পূর্ব থেকে তার জন্য সালাতের নির্ধারিত কোন স্থান না থাকে তাহলে একটি স্থান নির্ধারণ করে নেবে এবং সেখানে ই'তিকাফ করবে।

প্রাকৃতিক প্রয়োজনে এবাং জুমুআর উদ্দেশ্য ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হওয়ার বৈধতার প্রমাণ হলো ‘আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম (সা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া তার ই'তিকাফের স্থান থেকে বের হতেন না।

তাছাড়া এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ও জানা বিষয়। আর তা সারার জন্য বের হওয়া অনিবার্য, সুতরাং এ প্রয়োজনে বের হওয়াটা ই'তিকাফের আওতা বহির্ভূত। তবে তাহারাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর বাইরে বিলম্ব করবে না। কেননা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যা কার্যকরী, তা প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ। আর জুমুআর বিষয় এ কারণে যে, তা তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ (দীনী) প্রয়োজন। এবং এ প্রয়োজন দেখা দেওয়া জানা কথা।

আর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, জুমুআর উদ্দেশ্যে বের হওয়া ই'তিকাফকে ফাসিদ করে দিবে। কেননা জামে মসজিদে ই'তিকাফ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো।

আর এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সকল মসজিদেই ই'তিকাফ করা শরীআত সম্মত। আর শুরু করা যখন শুদ্ধ হলো তখন প্রয়োজন বের হওয়ার বৈধতা অবশ্যই দান করবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সূর্য যখন ঢলে পড়বে তখনই বের হবে। কেননা (জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য) ঐ সময়ের পরই সম্বোধন তার অভিমুখী হয়। যদি তার ই'তিকাফের স্থান জুমুআর মসজিদ থেকে দূরে হয়, তাহলে এমন সময়ে বের হবে যেন জুমুআর সালাত পাওয়া সম্ভব হয়, এবং তার পূর্বে চার রাকাআত, আরেক বর্ণনা মতে ছয় রাকাআত-চার রাকাআত সুন্নাত এবং দু'রাকাআত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করতে পারে। আর সেখানে জুমুআর পরে জুমুআর সুন্নাত সম্পর্কিত মতভেদ অনুযায়ী চার বা ছয় রাকাআত আদায় করবে।

জুমুআর সুন্নাত হলো জুমুআর আনুষঙ্গিক। সুতরাং এ গুলোকে জুমুআর সংগেই যুক্ত করা হয়। যদি জামে মসজিদে এর চেয়ে বেশী সময় অবস্থান করে তাহলে তার ই'তকাফ নষ্ট হবে না। কেননা, এটাও ইতিকাফের স্থান। তবে তা পসন্দনীয় নয়। কেননা সে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায়ের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে, সুতরাং বিনা প্রয়োজনে দুই মসজিদে তা আদায় করবে না।

যদি বিনা প্রয়োজনে কিছু সময়ের জন্যও মসজিদ থেকে বাইরে যায় তাহলে তার ই'তিকাফ ফাসিদ হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। কেননা ই'তিকাফের বৈপরিত্য পাওয়া গেছে। এটাই কিয়াসের দাবী।

সাহেবাইন বলেন, অর্ধেক দিনের বেশী না হলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না। এটাই সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। কেননা সামান্য সময় প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, পানাহার ও ঘুম ই'তিকাফ স্থলেই হবে। কেননা, নবী করিম(সা.) এর মসজিদ ছাড়া এসবের জন্য আর কোন স্থান ছিলো না। তাছাড়া এই প্রয়োজনগুলো তো মসজিদে সমাধা করা সম্ভব। সুতরাং বের হওয়ার প্রয়োনজন নেই।

মসজিদে পন্য উপস্থিত না করে ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কেননা এর প্রয়োজন হতে পারে। যেমন তার প্রয়োজন সম্পন্ন করে দেয়ার মতো কাউকে পায় না। তবে ফকীহ্গণ বলেছেন যে, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পণ্য উপস্থিত করা মাকরূহ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা মসজিদ বান্দাহর হক থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। আর পণ্য উপস্থিত করায় মসজিদকে তাতে লিপ্ত করা হয়।

মু'তাকিফ ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে তোমাদের বাচ্চাদের থেকে পৃথক রাখবে এবং তোমাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকেও।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর ই'তিকাফকারী কল্যাণমূলক ছাড়া কোন কথা বলবে না। তবে তার পক্ষে একেবারে চুপ থাকা মাকরূহ। কেননা আমাদের শরীআতে নীরবতার রোযা ইবাদতরূপে গণ্য নয়। কিন্তু যেসব কথায় গুনাহ্ হয়, তা পরিহার করে চলবে।

আর মু'তাকিফের জন্য সহাবাস হারাম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবে না।

অনুরূপভাবে স্পর্শ ও চুম্বনও হারাম। কেননা, তা সহবাসের আবেদন সৃষ্টিকারী। সুতরাং তা হারাম হবে। কারণ সহবাস হলো ই'তিকাফের নিষিদ্ধ কাজ- যেমন ইহরাম অবস্থায় (এগুলো হারাম)। সিয়াম বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বিরত থাকা সিয়ামের রুকন। সিয়ামের নিষিদ্ধ কাজ নয়। সুতরাং আবেদন সৃষ্টিকারী বিষয়গুলোর দিকে তা সম্প্রসারিত হবে না।

যদি রাত্রে কিংবা দিনে ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলে সহবাস করে তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা (দিবসের ন্যায়) রাত্রও ই'তিকাফের সময়। রোযার বিষয়টি এর বিপরীত। (অর্থাত্ ভুলের দ্বারা ফাসিদ হয় কিন্তু) ই'তিকাফকারীর অবস্থা স্বয়ং স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং ভুলের কারণে তাকে মা'যুর ধরা হবে না।

যদি 'যোনিপথ' ছাড়া অন্যভাবে সংগম করে আর বীর্যস্খলন ঘটে কিংবা যদি স্পর্শ বা চুম্বন করে, ফলে বীর্যস্খলন ঘটে তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এর মধ্যে সংগমের মর্ম বিদ্যমান। এ কারণেই তা দ্বারা রোযা ফাসিদ হয়ে যায়। যদি বীর্যস্খলন ন ঘটে তাহলে ই'তিকাফ ফাসিদ হবে না, যদিও তা হারাম ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা, তাতে সংগমের মর্ম বিদ্যমান নেই। আর সেটাই হলো ফাসিদকারী। এ কারণেই তা দ্বারা রোযা ফাসিদ হয় না।

যে ব্যক্তি নিজের উপর কতক দিনের ই'তিকাফ ওয়াজিব করলো, তার উপর সেই দিনগুলোর রাত্রিসহ ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে। কেননা বহুবচন রূপে দিনগুলো উল্লেখ করলে তার পাশাপাশি রাত্রগুলোও এর অন্তর্ভূক্ত হয় ।যেমন বলা হয় তোমাকে কয়েক দিন থেকে দেখিনি। এখানে সে দিনগুলোর রাত্রও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আর দিনগুলো অবিরাম হবে, যদি ও অবিরমভাবে শর্ত আরোপ না করা হয়। কেননা ই'তিকাফের ভিত্তিই হলো অবিরমতার উপর। কারণ রাত্র দিন সমগ্র সময়টুকুই ইতিকাফ যোগ্য। রোযার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা রোযার ভিত্তি হলো বিচ্ছিন্নতার উপর। কারণ রাত্রগুলো রোযার উপযুক্ত নয়, সুতরাং যতক্ষণ না অবিরামতার কথা স্পষ্ট বলবে, ততক্ষণ বিচ্ছিন্নভাবে রোযা ওয়াজিব হবে।

কিন্তু যদি শুধু দিবসগুলোর ই'তিকাফের নিয়্যত করে থাকে তাহলে তার নিয়্যত সহীহ্ হবে। কেননা সে শব্দটির হাকীকত বা মৌল অর্থ উদ্দেশ্য করেছে।

যে ব্যক্তি দু'দিনের ই'তিকাফ নিজের উপর ওয়াজিব করলো, তার উপর ঐ দু'দিনের রাত্রসহ ই'তিকাফ ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, প্রথম রাত্রটি দাখিল হবে না। কেননা দ্বিবচন তো বহুবচন থেকে ভিন্ন। আর মধ্যবর্তী রাত্রটি সংযুক্তির প্রয়োজনে অন্তর্ভূক্ত হবে।

যাহিরী রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, দ্বিবচনের মাঝে বহুবচনের অর্থ রয়েছে। সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে সতর্কতার জন্য দ্বিবচনকে বহুবচনের সংগে যুক্ত করা হবে। আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

অধ্যায়: হজ্জ

অধ্যায়: হজ্জ

হজ্জ ওয়াজিব সে সকল লোকের উপর যারা স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক ও সুস্থদেহের অধিকারী। যখন তারা পাথেয় ও বাহনে সক্ষম হয়, আর তা বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে এবং ফিরে আসা পর্যন্ত আপন পোষ্য পরিজনের খোরপোষ থেকে অতিরিক্ত হয় আর পথও নিরাপদ হয়।

গ্রন্থকার এখানে ওয়াজিব শব্দটি ব্যবহার করেছেন অথচ তা অকাট্য ফরয এবং তার ফরয হওয়া কিতাবুল্লাহ্ দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো, আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণী- আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের উপর বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরয..........শেষ পর্যন্ত।

জীবনে তা একবারই শুধু ফরয হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। হজ্জ কি প্রতি বছর ফরয, না শুধু একবার? তখন তিনি বললেন, না, বরং একবার; এর অতিরিক্ত যা করা হবে তা নফল হবে।

তাছাড়া হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ তো হলো বায়তুল্লাহ্ আর তা একাধিক নয়। সুতরাং বারংবার ওয়াজিব হতে পারে না।

আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) এর মতে হজ্জ ওয়াজিব অবিলম্বে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এক বর্ণনায় এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে তা বিলম্ব আদায় করা যায়। কেননা তা পূর্ণ জীবনে অর্পিত ওয়াজিব। সুতরাং হজ্জের ক্ষেত্রে পূর্ণ জীবন হলো সালাতের ক্ষেত্রে সময়ের মতো।

প্রথমোক্ত মতের দলীল এই যে, হজ্জ বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এক বছর সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। আর এক বছর সময়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই সতর্কতার জন্য (সময়সীমা) সংকুচিত করা হয়েছে। আর এই সতর্কতার প্রেক্ষিতেই তাড়াতাড়ি আদায় করা (সর্বসম্মতিক্রমে) উত্তম। সালাতের সময়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এত অল্প সময়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক।

স্বাধীনতা ও প্রাপ্তবয়স্কতার শর্তের কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

যে কোন গোলাম যদি দশবারও হজ্জ করে অতঃপর স্বাধীন হয়, তাহলে তার উপর ইসলামের ফরয হজ্জ ওয়াজিব হবে। আর কোন নাবালিগ যদি দশবারও হজ্জ করে অতঃপর বালিগ হয় তাহলে তার উপর ইসলামের ফরয ওয়াজিব হবে। তাছাড়া এই জন্য যে, হজ্জ হলো একটি ইবাদত। আর যাবতীয় ইবাদত নাবালিগদের থেকে রহিত।

আর মস্তিষ্কের সুস্থতা শর্ত দায়িত্ব আরোপের বৈধতার জন্য। অনুরূপভাবে অংগ-প্রত্যংগের সুস্থতা (এরও শর্ত রয়েছে)। কেননা তা ছাড়া অক্ষমতা অনিবার্য। অন্ধ ব্যক্তি যদি এমন কাউকে পায়, যে তার সফরের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে(অর্থাত্ চলা-ফেরায় তাকে সাহায্য করবে)। এবং পাথেয় ও বাহনেও সমর্থ হয়, তবুও ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন। সালাত অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পংগু সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে। কেননা, অপরের সাহায্যে সে সক্ষম। সুতরাং সে বাহনের সাহায্যে সক্ষমতা অর্জনকারীর সদৃশ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে নিজে হজ্জের রোকনসমূহ আদায় করতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে অন্ধ ব্যক্তিকে যদি পথ বাতলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে নিজেই আদায় করতে পারে। ফলে সে পথ হারিয়ে ফেলা ব্যক্তি সদৃশ হলো।

পাথেয় ও বাহন ব্যবস্থায় সক্ষম হওয়া জরুরী। বাহন সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার অর্থ এই পরিমাণে অর্থ থাকা, যাতে হাওদার একাংশ এবং সামান পত্র বহনে একটি উট ভাড়া করতে সমর্থ হয়।

যাওয়া ও আসার সময় পর্যন্ত খরচের ব্যবস্থায় সক্ষম হওয়া জরুরী। কেননা নবী করিম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত রাস্তার সক্ষম হওয়ার অর্থ কি? তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন- পাথেয় ও বাহন।

যদি সে 'পালাক্রমে' সওয়ারী ভাড়া করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কেননা দু'জন যদি পালাক্রমে সওয়ার হয় তাহলে পুরা সফরে বাহন পাওয়া হল না।

এই সম্পূর্ণ খরচ বাসস্থান ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন হতে উদ্বৃত্ত থেকে হবে ।যেমন, খাদিম, ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়। কেননা এগুলো তার মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভূক্ত।

(তদ্রুপ এই সম্পূর্ণ খরচ) তার ফিরে আসা পর্যন্ত তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ থেকে উদ্বৃত্ত হতে হবে। কেননা ভরণ-পোষণ হলো স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার, আর শরীআতের নির্দেশ মতেই শরীআতের হকের উপর বান্দার হক অগ্রগণ্য।

মক্কাবাসীদের উপর এবং তাদের পার্শ্ববর্তীদের উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সওয়ারী শর্ত নয়। কেননা হজ্জ আদায় করার জন্য তাদের উপর অতিরিক্ত কষ্টে লিপ্ত হতে হয় না। সুতরাং তা জুমুআর জন্য পথ চলার অনুরূপ হলো। পথের নিরাপত্তা অপরিহার্য। কেননা এছাড়া সক্ষমতা সাব্যস্ত হয় না।

কোন কোন মতে এটা হলো হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত। এমনকি (মৃত্যুর সময়) ওসীয়ত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। এ মত ইমাম আবূ হানীফা (র.)

http://islaminonesite.wordpress.com/

থেকে বর্ণিত। কারো কারো মতে এটা হজ্জ আদায় করার শর্ত, ওয়াজিব হওয়ার জন্য নয়। কেননা নবী করিম (সা.) সক্ষমতার ব্যাখ্যা করেছেন শুধু ‘পাথেয় ও বাহন’ দ্বারা।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, তার সংগে তার স্বামী কিংবা কোন মাহরাম থাকতে হবে, যাকে সংগে নিয়ে সে হজ্জ করে আসবে। যদি তার ও মক্কা শরীফের মাঝে তিন দিনের দূরত্ব থাকে তাহলে স্বামী বা মাহরাম ছাড়া হজ্জ করতে যাওয়া তার জাইয নয়।

শাফিঈ (র.) বলেন, যদি কাফেলার সাথে রওয়ানা হয় আর তার সংগে নির্ভরযোগ্য কতিপয় স্ত্রীলোক থাকে, তাহলে তার জন্য হজ্জ করা জাইয হবে। কেননা সফর থাকার কারণে নিরাপত্তা পাবে।

আমাদের দলীল এই যে, নবী করিম (সা.) বলেছেন- কোন স্ত্রীলোক যেন মাহরাম ছাড়া হজ্জে না যায়। আর এ জন্য যে, মাহরাম ছাড়া তার ব্যাপারে ফিতনার আশংকা রয়েছে। আর অন্যান্য স্ত্রীলোক তার সংগে যুক্ত হওয়ার দ্বারা ফিতনার আশংকা আরো বৃদ্ধি পাবে। এ কারণেই সংগে অন্য স্ত্রীলোক থাকা সত্ত্বেও পর নারীর সংগে একান্তে মিলিত হওয়া হারাম। পক্ষান্তরে তার ও মক্কার মধ্যবর্তী দুরত্ব তিন দিনের কম হওয়ার বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা সফরের কম দূরত্বে মাহরাম ছাড়া বের হওয়া তার জন্য জাইয রয়েছে।

যদি সে মাহরাম পেয়ে যায় তাহলে স্বামীর তাকে বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, তার বাধা দেয়ার অধিকার থাকবে। কেননা, সফরে বের হওয়াতে তার হক নষ্ট হয়।

আমাদের দলীল এই যে, ফরযসমূহের ক্ষেত্রে স্বামীর অধিকার প্রকাশ পাবে না। আর হজ্জ ফরযসমূহের অন্তর্ভূক্ত। এমনটি নফল হজ্জের ক্ষেত্রে তার বাধা প্রদানের অধিকার রয়েছে।

মাহরাম যদি ফাসিদ হয় সেক্ষেত্রে ফকীহ্গণ বলেছেন যে, তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। কেননা সফর সংগী হওয়ার উদ্দেশ্য তার দ্বারা হাছিল হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে কোন মাহরামের সংগে বের হওয়া তার জন্য জাইয হবে। কিন্তু মাজূসী হলে জাইয হবে না। কেননা, সে তো তার সংগে বিবাহের বৈধতার কথা বিশ্বাস করে। বাচ্চা কিংবা বিকৃত মস্তিষ্ক মাহরাম গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের পক্ষ থেকে হিফাজত হাসিল হবে না।

যে বালিকা যৌনাবেদনের সীমায় উপনীত হয়ে গেছে, সে প্রাপ্ত বয়স্কার সমতুল্য। কাজেই মাহরাম ছাড়া তাকে নিয়ে সফর করা জাইয নেই। মাহরামের ব্যয়ভার স্ত্রী লোকটিকেই বহন করতে হবে। কেননা সে তার মাধ্যমেই হজ্জ আদায়ে সক্ষম হচ্ছে।

মাহরামের সংগে কি হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, না হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, এ বিষয়ে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে- যেমন পথের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাদের মতভেদ রয়েছে।

ইহরাম বাধার পর নাবালক যদি 'সাবালক' হয় কিংবা দাস স্বাধীনতা লাভ করে, তার পর হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে তা তাদের ফরয হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা তাদের ইহরাম তো নফল আদায়ের জন্য সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা ফরয আদায়ের ইহরামে পরিবর্তিত হবে না।

যদি নাবালক (বালেগ হওয়ার পর) ওকুফে আরাফার পূর্বে ইহরামের নবায়ণ করে ফরয হজ্জের নিয়্যত করে নেয়, তাহলে জাইয হবে। কিন্তু দাস এরূপ করলে জাইয হবে না। কেননা যোগ্যতা না থাকার কারণে বালকের ইহরাম অবশ্যপালনীয় নয়, পক্ষান্তরে দাসের ইহরাম অবশ্য পালনীয়। সুতরাং অন্য ইহরাম শুরু করার মাধ্যমে বর্তমান ইহরাম হতে বের হয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ উত্তম জানেন।

পরিচ্ছেদ- ইহরামের স্থানসমূহ

ইহরাম অবস্থা ছাড়া যে সকল স্থান অতিক্রম করা কারো জন্য জাইয নেই সেগুলো মোট পাচটি। মদীনাবাসীদের জন্য হলো 'যুল হুলায়ফা' এবং ইরাকবাসীদের জন্য

http://islaminonesite.wordpress.com/

হলো ‘যাতু ইরক’ এবং সিরিয়াবাসীদের জন্য হলো জুহফা এবং নাজদবাসীদের জন্য হলো ‘কারন’ এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য হলো ইয়ালামলাম।

এভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এই সকল এলাকার লোকদের জন্য এই সকল স্থানকে ‘মীকাত’ রূপে নির্ধারণ করেছেন।

এই নির্ধারণের ফলাফল হলো ইহরাম বাধার কাজটি এ সকল স্থান থেকে পিছানো নিষিদ্ধ। কেননা এসকল স্থান হতে অগ্রবর্তী করা তো সকলের মতেই জাইয।

বহিরাগত লোকেরা যখন মক্কায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে ঐ সকল মীকাত পর্যন্ত উপনীত হয়, তখন আমাদের মতে ইহরাম বেধে নেয়া তার জন্য জরুরী। হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্য থাকুক কিংবা অন্য উদ্দেশ্য থাকুক। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- ইহরাম অবস্থা ছাড়া কেউ যেন মীকাত অতিক্রম না করে।

তাছাড়া এই জন্য যে, ইহরাম ওয়াজিব হওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই পবিত্র অঞ্চলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সুতরাং এ বিষয়ে হজ্জকারী, উমরাকারী ও অন্যান্যরা সমান হবে।

যারা মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী, তাদের জন্য নিজস্ব প্রয়োজনে ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ। কেননা তাকে তো সচরাচর মক্কায় প্রবেশ করতেই হয়। আর প্রতিবার ইহরাম বাধ্যতামূলক করাতে সুস্পষ্ট অসুবিধা রয়েছে। সুতরাং তারা মক্কাবাসীদের মতই হবে। আর মক্কাবাসীদের জন্য প্রয়োজনে ইহরাম ছাড়া মক্কা হতে বের হওয়া এবং মক্কায় প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে।

আর হজ্জ বা উমরা আমাদের নিয়্যত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা বিশেষ সময়ে হয়ে থাকে সুতরাং এতে কোন অসুবিধা নেই।

যদি এ সকল মীকাতে পৌছার আগেই ইহরাম বেধে নেয়, তাহলে তা জাইয। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন- তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর। আর পূর্ণতা হলো এ দু’টি ইহরাম বাধা স্বীয় পরিবারের গৃহ থেকে। ‘আলী ইব্ন মাস’ঊদ (রা.) এ রূপই বলেছেন। সুতরাং ইহরাম মীকাতের আগে বাধাই

http://islaminonesite.wordpress.com/

উত্তম। কেননা হজ্জের পূর্ণতা এ ধারায়ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে; আর এতে কষ্টও অধিক এবং ভক্তির প্রকাশও অধিক।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আগে থেকে ইহরাম বাধা তখনই উত্তম হবে, যখন কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে।

যে ব্যক্তি মীকাতের ভিতরে বাস করে, তার জন্য মীকাত হলো 'হিল্লু' (অর্থাত্ হারামের বাইরের এলাকা) । অর্থাত্ হারাম ও মীকাতের মধ্যবর্তী অঞ্চল। কেননা আপন পরিবারের নিকট হতে ইহরাম বেধে যাওয়া তার জন্য জাইয রয়েছে। আর মীকাতের পর থেকে হারাম পর্যন্ত অঞ্চলটি অভিন্ন স্থান রূপে বিবেচিত।

যে ব্যক্তি মক্কায় বাস করে, তার মীকাত হলো হজ্জের ক্ষেত্রে হরম এবং উমরার ক্ষেত্রে 'হিল্লু'। কেননা নবী করীম (সা.) তার সাহাবায়ে কিরামকে হজ্জের জন্য মক্কার অভ্যান্তর থেকে ইহরাম বাধার নির্দেশ দিয়েছেন। পক্ষান্তরে 'আইশা (রা.) এর ভাই আবদুর রহমান (রা.) কে তানঈম থেকে তাকে উমরা করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তানঈম 'হিল্লু' এ অবস্থিত।

তাছাড়া এই জন্য যে, হজ্জ আদায় করা হয় আরাফাতে। আর তা 'হিল্লু' এর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ইহরাম হরম থেকে হওয়া উচিত, যাতে এক ধরনের সফর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উমরা আদায় করা হয় হরমের অভ্যন্তরে। সুতরাং উক্ত কারণে হিল্লু থেকে ইহরাম হওয়া উচিত। তবে হাদীছে তানঈম এর কথা উল্লেখিত হওয়ার কারণে তানঈম থেকে ইহরাম করাই উত্তম আল্লাহ্-ই অধিক অবগত।

প্রথম অনুচ্ছেদ

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইহরাম

যখন ইহরাম বাধতে, মনস্থ করবে তখন গোসল কিংবা উযূ করে নিবে। তবে গোসল করাই উত্তম। কেননা বর্ণিত আছে, নবী করিম (সা.) তার ইহরামের জন্য গোসল করেছিলেন। তবে এ গোসল হলো পরিচ্ছন্নতার জন্য(পবিত্রতা অর্জনের জন্য নয়)। তাই ঋতুগ্রস্ত স্ত্রীলোককেও গোসল করতে বলা হবে। যদিও তাতে তার গোসলের ফরয আদায় হবে না। সুতরাং উযূ গোসলের স্থলবর্তী হবে, যেমন জুমুআর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে গোসলই উত্তম। কেনন, গোসলের মাঝে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি পূর্ণতর। তাছাড়া নবী করীম (সা.) এর সময় তহবন্দ ও চাদর পরিধান করেছেন। তাছাড়া এই জন্য যে, সেলাই করা কাপড় পরা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ সতর ঢাকা এবং গরম ও শীত নিবারণ জরুরী, আর তা আমাদের নির্ধারিত কাপড়েই সম্ভব। তবে নতুন কাপড়ই উত্তম। কেননা তা পবিত্রতার অধিক নিকটবর্তী।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, তার কাছে আতর থাকলে তা ব্যবহার করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন আতর ব্যবহার করা মাকরূহ হবে, যার অস্তিত্ব ইহরামের পরও অবশিষ্ট থেকে যায়। মালিক ও শাফিঈ (র.) এর ও এ মত। কেননা সে ইহরামের পর আতর থেকে উপকৃত হচ্ছে।

প্রসিদ্ধ মতামতে দলীল হলো ' আইশা (রা.) এর হাদীছ। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে ইহরামের পূর্বে ইহরামের জন্য সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

তাছাড়া এই জন্য যে, নিষিদ্ধ বিষয় হলো ইহরামের পরে খুশবু ব্যবহার করা। আর যা অবশিষ্ট থেকে যায়, তা তার সংগে সংযুক্তির কারণে যেন তার আনুষঙ্গিক। কাপড়ের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা তার থেকে বিচ্ছিন্ন।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে। কেননা জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) তার ইহরামের সময় 'যুলহুলায়ফায়' দু'রাকাআত সালাত আদায় করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, আর দু'আ পড়বে- হে আল্লাহ্, আমি হজ্জের নিয়্যত করছি; সুতরাং আপনি আমরা জন্য তা সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল রুকন। কেননা, হজ্জ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে আদায় করা হয়। সুতরাং সাধারণতঃ তা কষ্টমুক্ত হয় না, তাই সহজ তা প্রার্থনা করবে।

আর ফরয সালাত আদায়ের বেলায় এ ধরনের দু'বার কথা বলা হয়নি। কেননা সালাতের সময় সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণতঃ তা আদায় করা সহজ।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর সালাতের পরে তালবিয়া পাঠ করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) সালাতের পরে তালবিয়া পড়েছিলেন। তবে বাহন তাকে নিয়ে সোজা দাড়িয়ে যাওয়ার পরে তালবিয়া পড়ে তাহলেও জাইয হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছটির কারণে প্রথমটিই উত্তম। যদি সে শুধু হজ্জ আদায়কারী হয় তাহলে তালবিয়া দ্বারা শুধু হজ্জের নিয়্যত করবে। কেননা এটা ইবাদত। আর আমল নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল।

আর তালবিয়া হল এ বাক্য বলা- আমি হাযির, হে আল্লাহ্, আমি হাযির। আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নেই। আমি হাযির, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য এবং নিয়ামত ও রাজত্ব আপনারই এবং আপনার কোন শরীক নেই।

এর হামযাটি জের যুক্ত, জবরযুক্ত নয়, যাতে বক্তব্যটি স্বতন্ত্র হয়, পূর্বসম্পর্কিত না হয়। কেননা জবরযুক্ত হলে (ব্যকরনের দৃষ্টিতে) তা পূর্ববর্তী (বাক্যের বিশেষণ হবে।

এই তালবিয়া হলো হযরত ইবরাহীম (আ.) এর আহবানের সাড়াদান, যেমন সংশ্লিষ্ট ঘটনায় সুবিদিত।

উল্লেখিত শব্দগুলোর কোন কিছুই বাদ দেওয়া উচিত নয়। কেননা বর্ণনাকারী সর্বসম্মতিক্রমেই তা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তা থেকে কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। তবে যদি কিছু বৃদ্ধি করে তাহলে তা জাইয হবে। আর এতে ভিন্ন মত রয়েছে ইমাম শাফিঈ (র.) এর এবং তার নিকট থেকে রাবীর বর্ণনা অনুযায়ী।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তিনি একে আযান ও তাশাহুদের উপর কিয়াস করেন, এদিক থেকে যে, তা বিধিবদ্ধ যিকির।

আমাদের দলীল এই যে, ইব্ন মাস'ঊদ, ইব্ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবাগণ হাদীছে বর্ণিত শব্দের সংগে অতিরিক্ত যোগ করেছেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, তালবিয়ার উদ্দেশ্য হলো প্রশংসা ও বন্দেগীর প্রকাশ। সুতরাং তার সংগে অতিরিক্ত যোগ করা নিষিদ্ধ হবে না।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন তালবিয়া পড়বে, তখন ইহরাম বাধা হয়ে যাবে। অর্থাত্ যদি নিয়্যত করে থাকে। কেননা ইবাদত নিয়্যত ছাড়া আদায় হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার তা উল্লেখ করেননি। কেননা এ দু'আর মধ্যে নিয়্যতের দিকে ইংগিত রয়েছে।

যতক্ষণ তালবিয়া না বলবে ততক্ষণ শুধু নিয়্যত দ্বারা সে ইহরাম আরম্ভকারী রূপে বিবেচিত হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

(আমাদের দলীল) কেননা এ হলো একটি আমল আদায় করার সংকল্প। সুতরাং কোন যিকির জরুরী হবে, যেমন সালাতের তাহরীমার ক্ষেত্রে। তবে জনুবিয়া ছাড়া এমন যিকির যা দ্বারা তাযীম উদ্দেশ্য হয়, ইহরাম শুরুকারী গণ্য হবে। সেটা ফারসীতে হোক কিংবা আরবীতে। আমাদের ইমামদের পক্ষ থেকে এটাই হলো প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াত।

সাহেবাইনের নীতি অনুযায়ী হজ্জ ও নামাযের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, হজ্জের মধ্যে সালাতের তুলনায় অধিক অবকাশ রয়েছে। এ কারণেই হজ্জের ক্ষেত্রে গায়র যিকিরকে যিকিরের স্থলবর্তী করা হয়। যেমন উটকে হার পরিয়ে দেয়া। সুতরাং অন্য যিকিরকে তালবিয়ার স্থলবর্তী এবং আরবী ছাড়া অন্য ভাষাকে (আরবীর) স্থলবর্তী করা যেতে পারে।

সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি যে সকল বিষয় আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, তা পরিহার করে চলবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বানীই

http://islaminonesite.wordpress.com/

হলো মুলঃ হজ্জে সহবাস, পাপাচার ও ঝগড়া-বিবাদ নেই। এখানে না-বাচক শব্দে নিষেধ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত অর্থ সহবাস কিংবা অশ্লীল কথা। কিংবা নারীদের উপস্থিতিতে যৌন বিষয়ক আলোচনা। আয়াতে বর্ণিত অর্থ নাফরমানি।

ইহরামের অবস্থায় এগুলো কঠোরতর হারাম। বিবাদ অর্থ সংগীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, ঝগড়া না করার অর্থ হলো হজ্জের সময় অগ্রপশ্চাত্‌ করা নিয়ে মুশরিকদের সংগে বিবাদ না করা।

কোন শিকার হত্যা করবে না। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন, মুহরিম অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা করো না।

শিকারের প্রতি ইংগিত করবে না এবং শিকার সম্পর্কে অবহিত করবে না। কেননা, আবূ কাতাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি হালাল অবস্থায় একটি বণ্য-গাধা শিকার করেছিলেন। আর তার সংগীরা মুহরিম অবস্থায় ছিলেন। তখন নবী করীম (সা.) তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা কি ইংগিত করেছিলে? তোমরা কি বাতলিয়ে দিয়েছিলে? তোমরা কি সাহায্য করেছিলে? তারা সকলে বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহলে তোমরা যেতে পারো।

তাছাড়া এই জন্য যে, এগুলোর দ্বারা শিকারের নিরাপত্তা বিনষ্ট করা হয়। কেননা, শিকার তার বন্যতা ও চক্ষুর আড়ালে থাকার কারণে নিরাপড় ছিলো।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জামা, পাজামা, পাগড়ী ও মোজা পরবে না। তবে যদি জুতা না পায় তাহলে থেকে নীচের দিকে মোজা কেটে নিবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সা.) মুহরিমকে এ সকল জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং শেষে বলেছেন- এবং মোজা পরবে না। তবে যদি জুতা না পাওয়া যায় তাহলে মোজা দু'টোকে থেকে নীচের দিকে কেটে ফেলবে।

এখানে এর অর্থ হলো পায়ের পাতার মধ্যস্থলের জোড় (গ্রন্থি), যেখানে ফিতা বাধা হয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে হিশাম তা বর্ণনা করেছেন।

চেহারা এবং মাথা ঢাকবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, পুরুষের জন্য চেহারা ঢাকা জাইয আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- পুরুষের ইহরাম হলো তার মাথায় এবং স্ত্রীলোকের ইহরাম হলো তার চেহারায়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) এর বাণী- তার চেহারা এবং মাথা (কাফনের কাপড়ে) ঢাকবে না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া বলা অবস্থায় উত্থিত করা হবে। এ কথা তিনি বলেছেন ঐ মুহরিম সম্পর্কে, যে মারা গিয়েছিলো।

তাছাড়া এই জন্য যে, স্ত্রীলোকের চেহারা ঢাকা হয় না। অথচ তা খুলে রাখাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে। সুতরাং পুরুষের চেহারা তো খুলে রাখা অধিক সংগত।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, আর সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। কেননা নবী (সা.) বলেছেন- তদ্রুপ তেল ব্যবহার করবে না। আমাদের বর্ণিত এ হাদীছের প্রেক্ষিতে।

আর মাথা মুড়াবে না এবং শরীরের পশমও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- তোমরা তোমাদের মাথা মুড়াবে না।

আর দাড়ি ছাটবে না। কেননা এটা মুড়ানোর সমার্থক। তাছাড়া এতে ধুলিমলিনতা এবং ময়লা দূর করা হয়।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, জাফরান ও উসফোর রজিত কাপড় পরিধান করবে না। কেননা নবী (সা.) বলেছেন- মুহরিম এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না, যাকে জাফরান বা কুসুম দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে।

তবে যদি তা এমনভাবে ধোয়া হয় যে, আর সুগন্ধ বেরোয় না। (তাহলে পরা যাবে)। কেননা, নিষেধ করা হয় সুগন্ধের কারণে রংয়ের কারণে, নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, কুসুম রঞ্জিত কাপড় পরিধানে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটা শুধু রং, তাতে কোন সুগন্ধ নেই। আমাদের দলীল এই যে, তাতে সুঘ্রাণ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, গোসল করা এবং হাম্মামখানায় প্রবেশ করাতে অসুবিধা নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম মালিক(র.) বলেন, শামিয়ানা বা এ ধরনের কিছুর ছায়া গ্রহণ করা মাকরুহ হবে। কেননা এটা মাথার ঢাকার সদৃশ।

আমাদের দলীল এই যে, উছমান (রা.) এর জন্য ইহরামের অবস্থায় শামিয়ানা টাংগানো হতো।

তাছাড়া এই জন্যে যে, এটা শরীরকে স্পর্শ করে না। সুতরাং তা গৃহের সদৃশ হলো।

যদি কা'বা শরীফের গিলাফের ভিতরে ঢুকে যায় আর তা তাকে ঢেকে ফেলে তবে যদি তার মাথা বা চেহারায় কাপড় না লাগে তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা হলো ছায়া গ্রহণেরই মত।

কোমরে টাকার থলে বাধায় কোন দোষ নেই।

ইমাম মালিক(র.) বলেন, যদি তাতে অন্য কারো খরচের টাকা থাকে তাহলে মাকরূহ হবে। কেননা এর কোন প্রয়োজন নেই।

আমাদের দলীল এই যে, এটা সেলাইকৃত কাপড় পরার সমার্থক নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উভয় অবস্থাই সমান হবে।

মাথা ও দাড়ি 'খিতমি দ্বারা ধুবে না। কেননা এটা এক ধরনের সুগন্ধি। তাছাড়া এটা মাথার উকুন ধ্বংস করে।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, সকল সালাতের পরে এবং যখনই কোন উচু স্থানে আরোহণ করবে কিংবা উপত্যকায় অবতরণ করবে কিংবা সওয়ারদের দেখা পাবে তখনই বেশী বেশী তালবিয়া পড়বে এবং শেষ রাতের দিকেও। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাহাবাগণ এ সকল অবস্থায় তালবিয়া পড়তেন।

ইহরামের তালবিয়া হলো সালামের তাকবীরের অনুরূপ। সুতরাং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের সময় তা বলবে।

উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পড়বে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- শ্রেষ্ঠ হজ্জ হলো 'আজ্জ ও ছাজ্জ'। আজ্জের অর্থ উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া আর 'ছাজ্জ' হল রক্ত প্রবাহিত করা (কুরবানী করা)।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন প্রথমে মাসজিদুল হারামে যাবে। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন তখন প্রথমে মাসজিদুল হারামে গিয়েছিলেন।

তাছাড়া আসল উদ্দেশ্য তো হলো বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত করা। আর তা হলো মাসজিদুল হারামের মধ্যে। আর মাসজিদুল হারামে রাত্রে বা দিনে প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই। কেননা তা হলো একটি শহরে প্রবেশ। সুতরাং রাত্র বা দিবস কোন একটির বিশেষত্ব নেই।

যখন বায়তুল্লাহ্ দৃষ্টিগোচর হয়,তখন আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়বে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বায়তুল্লাহর সাক্ষাত্ লাভ কালে বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার বলতেন।

মাবছূত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (র.) হজ্জের স্থানগুলোর জন্য কোন দু'আ নির্ধারণ করেন নি। কেননা, দু'আর নির্ধারণে হৃদয়ের বিগলিত ভাব দূরীভুত করে দেয়। তবে কেউ যদি হাদীছে বর্ণিত দু'আ বরকত লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করে তবে তা উত্তম।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, অতঃপর হাজরে আসওয়াদ থেকে(তাওয়াফ) শুরু করবে। অর্থাত্ হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহু আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে হাজরে আসওয়াদ থেকে আমল (তাওয়াফ) শুরু করেছিলেন, অর্থাত্ হাজরে আসওয়াদের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহু আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়েছিলেন।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, উভয় হাত উপরে তোলবে। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, সাত স্থান ব্যতীত হস্ত উত্তোলন করবে না। সেগুলোর মধ্যে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

কোন মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদ (চুম্বন) করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.) আপন পবিত্র ওষ্ঠদ্বয় স্থাপন করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছিলেন। এবং উমর(রা.) কে বলেছিলেন, তুমি শক্তিশালী মানুষ, দুর্বলকে কষ্ট দিবে। সুতরাং তুমি হাজরে আসওয়াদের সামনে মানুষের প্রতি চাপ সৃষ্টি করো না। তবে কখনো ফাক পেয়ে গেলে তখন তা স্পর্শ

http://islaminonesite.wordpress.com/

করে নিও। অন্যথায় তার মুখোমুখি হয়ে আল্লাহু আকবার ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে নিও।

তাছাড়া এই জন্য যে, হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা হলো সুন্নত আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যদি হাতের কোন জিনিস দ্বারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করা সম্ভব হয়, যেমন খেজুরের ডাল ইত্যাদি দ্বারা, অতঃপর সেটাকে চুম্বন করে তাহলে তাই করে নিবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী(সা.) সওয়ারিতে আরোহণ করা অবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করেছিলেন এবং হাতের লাঠি দ্বারা রুকন সমুহ স্পর্শ করেছিলেন।

যদি তার কিছুই করা সম্ভব না হয়, তাহলে শুধু হাজারে আসওয়াদের মুখোমুখি দাড়াবে এবং আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে আর আল্লাহ্র প্রশংসা করবে এবং নবী(সা.) এর উপর দরূদ পাঠ করবে।

ইমাম কদুরী(র.) বলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহর দরজা সংলগ্ন দিকটি নিজের ডান দিকে রাখবে এবং চাদরকে করবে। অতঃপর বায়তুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করিম(সা.) হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন এবং দরজার সংলগ্ন দিকটি ডান দিকে রেখেছেন অতঃপর সাতবার বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করেছেন।

অর্থ চাদরকে ডান বগলের নীচে দিয়ে নিয়ে বাম কাধের উপর ফেলবে। এ হল সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্(সা.) থেকে এ আমল বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করবে। হাতীম হলো বায়তুল্লার ঐ স্থানটি, য়েখানে মীযাবে রহমত রয়েছে। (হাতীম অর্থ ভাংগা অংশ) এ অংশটাকে হাতীম বলা হয় এই জন্য যে, সেটাকে বায়তুল্লাহ্ থেকে ভেংগে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

আবার এ অংশটাকে হিজরও বলা হয়। কেননা এ অংশটাকে বায়তুল্লাহ্র অন্তর্ভূক্ত হতে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

বস্তুতঃ তা বায়তুল্লাহ্‌র অংশ। কেননা ‘আইশা(রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ্‌(সা.) বলেছেন- (হাতীম বায়তুল্লাহ্‌র অংশ বিশেষ)। এজন্য হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করবে। এমন কি যদি কেউ হাতীম ও বায়তুল্লাহ্‌র মধ্যবর্তী ফাকে প্রবেশ করে তাওয়াফ করে, তাহলে জাইয হবে না।

অবশ্য যদি কেউ শুধু হাতীমকে কিবলা বানিয়ে সালাত আদায় করে, তাহলে তার সালাত শুদ্ধ হবে না। কেননা সালাতে কা’বা অভিমুখী হওয়া যে ফরয, তা কুরআনের বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং সতর্কতার প্রেক্ষিতে যা শুধু খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সাব্যস্ত, তাতে ফরয আদায় হবে না। আর তাওয়াফের ক্ষেত্রে সতর্কতা হলো হাতীমের বাইরে দিয়ে তাওয়াফ করা। ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, প্রথম তিন চক্করে রমল করবে।

রমল অর্থ হাটার সময় কাধ ঝাকি দিয়ে চলা, যুদ্ধমুখী দুই সারীর মাঝখানে দম্ভকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর মত। আর তা করবে চাদর ডান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাধের উপর ফেলে। রমলের কারণ ছিলো মুশরিকদের সামনে বীরত্ব প্রকাশ করা। কেননা মুশরিকরা বলাবলি করেছিলো, ইয়াসরিবের জয় তাদের কাহিল করে ফেলেছে।

অতঃপর কারণ দূরীভূত হওয়ার পরও নবী(সা.) এর যামানায় এবং পরবর্তীতেও (রমলের) বিধান বহাল থাকে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অবশিষ্ট চক্করগুলোতে নিজ স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। রাসূলুল্লাহ্‌(সা.) এর হজ্জের বিবরণ বর্ণনাকারী সবাই এ বিষয়ে একমত। আর রমল অব্যাহত থাকবে হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদে পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ্‌(সা.) এর রমল সম্পর্কে এরূপই বর্ণিত।

রমলের সময় যদি সে মানুষের ভীড়ের চাপে পড়ে তাহলে দাড়িয়ে যাবে। আবার যখন ফাক পাবে তখন রমল করবে। কেননা রমলের স্থলবর্তী কিছু নেই। তাই সে থেমে থাকবে যেন সুন্নত মুতাবিক তা আদায় করতে পারে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা মুখোমুখি হওয়াই তার স্থলবর্তী।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যখনই হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাবে, সম্ভব হলে তা স্পর্শ করবে। কেননা তাওয়াফের চক্করগুলো সালাতের রাকাআতের মতো। সুতরাং প্রত্যেক রাকাআত যেমন তাকবীর দিয়ে শুরু করা হয়, তেমনি প্রতিটি চক্কর হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে শুরু করবে।

যদি স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তাহলে তার দিকে মুখ করে আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে। যেমন আমরা্ পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করবে। যাহিরে রিওয়ায়াতের মতে তা মুস্তাহাব। ইমাম মুহাম্মদ(র.) থেকে একটি বর্ণনায় এটি সুন্নত।

এ দু'টি ছাড়া অন্য কোন রোকন স্পর্শ করবে না। কেননা্ নবী(সা.) এ দু'টি রোকন স্পর্শ করতেন। অন্যকোন রুকন স্পর্শ করতেন না।

আর তাওয়াফ শেষ করবে চুম্বনের মাধ্যমে অর্থাত্ হাজরে আসওয়াদের চুম্বন করে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অতঃপর মাকামে (ইবরাহীমে) এসে সেখানে দু'রাকাআত সালাত আদায় করবে। কিংবা ওয়াজিব যে কোন স্থানে সহজে সম্ভব হয়। আমাদের মতে এ সালাত ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তা সুন্নত। কেননা, ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল নেই।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বাণী- তাওয়াফকারী যেন প্রতি সাত চক্করের পর দু'রাকাআত সালাত আদায় করে। আর নির্দেশ ওয়াজিব প্রমাণ করে।

অতঃপর হাজরে আসওয়াদের নিকট এসে আবার তা চুম্বন করবে। কেননা বর্ণিত আছে, নবী(সা.) দু'রাকাআত পড়ার পর হাজরে আসওয়াদের নিকট ফিরে এসেছিলেন। মূলনীতি এই যে, যে তাওয়াফের পর সাঈ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে হাজরে আসওয়াদের নিকট ফিরে আসবে। কেননা, তাওয়াফ যেমন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দ্বারা শুরু করা হয়, তেমনি সাঈ-ও তা দ্বারা শুরু করবে। এর বিপরীত যে তাওয়াফ, যার পর সাঈ নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, এ তাওয়াফের নাম তাওয়াফে কুদূম। এটাকে তাওয়াফুত্তাহিয়্যাতিও বলে। এটা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।

ইমাম মালিক(র.) বলেন, তা ওয়াজিব। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফে উপস্থিত হবে, সে যেন তাওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্কে তাহিয়্যা পেশ (সম্মান প্রদর্শন) করে।

আমাদের দলীল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াফের আদেশ করেছেন। আর নিঃশর্ত আদেশে পুনরাবৃত্তি দাবী করে না। এদিকে 'ইজমা' এর মাধ্যমে আদেশের ক্ষেত্র রূপে তাওয়াফে যিয়ারত নির্ধারিত হয়ে গেছে।

আর ইমাম মালিক(র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে তাওয়াফের তাওয়াফে তাহিয়্যা বলা হয়েছে। তার তা মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণ করে।

মক্কাবাসীদের জন্য তাওয়াফে কুদূম নেই। কেননা তাদের ক্ষেত্রে তো আগমন অবিদ্যমান।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করবে এবং তাতে আরোহণ করবে। বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ করবে এবং আল্লাহু আকবার বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে, নবী করীম(সা.) এর উপর দরুদ পড়বে এবং উভয় হাত উপরে তোলে আপন প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন, এমনকি যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফ তার দৃষ্টিগোচর হয়, তখন বায়তুল্লাহ্ মুখী হয়ে দাড়িয়ে তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন।

তাছাড়া এই জন্য যে, ছানা ও দুরুদকে দু'আর উপর অগ্রবর্তী করা হয় যাতে কবুলিয়াতের নিকটবর্তী হয়, যেমন অন্যান্য দু'আর ক্ষেত্রে।

আর হাত তোলা হলো দু'আর সুন্নাত।

পাহাড়ে এতটুকু উপরে আরোহণ করবে, যাতে বায়তুল্লাহ্ তার দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করাই আরোহণের উদ্দেশ্য। আর যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সাফা পাহাড়ের দিকে যেতে পারে। নবী করীম(সা.) বাবে বনী মাখযূম

http://islaminonesite.wordpress.com/

তথা বাবে সাফা দিয়ে শুধু এজন্য বের হয়েছিলেন যে, সেটা সাফার দিকে যাওয়ার নিকটতম দরজা ছিলো, এজন্য নয় যে, তা সুন্নাত।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অতঃপর মারওয়ার উদ্দেশ্যে অবতরণ করবে এবং ধীর-স্থিরভাবে হেটে যাবে। যখন বায়তুল ওয়াদি পর্যন্ত পৌছবে, তখন সবুজ নিশানদ্বয়ের মাঝে সাধারণভাবে দৌড়াবে। অতঃপর মারওয়া পর্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে হেটে যাবে ও তাতে আরোহণ করবে, এবং সাফায় যা করেছে, এখানেও তা করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) সাফা থেকে অবতরণ করে মারওয়ার উদ্দেশ্যে হেটে যান এবং বাতনুল ওয়াদিতে দৌড়েছেন। বাতনুল ওয়াদি থেকে বের হয়ে হেটে চলেন এবং মারওয়ায় আরোহণ করেন। এখানে যে উভয়ের মাঝে সাত চক্কর তাওয়াফ করেন। এ হলো এক চক্কর।

এভাবে সাত চক্কর দিবে। সাফা চক্কর দিবে। সাফা থেকে শুরু করবে এবং মারওয়ায় গিয়ে শেষ করবে। আর প্রতি চক্করের সময় বাতনুল ওয়াদিতে দৌড়বে। দলীল হল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

আর সাফা থেকে শুরু করার কারণ, এ সম্পর্কে নবী(সা.) এর এ বাণী- আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে যেটি (অর্থাত্ সাফা) দিয়ে শুরু করেছেন, তোমরাও তা থেকে শুরু কর।

আর সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ হলো ওয়াজিব।

এটি রুকন নয়। তবে ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, এটি রুকন। কেননা নবী করীম(সা.) বলেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর সাঈ নির্ধারণ করছেন। সুতরাং তোমরা সাঈ করো।

আমাদের দলীল আল্লাহ্ তা['আলার বাণী- ঐ দুটির ওয়াজিব উভয়টিকে 'নফি' করে। তবে আমরা রকনের পরিবর্তে ওয়াজিব হওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আর এ জন্য যে, আকাট্য দলীল ছাড়া রুকন সাব্যস্ত হয় না। আর এখানে তা পাওয়া যায়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর ইমাম শাফিঈ(র.) বর্ণিত হাদীছে শব্দ মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর সময় ওসীয়ত করা প্রসংগে বলেছেন- তোমাদের কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় আর সে কিছু সম্পদ রেখে যায় তাহলে তার উপর ওসীয়ত করার বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে(অথচ ওসীয়ত ওয়াজিব নয়)।

অতঃপর মক্কা শরীফে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করবে। কেননা সে হজ্জের ইহরা বেধেছে। সুতরাং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার পূর্বে সে ইহরাম মুক্ত হতে পারবে না।

যখনই তার ইচ্ছা হবে সে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে। কেননা তাওয়াফ হলো সালাত সদৃশ। রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- (বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ হলো সালাত) আর সালাত হলো নির্ধারিত ইবাদতের মধ্যে উত্তম। সুতরাং তাওয়াফও অনুরূপ। তবে এই সময়ের মধ্যে এ সকল তাওয়াফের পরে সাঈ করবে না। কেননা সাঈ একবারই শুধু ওয়াজিব হয়। আর নফল সাঈ শরীআত অনুমোদিত নয়। আর প্রতি সাত চক্করের জন্য দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এ দু'রাকাআত হলো তাওয়াফের সালাত। যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, ইয়াওমুত্তারবিয়ার (৮ই যিলহাজ্জের) পূর্বের দিন ইমাম একটি খুতবা বা ভাষণ দান করবেন, যাতে মানুষকে মিনায় যাওয়া আরাফায় সালাত আদায় করা, উকুফ করা এবং আরাফা থেকে ফিরে আসার নিয়ামাবলী শিক্ষা দিবেন।

মোট কথা হজ্জে তিনটি খুতবা রয়েছে। প্রথমটি যা আমরা উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয়টি হলো আরাফার দিবসে আরাফাতে আর তৃতীয়টি হলো এগার তারিখে মিনায়। অতএব প্রতি দুই খুতবার মাঝে এক দিনের ব্যবধান রয়েছে।

ইমাম যুফার(র.) বলেন, লাগাতার তিনদিন খুতবা প্রদান করা হবে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো ইয়াওমুত্তারবিয়া (৮ই যিলহাজ্জ)। কেননা এই দিনগুলো হজ্জ মৌসুমের দিন এবং হাজীদের একত্র হওয়ার সময়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, খুতবাগুলোর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষাদান। অথচ ইয়াওমুত্তারবিয়া ও ইয়াওমুন নহর হলো ব্যস্ততার দিন। সুতরাং আমরা যা বলেছি সেটাই হবে অধিকতর উপকারী এবং অন্তরে অধিক ক্রিয়াশীল।

আট তারিখে মক্কায় ফজরের সালাত আদায় করে মিনার উদ্দেশ্যে বের হবে এবং আরাফা-দিবসের ফজরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) আট তারিখে মক্কায় ফজরের সালাত আদায় করেন আর সূর্যোদয়ের পর মিনার উদ্দেশ্যে যান এবং সেখানে যুহর, আসর, মাগরিব, ঈশা ও ফজর আদায় করেন। অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।

যদি হাজী আরাফার রাত্র মক্কায় যাপন করে আর সেখানেই ফজর পড়ে অতঃপর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় এবং মিনা দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা এই দিনে মিনায় হজ্জের কোন ক্রিয়াকর্ম নেই। তবে রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর সুন্নত অনুসরণ না করার কারণে সে মন্দ কাজ করল।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অতঃপর আরাফা অভিমুখে রওয়ানা হবে এবং সেখানে অবস্থান করবে। এর দলীল হলো আমাদের পূর্ব বর্নিত হাদীছ।

এ হলো উত্তমতার বিবরণ। তবে কেউ যদি মীনা থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বেই চলে যায় তাহলে তা জাইয। কেননা এই স্থানের সংগে তার পালনীয় আর কোন হুকুম নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাব্সূত কিতাবে বলেছেন, আরাফা মাঠে লোকদের সাথে অবস্থান করবে। কেননা, আলাদা অবস্থানে অহংকার প্রকাশ পায়। অথচ অবস্থা হলো বিনয় প্রকাশের। আর সমাবেশের মাঝে দু'আ কবুলের আশা অধিক। কোন কোন মতে লোকদের সাথে বসার উদ্দেশ্য চলাচলের পথে অবতরণ না করা, যাতে চলাচলকারীদের অসুবিধা না হয়।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, সূর্য যখনই হেলে পড়বে তখন ইমাম লোকদের নিয়ে যুহর ও আসর পড়বেন। তিনি প্রথমে খুতবা পাঠ করবেন। আর খুতবায় লোকদের আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান, কংকর নিক্ষেপ, কুরবাণী, মাথা মুড়ানো এবং তাওয়াফে যিয়ারত করার নিয়মাবলী শিক্ষা দান করবেন। দু'টি খুতবা দিবেন। উভয়

http://islaminonesite.wordpress.com/

খুতবার মধ্যে একটি বৈঠকের দ্বারা পার্থক্য করবেন। রাসূলুল্লাহ্(সা.) এরূপ কথা করেছেন।

আর ইমাম মালিক(র.) বলেন, সালাতের পর খুতবা প্রদান করবেন। কেননা, এটা ওয়ায ও উপদেশের খুতবা। সুতরাং তা ঈদের খুতবার সদৃশ।

আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর যে আমল আমরা বর্ণনা করেছি।

তা ছাড়া এই জন্য যে, এ খুতবার উদ্দেশ্য হলো হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দেওয়া। আর এ দুই সালাত একত্রে আদায় করা উক্ত আমলসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

যাহিরী মাযহাব অনুযায়ী ইমাম যখন মিম্বরে আরোহণ করেন এবং উপবেশন করেন তখন মুআয্যিনগণ আযান দিবেন। যেমন জুমুআর জন্য দেওয়া হয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইমাম বের হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া হবে। তার পক্ষ থেকে বর্নিত আরেকটি মতে খুতবার পরে আযান দিবে। আ বিশুদ্ধ হলো আমরা যা উল্লেখ করেছি। কেননা নবী করীম(সা.) যখন বের হলেন এবং নিজ উটনীর উপর আরোহণ করলেন তখন মুআয্যিনগণ তার সামনে আযান দিয়েছিলেন।

ইমাম খুতবা থেকে ফারিগ হওয়ার পর মুআয্যিন ইকামত বলবেন। কেননা এই হলো সালাত শুরু করার সময়। সুতরাং তা জুমুআর সদৃশ।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, আর ইমাম লোকদের নিয়ে যুহরের ওয়াকতের মধ্যে এক আযান ও দুই ইকামাতসহ যুহর ও আসরের সালাত আদায় করবেন।

হাদীছ বর্ণনাকারিগণ ঐকমত্য অনুযায়ী দুই সালাত একত্র করা সম্পর্কিত বহু হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

জাবির(রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী করীম(সা.) উক্ত দুই সালাত এক আযান ও দুই ইকামাত দ্বারা আদায় করেছেন।

আবার বর্ণনা দিয়েছেন যে, প্রথমে যুহরের জন্য আযান দিবে এবং যুহরের জন্য ইকামাত বলবে, অতঃপর আসরের জন্য ইকামাত বলবে। কেননা আসরের সালাত

http://islaminonesite.wordpress.com/

কে তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং মানুষের অবগতির জন্য আলাদা ইকামাত বলবে।

উভয় সালাতের মাঝে কোন নফল পড়বে না। উকুফের উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য। এ কারণেই আসরকে তার নির্ধারিত সময় থেকে এগিয়ে আনা হয়েছে।

যদি কেউ নফল আদায় করে, তাহলে সে মাকরূহ কাজ করল এবং যাহিরী রিওয়ায়াত অনুযায়ী আসরের সালাতের জন্য দ্বিতীয় আযান দিতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) থেকে অবশ্য ভিন্নমত বর্ণিত হয়েছে। কেননা নফল বা অন্য কোন আমলে নিয়োজিত হওয়া প্রথম আযানের সংযুক্তি নষ্ট করে দেয়। সুতরাং আসরের জন্য পুনরায় আযান দিতে হবে।

যদি খুতবা ছাড়া সালাত আদায় করে তাহলে সালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা এ খুতবা ফরয নয়।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের অবস্থান থেকে একা যুহর পড়বে, সে আসরের সালাত আসরের ওয়াকতেই আদায় করবে।

এটি হলো আবূ হানীফা(র.) এর মত। আর সাহেবাইন বলেন, মুনফারিদও উভয় সালাত একত্রে আদায় করবেন। কেননা উকুফকে প্রলম্বিত করার প্রয়োজনে একত্র করার বৈধতা এসেছে। আর মুনফারিদেরও সে প্রয়োজন রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, কুরআনের বাণী দ্বারা সালাতের ওয়াক্তের হিফাজত করা ফরয। সুতরাং যে ব্যাপারে শরীআতের বিধান এসেছে, এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এ ফরয তরক করা জাইয হবে না। আর তা হলো ইমাম ও জামা'আতের সংগে উভয় সালাতকে একত্র করা।

আসরকে অগ্রবর্তী করার কারণ হলো জামা'আত সংরক্ষণ করা। কেননা সকলে যার যার উকুফের স্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আসরের জন্য পুনরায় একত্র হওয়া কঠিন হবে। সাহেবাইন একত্র করার যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা নয়। কেননা (নামায ও উকুফের মাঝে তো) বিরোধ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে উভয় সালাতের জন্যই ইমামের উপস্থিতির শর্ত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম যুফার (র.) বলেন, শুধু আসরের জন্য এ শর্ত। কেননা আসরকেই তার নির্ধারিত সময় থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। হজ্জের ইহরাম সম্পর্কেও একই মত ভিন্নতা রয়েছে।

তবে এক বর্ণনা মতে হজ্জের ইহরাম যাওয়ালের পূর্বে হওয়া জরুরী। যাতে(উভয় সালাত) একত্র করার ওয়াক্ত আসার পূর্বে ইহরাম বিদ্যমান থাকে। অন্য বর্ণনা মতে সালাতের উপর অগ্রবর্তী করাই যথেষ্ট। কেননা সালাত হলো উদ্দেশ্য।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অতঃপর ইমাম উকুফের স্থানের অভিমুখী হবেন এবং জাবালের নিকটে অবস্থান করবেন। আর লোকেরাও সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পরই ইমামের সংগে অবস্থান করবে। কেননা নবী করীম(সা.) সালাত থেকে ফারিগ হওয়ার পর উকুফের স্থানের অভিমুখে গমন করেছেন। উক্ত পাহাড়কে ‘জাবালে রাহমাত’ বলে। আর উকুফের এ স্থান হল উকুফের প্রধান স্থান।

ইমাম কুদূরী (র.) বলেন, বাতনে উরানাহ ছাড়া সমগ্র আরাফাত হলো উকুফের স্থান। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- সমগ্র আরাফা উকুফের স্থান। তবে বাতনে উরানাহ থেকে দূরে থাকবে। তদ্রুপ সমগ্র মুহাসসার থেকে দূরে থাকবে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, ইমামের কর্তব্য হলো আরাফার সওয়ারির উপর অবস্থান করা। কেননা নবী(সা.) তার উস্ট্রী উপর অবস্থান করেছিলেন।

তবে পায়ের উপর দাড়িয়ে অবস্থান করলেও জাইয হবে। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছটির কারণে প্রথম সুরতটি উত্তম।

কেবলামুখী হয়ে অবস্থান করা উচিত। কেননা, নবী করীম (সা.) এরূপই উকুফ করেছিলেন এবং তিনি বলেছেন- উত্তম উকুফ হলো যা কিবলা মুখী হয়ে করা হয়।

আর তিনি দু’আ করবেন এবং মানুষকে হজ্জের আহকাম শিক্ষা দিবেন। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) আরাফা দিবসে হস্ত প্রসারিত করে দু’আ করতেন যেন এক মিসকীন আহার প্রার্থনা করছেন।

আর ইচ্ছা অনুযায়ী দু’আ করবেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদিও কিছু কিছু দু'আ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এবং সেগুলোর বিশদ বিবরণ আমি কিতাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীক বলে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, মানুষের কর্তব্য হলো ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করা। কেননা তিনি তো দু'আ করবেন এবং শিক্ষা দান করবেন। ফলে লোকেরা তা শুনতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

আর এ-ও তাদের উচিত যে, ইমামের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করবে। যাতে তারা কেবলামূখী হতে পারে। এটা হলো উত্তমতার বিবরণ। কেননা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, সমগ্র আরাফা হলো উকূফের স্থান। ইমাম কুদূরী(র.) বলেন-

আরাফায় অবস্থানের পূর্বে গোসল করা এবং খুব মনোযোগ সহকারে দু'আ করা মুস্তাহাব।

গোসল করা সুন্নাত। ওয়াজিব নয়। সুতরাং যদি শুধু উযূই করে তাহলেও জাইয হবে, যেমন জুমুআ, দুই ঈদ, ও ইহরামের সময়। আর খুব মনোযোগ দিয়ে দু'আ করা এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্(সা.) এই অবস্থান ক্ষেত্রে আপন উম্মতের জন্য অতি মনোযোগ দিয়ে দু'আ করেছিলেন। তখন খুন-খারাবী ও যুলুমের অপরাধ ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তার দুআ কবুল করা হয়েছে।

আর উকুফের স্থানে মুহূর্তের পর মুর্হুতে তালবিয়া পড়তে থাকবে।

ইমাম মালিক(র.) বলেন, আরাফায় উকুফের সাথে সাথেই তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। কেননা মৌখিক সাড়াদানের সময় হলো রুকনসমূহের ব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর আমাদের দলীল হলো এই মর্মে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম(সা.) জামরাতুল আকাবায় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত লাগাতার তালবিয়া পড়েছেন।

তাছাড়া হজ্জের তালবিয়া হলো সালাতের তাকবীরের ন্যায়। সুতরাং ইহরামের শেষ ভাগ পর্যন্ত তা বলবে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন- সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ইমাম এবং তার সংগে অন্যান্য লোকের ধীর-স্থির যাত্রা করে মুযদালিফায় আগমন করবে। কেননা নবী করীম(সা.) সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হয়েছিলেন। তাছাড়া এতে মুশরিকদের প্রতি বিরোধিতা

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রকাশ করা হয়। আর নবী করীম(সা.) পথে তার সওয়ারিতে ধীর-স্থিরভাবে চলতেন।

আর যদি ভিড়ের আশংকায় ইমামের পূর্বে সে যাত্রা করে কিন্তু আরাফার সীমানা অতিক্রম না করে তাহলে তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা সে তো আরাফা ত্যাগ করেনি। তবে উত্তম এই জন্য যে, নিজের স্থানেই সে অবস্থান করবে, যদি সে যথাসময়ের পূর্বে যাত্রা শুরুকারী না হয়।

আর যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার এবং ইমামের যাত্রা করার পর ভিড়ের আশংকায় সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আইশা (রা.) ইমামের যাত্রা করার পর পানীয় চেয়ে পাঠালেন এবং ইফতার করলেন এরপর রওয়ানা হলেন।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন- মুযদালিফায় আসার পর মুস্তাহাব হলো ঐ পাহাড়ের কাছাকাছি অবস্থান গ্রহণ করা, যার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করা হতো। ঐ পাহাড়ের নাম কুযাহ। কেননা নবী করীম(সা.) এই পাহাড়ের নিকট অবস্থান করেছিলেন। তদ্রুপ উমর(রা.) ও (অবস্থান করেছিলেন)। চলাচলের পথে অবস্থান করা পরিহার করবে, যাতে চলাচলকারীদের কষ্ট না হয়। সুতরাং পথের ডানে কিংবা বামে অবস্থান করবে।

আরাফায় অবস্থান প্রসংগে যে কথা আমরা বলেছি, সেই একই কারণে (মুযদালিফায়ও) ইমামের কাছাকাছি অবস্থান করবে।

ইমাম কুদূরী বলেন- ইমাম এক আযান ও এক ইকামতে লোকদের নিয়ে মাগরিব ও 'ঈশার সালাত আদায় করবেন।

ইমাম যুফার (র.) এক আযান ও দুই ইকামতের কথা বলেছেন, আরাফায় দুই সালাত একত্র করা উপর কিয়াস করে।

আমাদের দলীল হলো জাবির(রা.) এর বর্ণনা যে, নবী করীম (সা.) এক আযান ও এক ইকামাতে উভয় সালাত একত্রে আদায় করেছিলেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাছাড়া এই জন্য যে, 'ঈশার সালাত তার নিজ ওয়াক্তে আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং অবহিত করার জন্য আলাদা ইকামতের প্রয়োজন নেই। আরাফায় আসরের সালাত এর বিপরীত। কেননা সেটাকে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং অতিরিক্ত ঘোষণার জন্য আলাদা ইকামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আর উভয় সালাতের মাঝে নফল পড়বে না। কেননা তা উভয় সালাতের একত্রতায় ত্রুটি সৃষ্টি করবে।

আর যদি নফল পড়ে কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত হয় তাহলে ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কারণে পুনরায় ইকামতে দিবে। আযানও পুনরায় দেওয়া উচিত ছিল, যেমন প্রথম একত্রীভূত সালাতের বেলায় (অর্থাত্ আরাফায়) তবে আমরা শুধু ইকামাত পুনরায় দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করেছি, এই জন্য যে, নবী করীম(সা.) থেকে বর্ণিত আছে- মুযদালিফায় মাগরিবের সালাত পড়েছেন এরপর রাতের খাবার খেয়েছেন এরপর ঈশার সালাতের জন্য (শুধু) আলাদা ইকামাত দিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে এই একত্রীকরণের জন্য জামাআতের শর্ত নেই। কেননা মাগরিবকে তার নিজ ওয়াকত থেকে বিলম্বিত করা হয়েছে। আরাফায় একত্রীকরণের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তথায় আদায়কে তার নিজ ওয়াক্ত থেকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি পথে মাগরিবের সালাত আদায় করবে, সে সালাত তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

এটি ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর মত। ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) বলেন, এ সালাতই তার জন্য যথেষ্ট হবে। তবে সে মন্দ কাজ করল। একই মতভিন্নতা রয়েছে যদি মাগরিবের সালাত আরাফায় পড়ে থাকে।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) এর দলীল এই যে, সে তো উক্ত সালাত তার ওয়াকতেই আদায় করেছে। সুতরাং পুনরায় তা আদায় করা ওয়াজিব হবে না। যেমন ফজর

http://islaminonesite.wordpress.com/

উদিত হওয়ার পরে আদায় করলে। তবে যেহেতু বিলম্ব করা সুন্নত ছিল, সেহেতু তা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ(র.) এর দলীল হলো নবী (সা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ। তিনি উসাম (রা.) কে মুযদালিফার পথে বলেছেন- (সালাত তোমার সম্মুখে) এর অর্থ সালাতের ওয়াক্ত। এ কথা এদিকেই ইংগিত প্রদান করে যে, বিলম্ব করা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, যাতে মুযদালিফায় দুই সালাত একত্র করা সম্ভব হয়। সুতরাং যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়, ততক্ষণ পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে, যাতে সে উভয় সালাতের মাঝে একত্রকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে ফজর উদিত হয় পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে যাতে সে উভয় সালাতের মাঝে একত্রকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে ফজর উদিত হয়ে গেলে তো একত্র করা সম্ভব নয়। সেহেতু পুনরায় আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যখন ফজর উদিত হবে তখন ইমাম অন্ধকারেই লোকদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করবে। কেননা ইব্ন মাসঊদ(রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) সে দিন ফজর অন্ধকারে পড়েছিলন।

তাছাড়া এই জন্য যে, অন্ধকারে ফজর পড়ার মাঝে উকুফের (মুযদালিফায় অবস্থানের) প্রয়োজন পূর্ণ হয়। (কেননা ফজরের পরই হলো মুযদালিফায় অবস্থানের সময়)। সুতরাং তা জাইয হবে। যেমন আরাফায় আসার অগ্রবর্তী করা হয়।

অতঃপর ইমাম উকুফ করবেন এবং লোকেরা তার সংগে উকুফ করবে। তারপর তিনি দু'আ করবেন। কেননা নবী (সা.) এই স্থানে উকুফ করে দু'আ করেছিলেন। কেননা ইব্ন 'আব্বাস(রা.) এর হাদীছে বর্ণিত আছে যে, এখানে উম্মতের জন্য তার দু'আ কবূল করা হয়। এমনকি হত্যা করা এবং যুলুম করার অপরাধের ব্যাপারেও।

আমাদের মতে এ উকুফ হলো ওয়াজিব, রুকন নয়। তাই কোন ওযর ছাড়া তা তরক করলে কম ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিঈ(র.) একে রকুন বলেন, কেননা

http://islaminonesite.wordpress.com/

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- মাশআরুল হারামের নিকট আল্লাহ্র স্মরণ কর); এই ধরনের আদেশ দ্বারা রুকন সাব্যস্ত হয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী(সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তার পরিবারের দুর্বল লোকদের আগেভাগে রাত্রেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তা রুকন হতো তাহলে তিনি তা করতেন না।

আর ইমাম শাফিঈ(র.) যে আয়াত পেশ করেছেন, তাতে 'যিকির' শব্দটি রয়েছে। আর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, যিকির রুকন নয়।

আমরা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি জেনেছি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে- আমাদের সংগে এই অবস্থান ক্ষেত্রে অবস্থান করল এবং সে ইতোপূর্বে আরাফা থেকে উকুফ করে এসেছে, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ্(সা.) হজ্জের পূর্ণতাকে এই উকুফের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এবার তা ওয়াজিবের আলামত হওয়ার যোগ্য। তবে যদি ওযর , যেমন দুর্বলতা বা অসুস্থতা অথবা স্ত্রী লোক ভীড়ের কারণে তাকে তরক করে থাকে, তাহলে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, ওয়াদি মুহাস্সার ছাড়া সমগ্র মুযদালিফাই উকুফের স্থান।

দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যখন সূর্য উদিত হবে, তখন ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা রওয়ানা হয়ে মিনায় আগমন করবে।

নগণ্য বান্দা (অর্থাত্ গ্রন্থকার স্বয়ং) বলে- আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করুন- মুখতা ছারুল কুদুরীর বিভিন্ন নুসখায় এরূপই রয়েছে। কিন্তু এটা ভুল। সঠিক এই যে, যখন 'ইসফার' অর্থাত্ ফর্সা হয়ে যাবে, তখনই ইমাম ও অন্যান্য লোকেরা রওয়ানা দিবে। কেননা নবী করীম(সা.) সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা দিয়েছিলেন।

ইমাম কুদুরী (র.) বলেন, অতঃপর জামরাতুল আকাবা থেকে শুরু করবে। অর্থাত্ বাতনুল ওয়াদির দিক থেকে উক্ত জামরাহ্র প্রতি আংগুলের মাথায় রেখে ছুড়ে মারার মত ছোট ছোট সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। কেননা নবী করীম (সা.) যখন মিনার আগমন করলেন, তখন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত কোথাও

http://islaminonesite.wordpress.com/

নামেননি। এবং তিনি বলেছেন- তোমরা আংগুলের মাথায় রেখে ছুড়ে মারার মত ছোট ছোট কংকর নাও, যাতে তোমাদের একে অপরকে আঘাত না দেয়।

যদি এর চাইতে বড় কংকর নিক্ষেপ করে তা হলেও জাইয হবে। কেননা রামীর (নিক্ষেপের) উদ্দেশ্য তো হাসিল হয়ে যায়। তবে বড় পাথর মোটেও নিক্ষেপ করবে না, যাতে অন্য কেউ তা দ্বারা কষ্ট না পায়।

যদি আকাবার উপরে দিক থেকে নিক্ষেপ করে তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা তার চারিপার্শ্বই সংশ্লিষ্ট আমল আদায় করার স্থান। আমাদের বর্ণিত হাদীছের আলোকে বাতনুল ওয়াদি থেকে হওয়াই উত্তম।

প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে তাকবীর বলবে। ইব্‌ন মাস'ঊদ(রা.) ও ইব্‌ন উমর (রা.) এরূপ বর্ণনা করেছেন।

যদি তাকবীরের স্থলে তাসবীহ পড়ে তবুও যথেষ্ট হবে। কেননা, এতে যিকির হাসিল হয়ে যায়। আর যিকিরই হলো কংকর নিক্ষেপের আদব।

আর এ স্থানে বিলম্ব করবে না। কেননা নবী করীম(সা.) এখানে বিলম্ব করেন নি।

প্রথম কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে।

আমাদের দলীল, ইতোপূর্বে উল্লেখিত ইব্‌ন মাস'ঊদ(রা.) বর্ণিত হাদীছে একথা রয়েছে।

আর জাবির (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম(সা.) জামরাতুল আকাবায় প্রথম কংকরটি নিক্ষেপের সময় তালবিয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কংকর নিক্ষেপের নিয়ম এই যে, ডান হাতের বৃদ্ধাংগুলির পৃষ্ঠে কংকর স্থাপন করবে এবং শাহাদাত আংগুলির সাহায্যে নিক্ষেপ করবে। নিক্ষেপের দূরত্বের পরিমাণ এই যে, নিক্ষেপের স্থান এবং কংকর পড়ার স্থানের মাঝে পাচ হাত দূরত্ব হবে। হাসান(র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। কেননা এর কম পরিমাণে নিক্ষেপ হবে না, (বরং) ফেলে দেয়া হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে দেয়, তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা এটা পায়ের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। তবে সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণের কারণে সে গুনাহ্গার হবে।

আর যদি জামরার উপর কংকর রেখে দেয়, তবে যথেষ্ট হবে না। কেননা তা-তো রামী হলো না।

যদি কংকর নিক্ষেপ করে আর তা জামরাহ্র নিকট গিয়ে পড়ে, তাহলেও জাইয হবে। কেননা এই পরিমাণ থেকে বেচে থাকা সম্ভবপর নয়।

যদি জামরাহ্ থেকে দূরে গিয়ে পড়ে, তাহলে তা যথেষ্ট হবে না। কেননা কংকর নিক্ষেপ নির্দিষ্টস্থান ছাড়া ইবাদত রূপ গণ্য নয়।

যদি সাতটি কংকর একত্রে নিক্ষেপ করে, তাহলে তা একবার গণ্য হবে। কেননা শরীআতের স্পষ্ট নির্দেশ হলো কাজটি পৃথক ভাবে করা।

কংকর যে কোন স্থান থেকে ইচ্ছা সংগ্রহ করবে। তবে জামরাহ্র নিকট থেকে নয়। কেননা, তা মাকরূহ হবে। কারণ জামরাহর নিকটে পতিত কংকরগুলো হল প্রত্যাখ্যাত। হাদীছে এরূপই এসেছে। সুতরাং এগুলো কুলক্ষণ রূপে বিবেচিত । তা সত্ত্বেও যদি তা করে তবে যথেষ্ট হবে। রামীর কর্ম বিদ্যমান থাকার কারণে।

মৃত্তিকার যে কোন আংশ বিশেষের দ্বারা রামী জাইয।

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (তার মতে কংকর ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জাইয হবে না) কেননা রামী ক্রিয়াই হলো উদ্দেশ্য। আর তা মাটির দ্বারাও হাছিল হয়, যেমন পাথর দ্বারা হাছিল হয়।

আর সোনা বা রূপার টুকরা দ্বারা রামীর হুকুম এর বিপরীত। কেননা একে ছিটানো বলা হয়, রামী নয়।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন,তারপর আগ্রহ থাকলে কুরবানী করবে। তারপর মাথা মুড়াবে কিংবা ছাটাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন- আমাদের আজকের দিনে প্রথম কাজ হলো রামী করা, তারপর কুরবানী করা তারপর মাথা মুড়ানো।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাছাড়া মাথা মুড়ানো হলো হালাল হওয়ার (অর্থাত্ ইহরামমুক্ত হওয়ার) অন্যতম উপায়। তদ্রুপ যাব্হ করাও একটি উপায়। তাইতো অবরুদ্ধ ব্যক্তি ‘যাবহ্’ এর মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। সুতরাং কংকর মারাকে উভয়ের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর মাথা মুড়ানো হলো ইহরামের নিষিদ্ধ কার্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং কুরবানীকে তার উপর অগ্রবর্তী করা হবে।

কুরবানীকে তার আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, হজ্জে ইফরাদকারী যে, কুরবানী করে, তা হল নফল; আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে ইফরাদকারী সম্পর্কে।

আর মাথা মুড়ানো উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তিন বার বলেছেন- (আল্লাহ্ হলককারীদের প্রতি রহম করুন) হাদীছটিতে অধিক বার হলককারীদের প্রতি রহমের দু’আ করা হয়েছে।

তাছাড়া হলক হলো ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকর। আর তা-ই হলো উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে চুল ছাটার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। সুতরাং তা (ছাটার তুলনায় মুড়ানো) উযূর তুলনায় গোসলের সদৃশ হলো। হলকের ক্ষেত্রে মাথার চার ভাগের এক ভাগই যথেষ্ট হবে।

‘মাথা মাস্হ’ এর উপর কিয়াস করে একথা বলা হয়। তবে পুরো মাথা মুড়ানোই উত্তম রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর অনুসরণে।

চুল ছাটার নিয়ম হলো চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আংগুল পরিমাণ ছেটে ফেলা। এরপর তার জন্য স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সব কিছু হালাল হয়ে গেছে।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, তবে ‘খুশবু’ ও ছাড়া। কেননা তা সহবাসের প্রতি আকর্ষণকারী।

আমাদের দলীল হলো এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বাণী- স্ত্রী সহবাস ছাড়া আর সব কিছু তার জন্য হালাল হয়ে গেছে। আর হাদীছ কিয়াসের উপর অগ্রগণ্য।

আমাদের মতে লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যভাবে সহবাস করা তার জন্য হালাল নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আমাদের দলীল হল, এটাও তো স্ত্রী দ্বারা শাহওয়াত পুরা করার অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং পূর্ণ হালাল হওয়া পর্যন্ত তা বিলম্বিত করা হবে।

আমাদের মতে হালাল হওয়ার জন্য কংকর নিক্ষেপ কোন উপায় নয়। ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, হলকের ন্যায় এটাও কুরবানীর দিনের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ইহরামমুক্ত করার ক্ষেত্রে এটা হলকের সমপর্যায়ের।

আমাদের দলীল এই যে, যেটা ইহরাম মুক্তকারী হবে, সেটা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। যেমন মাথা মুড়ানোর বিষয়টি। অথচ রামী তো অপরাধ রূপে বিবেচিত নয়। তাওয়াফের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা পূর্ববর্তী হলফ দ্বারা হালা হয়ে গেছে, তাওয়াফ দ্বারা নয়।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, অতঃপর সেই দিন কিংবা তার পরের দিন কিংবা তার পরবর্তী দিন মক্কায় গমন করবে; এবং সাত চক্কর বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফে যিয়ারত করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) যখন মাথা মুড়ালেন, তখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানে যুহরের সালাত আদায় করলেন। আর তাওয়াফ যিয়ারতের সময় হলো কুরবানীর দিনগুলো। (দশ, এগার ও বার তারিখ)।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াফকে 'যবাহ্' এর উপর সংযুক্ত করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- (অনন্তর তোমরা তা থেকে আহার কর)। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেছেন- (আর তারা যেন তাওয়াফ করে)। সুতরাং উভয়টির সময় একই হবে।

আর তাওয়াফের প্রথম সময় হলো ইয়াওমুন্-নহরের ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে। কেননা এর পূর্বে রাত্রের যে সময় রয়েছে, তা হলো আরাফায় অবস্থানের সময়। আর তাওয়াফ হলো তার পরবর্তী পর্যায়ে।

আর এ দিনগুলোর মাঝে (তাওয়াফের জন্য) সবোত্তম হলো প্রথম দিন, যেমন কুরবানীর বেলায়। এবং হাদীছ শরীফে রয়েছে তন্মোধ্যে সর্বোত্তম হলো প্রথম দিনটি।)

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি তাওয়াফুল কুদুমের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে থাকে, তাহলে এই তাওয়াফে রামাল করবে না। এবং তার উপর সাঈও নেই। আর যদি পূর্বে সাঈ না করে থাকে তাহলে এই তাওয়াফ রামাল করবে এবং তারপরে সাঈ করবে। কেননা হজ্জের মধ্যে সাঈ শুধু একবার ব্যতীত শরীআত প্রমণিত নয়। আর রামাল শুধু ঐ তাওয়াফ একবার প্রমাণিত, যার পরে সাঈ রয়েছে।

আর এই তাওয়াফের পরও দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। কেননা আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী প্রতিটি তাওয়াফের সমাপ্তি হবে দুই রাকাআত সালাতের দ্বারা। তাওয়াফ ফরয হোক বা নফল।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, আর এ তাওয়াফই হজ্জের ফরয তাওয়াফ এবং তা হজ্জের রুকন। কেননা এ তাওয়াফই হলো নির্দেশিতত আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে- (তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে) । আর একে এবং ও বলা হয়।

আর তাওয়াফে যিয়ারাতকে এই দিনগুলো থেকে বিলম্বিত করা মাকরূহ। কেননা আমরা বলে এসেছি যে, এই তাওয়াফ এই দিনগুলোর সময়ের সাথে সীমিত। যদি এই দিনগুলো থেকে বিলম্বিত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। জিনায়াত (হজ্জের ত্রুটি বিষয়ক) অধ্যায়ে ইনশাল্লাহ্ আমরা তা আলোচনা করবো।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অতঃপর মিনায় ফিরে এসে সেখানেই অবস্থান করবে। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, নবী করীম(সা.) মিনায় ফিরে এসেছিলেন। তাছাড়া এই জন্য যে, তার যিম্মায় রামী রয়ে গেছে, আর রামীর স্থান হলো মিনা।

কুরবানীর তিনদিনের দ্বিতীয় দিনে যখন সূর্য হেলে পড়বে, তখন তিনটি জামারায় রামী করবে। মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী জামরাহ থেকে শুরু করবে। সে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কংকরের সাথে তাকবীর বলবে। এবং সেখানে একটু থামবে। এবং সেখানেও একটু থামবে। অতঃপর জামরাতুল আকাবায় রামী করবে। একইভাবে রামী করবে। কিন্তু সেখানে থামবে না।

রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর হজ্জের আমলসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করার সময় জাবির (রা.) এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

উভয় জামরাহ্র নিকট ঐ স্থানে দাড়াবে, যেখানে লোকেরা দাড়ায় এবং আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ-সানা করবে। তাহলীল তাকবীর বলবে, এবং নবী করীম (সা.) এর উপর দরুদ পড়বে। আর নিজের যাবতীয় প্রয়োজনের জন্য দু'আ করবে। (দু'আয় উভয় হাত কাধ পর্যন্ত উঠাবে) কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সাতটি স্থান ব্যতীত যেন হাত তোলা না হয়। তন্মোধ্যে দুই জামরাহ্র নিকটের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর হাত তোলার মানে দু'আর জন্য হাত তোলা।

এই অবস্থান ক্ষেত্রসমূহে ইমামের কর্তব্য হলো দু'আর সময় সকল মু'মিনের জন্য ইস্তিগফার করা। কেননা নবী করিম (সা.) বলেছেন-

হে আল্লাহ্, হাজীকে ক্ষমা করুন এবং হাজী যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকে ক্ষমা করুন।

মূলনীতি এই যে, যে রামীর পরে আরেকটি রামী রয়েছে, সে রামীর পরে থামবে। কেননা এটা হলো ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়। সুতরাং এসময় দু'আ করাই সমীচীন আর যে রামীর পরে আর কোন রামী নেই, তার পরে থামবে না, কেননা ইবাদত শেষ হয়ে গেছে। এ জন্যই ইয়াওমুন্-নহরেও জামরাতুল আকাবার পরে থামবে না।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, এর পরবর্তী দিন সূর্য হেলে পড়ার পর একই ভাবে তিনটি রামী করবে। অতঃপর যদি মীনা থেকে জলদী চলে যেতে চায়, তাহলে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। আর যদি মিনায় থেকে জলদী চলে যেতে চায়, তাহলে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করবে। আর যদি মিনায় অবস্থান করতে চায়, তাহলে চুতর্থ দিন সূর্য হেলে পড়ার পর তিনটি রামী করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি দু'দিনের মাথায় জলদী চলে যেতে চায়, তার কোন গুনাহ নেই। আবার যে বিলম্ব করতে চায়, তারও কোন গুনাহ নেই। এ বিধান ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে।

তবে উত্তম হলো মিনায় অবস্থান করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) চতুর্থ দিনও অপেক্ষা করেছেন, তিনটি জামরাহ্র রামী করা পর্যন্ত।

চতুর্থ দিনের ফজর উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার জন্য যাত্রা করার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু ফজর উদিত হওয়ার পর যাত্রা করার অবকাশ নেই। কেননা রামী

http://islaminonesite.wordpress.com/

করার ওয়াকত এসে যাওয়ার কারণে। তবে এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

যদি এই দিনে (অর্থাত্ চতুর্থ দিনে) ফজর উদিত হওয়ার পর যাওয়ালের পূর্বে রামী করে ফেলে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)- এর মতে তা জাইয হবে। এ হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা।

অন্যান্য দিনের উপর কিয়াস করে সাহেবাইন বলেন, তা জাইয হবে না। কেননা অন্যান্য দিনের সাথে পার্থক্য ছিলো শুধু (মক্কা অভিমুখে) যাত্রার নিয়মের সংগে যুক্ত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মাযহাব ইব্ন 'আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই জন্য যে, রামী না করার ক্ষেত্রেই যখন শিথিলতার ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া আরো স্বাভাবিক। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ঐ দু'টি দিনে যাওয়ালের পরে ছাড়া রামী জাইয নয়। কেননা দিন দু'টিতে রামী ত্যাগ করা বৈধ নয়। সুতরাং তা বর্ণিত মূল অবস্থার উপর বহাল থাকবে।

কুরবানীর দিন রামীর প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার সময় থেকে।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, রামীর প্রথম ওয়াক্ত হলো মধ্যরাতের পর থেকে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করিম(সা.) রাখালদের রাতে রামী করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমাদের দলীল হলো নবী করীম(সা.) এর বাণী- তোমরা ভোরে উপনীত হওয়া ছাড়া জামরাতুল আকাবার রামী করবে না। অন্য রিওয়ায়াত রয়েছে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে রামী করবে না।

সুতরাং প্রথম বর্ণনা দ্বারা মূল ওয়াক্ত সাব্যস্ত হবে, আর দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা উত্তম হওয়া সাব্যস্ত হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ(র) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্র। তাছাড়া এই জন্য যে, ইয়াওমুন-নহরের রাত্র হলো মুযদালিফায় অবস্থানের রাত্র। আর রামী তো উকুফের পরবর্তী পর্যায়ে। সুতরাং অনিবার্যভাবেই রামীর ওয়াক্ত উকুফের পরেই হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে (রামীর) এই সময় সূর্যাস্ত প্রলম্বিত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- নিশ্চয়! এই দিনে আমাদের প্রথম আমল হলো রামী।

এখানে পূর্ণ দিবসকেই রামীর সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর দিবস শেষ হয় সূর্যাস্তের মাধ্যমে।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যাওয়ালের সময় পর্যন্ত তা প্রলম্বিত হবে। আমাদের বর্ণিত হাদীছটি হলো তার বিপক্ষে প্রমাণ।

যদি রাত্র পর্যন্ত বিলম্ব করে তবে রাত্রেই রামী করবে। এজন্য তার উপর কোন দম নেই।

প্রমাণ হলো (ইতোপূর্বে বর্ণিত) রাখালদের অনুমতি সংক্রান্ত হাদীছ।

যদি আগামী দিন পর্যন্ত বিলম্ব করে তাহলে আগামী দিনেই রামী করবে। কেননা তা মৌলিকভাবে রামীর সময় ।

তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে রামীকে তার নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত করার কারণে। আর এ-ই হলো তার মাযহাব।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যদি সওয়ার অবস্থায় রামী করে, তাহলে যথেষ্ট হবে। কেননা, কংকর নিক্ষেপের আমল তো হাছিল হয়েছে।

আর যে রামীর পর আরেকটি রামী রয়েছে, সেক্ষেত্রে উত্তম হলো পায়ে হেটে রামী করা। আর যে রামীর পরে রামী নেই, সেক্ষেত্রে সওয়ার অবস্থায় রামী করতে পারে। কেননা, প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে রামীর পরে অবস্থান ও দু'আ রয়েছে, যেমন আমরা পূর্বে

http://islaminonesite.wordpress.com/

উল্লেখ করে এসেছি। সুতরাং পায়ে হেটে রামী করবে, যাতে তা বিনয় প্রকাশের অধিকতর নিকটবর্তী হয়।

উত্তমতার বিষয়টি ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কংকর নিক্ষেপের রাত্রগুলো মিনায় অবস্থান না করা মাকরূহ। কেননা, নবী(সা.) মিনাতেই রাত্রি যাপন করেছেন। আর উমর(রা.) মিনাতে না থাকার কারণে শাস্তি দিতেন।

যদি স্বেচ্ছায় (বিনা ওযররে) অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, তাহলে আমাদের মতে তার উপর কোন দন্ড আসবে না।

ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের যুক্তি এই যে, কেননা রাত্রগুলো মিনায় অবস্থান সাব্যস্ত হয়েছে, যাতে দিনগুলোতে রামী করা সহজ হয়। সুতরাং এই অবস্থান হজ্জের অন্তর্ভূক্ত আমল নয়। সুতরাং তা তরক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করবে না।

আর এটা মাকরূহ যে, কেউ তার সামা-পাত্র আগেভাগে মক্কায় পাঠিয়ে দেয় এবং মীনায় অবস্থান করে রামী করা পর্যন্ত। কেননা বর্ণিত আছে যে, উমর(রা.) এরূপ করতে নিষেধ করতেন এবং এজন্য শাস্তি দিতেন।

আর এ জন্য যে, তার মন সে দিকে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। যখন মক্কার দিকে যাত্রা করবে, তখন মুহাছ্‌ছাব অর্থাত্‌ আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করবে।

এটা একটা জায়গার নাম, যেখানে রাসূলুল্লাহ্‌(সা.)অবতরণ করেছিলেন। আর তার অবতরণ ছিলো ইচ্ছাকৃত। এ-ই বিশুদ্ধ মত। তাই এখানে অবস্থান করা সুন্নাত হবে। যেমন বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) সাহাবায়ে কিরামকে বলেছিলেন, আগামীকাল আমরা খায়ফে বনী কানানা-তে অবতরণ করবো, যেখানে মুশরিকরা তাদের শিরকের উপর থাকার পরস্পর শপথ নিয়েছিল।

তিনি একথা বলে বনূ হাশিমকে বর্জনের ব্যাপারে তাদের চরম তৎপরতার প্রতি ইংগিত করেছিলেন। সুতরাং আমরা জানলাম যে, তিনি তার প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ মুশরিকদের দেখানোর ইচ্ছা করেছিলেন। সুতরাং তাওয়াফের রামালের ন্যায় এটিও সুন্নাত হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, অতঃপর মক্কায় প্রবেশ করবে এবং বায়তুল্লাহ্ সাত চক্কর তাওয়াফ করবে, তাতে রামাল করবে না।

এটা হলো প্রত্যাবর্তনের তাওয়াফ এটাকে বিদায়ী তাওয়াফও বলা হয়। এবং বায়তুল্লাহ্র সংগে শেষ সাক্ষাতের তাওয়াফও বলা হয়। কেননা এই তাওয়াফের মাধ্যমে সে বায়তুল্লাকে বিদায় জানাচ্ছে এবং বায়তুল্লাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করছে। তাওয়াফের মাধ্যমে সে বায়তুল্লাহ্কে বিদায় জানাচ্ছে এবং বায়ুতুল্লাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তন করছে।

আমাদের মতে এটি ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল হল, রাসূলুল্লাহ্(সা.) এ বাণী- যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করবে, বায়তুল্লাহ্র সংগে তার শেষ সাক্ষাত্ যেন হয় তাওয়াফের মাধ্যমে। ঋতুগ্রস্ত নারীদের তিনি (এই তাওয়াফ না করার) রখসত দিয়েছেন।

তবে মক্কাবাসীদের উপর এ তাওয়াফ ওয়াজিব নয়। কেননা, তারা তো প্রত্যাবর্তন করছেন না এবং বিদায়ও জানাচ্ছেন না।

এই তাওয়াফে রামাল নেই। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, রামাল শুধু একবারই অনুমোদিত হয়েছে।

এরপর অবশ্য তাওয়াফের দুই রাকাআত সালাত আদায় করবে। এর কারণ পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

অতঃপর যমযমের নিকট এসে যমযমের পানি পান করবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) নিজ হাতে বালতি করে পানি তুলেছেন এবং পান করেছেন। অতঃপর বালতির অবশিষ্ট পানি কুয়ায় ফেলে দিয়েছেন।

আর মুস্তাহাব হলো বায়তুল্লাহর দরজায় আসবে এবং চৌকাঠে চুম্বন করবে। এরপরে আসবে মুলতাযামে আর তাহলো দরজা। আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান সে

http://islaminonesite.wordpress.com/

স্থানে বুক ও চেহারা লাগাবে এবং কিছু সময় বায়তুল্লাহর গিলাফ জড়িয়ে ধরবে। অতঃপর তার বাড়ির দিকে ফিরবে।

এভাবেই বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম(সা.) মুলতাযিমের সংগে এরূপ করেছেন।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন, এ-ও উচিত যে, বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে পিছনের দিকে হেটে ফিরবে। বায়তুল্লাহর বিচ্ছেদে ক্রন্দনরত শোকাভিভূত অবস্থায়। এভাবে বায়তুল্লাহ্‌ শরীফ থেকে বের হয়ে আসবে। এই হলো হজ্জের পূর্ণ বিবরণ।

পরিচ্ছেদ- উকুফের সাথে সংশ্লিষ্ট

মুহরিম যদি মক্কায় প্রবেশ না করেই আরাফা অভিমুখে গমন করে এবং আমাদের পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুসারে সেখানে উকুফ করে তাহলে তার, যিম্মা থেকে তাওয়াফুল কুদুম রহিত হয়ে যাবে। কেননা তাওয়াফুল কুদূম হজ্জের শুরুতে এমনভাবে শরীআতের বিধান সাব্যস্ত হয়েছে যে, তার উপর হজ্জের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম পরস্পরায় আবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে তা আদায় করা সুন্নত হবে না।

আর এটা তরক করার কারণে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা সুন্নাত। আর সুন্নাত তরক করার কারণে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না।

যে ব্যক্তি নয় তারিখের সূর্য হেলে পড়া থেকে দশ তারিখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে কোন সময়ে আরাফায় উকুফ করতে পারে, সে হজ্জ পেয়ে গেলো।

সুতরাং আমাদের মতে উকুফের প্রথম ওয়াক্ত হলো যাওয়ালের পর। কেননা বর্ণিত আছে যে,নবী করীম(সা.) যাওয়ালের পর উকুফ করেছেন, আর এ হলো প্রথম ওয়াক্তের পর।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর নবী(সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি অন্ততঃ রাত্রে আরাফার অবস্থান লাভ করতে পারে সে হজ্জ পেয়ে গেলো, আর যে রাত্রেও আরাফার অবস্থান লাভ করতে না, পারে তার হজ্জ ফওত হয়ে গেলো। এ হলো উকুফের শেষ সময়ের বিবরণ।

ইমাম মালিক(র.) যদিও বলতেন যে, উকুফের প্রথম ওয়াক্ত হলো ফজর উদিত হওয়ার কিংবা সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে, কিন্তু আমাদের এইমাত্র বর্ণিত হাদীছ তার বিপক্ষে দলীল।

যদি যাওয়ালের পর উকুফ করে সেই মুহূর্তে রওয়ানা দিয়ে দেয়, তাহলে আমাদের মতে যথেষ্ট হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বিষয়টিকে অব্যয় যোগে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন- হজ্জ হলো আরাফার অবস্থান। সুতরাং যে ব্যক্তি রাত্রের বা দিনের কিছু সময় আরাফায় অবস্থান করলো, তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে গেলো। অব্যয়টি হলো ইচ্ছা প্রদানমূলক অব্যয়।

ইমাম মালিক(র.) বলেন, দিনের সহিত রাত্রের কিছু অংশে উকুফ না করলে যথেষ্ট হবে না। কিন্তু আমাদের বর্ণিত হাদীছ তার বিপক্ষে দলীল।

যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা বেহুশ অবস্থায় কিংবা সে আরাফা না জেনে অতিক্রম করে, তবে তার উকুফ জাইয হয়ে যাবে। কেননা যা হজ্জের রকুন আর্থাত্ উকুফ, তা তো পাওয়া গেছে। অজ্ঞানাবস্থা কিংবা ঘুমের অবস্থার কারণে তো সেটা ব্যাহত হয় না; যেমন সাওমের রুকনের বেলায় সালাতের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা অজ্ঞান অবস্থায় সালাত অব্যাহত থাকতে পারে না।

আর অজ্ঞান অবস্থায় আরাফা অতিক্রম করার সময় উকুফের নিয়্যত অনুপস্থিত, কিন্তু নিয়্যত তো হজ্জের প্রতিটি রুকনের জন্য শর্ত নয়।

কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে যায় আর তার সাথীরা তার পক্ষ হতে ইহরাম বেধে দেয় তাহলে কেউ তা জাইয হবে ।

এ হল আবূ হানীফা(র.) এর মাযহাব। সাহেবাইনের মতে তা জাইয হবে না।

যদি কোন মানুষকে বলে রাখে যে, সে অজ্ঞান হয়ে গেলে কিংবা ঘুমিয়ে গেলে সে যেন তার পক্ষ থেকে ইহরাম বেধে দেয় আর আদিষ্ট ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে ইহরাম

http://islaminonesite.wordpress.com/

বেধে নেয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে। এর উপর ফকীহ্দের ইজমা রয়েছে। সুতরাং যদি সে সংজ্ঞা ফিরে পায় কিংবা জাগ্রত হয় এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে, তাহলে জাইয হয়ে যাবে।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, (প্রথমোক্ত সুরতে) সে নিজেও ইহ্রাম বাধেনি আবার কাউকে ইহ্রাম বেধে দেয়ার আদেশও করেনি। কেননা সে তো স্পষ্টতঃ অনুমতি প্রদান করেনি। আর লক্ষণগত অনুমতি নির্ভর করে বিষয়টি তার জানা থাকার উপর। তাছাড়া লক্ষণগত অনুমতির বৈধতা তো অনেক ফকীহ্ এরই জানা নেই। সুতরাং সাধারণ মানুষ তা জানবে কিভাবে। অন্যকে এ বিষয়ে স্পষ্ট আদেশ দানের অবস্থা এর বিপরীত।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, যখন সে তাদের সফর সংগী হওয়ার ব্যাপারে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তখন সে ঐ সকল বিষয়ে তাদের প্রত্যেকের নিকট সাহায্যের আশাক পোষণ করেছে, যা সে নিজে সম্পাদন করত সক্ষম নয়। আর এই সফরের উদ্দেশ্যমূলক বিষয় হলো ইহ্রাম। সুতরাং লক্ষণগতভাবে ইহ্রাম বেধে দেয়ার অনুমতি সাব্যস্ত হবে। আর প্র্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞাত রয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর হুকুম তো প্রমাণের উপরই নির্ভরশীল।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন- এই সকল বিষয়ে স্ত্রী লোকের হুকুম পুরুষের অনুরূপ। কেননা পুরুষদের মতই তারাও সম্বোধনের অন্তর্ভূক্ত।

তবে সে তার মাথা খুলে রাখবে না। কেননা সেটা তার সতরের অন্তর্ভূক্ত।

আর তার চেহার খোলা রাখবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, স্ত্রী লোকের ইহ্রাম হলো তার চেহারার মধ্যে।

যদি মুখের উপর কোন কিছু ঝুলিয়ে দেয় এবং তা চেহারা থেকে পৃথক রাখে তাহলে জাইয হবে।

‘আইশা(রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এটা হলো হাওদার ছায়া গ্রহণের মত।

আর সে উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পড়বে না। কেননা তাতে ফিতনার আশংকা রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সে রামাল করবে না এবং সাঈ করার সময় উভয় চিহ্নের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াবে না। কেননা তা সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

আর সে মাথা মুড়াবে না, বরং চুল ছাটবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) স্ত্রী লোকদেরকে হক করা থেকে নিষেধ করেছেন। এবং তাদের ছাটার আদেশ দান করেছেন।

তাছাড়া দলীল এই যে, তাদের ক্ষেত্রে মাথা মুড়ানো মুসলার (বিকৃতি সাধনের) হুকুম রাখে, পুরুষের ক্ষেত্রে দাড়ি চাছা যেমন।

আর সে ইচ্ছামত সেলাই করা কাপড় পরিধান করবে। কেননা সেলাই বিহীন কাপড় পরিধানে ছতর খুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

ফকীহ্গণ বলেছেন, ভিড় থাকলে তারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে যাবে না। কেননা পুরুদের সংস্পর্শে যেতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ফাকা জায়গা পেয়ে যায় তাহলে স্পর্শ করতে পারে।

জামে ‘সাগীর প্রণেতা বলেন, যে ব্যক্তি নফল কুরবানী, কিংবা মান্নতের কিংবা কোন শিকারের ক্ষতি পূরণের অথবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যের উটনীকে কালাদা(কুরবানীর পশুর চিহ্ন) পরাল এবং তা নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো তার ইহরাম হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে।

কেননা রাসূলূল্লাহ্(সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি উটনীকে কালাদা পরাল, সে ইহরাম বেধে নিল। তাছাড়া এই জন্য যে, (হযরত ইবরাহীম(আ.) এর আহবানে) সাড়া দান প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে যাওয়া তালবিয়া পাঠের সমতুল্য। কেননা এ কাজ সে ব্যক্তিই করে, যে হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা করে। আর সাড়াদানের প্রকাশ কখনো কর্ম দ্বারাও হয়, যেমন কথা দ্বারা হয়। সুতরাং এমন কাজের সংগে নিয়্যতের দ্বারা সে মুহরিম হয়ে যাবে, যে কাজ ইহরামের বৈশিষ্ট্যভূক্ত।

কালাদা পরানোর সুরত এই যে, উটনীর ছেড়া জুতা, ডোলের রশি কিংবা গাছের ছাল ঝুলিয়ে দেওয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি পশুকে কালাদা পরিয়ে লোক মারফত পাঠিয়ে দেয়, নিজে সংগে না নেয় তাহলে সে মুহরিম হবে না। কেননা 'আইশা(রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর হাদী(হারাম অভিমুখী যাবাহ করার পশু) এর কালাদা পাকিয়ে দিয়েছিলাম। আর তিনি লোক মারফত তা পাঠিয়ে দেন এবং হালাল অবস্থায় পরিবারের মধ্যে অবস্থান করেছেন।

লোক মারফত প্রেরণের পর যদি রওয়ানা হয় তাহলে উক্ত পশুর সংগে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সে মুহরিম হবে না। কেননা রওয়ানা হওয়ার সময় তার সংগে যদি কোন হাদী না থাকে, যা সে হাকিয়ে নিয়ে যাবে, তাহলে তো তার পক্ষ হতে নিয়্যত ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেলো না। আর শুধু নিয়্যতে মুহরিম হয় না।

যদি পথিমধ্যে সে প্রেরিত পশু পেয়ে যায় এবং তা হাকিয়ে নিয়ে যায় কিংবা শুধু পেয়ে গেলো, তাহলে যেহেতু তার নিয়্যত এমন একটি আমলের সংগে যুক্ত হয়েছে, যা ইহরামের বৈশিষ্ট্যভূক্ত, সেহেতু সে মুহরিম হয়ে যাবে। যেমন শুরু থেকে হাকিয়ে নিলে হয়।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, হজ্জে তামাত্তু-এর উটনী এর অতিক্রম। কেননা সে ক্ষেত্রে রওয়ানা দেওয়া মাত্র সে মুহরিম হয়ে যাবে। অর্থাত যদি ইহরামের নিয়্যত করে থাক। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। সাধারণ কিয়াস তাই, যা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, তামাত্তু-এর হাদী শরীআতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত রূপে শুরু থেকেই হজ্জের আমলসমূহের অন্তর্ভূক্ত একটি আমল রূপে নির্ধারিত। কেননা এটা মক্কার সাথে বিশিষ্ট। এবং (হজ্জ ও উমরা এই) দুই ইবাদত একত্রে আদায়ের শোকর হিসাবে তা ওয়াজিব হয়েছে।

আর অন্যান্য হাদী তো (ক্ষেত্র বিশেষে) অপরাধ জনিত কারণেও ওয়াজিব হতে পারে। যদিও তা মক্কা পর্যন্ত না পৌছে। এ কারণেই তামাত্তু-এর হাদীর ক্ষেত্রে হাজীর রওয়ানা হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীর ক্ষেত্রে প্রকৃত আমলের উপর (অর্থাত্ যুক্ত হয়ে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপর) নির্ভরশীল থাকবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি উটনীকে চট পরিয়ে দেয় কিংবা কুজে আচড় কেটে দেয়া করে, কিংবা বকরীর গলায় কালাদা ঝুলিয়ে দেয়, তাহলে মুহরিম হবে না। কেননা চট পরানো গরম বা শীত বা মাছি থেকে রক্ষার জন্যেও হতে পারে। সুতরাং তা হজ্জের বৈশিষ্ট্য হলো না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে করা মাকরূহ। সুতরাং তা হজ্জের আমলের মধ্যে গণ্য নয়।

সাহেবাইনের মতে যদিও তা উত্তম তবে তা কখনো চিকিৎসার জন্যও হয়ে থাকে। আর কালাদা ঝুলানোর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তা হাদীর সাথেই বিশিষ্ট।

আর বকরীর গলায় কালাদা ঝুলানো প্রচলিত নয়। এবং তা সুন্নতও নয়।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, (হজ্জ প্রসংগে যেখানে ‘বুদন’ এর কথা এসেছে সেখানে) বুদন অর্থ উট এবং গরু।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন শুধু উট। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) জুমুআর সালাত প্রসংগে বলেছেন- যে তাড়াতাড়ি হাযির হয়, সে যেন ‘বাদানাহ’ (উটনী) কুরবানী করলো, আর যে তার পরে হাযির হলো, সে যেন গাভী কুরবানী করলো।

আমাদের দলীল এই যে, ‘বদনা’ শব্দটি ‘বাদানাহ’ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ স্থূলদেহী। আর এই অর্থের দিক থেকে উটনী ও গাভী দুটোই সমতুল্য। এজন্যই তো উভয়ের প্রতিটি সাতজনের জন্য যথেষ্ট হয়।

আর হাদীছের বিশুদ্ধ বর্ণনায় বকরী প্রেরণকারীর ন্যায় রয়েছে। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ অধিক অবগত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

কিরান

হজ্জে কিরান হলো হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে ইফরাদ থেকে উত্তম।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তামাত্তু কিরান থেকে উত্তম। কেননা কুরআনে তামাত্তু এর উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু কিরানের কোন উল্লেখ নেই।

ইমাম শাফিঈ(র.) এর দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বাণী – কিরান হলো শরীআত প্রদত্ত একটি রুখসত বা অবকাশ।

আর এ জন্য যে পৃথক পৃথক হজ্জ ও উমরা আদায়ের মধ্যে অধিক তালবিয়া, দীর্ঘ সফর এবং অধিক হলক (মাথা মুড়ানো) রয়েছে।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বাণী- হে মুহাম্মদের অনুসারিগণ! তোমরা এক সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধ।

তাছাড়া এই জন্য যে, তাতে দু'টি ইবাদত একত্রি করা হয়। সুতরাং এটা যুগপত্ ই'তিকাফ ও রোযার সাদাকা এবং তাহাজ্জুদসহ আল্লাহর রাস্তায় প্রহরাদানের সদৃশ হলো। আর তালবিয়ার তো নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই।

আর সফর উদ্দেশ্য মূলক ইবাদত নয়। আর হলক তো হলো ইবাদত হতে বের হওয়ার প্রক্রিয়া। সুতরাং ইমাম শাফিঈ(র.) যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, তা দ্বারা হজ্জে ইফরাদ অগ্রগণ্য হবে না।

ইমাম শাফিঈ(র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার উদ্দেশ্য হলো জাহেলিয়াত যুগের অধিবাসীদের এ মন্তব্য নাকচ করা যে, হজ্জের মাসকগুলোতে উমরা করা নিকৃষ্টতম পাপ।

(মালিক (র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কুরআনে কিরানের উল্লেখ রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী- (তোমরা আল্লাহ্র জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করো) এর অর্থ হলো আপন পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে উভয়ের জন্য ইহরাম বাধা, যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।

তাছাড়া এতে আগে থেকে ইহরাম বাধা হয়। এবং হজ্জ ও উমরা উভয়ের ইহরাম মীকাত থেকে শুরু করে উভয় ইবাদত থেকে ফারিগ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অথচ হজ্জে তামাত্তু এরূপ নয়। সুতরাং কিরান তামাত্তু থেকে উত্তম হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ও ইমাম শাফিঈ(র.) এর মধ্যে মত পার্থক্যের ভিত্তি এই যে, আমাদের মতে কিরান হজ্জকারীকে দু'টি তাওয়াফ এবং দু'টি সাঈ করতে হয়। আর ইমাম শাফিঈ(র.) এর মতে একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ করতে হয়।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, কিরানের বিবরণ এই যে, মীকাত থেকে এক সঙ্গে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাধবে এবং (ইহরামের দুই রাকাআতে) সালাতের পর বলবে- হে আল্লাহ! আমি এবং আমার পক্ষ থেকে এ দু'টি গ্রহণ করুন। কেননা কিরান অর্থই হলো হজ্জ ও উমরাকে একত্র করা। যেমন বলা হয়- (জিনিসটি ঐ জিনিসটির সংগে যুক্ত করলাম) যখন দু'জিনিসকে একত্র করা হয়। একইভাবে কিরান হয়ে যাবে।

যদি উমরার তাওয়াফের চার চক্কর শেষ হওয়ার পূর্বে হজ্জকে উমরার মাঝে দাখিল করে দেয়। যেহেতু উভয় ইবাদতকে একত্র করা বাস্তবায়িত হয়েছে। কেননা তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

আর যখন উভয়টি আদায় করার প্রতিজ্ঞা নিলো তখন উভয়টিকে সহজ করে দেওয়ার জন্য (আল্লাহর নিকট) প্রার্থনা করবে। এবং আদায়ের ক্ষেত্রে উমরাকে হজ্জের উপর অগ্রবর্তী করবে।

তদ্রুপ (তালবিয়ার ক্ষেত্রে) এক সাথে বলবে- কেননা সেতো উমরার কাজ আগে করবে, সুতরাং তালবিয়াতেও উমরার কথা আগে উল্লেখ করবে।

অবশ্য যদি দু'আ ও তালবিয়ায় উমরার কথা পরে উল্লেখ করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা অব্যয়টি নিছক যুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত (অগ্র পশ্চাত অর্থে নয়)

যদি শুধু অন্তরে নিয়্যত করে এবং তালবিয়াতে হজ্জ ও উমরার কথা উল্লেখ না করে, তাহলেও যথেষ্ট হবে। সালাতের উপর কিয়াস করে।

মক্কায় প্রবেশ করার পর প্রথম কাজ হিসাবে বায়তুল্লাহর সাত চক্কর তাওয়াফ করবে। এবং সাতের প্রথম তিনটিতে রামাল করবে। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে। এগুলো হলো উমরার কার্যসমূহ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

অতঃপর হজ্জের আমল শুরু করবে। অর্থাত সাত চক্কর তাওয়াফুল কুদূম করবে। তারপর সাঈ করবে। যেমন হজ্জে ইফরাদকারীদের ক্ষেত্রে আমরা বয়ান করে এসেছি।

আর উমরার কার্যসমূহকে অগ্রবর্তী করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরাশাদ করেছেন- আর কিরানে তো (কার্যতঃ) তামাত্তু এরই মর্ম রয়েছে।

হজ্জ আর উমরার মাঝখানে মাথা মুড়াবে না। কেননা হজ্জের ইহরামের প্রতি এটি অপরাধ। আর সে কুরবানীর দিন মাথা মুড়াবে। যেমন ইফরাদকারী মাথা মুড়ায়।

আমাদের মতে সে হালকের (মাথা মুড়ানোর) মাধ্যমে হালাল হবে, যাবাহ করার মাধ্যমে নয়। যেমন হজ্জে ইফরাদকারী (হলকের মাধ্যমে) হালাল হয়। এ হলো আমাদের মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, কিরানকারী একটি তাওয়াফ ও একটি সাঈ করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্জের মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে।

তাছাড়া হজ্জে কিরানের ভিত্তিই হলো পরস্পর প্রবিষ্টতার উপর। এ কারণেই তো তাতে এক তালবিয়া ও এক সফর এবং এক হলক যথেষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং রুকনসমূহ(তথা তাওয়াফ সাঈ) এর ব্যাপারেও এরূপ হবে। আমাদের প্রমাণ এই যে, সুবাই ইব্ন মা'বাদ যখন দু'টি তাওয়াফ ও দু'টি সাঈ করেছিলেন, তখন উমর(রা.) তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার নবীর সুন্নাতের দিকে পথপ্রাপ্ত হয়েছো।

তাছাড়া কারণ এই যে, কিরান অর্থই হলো একটি ইবাদতকে অন্য একটি ইবাদতের সংগে যুক্ত করা। আর সেটা প্রতিটি ইবাদেতর আমল আলাদাভাবে পূণরূপে আদায় করার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে।

আর এ জন্য যে, নির্দিষ্ট ইবাদতের মধ্যে প্রবিষ্টতা প্রয়োগ হয় না।

আর সফর তো হলো ইবাদত পর্যন্ত পৌছার মাধ্যমে এবং তালবিয়া হলো ইহরাম বাধার জন্য, আর মাথা মুড়ানো হলো ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্য। সুতরাং এ সকল কাজ তো উদ্দেশ্যমূলক নয়। পক্ষান্তরে রুকনসমূহ হলো উদ্দিষ্ট। তুমি কি

http://islaminonesite.wordpress.com/

লক্ষ্য করছ না যে, নফল সালাতের দুই দুই রাকাআত একত্রে আদায় করলে পরস্পর প্রবিষ্ট হয় না, অথচ এক তাহরীমা দ্বারাই তা আদায় করা যায়।

ইমাম শাফিঈ(র.) এর বর্ণিত রিওয়ায়াতের অর্থ হলো উমরার ওয়াক্ত হজ্জের ওয়াক্তের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, যদি কিরানকারী উমরা ও হজ্জের জন্য প্রথমেই দুই তাওয়াফ করে নেয় এবং এরপর দুই সাঈ করে, তাহলে তার জন্য যথেষ্ট। কেননা তার উপর যা কর্তব্য ছিলো, তা সে আদায় করেছে। তবে উমরার সাঈ বিলম্বিত করায় এবং তাওয়াফে কুদূমকে উমরার সাঈ'র উপর অগ্রবর্তী করায় সে মন্দ কাজ করল। তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

সাহেবাইনের মতে এ হুকুম স্পষ্ট। কেননা তাদের মতে উমরা ও হজ্জের কোন কাজ অগ্রবর্তী বা বিলম্বিত করার কারণে দম ওয়াজিব হয় না।

আর ইমাম আবূ হানফা(র.) এর মতে তাওয়াফে কুদূম হলো সুন্নাত। আর তা তরকের দ্বারা কম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং সুন্নাতকে অগ্রবর্তী করার দ্বারা দম ওয়াজিব না হওয়া আরো স্বাভাবিক। আর অন্য আমলে ব্যস্ত হওয়ার কারণে সাঈকে বিলম্বিত করার দ্বারা দম ওয়াজিব হয় না। সুতরাং তাওয়াফ সম্পাদনের সাঈ বিলম্বিত হওয়াার কারণে দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, কুরবানীর দিন যখন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে ফেলবে তখন এক বকরী কিংবা এক গরু কিংবা এক উট কিংবা বাদানার (উটের) এক-সপ্তমাংশ কুরবানী দিবে। এ হলো কিরানের দম। কেননা কিরানে তামাত্তু-এর মর্ম রয়েছে। আর তামাত্তু এর ক্ষেত্রে হাদী ওয়াজিব হওয়া কুরআনের ভাষ্যে প্রমাণিত। আর হাদী উট দ্বারা কিংবা গরু দ্বারা কিংবা বকরী দ্বারা হয়ে থাকে। হাদী অধ্যায়ে এ প্রসংগে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ্।

ইমাম কুদূরী(র.) বাদানাহ্ দ্বারা এখানে উট উদ্দেশ্যে করেছেন। যদিও বাদানাহ শব্দটি উট ও গরু উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করে। যেমন ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করে এসেছি। উটের সাতভাগের একভাগ যেমন জাইয তেমনি গরুর সাতভাগের একভাগও জাইয।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি যাবাহ করার মতো কিছু তার না থাকে, তাহলে হজ্জের দিনগুলোতে তিন দিন রোযা রাখবে, যার শেষ দিন হবে আরাফার দিন। আর সাতদিন রোযা রাখবে আপন পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসার পর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

যে ব্যক্তি যাবাহ করার মতো কিছু না পায় সে হজ্জের সময় তিন দিন রোযা রাখবে আর সাতটি রোযা রাখবে যখন তোমরা ফিরে আসবে। এ-ই হলো পূর্ণ দশটি।

'নাস' যদিও তামাত্তু সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু কিরানও তার সমতুল্য। কেননা (এখানেও) সে দু'টি ইবাদত আদায়ের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আর আয়াতের 'হজ্জ' শব্দটি দ্বারা হজের সময় উদ্দেশ্য। আর তা আল্লাহই বেশী জানেন। কেননা হজ্জ নিজস্বভাবে রোযার কাল হতে পারে না। তবে সর্বোত্তম হলো ইয়াওমুত্তারবিয়ার একদিন পূর্ব থেকে অর্থাত্ সাত তারিখ থেকে এবং ইয়ামুত্তারবিয়াতে (আট তারিখে) এবং ইয়াওমে আরাফায় (নয় তারিখে) এই তিন দিনে রোযা রাখা। কেননা রোযা হলো হাদীর স্থলবর্তী। সুতরাং মূল জিনিস তথা হাদী সংগ্রহে সক্ষম হওয়ার প্রত্যাশা শেষ সময় পর্যন্ত রোযাকে বিলম্বিত করাই মুস্তাহাব হবে।

যদি হজ্জ থেকে ফারিগ হওয়ার পর মক্কায় থাকা অবস্থায় সাতটি রোযা রেখে নেয়। তাহলে তাও জাইয হবে। এর অর্থ হলো আইয়ামে তাশরীক অতিক্রান্ত হওয়ার পর। কেননা এ দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফিঈ (র. বলেন, তা জাইয হবে না। কেননা তা প্রত্যাবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। তবে যদি মক্কায় থেকে যাওয়ার নিয়্যত করে , তাহলে প্রত্যাবর্তন সম্ভাবনা রহিত হওয়ার কারণে মক্কাতে রোযা রাখা যথেষ্ট হবে।

আমাদের দলীল এই যে, (আয়াতে উল্লেখিত) এর অর্থ হলো যখন তোমরা হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করো অর্থাত্ হজ্জ সম্পন্ন করে ফেল। কেননা সম্পন্ন হওয়া পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনের কারণ। কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পরই রোযা আদায় করা হচ্ছে। সুতরাং তা জাইয হবে।

যদি তার রোযা ফউত হয়ে যায় আর ইয়াওমুন নহর এসে পড়ে তাহলে দম ছাড়া আর কিছু যথেষ্ট হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, এ তাশরীকের দিনগুলোর পরে রোযা রেখে যাবে। কেননা এগুলো নির্ধারিত সময়ের সিয়াম। সুতরাং রমাযানের সাওমের ন্যায় এগুলো কাযা করা হবে। ই

ইমাম মালিক(র.) বলেন, আইয়ামে তাশরীকেই সিয়াম পালন করবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- যে ব্যক্তি কিছু না পায় তার জন্য বিধান হলো হজ্জের সময় তিন দিনের সিয়াম পালন। আর এই দিনগুলো হজ্জের সময়।

আমাদের দলীল হলো এই দিনগুলোতে সিয়াম পালনের নিষেধ সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদীছ রয়েছে। সুতরাং 'নাস' এই হাদীছ দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। অথবা এ জন্য যে (নিষিদ্ধ দিনে আদায় করলে) তা ত্রুটিমুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তা দ্বারা এ রোযা আদায় হবে না, যা পূর্ণ আকারে ওয়াজিব হয়েছে।

কিন্তু এর পরে আর কাযা করবে না। কেননা রোযা হলো (হাদী যবাহ করার) স্থলবর্তী আর স্থলবর্তী শুধু শরীআত কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়। আর 'নাস' সেটাকে হজ্জের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। আর 'দম' জাইয হওয়া হল মৌলিক বিধান অনুসারে।

উমর(রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ ধরণের ক্ষেত্রে তিনি বকরী যবাহ করার আদেশ করেছেন।

যদি হাদী সংগ্রহ করতে সক্ষম না হয় তাহলে হালাল হয়ে যাবে আর তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি তো হলো দুই ইবাদত একত্র করার সুবিধা ভোগের দম আর দ্বিতীয়টি হলো হাদী যবাহ করার পূর্বে হালাল হওয়ার দম।

কিরান হজ্জকারী যদি মক্কা প্রবেশ না করে আরাফাত অভিমুখে চলে যায়, তাহলে সে উকুফের মাধ্যমে উমরা তরককারী হয়ে গেলো। কেননা এখন তার পক্ষে উমরা আদায় করা সম্ভব নয়। কারণ তাহলে সে উমরার কার্যগুলোক হজ্জের কার্যগুলোর উপর ভিত্তিকারী হবে। অথচ সেটা শরীআত সম্মত নয়।

তবে শুধু আরাফা অভিমুখে যাত্রা করা দ্বারাই সে উমরা তরককারী হয়ে যাবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মাযহাবের এ-ই বিশুদ্ধ মত। তার মতে এই ব্যক্তির মাঝে এবং জুমুআর দিন যুহর আদায় করার পর জুমুআর জন্য যাত্রাকারী ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, জুমুআর ক্ষেত্রে যুহর আদায় করার পরও জুমুআ আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার কুরআনী আদেশ তার উপর আরোপিত হয়। পক্ষান্তরে কিরান ও তামাত্তু এর ক্ষেত্রে উমরা আদায়ের পূর্বে যাত্রা করা নিষিদ্ধ। সুতরাং উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, আর তার যিম্মা থেকে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা যখন উমরা বর্জিত হলো তখন দুই ইবাদত আদায়ের সুবিধা সে লাভ করেনি।

তবে উমরা শুরু করে তা তরক করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব। এবং উমরা কাযা করতে হবে। কেননা উমরা শুরু করা বিশুদ্ধ ছিলো। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সদৃশ হলো। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

হজ্জে তামাত্তু

হজ্জে তামাত্তু হজ্জে ইফরাদ থেকে উত্তম।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হজ্জে ইফরাদ উত্তম। কেননা তামাত্তুকারীর সফর তো হয় তার উমরার জন্য। আর হজ্জে ইফরাদকারীদের সফর হয় হজ্জের জন্য।

যাহেরি রিওয়ায়াতের দলীল এই যে, তামাত্তু এর মধ্যে দুই ইবাদত একত্র করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং তা কিরানের সদৃশ। তদুপরি তাতে অতিরিক্ত একটি আমল রয়েছে। আর তা হলো রক্ত প্রবাহিত করা। আর তার সফর মূলতঃ হজ্জের জন্যই হচ্ছে, যদিও মাঝখানে উমরা আদায় করা হচ্ছে। কেননা, এই উমরা তো হজ্জের

http://islaminonesite.wordpress.com/

অনুবর্তী। যেমন জুমুআ এবং জুমুআ অভিমুখে যাত্রার মাঝখানে সুন্নাত সালাত আদায় করা হয়।

তামাত্তুকারী দুই প্রকার। প্রথমতঃ যে কুরবানীর পশু সংগে হাকিয়ে নেয়, দ্বিতীয়তঃ যে কুরবানীর পশু নেয় না। আর তামাত্তুর অর্থ হলো একই সফরে দু'টি ইবাদত এমনভাবে আদায় করার সুবিধা গ্রহণ করা যে, এ উভয় ইবাদতের মধ্যবর্তী সময়ে পুরোপুরিভাবে পরিবারের মধ্যে দিয়ে অবস্থান না করা।

এ বিষয়ে বেশ কিছু মত পার্থক্য রয়েছে। যা আমরা পূর্ববর্তীতে ইনসাল্লাহ্ বর্ণনা করবো।

তামাত্তু-এর নিয়মে এই যে, হজ্জের মাসগুলোতে মীকাত থেকে কাজ শুরু করবে। অর্থাত্ প্রথমে উমরার ইহরাম করবে, এবং মক্কায় প্রবেশ করবে, এবং উমরার জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করবে এবং মাথা-মুড়াবে কিংবা চুল ছাটবে। তখন সে তার উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে। এই হলো উমরার বিবরণ।

তদ্রুপ যদি কেউ আলাহিদাভাবে উমরা করতে চায় তাহলে আমাদের উল্লেখিত নিয়মগুলো পালন করবে।

রাসূলুল্লাহ্(সা.) উমরাতুল কাযা আদায় করার সময় এরূপই করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, তার উপর মাথা মুড়ানো নেই। উমরা অর্থ শুধু তাওয়াফে সাঈ। তার বিপক্ষে আমাদের দলীল হলো আমাদের উল্লেখিত হাদীছ।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- (এমন অবস্থায় যে, তোমরা তোমাদের মস্তক মুন্ডনকারী হবে) উমরাতুল কাযা প্রসংগেই নাযিল হয়েছে।

তাছাড়া যেহেতু উমরাতে তালবিয়ার মাধ্যমে ইহরাম বেধেছে সেহেতু হলকের মাধ্যমে হালাল হওয়া সাব্যস্ত হবে। যেমন হজ্জে রয়েছে।

তাওয়াফ শুরু করার সংগে সংগে তালবিয়া বন্ধ করে দেবে। ইমাম মালিক(র.) বলেন, বায়তুল্লাহ্র প্রতি নযর পড়া মাত্র তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। কেননা উমরা অর্থ বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত। এবং তা দ্বারাই উমরা সম্পূর্ণ হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, নবী (সা.) উমরাতুল কাযা আদায় করার সময় যখন হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেছিলেন তখন তালবিয়া বন্ধ করেছিলেন।

তাছাড়া কারণ এই যে, আসল উদ্দেশ্য হলো তাওয়াফ। সুতরাং তাওয়াফ শুরু হওয়ার সংগে সংগে তালবিয়া বন্ধ করে দিবে। এ কারণেই হজ্জ আদায়কারী রামী শুরু করার সংগে সংগে তালবিয়া বন্ধ করে দেয়।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, এরপর সে মক্কায় হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। কেননা সে তো উমরা থেকে হালাল হয়ে গেছে। অতঃপর যেদিন ইয়াওমুত্তারবিয়া(আট তারিখ) হবে সেদিন মাসজিদুল হারাম থেকে ইহরাম বাধবে।

আসল শর্ত হলো হরম শরীফ থেকে ইহরাম বাধা। মসজিদ থেকে জরুরী নয়। তবে উত্তম। এর কারণ এই যে, সে মক্কাবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। আর আমরা এর পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, মক্কার অধিবাসীদের মীকাত হলো হরম শরীফ।

অতঃপর হজ্জে ইফরাদকারী যা যা করে, সেও তা করবে। কেননা সে তো এখন হজ্জ আদায় করছে। তবে তাওয়াফ যিয়ারতের সময় সে রামাল করবে। এরপর সাঈ করবে। কেননা হজ্জের ক্ষেত্রে এটা তার প্রথম তাওয়াফ। হজ্জে ইফরাদ-কারীর বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা একবার সে সাঈ করে ফেলেছে।

এই তামাত্তুকারী যদি হজ্জেরর ইহরাম বাধার পর মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বেই তাওয়াফ ও সাঈ করে থাকে, তাহলে তাওয়াফে যিয়ারতের মাঝে রামাল করবে না। এবং তার পরে সাঈ করবে না। কেননা তা সে একবার করছে। তবে আমাদের উদ্বৃত আয়াতের প্রেক্ষিতে তার উপর তামাত্তু এর দম ওয়াজিব হবে।

যদি কোন হাদী না পায় তাহলে সে হজ্জের সময় তিন দিন পালন করবে এবং প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন সিয়াম পালন করবে। কিরান প্রসংগে যেভাবে আমরা বর্ণনা করেছি, সেভাবে।

যদি শাওয়াল তিনটি সাওম পালন করে, এরপর উমরা আদায় করে তবে ঐ সাওম এই তিন সাওমের জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা এই রোযা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো তামাত্তু। আর এটা সে দমের স্থলবর্তী। আর এই অবস্থায় তো সে তামাত্তুকারী

http://islaminonesite.wordpress.com/

নয়। সুতরাং সবব বা কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে সিয়াম পালন করা তার জন্য বৈধ হবে না।

আর যদি সিয়ামগুলো উমরায় ইহরাম বাধার পর তাওয়াফ করার পূর্বে আদায় করে তবে জাইয হবে। এ হল আমাদের মাযহাব।

ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বানী- হজ্জের সময় তিন সিয়াম পালন করবে। (অর্থাত্ হজ্জের ইহরামের পর)।

আমাদের দলীল এই যে, সে রোযায় সবব বা কারণ সাব্যস্ত হওয়ার পর তা আদায় করেছে।

আর আয়াতে উল্লেখিত হজ্জ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজ্জের সময়(তা হজ্জের ইহরামরে পূর্বে হোক বা পরে) যেমন ইতোপূর্বে আমরা বয়ান করে এসেছি।

তবে সাওমকে শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা উত্তম। আর শেষ সময় হলো আরাফার দিবস। আমরা কিরান প্রসংগে এর কারণ বর্ণনা করে এসেছি।

আর তামাত্তুকারী যদি নিজের সাথে 'হাদী' নিতে চায় তাহলে (উমরায়) ইহরাম বাধবে এবং হাদী সাথে নিয়ে যাবে। এটা উত্তম। কেননা নবী করীম(সা.) হাদীসমূহ নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া এতে (নেক কাজের প্রতি) প্রস্তুতি ও তরান্বিত করার আগ্রহ প্রকাশ পায়।

হাদী যদি উট বা গরু হয় তাহলে চামড়ার টুকরা কিংবা ছেড়া জুতা তার গলায় ঝুলিয়ে দিবে। এর দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হযরত 'আইশা(রা.) এর হাদীছ। কালাদা ঝুলিয়ে দেওয়া চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা থেকে উত্তম। কেননা কালাদা পরানোর কথা কিতাবুল্লায় উল্লেখিত রয়েছে।

তাছাড়া কালাদা পরানো হয় ঘোষণার জন্য আর চট বা কাপড় দ্বারা আবৃত করা হয় সাজ-সজ্জার জন্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আগে তালবিয়া পড়বে তারপর কালাদা ঝুলাবে। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হাদীকে কালাদা পরানো এবং তা সংগে করে রওয়ানা দেয়ার মাধ্যমে ইহরাম শুরু হয়ে যায়। আর তালবিয়ার মাধ্যমে ইহরাম বাধা হলো উত্তম।

হাদীকে পিছন থেকে হাকিয়ে নিয়ে যাবে। এটা হাদীছে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া থেকে উত্তম। কেনন রাসূলুল্লাহ্(সা.) যিল হুলায়ফাতে ইহরাম বেধে ছিলেন, আর তার হাদীগুলোকে তার সামনে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তাছাড়া এতে অধিক ঘোষণা ও প্রচার হয়। তবে যদি পশু অবাধ্য হয়,তাহলে সামনে থেকেই টেনে নেবে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ(র) এর মতে করবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে করবে না। করা মাকরূহ। আভিধানিক অর্থে জখম করে রক্ত প্রবাহিত করা।

আর তার বিবরণ এই যে, উটনীর কুজ চিরে দিবে। অর্থাত্ বর্শাদ্বারা কুজের ডান দিকে নীচের অংশে জখম করে দেবে। তবে রিওয়ায়াত হিসাবে বাম দিকে জখম করার বিষয়টি অধিক বিশুদ্ধ। কেননা নবী(সা.) বাম দিকে জখম করেছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে, এবং ডান দিকে জখম করেছিলেন ঘটনাক্রমে। আর অবহিত করার জন্য উটনীর কুজে রক্ত মেখে দেবে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে এরূপ করা মাকরূহ। সাহেবাইনের মতে এরূপ করা ভাল।

আর ইমাম শাফিঈ(র.) এর মতে এরূপ করা সুন্নাত। কেননা তা নবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

সাহেবাইেনর যুক্তি এই যে, কালাদা ঝুলানোর উদ্দেশ্যে তো হলো এই যে, পানি খেতে নামলে কিংবা ঘাস খেতে গেলে যেন তাকে উত্যক্ত না করা হয়। কিংবা পথ হারিয়ে ফেললে যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়। আর এটা দ্বারা অধিক অর্জিত হয়, যেহেতে চিহ্নটি স্থায়ী থাকে। এ দিক থেকে এটা সুন্নাত হওয়ার কথা, কিন্তু বিকৃত ঘটার দিকটি তার পরিপন্থী। তাই আমরা বলেছি যে, এটা ভালো।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর দলীল এই যে, এ হল বিকৃতি স্বরূপ। আর তা নিষিদ্ধ।

আর যদি (বিকৃতি সাধন ও সুন্নাত হওয়ার মাঝে) বিরোধ দেখা দেয় তাহলে নিষেধাজ্ঞাই অগ্রাধিকার পায়।

আর নবী(সা.) করেছিলেন, হাদীর হিফাজতের জন্য। কেননা মুশরিকরা এটা ছাড়া হাদীকে উত্যক্ত করা হতে বিরত হতো না।

কোন কোন মতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) সমকালীন লোকেদের কে মাকরূহ বলতেন। কেননা তারা বেশী মাত্রায় জখম করে ফেলতো; এমনভাবে যে, জখম ছড়িয়ে পড়ার আশংকা হতো।

আর কোন কোন মতে কালাদা ঝুলানোর উপর কে অগ্রাধিকার প্রদান করাকে তিনি মাকরূহ মনে করতেন।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তাওয়াফ ও সাঈ করবে। এটা হলো উমরার জন্য যেমন আমরা ঐ তামাত্তুকারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, যে হাদী সংগে নেয় না।

তবে সে হালাল হবে না ।বরং তালবিয়া দিবসে (আট তারিখে) হজ্জের ইহরাম বেধে নিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন-

আমি আমার বিষয় যা পরে অনুধাবন করেছি, তা যদি আগে অনুধাবন করতাম তাহলে হাদী সংগে আনতাম না। আর এটাকে উমরা গণ্য করে তা থেকে হালাল হয়ে যেতাম। এই হাদীছ দ্বারা হাদী সংগে আনা অবস্থায় হালাল হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আর তালবিয়া দিবসে হজ্জের ইহরাম বাধবে, যেভাবে মক্কাবাসীদের ইহরাম বাধে, যা আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

যদি উক্ত সময়ের আগে ইহরাম বাধে তাহলে তা জাইয হবে। বরং তামাত্তুকারী হজ্জের ইহরাম যত তাড়াতাড়ি করবে ততই তা উত্তম। কেননা্ এতে সে কাজের দিকে অগ্রগামিতা ও অতিরিক্ত কষ্ট রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর এই উত্তমতা যেমন ঐ ব্যক্তির জন্য, যে হাদী সংগে এনেছে, তেমনি ঐ ব্যক্তির জন্য যে হাদী সংগে আনেনি। আর তার উপর একটি দম ওয়াজিব। তা হলো তামাত্তু এর দম, যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

ইয়াওমুন-নহরে (দশ তারিখে) যখন হলক করবে তখন উভয় ইহরাম থেকে সে হালাল হয়ে যাবে। কেননা যেমন সালাতের ক্ষেত্রে সালাম তেমনি হজ্জের ক্ষেত্রে হলক হল হালালকারী। সুতরাং হলক দ্বারা উভয় ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে।

মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু ও কিরান নেই। তাদের জন্য শুধু হজ্জে ইফরাদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার বিপক্ষে প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- আর তা (তামাত্তু) ঐ ব্যক্তির জন্য, যার পরিবার-পরিজন মাসজিদুল হারামেরে বাসিন্দা নয়।

তাছাড়া তামাত্তু ও কিরান শরীআতে অনুমোদিত হয়েছে, দুই সফরের একেটিকে রহিত করে সুবিধা গ্রহণ করার জন্য। আর তা বহিরাগতদের জন্যই প্রযুক্ত।

আর যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারী, তার হুকুম মক্কাবাসীদের মত। ফলে তার ক্ষেত্রেও হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কিরান হবে না।

পক্ষান্তরে মক্কী যদি কুফায় গিয়ে (অর্থাত্ মীকাতের বাইরে) হজ্জে কিরান করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে। কেননা তার উমরা ও হজ্জ দুটোই মীকাতের সংগে সম্পৃক্ত। সুতরাং সে বহিরাগতের ন্যায় হবে।

আর তামাত্তুকারী যদি উমরা থেকে ফারিগ হয়ে নিজে বাড়িতে ফিরে যায়, অথচ সে হাদী সংগে নেয়নি, তখন তার তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে দুই ইবাদতের মাঝে তার পরিবারের কাছে বৈধভাবে ফিরে গেছে, আর দ্বারা তামাত্তু বাতিল হয়ে যায়। কয়েকজন তাবিঈ থেকে তা বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি হাদী সংগে এনে থাকে তাহলে পরিবারের কাছে আসা তার জন্য বৈধ নয়। এবং তার তামাত্তু বাতিল হবে না।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসূফ (র.) এর মত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তামাত্তু বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে দুই সফরে উমরা ও হজ্জ আদায় করেছে।

শায়খাইনের দলীল এই যে, প্রত্যাবর্তন তার পক্ষে ওয়াজিব, যতক্ষণ সে তামাত্তু এর নিয়্যত বজায় রাখে। কেননা হাদী সংগে আনা তার হালাল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। সুতরাং তার বাড়িতে ফিরে আসা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে মক্কী যদি কুফায় গিয়ে উমরার ইহরাম করে এবং হাদী সংগে আনে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা প্রত্যাবর্তন তার উপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং তার পরিবার উপস্থিত হওয়া বৈধ গণ্য হবে।

যে ব্যক্তি হজ্জের মাসগুলোর পূর্বে উমরার ইহরাম বেধে নেয় এবং উক্ত উমরার জন্য চার চক্করের কম তাওয়াফ করে, এরপর হজ্জের মাস শুরু হলে উমরার তাওয়াফ পূর্ণ করে এবং হজ্জের ইহরাম বেধে নেয়, সে তামাত্তুকারী রূপে গণ্য হবে। কেননা আমাদের মতে ইহরাম হলো উমরার শর্ত। সুতরাং এটাকে হজ্জের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করা যায়। শুধু উমরার আমলগুলো হজ্জের মাসে আদায় করাটা হলো বিবেচ্য।

আর তাওয়াফের অধিকাংশটুকুই হজ্জের মাসের মধ্যে পাওয়া গেছে। আর অধিকাংশের উপর সমগ্রের হুকুম আরোপ করা হয়ে থাকে।

যদি হজ্জের মাস শুরু হওয়ার পূর্বে তাওয়াফ চার চক্কর কিংবা তার বেশী করে ফেলে অতঃপর সেই বছরই হজ্জ আদায় করে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা হজ্জের মাসের পূর্বেই সে অধিকাংশটুকু আদায় করে ফেলেছে।

এ হুকুম এজন্য যে, (তাওয়াফের অধিকাংশটুকু আদায় করার মাধ্যমে) উমরাকারী এমন অবস্থায় পৌছে গেছে যে, স্ত্রী সহবাসের কারণেও তার উমরা বাতিল হবে না। (বরং শুধু দম ওয়াজিব হবে)। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেলো যে, হজ্জের মাসের পূর্বে উমরা থেকে হালাল হয়ে গেলো।

ইমাম মালিক(র.) হজ্জের মাসে পূর্ণ হওয়ার বিষয় বিবেচনা করেন। তার বিপক্ষে দলীল হলো যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর এজন্য যে, সুযোগ লাভ সাব্যস্ত হয় কর্মসূহের আদায়ের মাধ্যমে। সুতরাং হজ্জের মাসে এক সফরে দুই ইবাদতের কর্মসমূহ আদায় করার সুযোগ লাভকারীই তামাত্তুকারী হবে।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, হজ্জের মাসগুলো হলো শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহাজ্জের দশদিন।

আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস'ঊদ, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর ও আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে 'আব্বাস (রা.) এবং আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে যুবায়র(রা.) প্রমুখ থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই জন্য যে, যিলহজ্জের দশ তারিখ অতিক্রান্ত হলে হজ্জ ফউত হয়ে যায়। অথচ সময় বাকি অবস্থায় ফউত হওয়া সাব্যস্ত হয় না।

আর এটা একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- (হজ্জের সময় হলো নির্ধারিত কয়েক মাস) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুই মাস এবং তৃতীয় মাসের অংশ বিশেষ। সমগ্র তৃতীয় মাস নয়।

যদি হজ্জের ইহরামকে হজ্জের মাসগুলোর উপর অগ্রবর্তী করে তাহলে তার ইহরাম জাইয হয়ে যাবে এবং হজ্জের ইহরাম হিসাবে তা গৃহীত হবে। ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার মতে তা উমরার ইহরাম হবে। কেননা তার মতে ইহরাম হলো রুকন আর আমাদের মতে শর্ত। সুতরাং সময়ের উপর অগ্রবর্তী করার বৈধতার ক্ষেত্রে তা তাহারাতের সদৃশ হবে।

তা ছাড়া এ জন্য যে, ইহরাম অর্থ কিছু বিষয় (নিজের উপর) হারাম করা। আর কিছু বিষয় নিজের উপর ওয়াজিব করা আর তা সকল সময়ে হতে পারে। সুতরাং অগ্রবর্তী মীকাত থেকে ইহরাম বাধার অগ্রবর্তী হলো।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেছেন, কুফার অধিবাসী (অর্থাত্ বহিরাগত) যদি হজ্জের মাসগুলোতে উমরার ইহরাম বেধে আসে এবং তা থেকে ফারিগ হয়ে হলক করে বা চুল ছাটে অতঃপর মক্কা কিংবা বসরা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে এবং সে বছরেই সে হজ্জ করে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রথম সুরতে কারণ এই যে, সে হজ্জের মাসগুলোর মধ্যে একই সফরে দু'টি ইবাদতের সুযোগ লাভ করেছে। দ্বিতীয় সুরত সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আবার কারো কারো মতে এটা শুধু ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। সাহেবাইনের মতে সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা তামাত্তুকারী হলো সেই ব্যক্তি, যার উমরার ইহরাম হবে মীকাত থেকে। এবং হজ্জের ইহরাম হবে মক্কা থেকে অথচ তার উভয়টির ইবাদতের দু'টি ইহরামই হচ্ছে মীকাত থেকে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, যতক্ষণ না সে নিজের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করবে, ততক্ষণ প্রথম সফরই অব্যাহত থাকবে। সুতরাং তার উভয় ইবাদতই প্রথম সফরে সংঘটিত। ফলে তামাত্তু এর দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি উমরার ইহরাম বেধে আগমন করে তা নষ্ট করে ফেলে, তারপর তা থেকে ফারিগ হয়ে চুল ছেটে নেয় পরে বসরায় বসবাস শুরু করে অতঃপর হজ্জের আগে উমরা করে এবং সেই বছরেই হজ্জ আদায় করে, তাহলে সে তামাত্তুকারী হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত।

সাহেবাইন বলেন, সে তামাত্তুকারী হবে। কেননা সে (বসরা থেকে যাত্রার মাধ্যমে) নতুন সফর করল। আর এই সফরে সে দু'টি ইবাদতের সুযোগ লাভ করেছে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে তার পূর্ব সফর নিরত রয়েছে।

আর যদি সে আপন পরিবারের নিকট ফিরে যায় এবং হজ্জের মাসে উমরা করে এবং সেই মাসেই হজ্জ করে, তাহলে সকলেরই মতে সে তামাত্তুকারী হবে। কেননা এটি হলো নতুন সফর। যেহেতু (বাড়িতে যাওয়ার কারণে) প্রথম সফর সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর নতুন সফরে দু'টি সহীহ্ ইবাদত সে সম্পন্ন করেছে।

সে যদি বসরায় গমন না করে মক্কাতেই অবস্থান করে এবং হজ্জের মাসে উমরা করে আর সে বছরই হজ্জ করে, তাহলে সকলের মতেই সে তামাত্তুকারী হবে না। কেননা তার উমরার ইহরাম হয়েছে মক্কা থেকে। এবং ফাসিদ উমরা দ্বারা তা প্রথম সফর সমাপ্ত হয়ে গেছে। আর মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি হজ্জের মাসে উমরা করে এবং সে বছর হজ্জও করে, সে দু'টোর যে কোনটি ফাসিদ করলে সেটির কর্মসমূহ পূর্ণ করবে। কেননা যাবতীয় আমল সম্পন্ন করা ছাড়া তো ইহরামের দায় থেকে সে মুক্ত হতে পারে না।

তবে তামাত্তু এর দম রহিত হয়ে যাবে। কেননা এক সফরের দু'টি সহীহ্ ইবাদত আদায় করার সুযোগ সে লাভ করেনি।

কোন স্ত্রী লোক যদি তামাত্তু করে, এরপর বকরী কুরবানী দেয়, তাহলে তামাত্তু এর দমের ব্যাপারে তা যথেষ্ট হবে না ।কেননা যা ওয়াজিব নয়, তা সে আদায় করেছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও এ হুকুম রয়েছে।

ইহরামের সময় যদি স্ত্রী লোক ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে গোসল করে ইহরাম বেধে নিবে এবং একজন হাজীর ন্যায় যাবতীয় কাজ করে যাবে। তবে পবিত্র হওয়ার আগে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে না।

এর দলীল 'আইশা(রা.) এর হাদীছ, যিনি সারিফ নামক স্থানে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া এজন্য যে, তাওয়াফের স্থান হল মসজিদ আর উকুফের স্থান হল খোলা মাঠ। আর এ গোসল হল ইহরামের জন্য, সালাতের জন্য নয়। সুতরাং গোসলের উদ্দেশ্য সফল হবে।

যদি উকুফের পরে এবং তাওয়াফ যিয়ারতের পরে ঋতুগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। বিদায়ী তাওয়াফ না করার কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা নবী (সা.) ঋতুগ্রস্ত নারীদের বিদায়ী হজ্জ তরক করার অনুমতি দান করেছেন।

যে ব্যক্তি মক্কাকে বাসস্থান রূপে গ্রহণ করে নেয়, তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ নেই। কেননা বিদায়ী তাওয়াফ ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব, যে মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করে। তবে ইমাম আবূ হানীফা(র.) থেকে একটি বর্ণনা আছে যে, কুরবানীর তৃতীয় দিন এসে যাওয়ার পর যদি বাসস্থান রূপে গ্রহণ করার নিয়্যত করে,তা হলে বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেউ কেউ ইমাম মুহাম্মদ(র.) থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। কেননা বিদায়ী তাওয়াফের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। সুতরাং এরপর ইকামতের নিয়্যত করার কারণে তা রহিত হবে না। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অপরাধ ও ত্রুটি

মুহরিম যদি খুশবু ব্যবহার করে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি পূর্ণ একটি অংগ কিংবা তার অধিক স্থানে খুশবু ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আর পূর্ণ অংগ হল যেমন মাথা,গোছা, উরু কিংবা এ ধরনের কোন অংগ। কেননা অপরাধ পূর্ণ গণ্য হয় সুযোগের গ্রহনের পূর্ণতার মাধ্যমে। আর তা হয় পূর্ণ এক অংগের মধ্যে ব্যবহারে। অতএব এর উপরই পূর্ণ প্রায়শ্চিত (দম) ওয়াজিব হবে।

যদি এক অংগ থেকেও কম পরিমাণে খুশবু ব্যবহার করে তাহলে তার উপর সাদকা ওয়াজিব হবে। ত্রুটি কম হওয়ার কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ(র) বলেন, অংগের পরিমাণ অনুপাতে দম ওয়াজেব হবে: অংশকে সমগ্রের তুলনা করে।

মুন্তাকা গ্রন্থে রয়েছে যে, একটি অংগের চতুর্থাংশ খুশবু ব্যবহার করলে তার উপর পূর্ণ দম ওয়াজিব হবে, মাথার চতুর্থাংশ হলক করার উপর কিয়াস করে। আমরা পরবর্তীতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করবো, ইনশাল্লাহ্।

দু'টি ক্ষেত্রে ছাড়া সকল ক্ষেত্রে ওয়াজিব দম বকরী দ্বারা আদায় হয়ে যাবে। আমরা ক্ষেত্র দু'টির উল্লেখ করব, হাদী অধ্যায়ে , ইনশাল্লাহ্।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইহরামের ক্ষেত্রে যে কোন অনির্ধারিত সাদাকা হল অর্ধ সা'আ গম। তবে উকূন বা টিড্ডি জাতীয় কিছু হত্যা করলে যা ওয়াজিব হয়(তা অর্ধ সা'আ নয়)।

ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, যদি কেউ মেহেদি দ্বারা মাথার চুল রঞ্জিত করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা খুশবু। রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- মেহেদি হলো খুশবু।

আর যদি তাতে মাথা প্রলিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো খুশবু ব্যবহার করার দম, অন্যটি হলো মাথা আবৃত করার দম।

আর যদি ওয়াসামাহ দ্বারা চুল রঞ্জিত করে, তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। কেননা তা সুগন্ধি নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মাথা ব্যাথায় চিকিৎসার জন্য ওয়াসামহর খেযাব লাগায়, তাহলে তার উপর দন্ড (দম) ওয়াজিব এ বিবেচনায় যে, তা মাথা আবৃত করে ফেলে। এ-ই বিশুদ্ধ মত।

মাবসূত কিতাবে এ প্রসংগে মাথা ও দাড়ির কথা একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর জামেউস সাগীর কিতাবে শুধু মাথার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের প্রত্যেকটির উপর ভিন্ন দম ওয়াজিব হবে।

যদি কেউ যয়তুন তেল ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, যদি চুলের মধ্যে ব্যবহার করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা তা উষ্কখুষ্কতা দূর করে। আর যদি চুল ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাহেবাইনের দলীল এই যে, এটি ভোগ্য দ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত। তবে তাতে কিছুটা উপকার লাভ রয়েছে। যেমন কীট ধ্বংস করা ও খুস্কতা দূর করা। সুতরাং তা লঘু ত্রুটির মধ্যে গণ্য। (সুতরাং দমের পরিবর্তে সাদাকা ওয়াজিব হবে)।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, যয়তুন তৈল হলো খুশবুর মূল। আর তাতেও কিছু না কিছু সুঘ্রাণ থাকে। তাছাড়া কীট ধ্বংস করে, চুল নরম করে, ময়লা ও উস্ক-খুস্কতা দূর করে। সুতরাং এই সব মিলে অপরাধের পূর্ণতা সাধিত হয়, কাজেই দম ওয়াজিব হবে। আর ভোগ্যদ্রব্যা হওয়া খুশবু হওয়ার বিপরীত নয়। যেমন জাফরান।

আর এই মতভিন্নতা হলো অবিমিশ্র যয়তুনের তেল এবং অবিমিশ্র তিলের তেল সম্পর্কে। আর এর মধ্যে খুশবু মিশ্রিত হলে তা ব্যবহারে সর্বসম্মত ভাবেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যেমন, বনস্পতি, ইয়াসমীন ও অন্যান্য সুগন্ধি জাতীয় তেল। কেননা এটি খুশবু। এই হুকুম তখন হবে, যখন খুশবু হিসাবে তা ব্যবহার করা হবে।

আর যদি তা দ্বারা জখম কিংবা পায়ের কাটার চিকিৎসা করা হয়, তাহলে তার উপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলো স্বয়ং সুগন্ধি নয়, বরং সুগন্ধির মূল। কিংবা এক প্রেক্ষিতে সুগন্ধি। সুতরাং সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করা শর্ত হবে। পক্ষান্তরে মিশক ও এই জাতীয় জিনিস দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের বিষয়টি এর বিপরীত। (এখানে সর্বাবস্থায় দম ওয়াজিব হবে।)

যদি পূর্ণ একদিন সেলাই করা কাপড় পরিধান করে কিংবা মাথা ঢেকে রাখে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি এর চেয়ে কম সময় হয় তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি অর্ধদিনের বেশী সময় পরিধান করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এটি ছিল ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর প্রথম দিকের মত।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন যে, শুধু পরিধান করলেই দম ওয়াজিব হবে। কেননা বস্ত্র শরীরের সংগে জড়িত হওয়া মাত্রই উপকারিতা পূর্ণ হয়ে যায়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল এই যে, বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য হলো (ঠান্ডা বা গরম দূর করার) উপকার লাভ। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময় বা মিয়াদ বিবেচনা করতে হবে, যাতে তা পূর্ণমাত্রায় হাসিল হয়। এবং তাতে দম ওয়াজিব হয়। সুতরাং সেই মিয়াদ একদিন দ্বারা ধার্য করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ একদিনের জন্য বস্ত্র পরিধান করা হয়, এরপর খুলে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে একদিনের কমে অপরাধ লঘু হয়ে যায়। তাই সাদাকা ওয়াজিব হবে।

তবে ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) অধিকাংশ সময়কে স্থলবর্তী বিবেচনা করেছেন।

যদি জামা চাদর রূপে ব্যবহার করে কিংবা বগল তলায় দিয়ে অপর কাধের উপর ফেলে রাখে কিংবা পায়জামাকে তহবন্দরূপে ব্যবহার করে, তাহলে কোন দোষ নেই। কেননা সে তা সেলাই করা কাপড় রূপে পরিধান করে নি। তদ্রূপ যদি দুই কাধ আবার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয় এবং উভয় হাত আস্তিনে প্রবেশ না করায়।

ইমাম যুফার(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

আমাদের দলীল এই যে, সে এটাকে আবা রূপে ব্যবহার করেনি। এ কারণেই এটি রক্ষা করতে কষ্ট স্বীকার করত হয়।

আর মাথা ঢাকার ব্যাপারেও সময়ের পরিমাণ তাই হবে, যা আমরা বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, যদি সম্পূর্ণ মাথা পূর্ণ একদিন ঢেকে রাখে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, এটা নিষিদ্ধ। আর যদি মাথার অংশ বিশেষ ঢেকে রাখে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক-চতুর্থাংশকে অপরাধ গণ্য করেছেন, মাথা মুড়ানো ও সতরের উপর কিয়াস করে। কেননা আংশিক আবরিত করা এমন উপকার ভোগ যা উদিষ্ট হয়ে থাকে। কোন কোন মানুষ এরূপ করায়ই অভ্যস্তও হয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আধিকের প্রকৃত অর্থ লক্ষ্য করে মাথার অধিকাংশও বিবেচনা করেন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি মাথার চতুর্থাংশ কিংবা দাড়ির চতুর্থাংশ বা তার বেশী হলক করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে ।আর যদি চতুর্থাংশের কম হয় তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মালিক(র.) বলেন, সবটুকু হলক না করলে দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, সামান্য পরিমাণ হলক করলেও দম ওয়াজিব হবে। তিনি একে হারাম শরীফের ঘাস-বৃক্ষের উপর কিয়াস করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, মাথার চতুর্থাংশ হলক করা পূর্ণ উপকার লাভের শামিল। কেননা এটি প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এতে পূর্ণ অপরাধ গণ্য হবে। কিন্তু চতুর্থাংশের কম হলে অপরাধ লঘু হবে। অংগের চতুর্থাংশে খুশবু মাখার ব্যাপারটি এর বিপরীত। কেননা (সচরাচর) তা উদ্দেশ্য হয় না। তদ্রুপ ইরাকে ও আর ব দেশেও দাড়ির অংশ বিশেষ হলক করার প্রচলন রয়েছে।

যদি সম্পূর্ণ ঘাড় হলক করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটি আলাদা অংগ, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে হলক করা হয়।

যদি উভয় বগল কিংবা একটি বগল হলক করা হয় তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা ময়লা দূর করা এবং স্বস্তি লাভের জন্য উভয়ের প্রত্যেকটিই হলকের উদ্দেশ্য হয়ে যাবে। সুতরাং(দম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে) নাভির নীচের চুলোর হুকুমের অনুরূপ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) এখানে (অর্থাত্ জামে সাগীরের বর্ণনায়) বগলদ্বয়ের ক্ষেত্রে মুড়ানোর কথা বলেছেন। কিন্তু মাবসূতের বর্ণনায় উপড়ানোর কথা রয়েছে আর সেটিই হলো সুন্নাত।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ(র.) বলেন, যদি পূর্ণ একটি অংগ হলক করে তাহল তার উপর দম ওয়াজিব হবে। তার চেয়ে কম হলে খাদ্য সামগ্রী সাদাকা করবে।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) পূর্ণ অংগ দ্বারা বুক, পায়ের গোছা ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। কেননা এ সকল অংগে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই লোমনাশক ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পূর্ণ অংগ হলক করলে অপরাধ পূর্ণ হবে আর আংশিক হলক করলে অপরাধ লঘু হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি মোচ ছাটে তাহলে একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের বিচার অনুসারে খাদ্যশস্য সাদাকা করা ওয়াজিব ।অর্থাত্ তিনি বিবেচনা করে দেখবেন যে, দাড়ির চতুর্থাংশের তুলনায় ছাটা মোচ কী পরিমাণ হচ্ছে; সেই অনুপাতে খাদ্যশস্য ওয়াজিব হবে। এমনকি যদি ছাটা মোট চতুর্থাংশের এক-চতুর্থাংশও হয় তাহলে একটি বকরীর চতুর্থাংশের মূল্য ওয়াজিব হবে। ছাটা শব্দটি প্রমাণ করে যে, মোচের ক্ষেত্রে এটাই সুন্নাত। হলক সুন্নাত নয়। বস্তুতঃ উপরের ঠোটের সীমা বরাবর ছাটা সুন্নাত।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যদি কেউ শিংগা লাগাবার স্থান হলক করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সাহেবাইন বলেন, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব। কেননা, হলক তো করা হয় শিংগা লাগানোর উদ্দেশ্যে। আর তা ইহরামের নিষিদ্ধ কাজ নয়। সুতরাং শিংগা লাগানোর সহায়কেরও একই হুকুম হবে। তবে যেহেতু এতে কিছুটা ময়লা দূর করা হয়, তাই সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, এ স্থানের হলকও উদ্দীষ্ট। কেননা তা ছাড়া মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব একটি পূর্ণ অংগ থেকে ময়লা দূর করার বিষয় সংঘটিত হয়েছে। তাই দম ওয়াজিব হবে।

যদি কোন মুহরিমের মাথা সে তার আদেশে কিংবা বিনা আদেশে মুড়িয়ে দেয় তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। আর যার মাথা মুড়ানো হলো তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, যদি তার আদেশ ছাড়া হয়ে থাকে, যেমন ঘুমন্ত অবস্থায়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে না। কেননা ইমাম শাফিঈ(র.) এর মূলনীতি হলো বল প্রয়োগ, ঐ ব্যক্তিকে, যার উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে, উক্ত কাজের দায়-দায়িত্বের পাকড়াও থেকে মুক্ত রাখে। আর ঘুম (অনিচ্ছার বিবেচনায়) বল প্রয়োগের চাইতেও অধিক।

আমাদের মতে ঘুম এবং বল প্রয়োগ গুনাহ্ রহিত করে, কিন্তু ফলাফল রহিত করে না। তাছাড়া দম ওয়াজিব হওয়ার কারণ তো সংঘটিত হয়েছে। আর তা হলো আরাম ও সৌন্দর্য লাভ। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিবই হবে নির্ধারিত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

অসহায় ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাধীন। কেননা এক্ষেত্রে বিপদ আসমানী। আর বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তো এসেছ বান্দার পক্ষ থেকে।

আর যার মাথা মুড়ানো হয়েছে, সে মুন্ডনকারীর নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা দম তো ওয়াজিব হয়েছে, সে যে আরাম লাভ করেছে, এ কারণে। সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে সংগম জনিত 'অর্থদন্ড' এর ক্ষেত্রে ধোকার সম্মুখীন হয়। তদ্রুপ মুন্ডনকারী যদি হালাল অবস্থায় থাকে তবু যে মুহরিমের মাথা মুড়ানো হয়েছে, তার ক্ষেত্রে বিধান ভিন্ন হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের বর্ণিত মাস'আলায় উভয় অবস্থায় মুন্ডনকারী উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ মতভিন্নতা রয়েছে যখন মুহরিম কোন হালাল ব্যক্তির মাথা মুড়িয়ে থাকে।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ মত ভিন্নতা রয়েছে যখন মুহরিম কোন হালাল ব্যাক্তির মাথা মুড়িয়ে থাকে।

ইমাম শাফিঈ(র.) এর দলীল এই যে, অণ্যের চুল মুড়ানো দ্বারা উপকার লাভ সাব্যস্ত হয় না। আর সেটাই হলো দম ওয়াজিবের কারণ।

আমদের দলীল এই যে, মানুষের শরীরে যা কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়,তা দূর করা ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্ত। কেননা ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশগুলো নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। যেমন হারাম শরীফের উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। সুতরাং তার ও অন্যের চুলের ব্যাপারে হুকুমের কোন পার্থক্য হবে না। তবে নিজের চুলের ব্যাপারে অপরাধ হয় পূর্ণমাত্রায়।

যদি কোন হালাল ব্যক্তির মোচ ছেটে দেয় কিংবা তার নখ কেটে দেয় তাহলে যে পরিমাণ ইচ্ছা খাদ্যশস্য দান করে দেবে। কারণ ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর এটাও এক ধরনের উপকার লাভ থেকে মুক্ত নয়। কেননা অন্যের ময়লা অবস্থা থেকেও মানুষ কষ্ট পায়, যদিও তা নিজের শরীরের ময়লা দ্বারা কষ্ট পাওয়ার তুলনায় কম। সুতরাং তাকে খাদ্যশস্য সাদাকা করতে হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি তার দু'হাত ও দু'পায়ের নখ কাটে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভূক্ত। এতে ময়লা দূর করা এবং শরীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জিনিস দূর করা হচ্ছে। সুতরাং যদি সবগুলো নখ কাটে তাহলে পূর্ণ উপকার লাভ সাব্যস্ত হয়। কাজেই 'দম' ওয়াজিব হবে।

যদি একই মজলিশে হয় তাহলে একটি দমের অতিরিক্ত হবে না। কেননা অপরাধটি একই ধরনের। যদি কয়েকটি মজলিসে হয়ে থাকে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ(র.)এর মতে একই হুকুম। কেননা এ অপরাধগুলোর ভিত্তি হলো একীভূত করার উপর। সুতরাং তা সাওম ভঙ্গের কাফ্ফারার সদৃশ হলো। তবে যদি কাফ্ফারা মাঝখানে আদায় করে দেয়। (তখন পরবর্তীটির জন্য আলাদা কাফ্ফার দিতে হবে) কেননা কাফ্ফারা আদায়ে প্রথম অপরাধের নিরসন হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে যদি প্রত্যেক মজলিসে একটি হাত বা একটি পায়ের নখ কেটে থাকে তাহলে চারটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে ইবাদতের অর্থ প্রবল। সুতরাং একীভূত করার বিষয়টি অভিন্ন মজলিসের সাথে শর্তযুক্ত। যেমন সাজদার আয়াতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যদি এক হাত বা এক পায়ের নখ কেটে থাকে তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে।

এ হুকুমের ভিত্তি হলো চতুর্থাংশকে সমগ্রের স্থলবর্তী করার উপর। যেমন মাথা মুড়ানোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

যদি পাচ আংগুলের কম নখ কেটে থাকে তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। অর্থাত্ প্রতিটি নখের পরিবর্তে একটি করে সাদাকা ওয়াজিব হবে।

ইমাম যুফার(র.) বলেন, তিনটির নখ কেটে থাকলেও একটি দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর প্রথম দিকের মত। কেননা হাতের পাচটি আংগুলের জন্য একটি দম ওয়াজিব হয়। আর তিনটি পাচটির অধিকাংশ।

আর কিতাবে যে হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ এই যে, এক হাতের পাচটি আংগুলের নখ কর্তন, যার উপর দম ওয়াজিব হয়-এর সর্বনিম্ন পরিমাণ। আর সেটাকে আমরা সমগ্র নখের স্থলবর্তী করেছি। সুতরাং এক হাতের

http://islaminonesite.wordpress.com/

অধিকাংশকে আবার তার সমগ্রের স্থলবর্তী করা যাবে না। কেননা তাহলে এ ধারা অনিঃশ্বেষিত ভাবে চলতে থাকবে।

যদি দুই হাত-পায়ের বিভিন্ন আংগুলের পাচটি নখ কাটে তাহলে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও আবূ ইউসূফ(র.) এর মত।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, দম ওয়াজিব হবে এক হাতের পাচটি নখ কাটলে আর মাথার বিভিন্ন স্থান থেকে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ চুল মুড়ালে যেমন একটি দম ওয়াজিব হয়।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও আবূ ইউসূফের (র.) দলীল এই যে, অপরাধের পূর্ণতা সাব্যস্ত হয় আরাম ও সৌন্দর্য লাভের মাধ্যমে। অথচ এভাবে কাটা দ্বারা অস্বস্তি ও অসৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। মাথার বিভিন্ন স্থান থেকে হলক করার বিষয়টি এর বিপরীত, কেননা এটি প্রচলিত, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে। আর অপরাধ যখন লঘু হয় তখন তাতে সাদাকা ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রতিটি নখের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাবে।

একই হুকুম হবে যদি বিক্ষিপ্তভাবে পাচটি নখের বেশী কেটে থাকে। তবে যদি সব কটি সাদাকা একটি দমের পরিমাণ হয়ে যায়, তখন যতটুকু ইচ্ছা সামান্য কম করে দিবে।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, যদি মুহরিমের নখ ভেংগে ঝুলে যায়, আর সে তা কেটে ফেলে দেয় তাহলে তার উপর দন্ড আসবে না। কেননা ভেংগে য্াওয়ার পর আর তার বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং তা হারামের শুস্ক বৃক্ষের সদৃশ হলো।

যদি কোন ওযরের কারণে খুশবু ব্যবহার করে কিংবা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করে থাকে কিংবা মাথা মুড়ায়, তাহলে তার ইখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে একটি বকরী যবাহ করবে কিংবা ইচ্ছা করলে ছয়জন মিসকীনকে তিন সা'আ গম দান করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে তিনদিন রোযা রাখবে।

কেননা আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- তাহলে ফিদাঈয়া দিতে হবে রোযা দ্বারা কিংবা সাদাকা দ্বারা কিংবা যবাহ দ্বারা । অব্যয়টি ইচ্ছা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত। আর

http://islaminonesite.wordpress.com/

রাসূলুল্লাহ(সা.) আয়াতটির ব্যাখ্যা এরূপই করেছেন, যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। আয়াতটি মা'যূর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

সাওম যে কোন স্থানেই আদায় করা যেতে পারে। কেননা সাওম হলো সর্বস্থানের ইবাদত। আমাদের মতে সাদাকারও একেই কারণে একই হুকুম। কিন্তু যবাহ করার বিষয়টি সকলের মতেই হরমের সাথে বিশিষ্ট। কেননা রক্ত প্রবাহিত করাকে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা নির্দিষ্ট স্থানেই শুধু ইবাদতের রূপে গন্য করা হয়েছে। আর এই দম কোন সময়ের সাথে বিশিষ্ট নয়। সুতরাং স্থানের সাথে বিশিষ্ট হওয়া অবধারিত হয়ে গেলো।

যদি খাদ্য সাদাকা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে দুপুর ও রাত্রে দু'বেলা খাইয়ে দেয়া যথেষ্ট হবে। তিনি এটাকে কসমের কাফ্ফারার উপর কিয়াস করেন।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে তা জাইয হবে না। কেননা সাদাকা শব্দটি মালিকানার ইংগিত বহন করে। আর আয়াতে সেটাই উল্লেখিত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ: ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সম্ভোগ

যদি আপন স্ত্রীর গুপ্তাংশের প্রতি কাম দৃষ্টিতে তাকায় এবং বীর্যস্খলিত হয়ে যায় তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা হারাম হলো সহবাস করা আর তা এখানে পাওয়া যায়নি। সুতরাং এটা কাম চিন্তার কারণে বীর্যস্খলিত হওয়ার অনুরূপ হলো।

যদি কামভাবে চুম্বন বা স্পর্শ করে তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

জামেউস সাগীর কিতাবে বলা হয়েছে, যদি কামভাবে স্পর্শ করে এবং বীর্যস্খলিত হয়(তবে দম ওয়াজিব হবে)। আর মাবসূত কিতাবে রয়েছে, বীর্যস্খলিত হওয়া না হওয়ার কোন পার্থক্য নেই। আর অনুরূপ হুকুম লজ্জাস্থানের বাইরে সংগম করার

http://islaminonesite.wordpress.com/

ক্ষেত্রেও। একই হুকুম (অর্থাত্ স্খলন হওয়া না হওয়া উভয় অবস্থাতেই দম ওয়াজিব হবে।)

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, এই সকল অবস্থায় বীর্যস্খলন হলে তার ইহরাম ফাসিদ হয়ে যাবে। তিনি এটাকে সাওমের উপর কিয়াস করেছেন।

আমাদের দলীল এই যে, হজ্জ নষ্ট হওয়ার সর্ম্পক হলো সংগমের সংগে। এ কারণেই অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের কোনটির কারণেই হজ্জ নষ্ট হয় না। আর এগুলো তো উদ্দিষ্ট সংগম নয়। সুতরাং যা মূল সংগমের সংগে সম্পৃক্ত তা এগুলোর সংগে যুক্ত হবে না। তবে এগুলোতে স্ত্রী থেকে আনন্দ লাভ ও সংগমের অর্থ বিদ্যমান আর তা হজ্জের নিষিদ্ধ বিষয়; এ জন্য দম ওয়াজিব হবে। সাওমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা সাওমে নিষিদ্ধ বিষয় হলো শাহওয়াত পূর্ণ করা। আর লজ্জাস্থান ছাড়া অন্যত্র সংগমে বীর্যস্খলন ছাড়া তা পূর্ণ হয় না।

যদি কেউ আরাফায় অবস্থানের পূর্বে ‘দুই পথের’ কোন একটিতে সংগম করে তাহলে তার হজ্জ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং একটি বকরী যবাহ করা তার উপর ওয়াজিব আর সে ঐ ব্যক্তির মতোই হজ্জের ক্রিয়াকর্ম করে যাবে, যার হজ্জ নষ্ট হয়নি।

এ বিষয়ে মূল দলীল বর্ণিত হাদীছ যে, নবী করীম(সা.) কে ঐ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে তার স্ত্রীর সংগে উভয়ে হজ্জের ইহরামে থাকা অবস্থায় সহবাস করেছে। তিনি বললেন, উভয়ে একটি দম দিবে এবং নিজেদের হজ্জের ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে। আর আগামী বছর তাদের উপর হজ্জ করা ওয়াজিব। সাহাবায়ে কিরামের এক জামা’আতের থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, একটি উট ওয়াজিব হবে ঐ ব্যক্তির উপর কিয়াস করে যে, আরাফায় উকুফের পরে যদি সে সহবাস করে বাদানাহ ওয়াজিব হবে। তার বিপক্ষে দলীল হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছের নিঃশর্ততা।

তা ছাড়া এ কারণে যে, হজ্জের কাযা যখন ওয়াজিব হয়েছে- আর তা কল্যাণ পুনঃঅর্জনের জন্যই ওয়াজিব হয়ে থাকে- তখন অপরাধের দিকটি লঘু হয়ে গেল।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সুতরাং বকরী যবাহ্ করাই যথেষ্ট হবে। উকুফের পরের অবস্থা এর বিপরীত। কেননা, তখন হজ্জের কাযা করা ওয়াজিব হয় না।

ইমাম কুদূরী(র.) উভয় পথের সংগমকে অভিন্ন ধরেছেন।

আর আবূ হানীফা(র.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, সম্মুখ পথ ছাড়া হলে সংগমের অপূর্ণতার কারণে ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা হলো।

আমাদের মতে তাদের নষ্টকৃত হজ্জ কাযা করার সময় স্ত্রীকে দূরে রাখা তার জন্য জরুরী নয়।

ইমাম মালিক(র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, তারা যখন থেকে বের হবে তখন থেকে আলাদা হয়ে যাবে। ইমাম যুফার(র.) বলেন, যখন উভয়ে ইহরাম বাধবে (তখন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।)

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, যখন ঐ স্থানে উপনীত হবে, যেখানে সহবাস করেছিল (তখন বিচ্ছিন্ন হবে)।

তার দলীল এই যে, (সেই স্থানে পৌছায়) স্বামী-স্ত্রী বিগত হজ্জের সহবাসের কথা স্মরণ করতে এবং সহবাসে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং উভয়ে বিচ্ছিন্ন থাকবে।

আমাদের দলীল এই যে, উভয়ের মাঝে সংযোগকারী গুণ তথা 'বিবাহ' তাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং ইহরামের পূর্বে তাদের বিচ্ছিন্ন থাকার কোন অর্থ নেই। কেননা তখন তো সহবাস করা জাইয রয়েছে। ইহরামের পরেও একই কথা। কেননা তারা আলোচনা করবে যে, ক্ষণিক আনন্দের মাশুল হিসাবে কি কঠিন কষ্ট আর ভোগান্তি তাদের হচ্ছে। ফলে স্বভাবঃতই তাদের লজ্জা ও অনুতাপ বৃদ্ধি পাবে এবং তা পরিহার করে চলবে। সুতরাং বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

যে ব্যক্তি উকুফে আরাফার পরে সহবাস করবে তার হজ্জ ফাসিদ হবে না, তবে তার উপর উট কুরবানী ওয়াজিব হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, যদি রামীর পূর্বে সহবাস করে তাহলেও তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের দলীল হল রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বাণী- ব্যক্তি আরাফায় উকূফ করল, তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। তবে উট ওয়াজিব ইব্ন 'আব্বাস (রা.) এর ফাতওয়ার কারণে। কিংবা এই কারণে যে, সহবাস হলো উপকার লাভের সর্বোচ্চ পর্যায়। সুতরাং তার ওয়াজিবও হবে গুরুতর।

যদি হলকের পরে সহবাস করে তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা স্ত্রী সহবাসের ক্ষেত্রে তার ইহরাম বহাল রয়েছে; সেলাই করা কাপড় পরিধান করা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ব্যাপারে বহাল নেই। সুতরাং অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু হয়ে গেলো। ফলে বকরীই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি উমরার চার চক্কর তাওয়াফ সম্পন্ন করার পূর্বে সহবাস করবে, তার উমরা ফাসিদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সে উমরার ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাবে এবং তা কাযা করবে আর তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব। আর যদি চার বা তার বেশী চক্কর তাওয়াফ করার পর সহবাস করে, তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কিন্তু তার উমরা ফাসিদ হবে না।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, উভয় অবস্থাতেই ফাসিদ হয়ে যাবে এবং হজ্জের উপর কিয়াস করে তার উপর একটি উট ওয়াজিব হবে। কেননা তার মতে হজ্জের ন্যায় উমরাও ফরয। আমাদের দলীল এই যে, উমরা হলো সুন্নাত। সুতরাং এর মর্যাদা হজ্জের চেয়ে নিম্নতর। সুতরাং উভয়ের পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য উমরার ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব হবে এবং হজ্জের ক্ষেত্রে উট ওয়াজিব হবে।

যে ব্যক্তি ইহরামের কথা ভুলে গিয়ে সহবাস করে, তার হুকুম ঐ ব্যক্তির মতই যে, ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করল।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, ভুলে গিয়ে সহবাস করা হজ্জকে নষ্ট করে না। একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে ঘুমন্ত ও বল প্রয়োগকৃত স্ত্রীলোকের সংগে সহবাসের ক্ষেত্রে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তিনি বলেন, এ সকল উপসর্গের কারণে নিষেধাজ্ঞা বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং তার এ কর্মটি ‘অপরাধ’ বলে গণ্য নয়।

আমাদের দলীল এই যে, হজ্জ নষ্ট হওয়ার কারণ ইহরাম অবস্থায় বিশেষ উপকার ভোগ করা। আর তা এ সকল উপসর্গের কারণে বিলুপ্ত হয় না।

আর হজ্জ সাওমের সমপর্যায়ের নয়। কেননা ইহরামের অবস্থাই হলো স্মরণ প্রদানকারী, যেমন সালাতের অবস্থা। পক্ষান্তরে সিয়ামের বিষয়টি এর বিপরীত। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

পরিচ্ছেদ: তাহারাত ব্যতীত তাওয়াফ সংশ্লিষ্ট বিষয়।

যে ব্যক্তি হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম করে, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, উক্ত তাওয়াফ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- তাওয়াফ হলো নামায, কিন্তু (পার্থক্য এই যে,) আল্লাহ্ তা’আলা তাতে কথা বলা বৈধ করেছেন। সুতরাং তাহারাত তাওয়াফের শর্ত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, আল্লাহ্ তা’আলার বাণী- তোমরা প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করো। এখানে তাহারাতের শর্ত আরোপ করা হয়নি। সুতরাং তা ফরয হবে না। তবে কেউ কেউ তাহারাতকে সুন্নাত বলেছেন। আর বিশুদ্ধতম মত এই যে, তা ওয়াজিব। কেননা তা তরক করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।

তাছাড়া এই কারণে যে, ওয়াহিতদ পর্যায়ের হাদীছ আমল ওয়াজিব করে। সুতরাং এ দ্বারা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হবে।

সুতরাং যখন তাওয়াফে কুদূম শুরু করবে, তখন সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও শুরু করার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তাহারাতে তরক করার কারণে তাতে ত্রুটি আসবে। সুতরাং সাদাকা দ্বারা তা পূরণ করতে হবে । (দমের পরিবর্তে সাদাকা ধার্য করার কারণ হলো) আল্লাহর পক্ষ থেকে যা ওয়াজিবকৃত অর্থাৎ তাওয়াফে

http://islaminonesite.wordpress.com/

যিয়ারত, তার চেয়ে এর মর্যাদার নিম্নতা প্রকাশ করা। অনুরূপ হুকুম যে কোন নফল তাওয়াফের বেলায়ও।

যদি হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করে তাহলে তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা সে রুকনের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করেছে; সুতরাং তা প্রথমটির চেয়ে গুরুতর হবে। সুতরাং দম দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

আর যদি সে জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফ করে, তবে তার উপর উট ওয়াজিব হবে। ইব্ন আব্বাস(রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ কারণে যে, জানাবাত হলো হাদাছের চেয়ে গুরুতর। সুতরাং পার্থক্য প্রকাশ করার জন্য উট দ্বারা ক্ষতিপূরন ওয়াজিব হবে।

অনুরূপ হুকুম যখন তাওয়াফের অধিকাংশ চক্কর জানাবাতের অবস্থায় কিংবা হাদাছের অবস্থায় করে। কেননা কোন কিছুর অধিকাংশটুকু তার সম্পূর্ণের হুকুম দ্বারা ধারণ করে।

তবে যতক্ষণ মক্কায় থাকে ততক্ষণ তাওয়াফ পুনরায় করে নেওয়াই উত্তম। তখন তার উপর দম ওয়াজিব নয়। কোন কোন অনুলিপিতে রয়েছে যে, পুনরায় তাওয়াফ করা তার উপর ওয়াজিব।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, হাদাছের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব পর্যায়ে তাকে পুনরায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেয়া হবে। আর জানাবাতের ক্ষেত্রে ওয়াজিব পর্যায়ে আদেশ করা হবে। কেননা জানাবাতের কারণে ত্রুটি গুরুতর এবং হাদাছের কারণে ত্রুটি লঘু।

যাহোক যদি পূর্বে হাদাছ অবস্থায় তাওয়াফ করার পর পুনরায় তাওয়াফ করে তাহলে তার উপর যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে না। যদিও সে কুরবানীর পর পুনঃতাওয়াফ করে থাকে। কেননা পুনরায় সম্পন্ন করার ত্রুটির সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান থাকে না।

আর যদি জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করার পর কুরবানীর দিনগুলোতে পুনরায় তাওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা নির্ধারিত

http://islaminonesite.wordpress.com/

সময়ের ভিতরেই সে পুনঃতাওয়াফ করেছে। যদি কুরবানীর দিনগুলোর পর সে পুনঃতাওয়াফ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী বিলম্বের কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

আর যদি কেউ জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফ করার পর বাড়িতে ফিরে যায়, তাহলে তার ফিরে আসা আবশ্যক। কেননা ত্রুটি অনেক বেশী। সুতরাং এর ক্ষতি পূরণের জন্য তাকে ফিরে আসার আদেশ করা হবে। আর নতুন ইহরাম বেধে ফিরবে।

আর যদি ফিরে না গিয়ে উট পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে। কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, এটা উক্ত তাওয়াফের জন্য ক্ষতিপূরণকারী। তবে ফিরে এসে তাওয়াফ করাই উত্তম।

যদি হাদাছের অবস্থায় তাওয়াফের পর বাড়ীতে ফিরে এসে আবার গিয়ে পুনঃতাওয়াফ করে নিলে জাইয হয়ে যাবে। আর যদি দম (দম হিসাবে) বকরী প্রেরণ করে তাহলে তা উত্তম। কেননা ত্রুটির দিকটি লঘু। আর বকরী প্রেরণে ফকীরদের উপকার রয়েছে।

যদি তাওয়াফে যিয়ারত মোটেই না করে বাড়িতে ফিরে এসে থাকে তাহলে তাকে ঐ ইহরাম নিয়েই (মক্কায়) ফিরে যেতে হবে। কেননা পূর্ব ইহরাম থেকে হালাল হওয়া পাওয়া যায়নি। সুতরাং তাওয়াফ করা পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস থেকে মুহরিম অবস্থায়ই থেকে যাবে।

যে ব্যক্তি হাদাছ অবস্থায় (বিদায়ী তাওয়াফ) করল, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেননা এ তাওয়াফ ওয়াজিব হলেও তার স্থান তাওয়াফে যিয়ারতের নিম্নে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা জরুরী।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) থেকে আরেক মতে রয়েছে যে, এক বর্ণিত বকরী ওয়াজিব হবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যদি বিদায়ী তাওয়াফ জানাবাতের অবস্থায় করে থাকে তাহলে বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা এটি গুরুতর ত্রুটি। তার বিদায়ী তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারতের চাইতে নিম্নতর। তাই বকরীই যথেষ্ট হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি তাওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর বা এর চাইতে কম চক্কর ছেড়ে দেয় তার উপর বকরী ওয়াজিব । কেননা কম পরিমাণ তরক করার ত্রুটি সামান্য। সুতরাং তা হাদাছের কারণে সৃষ্ট ত্রুটির সদৃশ হবে। সুতরাং তার উপর বকরী ওয়াজিব।

যদি বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে আবার না গিয়ে বকরী প্রেরণ করা যথেষ্ট হবে। আমরা পূর্বে এর বর্ণনা করেছি।

আর যে ব্যক্তি তাওয়াফের চার চক্কর তরক করলো; সে থেকে যাবে। যতক্ষণ না পুনরায় তাওয়াফ করবে। কেননা অধিকাংশ পরিমাণই বর্জিত হয়েছে। কাজেই সে যেন তাওয়াফ করেই নি।

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফ তরক করলো কিংবা তার চার চক্কর তরক করলো, তার উপর একটি বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা সে ওয়াজিব তরক করেছে কিংবা ওয়াজিবের অধিকাংশ তরক করেছে। আর যতক্ষণ সে মক্কায় থাকবে, ততক্ষণ সে পুনরায় তাওয়াফ করার জন্য আদিষ্ট। যাতে ওয়াজিব তার সময় মত আদায় হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি বিদায়ী তাওয়াফের তিন চক্কর তরক করলো, তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি হাতীমের ভিতরে দিয়ে ওয়াজিব তাওয়াফ আদায় করলো, সে যদি মক্কায় অবস্থানরত থাকে, তাহলে পুনরায় তাওয়াফ করে নেবে। কেননা আগেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, হাতীমের বাহির দিয়ে তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

হাতীমের ভিতর দিয়ে তাওয়াফ করার অর্থ হলো কা'বা শরীফের পার্শ্ব দিয়ে তাওয়াফ করার সময় কা'বা শরীফ ও হাতীমের মধ্যবর্তী উভয় করিডোরে দিয়ে প্রবেশ করে। এরূপ করলে সে তার তাওয়াফে ত্রুটি সৃষ্টি করলো। সুতরাং সে যতক্ষণ মক্কায় থাকবে ততক্ষণ সম্পূর্ণ তাওয়াফ পুনরায় করে নেবে, যাতে তার তাওয়াফ শরীআত সম্মতভাবে আদায় হয়ে যায়।

যদি শুধু হাতীমের অংশটিতে পুনঃতাওয়াফ করে তাহলেও যথেষ্ট হবে। কেননা সে বর্জিত অংশটি আদায় করে ফেলেছে। এর সুরত এই যে, হাতীমের বাইরে ডান

http://islaminonesite.wordpress.com/

থেকে আরম্ভ করে হাতীমের শেষ মাথায় যাবে। অতঃপর করিডোর দিয়ে হাতীমের ভিতরে প্রবেশ করে, অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। এভাবে সাতবার করবে।

যদি পুনঃতাওয়াফ তনা করে বাড়িতে ফিরে আসে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা প্রায় চতুর্থাংশ আমল তরক করার কারণে তার তাওয়াফ ত্রুটিপূর্ণ রয়ে গেছে। সুতারাং সাদাকা তার জন্য যথেষ্ট হবে না।

যে ব্যক্তি উযু ছাড়া তাওয়াফে যিয়ারত করলো এবং আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিকে তাহারাতের অবস্থা, বিদায়ী তাওয়াফ করে, তার উ্পর একটি দম ওয়াজিব। আর যদি জুনুবী অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করে থাকে, তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব।

এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে।

উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথম সুরতে তার বিদায়ী তাওয়াফ তাওয়াফে যিয়ারতে রূপান্তরিত হয়নি। কেননা বিদায়ী তাওয়াফ হলো ওয়াজিব। আর হাদাছের কারণে তাওয়াফ যিয়ারত পুনরায় করা ওয়াজিব নয়, বরং তা মুস্তাহাব। সুতরাং বিদায়ী তাওয়াফে যিয়ারতের রূপান্তরিত করা হবে না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরতে বিদায়ী তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারতে রূপান্তরিত করা হবে। কেননা এ অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত দোহরানো ওয়াজিব। সুতরাং সে বিদায়ী তাওয়াফ তরক করল এবং তাওয়াফে যিয়ারতকে কুরবানীর দিকগুলো থেকে বিলম্ব করল। এমতাবস্থায় বিদায়ী তাওয়াফ তরক করার কারণে সর্বসম্মতিক্রমে দম ওয়াজিব হবে। আর তাওয়াফে যিয়ারত বিলম্ব করার কারণে দম ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্কে মত পার্থক্য রয়েছে। তবে যতদিন মক্কায় অবস্থান করবে, ততদিন পুনরায় তার উপর বিদায়ী তাওয়াফ করার হুকুম রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের পর সে হুকুম আর থাকবে না। যেমন আমরা বয়ান করে এসেছি।

যে ব্যক্তি উযূ ছাড়া উমরার তাওয়াফ ও সাঈ করলো এবং ইহারামমুক্ত হয়ে গেলো সে মক্কায় অবস্থান কালে উভয়টি পুনরায় আদায় করে নিবে। আর তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তাওয়াফ পুনরায় করার কারণ এই যে, হাদাছের কারনে তাতে ত্রুটি এসেছে। আর সাঈ পুনরায় করার কারণ এই যে, তা তাওয়াফের অনুগত। যখন উভয়টি পুনরায় আদায় করবে, তখন ত্রুটি রহিত হওয়ার কারণে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না।

আর যদি পুনরায় ফিরে আসার আদেশ দেওয়া হবে না। কেননা তার হালাল হওয়া সংঘটিত হয়ে ছে উমরার রুকন আদায়ের পরে। আর যে ত্রুটি হয়েছে, তা সামান্য।

আর সাঈর ক্ষেত্রেও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা সে একটি গ্রহণযোগ্য তাওয়াফের পর সাঈ করেছে।

তদ্রুপ (কোন দন্ড আসবে না) যদি তাওয়াফ পুনরায় করে, কিন্তু সাঈ পুনরায় না করে। এটাই বিশুদ্ধ মত।

যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ তরক করে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে আর তার হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা আমাদের মতে সাঈ হলো ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এটা তরক করার কারণে দম ওয়াজিব হবে, কিন্ত হজ্জ ফাসিদ হবে না।

যে ব্যক্তি (হজ্জের) ইমামের পূর্বে (সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে) আরাফাত থেকে ফিরে আসে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে ।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা রুকন হলো আরাফার মূল অবস্থান। সুতরাং অবস্থান দীর্ঘায়িত না করার কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

আমাদের দলীল এই যে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান অব্যাহত রাখা ওয়াজিব । কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- তোমরা সূর্যাস্তের পর রওয়ানা হবে। সুতরাং তা তরক করার কারণে দম ওয়াজিব হবে। আর কেউ যদি রাত্রে উকুফ করে, তার অবস্থা এর বিপরীত। কেননা উকুফ অব্যাহত রাখা ঐ ব্যাক্তির জন্য ওয়াজিব, যে ব্যক্তি দিনে অবস্থান করে, রাত্রে নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি সূর্যাস্তের পর আরাফায় ফিরে আসে, তাহলে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না। এ হলো জাহিরে রিওয়াত অনুযায়ী। কেননা যা ছুটে গেছে, তার পুনঃপ্রাপ্তি হবে না। আর যদি সূর্যাস্তের পূর্বে ফিরে আসে, তবে এতে মত ভিন্নতা রয়েছে।

যে ব্যক্তি মুযদালিফায় অবস্থান তরক করবে, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এ হল ওয়াজিব আমলসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

যে ব্যক্তি সবকটি দিনের কংকর নিক্ষেপ তরক করলো, তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা ওয়াজিব তরক করা সংঘটিত হয়েছে। তবে একটি দমই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা প্রতি দিনের কংকর নিক্ষেপ একই শ্রেণীভূক্ত, যেমন চুল মুন্ডণের ব্যাপারে। সমস্ত শরীরের চুল মুন্ডনের কারণে একই দম ওয়াজিব হয়।

কংকর নিক্ষেপ তরক করা সাব্যস্ত হবে শেষ দিন (তের তারিখে) সূর্যাস্ত দ্বারা। কেননা শুধু ঐ দিনগুলোতেই কংকর নিক্ষেপ ইবাদত হিসাবে গৃহীত। সুতরাং উক্ত দিনগুলো যতক্ষণ অবশিষ্ট রয়েছে, ততক্ষণ রামী পুনরায় করা সম্ভব। সুতরাং সে ধারাবাহিকভাবে কংকর পুনঃনিক্ষেপ করে নিবে।

তবে বিলম্বের কারণে দম ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে। সাহেবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন।

যদি একদিনের রামী তরক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা একটা হজ্জের সমান।

আর যে ব্যক্তি (এক দিনের) তিনটি জামরার কোন একটি রামী তরক করে,তবে তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রতি দিনের সবক'টি মিলে হলো হজ্জের একটি পূর্ণ আমল। সুতরাং যা ছেড়ে দিয়েছে,তাহলো এক আমল থেকে কম। তবে যদি অর্ধেকের বেশী ছেড়ে দেয় তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। যেহেতু অধিকাংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আর যদি কুরবানীর দিনের (দশ তারিখের) জামরাতুল আকাবার রামী ছেড়ে দেয় তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা রামীর ক্ষেত্রে সে এই দিনের পূর্ণ আমল তরক করেছে। একই হুকুম হবে যদি সে উক্ত রামীর অধিকাংশ ছেড়ে দেয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি একটি দু'টি বা তিনটি কংকর তরক করে, তাহলে প্রতিটি কংকরের জন্য অর্ধ সা'আ গম সাদাকা করবে। তবে যদি তা একটি দমের পরিমাণে পৌছে যায়, তাহলে নিজ বিবেচনায় কিছু কম করে দেবে। কেননা ছেড়ে দেওয়া অংশ হলো কম। সুতরাং তার জন্য সাদাকা যথেষ্ট হবে।

যে ব্যক্তি মাথা মুড়ানো বিলম্বিত করলো, এমন কি কুরবানীর দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেলো তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। একই হুকুম হবে যদি তাওয়াফ যিয়ারত বিলম্বিত করে।

সাহেবাইন বলেন, উভয় ক্ষেত্রেই তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না। এরূপ মতভিন্নতা রয়েছে রামী বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে এবং একটি আমলকে আরেকটি আমলের উপর অগ্রবর্তী করার ব্যাপারে। যেমন, রামীর পূর্বে হলক করা, হজ্জে কিরানকারীর রামীর পূর্বে কুরবানী করা এবং যবাহ্ করার পূর্বে হলক করার ক্ষেত্রেও।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, যা ফউত হয়েছে (সর্বসম্মতিক্রমে) তা কাযা করার মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। আর 'কাযা' এর সাথে অন্য কোন দন্ড ওয়াজিব হয় না। আর ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল হলো হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা.) এর হাদীছ। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জের কোন একটি আমলের উপর অন্য কোন আমলকে অগ্রবর্তী করবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

তাছাড়া এ কারণে যে, যে আমল স্থানের সাথে নির্দিষ্ট, যেমন ইহরাম, তা উক্ত স্থান থেকে বিলম্বিত করলে দম ওয়াজিব হয়। তেমনি সময়ের সাথে নির্ধারিত যে আমলে, তা উক্ত সময় থেকে বিলম্বিত করলে অনুরূপ হুকুম হবে।

যদি কুরবানীর দিনগুলোতে হারামের বাইরে হলক করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যে ব্যক্তি উমরা হারাম থেকে বের হয়ে গেলো, অতঃপর চুল ছাটলো, তার উপর দম ওয়াজিব হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) বলেন, তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মুহাম্মদ(র.) জামেউস সাগীর কিতাবে উমরাকারীর ক্ষেত্রে আবূ ই্উসূফ(র.) এর মতে উল্লেখ করেছেন আর হজ্জকারীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি।

কোন কোন মতে (দম ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি) সর্বসম্মত। কেননা হজ্জের ক্ষেত্রে মিনায় হলক করার সুন্নাত ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। আর মীনা হল হারামের অন্তর্ভূক্ত।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, এতে মতপার্থক্য রয়েছে। আবূ ইউসূফ(র.) এর দলীল এই যে, হলক করার হুকুম হারামের সাথে খাস নয়। কেননা নবী (সা.) ও তার সাহাবায়ে কিরাম হুদায়বিয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হারামের বাইরেই হলক করেন।

সাহেবাইনের দলীল এই যে, হলককে যখন (ইহরাম থেকে) হালালকারী রূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তখন তা সালাতের শেষে সালামের ন্যায় হয়ে গেলো। কেননা সালাম (সালাত থেকে) হালালকারী হওয়া সত্ত্বেও সালাতের ওয়াজিবসমূহরে অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং ইহরাম যখন হজ্জের আমল রূপে সাব্যস্ত হলো, তখন যবাহ্র মত তা হারামের সাথেই বিশিষ্ট হবে । ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) এর দলীলের জবাব এই যে, হুদায়বিয়ার কিছু অংশ তো হারামে অবস্থিত। সুতরাং হয়ত তারা হারাম ভুক্ত অংশে হলক করেছেন।

মোট কথা, ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে ‘হলক’ হলো ‘কাল’ (কুরবানীর দিন-সমূহ) ও স্থান (হারাম) এর সাথে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে তা কোনটির সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। আর ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ, কিন্তু কালের সাথে নয়। আর ইমাম যুফার(র.) এর মতে কালের সাথে সীমাবদ্ধ, স্থানের সাথে নয়। (স্থান বা কালের সাথে) সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই মতবিরোধ দম দ্বারা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমেই তা স্থান বা কাল কোনটির সাথেই বিশিষ্ট নয়।

উমরার ক্ষেত্রে চুল ছাটা বা চাছা সর্বসম্মতিক্রমে কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। কেননা মূল উমরাই তো কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। স্থানের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা উমরার পুরো আমলই নির্ধারিত স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, যদি চুল না ছেটে চলে যায়, অতঃপর ফিরে আসে এবং ছাটে তাহলে সকলের মতেই তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। অর্থাত্ উমরাকারী যদি হরমের বাইরে চলে যায় অতঃপর ফিরে আসে। কেননা সে তো চাছা বা ছাটার কাজটি যথাস্থানেই করেছে। সুতরাং তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না। হজ্জে কিরানকারী যদি যবাহ করার পূর্বে হলক করে, তাহলে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। একটি দম হলো অসময়ে হলক করার কারণে। কেননা হলকের যথা সময় হলো 'যবাহ' এর পরে। আরেকটি দম হলো যবাহ্কে হলক থেকে বিলম্বিত করার কারণে।

সাহেবাইনের মতে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর তা প্রথমটি বিলম্বের কারণে কিছুই ওয়াজিব হবে না। এর কারণ ইতোপূর্বে আমরা বলে এসেছি।

পরিচ্ছেদ: শিকার

জেনে রাখা উচিত যে, স্থলের শিকার মুহরিমের জন্য হারাম। আর পানির শিকার তার জন্য হালাল। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। স্থলের শিকার বলতে ঐ সমস্ত প্রাণীকে বোঝানো হয়েছে, যার জন্ম ও বাস পানিতে।

আর শিকার অর্থ আত্মরক্ষাকারী এবং জন্মগতভাবে বন্য প্রাণী। তন্মেধ্যে পাচটি দুষ্ট প্রাণীকে রাসূলুল্লাহ্(সা.) ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। সেগুলো হলো দংশনকারী কুকুর, নেকড়ে, চিল, কাক ও সাপ-বিচ্ছু। কেননা এগুলো নিজে থেকেই প্রথমে আক্রমণ করে।

আর কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য, যা মরা খায়। ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে একথাই বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, মুহরিম যদি কোন শিকার হত্যা করে কিংবা যে হত্যা করবে তাকে বাতলিয়ে দেয়, তবে তার উপর দন্ড ওয়াজিব হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

হত্যা করার ক্ষেত্রে দন্ড ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- ইহরাম অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা কর না। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার হত্যা করল, তার উপর দন্ড ওয়াজিব।

এখানে দন্ড ওয়াজিব হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে। শিকার দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিঈ(র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, (আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে,) দন্ডের সম্পর্ক হলো হত্যার সাথে। আর শিকার বাতলে দেওয়া হত্যা করা নয়। সুতরাং এটা হালাল ব্যক্তি হালাল ব্যাক্তিকে শিকার দেখিয়ে দেয়ার সদৃশ হলো।

আমাদের দলীল হলো (ইহরাম অধ্যায়ের শুরুতে) বর্ণিত আবূ কাতাদা(রা.) এর হাদীছ।

আর 'আতা বলেন, এ বিষয়ে লোকদের ইজমা রয়েছে যে, শিকার যে দেখিয়ে দেবে,তার উপর দন্ড ওয়াজিব হবে।

তাছাড়া এই জন্য যে, শিকার দেখিয়ে দেওয়া ইহরামের নিষিদ্ধ কাজসমূহের অন্তর্ভূক্ত। কারণ, তাতে শিকারের নিরাপত্তা নষ্ট করা হয়। কেননা সে তার বন্যতা ও আত্মগোপনতা দ্বারা নিরাপদ ছিলো। সুতরাং দেখিয়ে দেওয়া হত্যা করার মতই হলো।

আরেকটি কারণ এই যে, মুহরিম তার ইহরামের মাধ্যমে শিকারের সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকা নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছে। সুতরাং অনিবার্যকৃত দায়িত্ব বর্জন করার কারণে ক্ষতিপূরণ দিবে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার নিকট কিছু আমানত রাখা হয়ে থাকে।

হালাল ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তার পক্ষ থেকে তো কোন দায়িত্ব বদ্ধতা নেই। তদুপরি ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) ও ইমাম যুফার (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হালাল ব্যক্তির উপরও দন্ড ওয়াজিব হবে।

বাতলিয়ে দেয়ার কারণে দন্ড ওয়াজিব হওয়ার শর্ত এই যে, যাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো, সে শিকারের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না আর দেখিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তাকে সে বিশ্বাস করেছে।। সুতরাং যদি সে তাকে অবিশ্বাস করে এবং অন্যকে

http://islaminonesite.wordpress.com/

বিশ্বাস করে তবে যাকে অবিশ্বাস করা হলো, তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

আর যে দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ হালাল ব্যক্তি যদি হারামেরও হয় তবুও তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না্। আমরা এর কারণ উপরে বলেছি।

দন্ড ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখিয়ে দেওয়া আর ভুলে দেখিয়ে দেওয়া সমান। কেননা এটা এমন ক্ষতিপূরণ, যার ভিত্তি হলো প্রাণনাশ করা। সুতরাং এটা মাল নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ সদৃশ হলো।

আর প্রথমবার অন্যায়কারী এবং দ্বিতীয়বার অন্যায়কারীর হুকুম অভিন্ন। কেননা ওয়াজিব হওয়ার কারণ অভিন্ন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে দন্ড এই যে, যে স্থানে শিকার হত্যা করা হয়েছে, সে স্থানে কিংবা (জঙ্গল এলাকা হলে) তার নিকটতম স্থানে শিকারকৃত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করা হবে। দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ করবেন। অতঃপর জাযা আদায় করার ব্যাপারে শিকারীর ইচ্ছার উপর ন্যাস্ত। যদি উক্ত প্রাণীর মূল্য একটি হাদী ক্রয় করার সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলে ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা একটি হাদী ক্রয় করে যবাহ্ করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে উক্ত মূল্য দ্বারা খাদ্য সামগ্রী খরিদ করে প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা'আ গম কিংবা একে সা'আ খেজুর বা যব সাদাকা করবে। কিংবা চাইলে সিয়াম পালন করবে। যেমন সামনে আমরা বর্ণনা করবো।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) ও শাফিঈ(র.) বলেন, যে সকল শিকার কৃত জন্তুর সমতুল্য 'গঠনের' জন্তু রয়েছে, সেক্ষেত্রে সমতুল্য জন্তু জাযা রূপে ওয়াজিব হবে। সুতরাং হরিণের ক্ষেত্রে বকরী, হায়েনার ক্ষেত্রে বকরী, খরগোশের ক্ষেত্রে এক বছর বয়স্ক মেষশাবক, বন্য ইদুর এর ক্ষেত্রে চারমাস বয়স্ক মেষশাবক ওয়াজিব হবে। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- যে প্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার সমতুল্য প্রাণী জাযারূপে ওয়াজিব হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আর শিকারের সমতূল্য প্রাণী সেটাই হবে, যেটা দৃশ্যতঃ হত্যাকৃত প্রাণীর সদৃশ। কেননা মূল্যকে তো বলা যায় না। আর সাহাবায়ে কিরাম আকৃতিগত দিক থেকে সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন।

আর উটপাখি, হরিণ, বন্যগাধা ও খরগোশের সদৃশ প্রাণী সেগুলোই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। আর রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, হায়েনা একটি শিকার এবং তার ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব হবে।

আর যে সকল প্রাণীর আকৃতিগত সদৃশ প্রাণী নেই, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে মূল্য ওয়াজিব হবে। যেমন চড়ুইপাখি, কবুতর ইত্যাদি। আর যখন মূল্য ওয়াজিব হবে, তখন ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও আবূ ইউসূফ(র.) এর মত অনুযায়ী হবে।

ইমাম শাফিঈ(র.) কবুতরের ক্ষেত্রে বকরী ওয়াজিব বলে মত প্রকাশ করেন এবং উভয়ের মাঝে সদৃশ প্রমাণ করেন এদিক থেকে যে, উভয়ের প্রতিটি লম্বা চুমুকে পানি পান করে এবং প্রায় অভিন্ন রকম শব্দ করে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও আবূ ই্উসূফ(র.) এর দলীল এই যে, নিঃশর্ত সমতুল্যতা দ্বারা সমতুল্যই গ্রহণ করা হবে। কেননা শরীআতে এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যেমন হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে।

কিংবা এ কারণে যে, সর্বসম্মতভাবে গুণগত সমতুল্যতার অর্থ উদ্দেশ্য। কিংবা এ কারণে যে, গুণগত সমতুল্যতার মধ্যে ব্যাপকতা রয়েছে। আর বিপরীত ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা রয়েছে।

আর আল্লাহ্ অধিক অবগত ‘নাস’ এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, জাযা হলো যে বন্যপ্রাণী হত্যা করা হয়েছে, তার মূল্য।

আর শব্দটি বণ্য ও গৃহপালিত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এরূপ বলেছেন, আবূ উবায়দ ও আছমারী। আর যে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য মূল্য নিরূপণ করা, নির্দিষ্ট প্রাণী সাব্যস্ত করা নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে হাদী কিংবা খাদ্য সামগ্রী কিংবা সিয়ামকে ভাষা হিসাবে সাব্যস্ত করার ইখতিয়ার হলো হত্যাকারীর।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিঈ(র.) বলেন, এ বিষয়ে ইখতিয়ার হলো ন্যায়পরায়ণ বিচারকদ্বয়ের। যদি তারা হাদী এর ফায়সালা করেন, তাহলে আকৃতিগত সমতূল্য প্রাণী ওয়াজিব হবে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর যদি তারা খাদ্য সামগ্রী বা সিয়ামের ফায়সালা করেন, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ(র.) যেমন বলেছেন (অর্থাত্ শিকারের মূল্য নির্ধারণ করে তা দ্বারা খাদ্য সামগ্রী খরিদ করে সাদাকা করা হবে।)

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও ইমাম ইউসূফ(র.) এর দলীল এই যে, ইখতিয়ার প্রদানের বিষয়টি শরীআতে অনুমোদিত হয়েছে দায়গ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি আহসানীর জন্য। সুতরাং শিকারের হাতেই ইখতিয়ার থাকা উচিত, যেমন কাসমের কাফ্ফারার ইখতিয়ারের ব্যাপারে।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিঈ(র.) এর দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তা ফায়সালা করবে অর্থাত্ হাদী যা কা'বা পর্যন্ত উপনীত হবে কিংবা মিসকীনদের খাদ্য রুপে কাফ্ফারা কিংবা সেই পরিমাণ রোযা, যাতে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে।

শব্দটিকে রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তা আয়াতের এর ব্যাখ্যা রূপে এবং বিচারকের বা বিচার ক্রিয়ার (ক্রিয়াগত কর্মকারক) রুপে এসেছে। অতঃপর অব্যয় দ্বারা খাদ্য সাদাকা এবং সিয়াম পালনের বিষয় দু'দুটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ইখতিয়ারের বিষয়টি বিচারকদ্বয়ের হাতেই থাকবে।

আমরা বলি শব্দটিকে করা হয়েছে এর উপর। এর উপর নয়। প্রমাণ এই যে, শব্দটি হয়েছে। তদ্রুপ শব্দটি হয়েছে। সুতরাং এ দুটিতে বিচারকদ্বয়ের পশুর মূল্য নির্ধারণের জন্য। অতঃপর ইখতিয়ার থাকবে ঐ ব্যক্তির হাতে, যার উপর জাযা ওয়াজিব হয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ঐ স্থানেই বিচারকদ্বয় মূল্য নির্ধারণ করবেন, যেখানে মুহরিম শিকার হত্যা করেছে। কেননা স্থানের বিভিন্নতার কারণে মূল্য পার্থক্য হয় থাকে।

যদি স্থানটি মরু প্রান্তর হয় যেখানে শিকার বেচাকেনা হয় না, তাহলে তার নিকটতম এমন স্থান বিবেচনায় আনা হবে, যেখানে পশু বেচাকেনা হয়।

মাশায়েখগণ বলেছেন, মূল্য নির্ধারণ এর ক্ষেত্রে একজন যথেষ্ট তবে দু'জন হওয়া উত্তম। কেননা তা অধিক সতর্কতাপর্ণ এবং ভুল হওয়া থেকে অধিক নিরাপদ। যেমন হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে ।

আর কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে এখানে দু'জনের হওয়া আবশ্যক রূপে বিবেচনা করা হবে।

'হাদী' মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও যবাহ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা্'আলা বলেছেন- হাদী যা কা'বায় উপনীত হবে।

তবে মিসকীনদেরকে খাদ্য প্রদান মক্কা ছাড়া অন্যত্র জাইয হবে। ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি এটাকেও হাদী এর উপর কিয়াস করেন। উভয়ের মাঝে এ ব্যাপারে সমন্বয় হলো হারামের অধিবাসীদের জন্য সচ্ছলতা বিধান।

আমরা বলি, হাদী যবাহ করা এমন একটি বিশেষ ইবাদত, যা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। সুতরং তা স্থান ও কালের সাথে বিশিষ্ট হবে। আর ছাদাকা হলো সর্ব সময়ে ও সর্বস্থানে বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি ইবাদত।

আর সাওম মক্কায় পালন করা জাইয হবে। কেননা তা সর্বস্থানেই ইবাদত রূপে অনুমোদিত।

যদি কুফায় (অর্থাত্ মক্কা ছাড়া অন্যত্র) যবাহ করে তাহলে তা খাদ্য সামগ্রী প্রদানের বিকল্প হিসাবে জাইয হবে। অর্থাত্ যদি এ পরিমাণ গোশ্ত (প্রতি মিসকীনকে) সাদাকা করে আর তা ওয়াজিব খাদ্য সামগ্রীর মূল্যের সমপরিমাণ হয়। কেননা 'যবাহ' করা খাদ্যসামগ্রী সাদাকা করার স্থলবর্তী হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি শিকারী হাদী যবাহ্ করা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে কুরবানী রূপে যা যথেষ্ট তা হাদী রূপে যবাহ্ করবে। কেননা নিঃশর্তভাবে হাদী শব্দটি কুরবানীর পশুকেই বোঝায়।

ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিঈ(র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ছোট পশুর জাইয হবে। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম (খরগোশের ক্ষেত্রে) এক বছরী মেষশাবক এবং (বন্য ইঁদুরের ক্ষেত্রে) চার মাস বয়সের মেষশাবক ওয়াজিব করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে খাদ্য সামগ্রী প্রদান হিসাবে ছোট পশু জাইয হবে, যদি তা সাদাকা করে। (যবাহ্ হিসাবে নয়)।

যদি খাদ্যসামগ্রী সাদাকা করাকে গ্রহণ করে নেয় তাহলে আমাদের মতে খাদ্য সামগ্রীর মাধ্যমে হত্যাকৃত পশুটির মূল্য নির্ধারণ করা হবে। কেননা, হত্যাকৃত পশূরই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব, সুতরাং তার মূল্যই বিবেচনা করা হবে।

যখন মূল্য ছাড়া খাদ্য সামগ্রী খরিদ করবে, তখন প্রত্যেক মিসকীনকে ‘অর্ধ সা’আ গম কিংবা এক সা’আ খেজুর বা যব সাদাকা করবে। কোন মিসকীনকে অর্ধ সা’আ এর কম খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা জাইয হবে না। কেননা কুরআন শরীফে উল্লেখিত দ্বারা শরীআতের নির্ধারিত পরিমাণই উদ্দেশ্য হবে।

আর যদি সিয়াম পালনই গ্রহণ করে তাহলে হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণ করবে খাদ্যসামগ্রীর মাধ্যমে। অতঃপর প্রত্যেক অর্ধ সা’আ গম কিংবা এক সা’আ খেজুর বা যবের পরিবর্তে একদিন রোযা রাখবে। কেননা, সিয়াম দ্বারা হত্যাকৃত পশুর মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, সাওমের কোন অর্থমূল্য নেই। তাই আমরা খাদ্য সামগ্রীর দ্বারাই তার মূল্য নির্ধারণ করলাম।

আর এইভাবে (অর্ধ সা’আ দ্বারা রোযার) মূল্য নির্ধারণ করা শরীআতে প্রচলিত, যেমন, সিয়ামের ফিদইয়ার ক্ষেত্রে।

যদি অর্ধ সা’আ এর কম খাদ্য সামগ্রী বেচে যায়, তাহলে সে ইচ্ছাধীন। চাইলে সে অবশিষ্ট খাদ্য (গম) সাদাকা করে দেবে কিংবা চাইলে তার পরিবর্তে একদিনের

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাওম পালন করবে। কেননা এক দিনের কম সময়ের সাওম তো শরীআতসম্মত নয়।

একই হুকুম হবে যদি খাদ্য সামগ্রী একজন মিসকীনের খাদ্য পরিমাণ থেকে কম হয় তাহলে ওয়াজিব পরিমাণই দান করবে, অথবা পূর্ণ একদিন রোযা রাখবে।

উপরে আমরা এর কারণ বলেছি। যদি কোন শিকারকে আহত করে কিংবা তার পশম উপড়ে ফেলে কিংবা তার কোন অংগ কর্তন করে,তাহলে একারণে তার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অংশবিশেষকে সমগ্রের উপর কিয়াস করে এ হুকুম আরোপ করা হয়েছে। যেমন, হকুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়।

যদি কোন পাখীর পালক উপড়ে ফেলে কিংবা কোন শিকারের হাত পা কেটে ফেলে, যার ফলে সে আত্মরক্ষার অবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাহলে তার পূর্ণ মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে আত্মরক্ষার উপায় নষ্ট করে দেওয়ার মাধ্যমে সে শিকারের নিরাপত্তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং সে তার পূর্ণ মূল্য ক্ষতিপূরণ দিবে।

যে ব্যক্তি উটপাখীর ডিম ভেংগে ফেললো তাকে তার মূল্য দান করতে হবে। আলী ও ইবন আব্বাস(রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া এই কারণে যে, এ হলো শিকার উটপাখীর মূল এবং তাতে শিকারে (তথা উটপাখীতে) রূপান্তরিত হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। সুতরাং যদি তা নষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে সতর্কতা হিসাবে সেটিকে শিকারের স্থলবর্তী ধরা হবে।

যদি ডিম থেকে মৃতছানা বের হয় তাহলে তাকে উক্ত ছানার মূল্য দান করতে হবে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দানী সাধারণ কিয়াসের দাবী হলো শুধু ডিমের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। কেননা ছানাটির প্রাণ অজ্ঞাত।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, (কুদরতের পক্ষ হতে) ডিমকে প্রস্তুতই করা হয়েছে তা থেকে জীবিত ছানা বের হয়ে আসার জন্য। আর সময়ের পূর্বে ভেংগে ফেলাই

http://islaminonesite.wordpress.com/

হচ্ছে (দৃশ্যতঃ) তার মৃত্যুর কারণ। সুতরাং সতর্কতা হিসাবে মৃতুকে ডিম ভাংগার সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে।

(বাহিক কারনের সাথে সম্পৃক্ত করার) এই নীতির ভিত্তিতেই (বলা হয় যে) যদি কেউ হরিণের পেটে আঘাত করে, ফলে হরিণ মৃত বাচ্চা প্রসব করে এবং নিজেও মারা যায়, তাহলে তার উপর উভয়ের মূল্য ওয়াজিব হবে।

কাক, চিল, (শকুন) নেকড়ে, সাপ, বিচ্ছু, ইদুর ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করার কারণে কোন জাযা আসবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, পাচটি প্রাণী হলো দুষ্ট প্রকৃতির। এগুলোকে হিল(হরমের বাইরে) হরম সর্বত্র হত্যা করা হবে। এগু্লো হলো চিল, সাপ, বিচ্ছু, ইদুর ও মূল্য ওয়াজিব হবে।

কাক, চিল, (শকুন) নেকড়ে, সাপ, বিচ্ছু ইদুর ও দংশনকারী কুকুর হত্যা করার কারণে কোন জাযা আসবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, পাচটি প্রাণী হলো দুষ্ট প্রকৃতির। এগুলোকে হিল(হরমের বাইরে) হরম সর্বত্র হত্যা করা হয়। এগুলো হলো চিল, সাপ, বিচ্ছু, ইদুর ও দংশনকারী কুকুর।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, মুহরিম (তার ইহরামের অবস্থায়) ইদুর,কাক, চিল, বিচ্ছু ও ইদুর এবং দংশনকারী কুকুর হত্যা করতে পারবে।

কোন কোন বর্ণনায় নেকড়ের কথাও উল্লেখিত হয়েছে। কারো কারো মতে দংশনকারী কুকুর দ্বারা নেকড়ে উদ্দেশ্য। কিংবা বলা যেতে পারে যে, নেকড়ে দংশনকারী কুকুরের সমপর্যায়ভূক্ত।

হাদীছে উল্লেখিত কাক দ্বারা ঐ কাক উদ্দেশ্য, যে মুর্দার খায় আবার শস্য দানাও খায়। কেননা এই কাক প্রারম্ভেই কষ্ট দেয়। পক্ষান্তরে নামক (ছাতার জাতীয়) পাখি এর অন্তর্ভূক্ত নয়। এটাকে কাক বলা হয় না। এবং তা প্রারম্ভে কষ্ট দেয় না।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, দংশণকারী কুকুর এবং সাধারণ কুকুর তদ্রুপ গৃহপালিত কুকুর এবং বণ্য কুকুর সবই অভিন্ন। কেননা কুকুর শ্রেণীটাই মূলতঃ উদ্দেশ্য। তদ্রুপ গৃহবাসকারী ইদুর ও বন্য ইদুর অভিন্ন। গুই সাপ

http://islaminonesite.wordpress.com/

ও কাঠবিড়ালী ব্যতিক্রমী পাচটি প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এগুলো নিজে প্রারম্ভে কষ্ট দেয় না।

মশা, পিপড়া, বোলতা ও আঠালি হত্যা করলে দন্ড আসবে না। কেননা, এগুলো শিকার এর অন্তর্ভূক্ত নয় এবং এগুলো শরীর থেকে সৃষ্ট নয়। তাছাড়া এগুলো স্বভাবত ভাবেই কষ্টদানকারী।

পিপড়া দ্বারা কালো ও লাল পিপড়া উদ্দেশ্য, যে গুলো কামড়ায়। যে সমস্ত পিপড়া কামড়ায় না, সেগুলোকে হত্যা করা জাইয হবে না। তবে প্রথমোক্ত কারণে (অর্থাত্ শিকারভূক্ত না হওয়ার কারণে) কোন 'জাযা' ওয়াজিব হবে না।

যে ব্যক্তি উকুন হত্যা করবে সে একমুঠ গমের মতো যৎসাম্য যা ইচ্ছা সাদাকা করে দেবে। কেননা শরীরের ময়লা থেকে সৃষ্ট।

জামেউস সাগীরের মতে 'কিছু খাদ্য দান করবে'। এটা প্রমাণ করে যে, একটুকরা রুটির মতো কোন মিসকীনকে সামান্য কিছু খাদ্য দান করাই যথেষ্ট হবে, যদিও তা উদর পূর্তির পরিমাণ না হয়।

যে ব্যক্তি টিড্ডি হত্যা করে সে ইচ্ছা মাফিক কিছু পরিমাণ সাদাকা দিবে। কেননা টিড্ডি হলো স্থলচর শিকার। কেননা শিকার বলা হয় ঐ প্রাণীকে, যাকে কৌশল ছাড়া ধরা যায় না। আর শিকারী ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ধরতে চায়।

একটি খেজুরও একটি টিড্ডি থেকে উত্তম। কেননা উমর(রা.) বলেছেন, একটি খেজুর একটি টিড্ডি থেকে উত্তম।

কচ্ছপ ধরে হত্যা করলে কোন দন্ড আসবে না। কেননা তা কীটপতংগভূক্ত। সুতরাং গাদি পোকা ও কাকলাস সমতূল্য। আর এগুলোকে বিনা কৌশলে ধরা যায়, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো কেউ ধরে না। সুতরাং এগুলো শিকার নয়।

যে ব্যক্তি হরমের শিকার ধরে দোহন করলো, তার উপর দুধের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা দুধ শিকারের অংশ। সুতরাং তা পূর্ণ শিকারের সমতুল্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি এমন শিকার হত্যা করলো, যার গোশত খাওয়া হয় না, যেমন(সিংহ বাঘ ও নেকড়ে জাতীয়) হিংস্রপ্রাণী এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রাণী (যেমন বাজ, শকুন ইত্যাদি হিংস্রপ্রাণী) তাহলে তার উপর ‘জাযা’ ওয়াজিব হবে, এগুলো ব্যতীত, যেগুলোকে শরীআত ব্যতিক্রমী সাব্যস্ত করেছে। আর এগুলো (ইতোপূর্বে) আমরা গণনা (বর্ণনা) করেছি।

আর ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, জাযা ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলো স্বভাবগত ভাবে কষ্টদায়ক। সুতরাং এগুলো ব্যতিক্রমধর্মী দুষ্টপ্রাণী সমূহের অন্তর্ভূক্ত হবে। তদ্রুপ আভিধানিক দিক থেকে শব্দটি যাবতীয় হিংস্রপ্রাণীকে অন্তর্ভূক্ত করে।

আমাদের দলীল এই যে, হিংস্রপ্রাণী তার বন্য স্বভাবের কারণে শিকার রূপে গণ্য। তাছাড়া এগুলোকে চামড়া সংগ্রহের উদ্দেশ্য কিংবা এগুলো দ্বারা অন্য শিকার ধরার উদ্দেশ্যে কিংবা এগুলোর জ্বালাতন রোধ করার উদ্দেশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা হয়।

(হাদীছে উল্লেখিত) দুষ্ট প্রাণীসমূহের উপর কিয়াস করা সম্ভব নয়। কেননা তাতে হাদীছে বর্ণিত সংখ্যা অকার্যকার করা হয়। আর প্রচলিত ব্যবহারে শব্দটি হিংস্রপ্রাণী সমূহের উপর প্রযুক্ত হয় না। আর প্রচলিত ব্যবহারই অধিক কার্যকর।। আর তার মূল্য একটি বকরীর মূল্যকে অতিক্রম করবে না।

ইমাম যুফার (র.) বলেন, ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর কিয়াস করে এখানেও মূল্য যে পরিমাণই পৌছাক, তাই ওয়াজিব হবে।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বাণী হায়েনাও শিকারভুক্ত এবং এতে এক বকরী ওয়াজিব।

তাছাড়া এ কারণে যে, যেগুলোর মূল্য বিবেচনা করা হয় মূলতঃ চামড়া থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাব্যতার কারণে; এ কারণে নয় যে, তা হামলা করে এবং কষ্ট দেয়। এদিক থেকে বাহ্যতঃ তার মূল্য বকরীর মূল্যের অধিক হবে না।

কোন হিংস্রপ্রাণী যদি মুহরিমের উপর হামলা করে আর সে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব নয়।

ইমাম যুফার (র.) হামলাকারী উটের উপর কিয়াস করে বলেন, ওয়াজিব হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের দলীল হলো, উমরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ যে, তিনি একটি হিংস্রপ্রাণী হত্যা করে একটি মেষ হাদী রুপে যবাহ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা আগে বেড়ে তাকে হত্যা করেছি।

আর এ কারণে যে, মুহরিমকে শিকারের পিছনে লাগাতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তার অত্যাচার রোধ করতে নিষেধ করা হয়নি। একারণই তো যেগুলোর পক্ষ থেকে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলোকে রোধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেমন দুষ্ট প্রকৃতির প্রাণী সমূহের বেলায়। সুতরাং যে প্রাণীর অত্যাচার বাস্তব রূপ লাভ করেছে, তাকে রোধ করার বেলায় অনুমতি হওয়া আরো যুক্তিযুক্ত। আর শরীআতের পক্ষ হতে অনুমতি থাকা অবস্থায় শরীআতের অধিকার হিসাবে শাখা ওয়াজিব হবে না।

হামলাকারী উটের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা অধিকার যার, অর্থাত(উটের) মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতি নেই।

আর মুহরিম যদি (ক্ষুধার্ত অবস্থায়) বাধ্য হয়ে কোন শিকার হত্যা করে, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে স্পষ্ট বাণী দ্বারা অনুমতির বিষয়টি কাফ্ফারার সাথে আবদ্ধ, যেমন ইতোপূর্বে আমরা তিলাওয়াত করে এসেছি।

মুহরিমের গৃহপালিতে বকরী, গুরু, উট, মুরগী ও হাস জাইয করায় কোন দোষ নেই। কেননা বন্যতার বৈশিষ্ট্য না থাকাতে এই প্রাণীগুলোকে শিকার ভুক্ত নয়। আর হাস দ্বারা ঐ হাস উদ্দেশ্য, যা বাড়ীতে কিংবা জলাশয়ে থাকে। কেননা জন্মগতভাবেই তা প্রতিপালিত।

যদি কেউ রোম কবুতর হত্যা করে তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে।

ইমাম মালিক (র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। তার দলীল এই যে, তা পালিত, মানুষের সংগ লাভে আশস্ত এবং আপন ডানা দ্বারা আত্মরক্ষা সমর্থ নয়। কেননা সে ধীরগতিসিম্পন্ন।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমরা বলি, কবুতর সৃষ্টিগত ভাবেই বন্য স্বভাবের এবং উড্ডয়ন দ্বারা আত্মরক্ষায় সমর্থ, যদিও তা ধীরগতি সম্পন্ন। আর মানুষের সংগ লাভে অভ্যস্ত হওয়াটা অস্থায়ী। সুতরাং তা বিবেচ্য নয়।

তদ্রূপ গৃহপালিত হরিণ হত্যা করলে(দন্ড ওয়াজিব হবে) কেননা মূলতঃ তা শিকার। সুতরাং সংগ লাভের সাময়িক অভ্যস্থতা তার শিকার গুণ রহিত করবে না। যেমন উট যদি পালিয়ে গিয়ে বন্য হয়ে পড়ে, তাতে মুহারিমের জন্য হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে শিকারভূক্ত হবে না।

মুহরিম যদি কোন শিকার যবাহ করে, তাহলে তার যবাহকৃত পশু মুর্দার হিসাবে বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়া হালাল হবে না।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, মুহরিম যদি অন্য কারো জন্য যবাহ করে তাহলে তা হালাল হবে। কেননা সে তো হলো অপর ব্যক্তিটির পক্ষ থেকে কার্যসম্পাদনকারী। সুতরাং তার কর্ম উক্ত ব্যক্তিটির সংগেই সম্পৃক্ত হবে।

আমাদের দলীল এই যে, যবাহ হলো শরীআতসম্মত একটি কর্ম। আর এটি (মুহরিমের জন্য) হারাম কর্ম। সুতরাং যবেহ রূপে বিবেচিত হবে না, যেন মাজূসীর যবাহকৃত জন্তু।

এটি এজন্য যে বিধান রূপে শরীআতসম্মত যবাহকেই গোশ্ত ও রক্তের মাঝে পার্থক্যকারী স্থলবর্তী গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং শরীআতসম্মত যবেহ না হলে পার্থক্যকারীরও থাকবে না।

যবাহকারী মুহরিম যদি উক্ত পশুর কোন কিছু ভক্ষণ করে,তাহলে ভক্ষিত অংশের মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে।

এটি ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, যা খেয়েছে, তার জাযা দিতে হবে না। অন্য কোন মুহরিম যদি তা থেকে খায়, তাহলে সকলের মতেই তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

সাহেবাইন দলীল এই যে, এটা তো মুর্দার। সুতরাং তা খাওয়ার কারণে তাওবা করা ছাড়া অন্য কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। অন্য কোন মুহরিম খেলে তা হুকুম হয় এটির সে হুকুম হবে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, আমরা একথা উল্লেখ করে এসেছি যে, মুহরিমের যবাহ্কৃত পশু হারাম হওয়ার কারণ হলো তা মুর্দার হওয়া। এবং এ কারণে যবাহ্ করাটা তার ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তার ইহরামের শিকারকে যবাহ্ এর পাত্র হওয়া থেকে এবং যবাহ্কারীদের যবাহ্র যোগ্যতা থেকে বের করে দিয়েছে। সুতরাং ভক্ষণ হারাম হওয়ার বিষয়টি এ সকল মাধ্যম বিদ্যমান থাকার কারণে তার ইহরামের সংগে যুক্ত হবে ।অন্য মুহরিমের বেলায় এর হুকুম বিপরীত। মুহরিমের বিষয়টি এর বিপরীত। মুহরিমের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা তার ভক্ষণ করাটা তার ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়।

কোন হালাল ব্যক্তি যে শিকার করা হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইমাম মালিক(র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। তার দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- মুহরিম কোন শিকারের গোশত খেলে আপত্তি নেই, যদি সে নিজে শিকার না করে থাকে, কিংবা তার জন্য শিকার করা না হয়ে থাকে।

আমাদের দলীল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম মুহরিমের ব্যাপারে শিকারে গোশতের বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন, তাকে কোন অসুবিধা নেই। আর ইমাম মালিক(র.) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন,তাতে ব্যবহৃত অব্যয়টি মালিকানা জ্ঞাপক। সুতরাং (তার জন্য শিকার করার) অর্থ হবে জীবন্ত শিকারটি তাকে দান করা (যবাহ্ করে) গোশত দান করা নয়। কিংবা অর্থ এই যে, তার আদেশে শিকার করা হয়েছে।

ইমাম কুদুরী(র.) শিকার না দেখিয়ে দেয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, (আমাদের মাযহাবে) শিকার দেখিয়ে দেয়া হারাম। কিন্তু মাশায়েখগণ বলেন যে, এ বিষয় দু'টি বর্ণনা রয়েছে। হারাম হওয়ার দলীল হলো আবূ কাতাদা(রা.) এর হাদীছ। আর তা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কোন হালাল ব্যক্তি যদি হরম শরীফ এলাকার শিকার যবাহ্ করে, তা হলে তার মূল্য ওয়াজিব হবে, যা সে দরিদ্রদের মাঝে সাদাকা করে দেবে। কেননা শিকার হরম এলাকার হওয়ার কারণে নিরাপত্তার অধিকারী। এক দীর্ঘ হাদীছে রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- (হরমের শিকারকে তাড়া করা যাবে না)।

আর রোযা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে না। কেননা এটা হলো অর্থদন্ড, কাফ্ফারার নয়। সুতরাং মালের ক্ষতিপূরণ সদৃশ হলো।

এ পার্থক্যের কারণ এই যে, ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়েছে পাত্রের মাঝে (অর্থাত্ শিকারের মাঝে) বিদ্যমান একটি গুণ নষ্ট করার কারণে। আর তা হলো নিরাপত্তার অধিকার। পক্ষান্তরে কাফ্ফারার রূপে মুহরিমের উপর রোযা ওয়াজিব হয়েছে, তা হলো তার কর্মের শাস্তি। কেননা হুরমাত(বা হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হয়েছে, তার মাঝে বিদ্যমান একটি গুণের কারণে। সেটা হলো তার ইহরাম। আর রোযা কর্মের সাজা হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিন্তু কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আর ইমাম যুফার(র.) বলেন যে,রোযা রাখা তার জন্য যথেষ্ট হবে, -মুহরিমের উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, তার উপর কিয়াস করে। উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য আমরা উল্লেখ করে এসেছি।

এ ক্ষেত্রে হাদী যথেষ্ট হবে কিনা, এ সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে।

যে ব্যক্তি হরম অঞ্চল কোন শিকার সংগে করে প্রবেশ করলো, তার কর্তব্য হবে হরম অ্ঞ্চলে তা ছেড়ে দেওয়া, যদি তা তার হাতে থাকে।

এ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ(র.) এর ভিন্নমত রয়েছে। তিনি বলেন, বান্দার প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বান্দার মালিকানাধীন জিনিসে শরীআতের হক প্রকাশ পায় না।

আমাদের দলীল এই যে, যখন সেটা হরম এলাকায় এসে গেছে তখন হরমের সম্মান রক্ষার্থে 'পাকড়াও' পরিহার করা তার অবশ্য কর্তব্য হবে। কিংবা (বলা যায় যে,) তা হরমের শিকার হয়ে গেছে; সুতরাং বর্ণিত হাদীছ এর কারণে নিরাপত্তার অধিকারী হয়ে গেছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যদি সে তা বিক্রি করে থাকে তাহলে শিকার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিক্রয় প্রত্যাহার করতে হবে। কারণ বিক্রি জাইয হয়নি। কেননা এতে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করার দিক রয়েছে, আর তা নিষিদ্ধ।

আর যদি শিকার অপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে তার উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা শিকার যে নিরাপত্তার অধিকারী হয়েছিলো, তা হরণ করার মাধ্যমে তার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

আর এরূপই হুকুম, যদি মুহরিম অন্য মুহরিমের নিকট কিংবা হালাল ব্যক্তির নিকট শিকার বিক্রি করে। এর কারণ তা-ই, যা আমরা বলে এসেছি।

আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ইহরাম বেধেছে যে, তার বাড়ীতে কিংবা তার সংগের খাচায় কোন শিকার আটক রয়েছে, তার জন্য উক্ত শিকার ছেড়ে দেয়া জরুরী নয়।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তা ছেড়ে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। কেননা শিকারকে নিজের মালিকানায় আটকে রাখার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করছে। সুতরাং এটা হয়ে গেল, যেমন শিকার তার হাতে রয়েছে।

আমাদের দলীল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম এমন অবস্থায় ইহরাম বাধতেন যে, তাদের বাড়ীঘরে শিকার ও গৃহপালিত পশুসমূহে আটক থাকতো। আর তাদের থেকে সেগুলো ছেড়ে দেয়ার কোন ঘটনা বর্ণিত নেই। আর এই ছেড়ে না দেয়াই ব্যাপক রীতি হিসাবে চলে এসেছে। আর তা শরীআতের একটি দলীলরূপে বিবেচিত।

তাছাড়া এ কারণে যে, কর্তব্য হলো শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করা। অথচ তার পক্ষ থেকে তো কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। কেননা, শিকার তো তার হিফাজতে নেই বরং বাড়ীর এবং খাচার হিফাজতে রয়েছে। শুধু কথা এই যে, তার মালিকানায় রয়েছে। কিন্তু যদি সে খোলা প্রান্তরে ছেড়ে দেয় তবু তো সেটা তার মালিকানারই থেকে যায়, সুতরাং মালিকানায় থাকার বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

কারো কারো মতে খাচা যদি তার হাতে থাকে তাহলে ছেড়ে দেয়া তার কর্তব্য হবে, তবে এমনভাবে যাতে তা নষ্ট না হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন,কোন হালাল ব্যক্তি যদি শিকার ধরে, অতঃপর ইহরাম বাধে আর অন্য কেউ তার হাতে থেকে শিকারটি ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এটা আবূ ইমাম হানীফা (র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, ক্ষতিপুরণ হবে না। কেননা যে ছেড়ে দিয়েছে, সে 'আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার' এর পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছে। আর সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, সে ব্যক্তি শিকার ধরার মাধ্যমে এমন মালিকানা অর্জন করেছে, যা সংরক্ষণীয়। সুতরাং তার ইহরামের কারণে উক্ত মালিকানার সংরক্ষণাধিকার রহিত হবে না। আর যে ছেড়ে দিয়েছে, সে তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। সুতরাং তাকে এর ক্ষতিপুরণ দিতে হবে।

এর বিপরীত হুকুম হবে যদি ইহরাম অবস্থায় শিকারটি ধরে থাকে। কেননা সে শিকারের মালিক হয়নি। তার উপর ওয়াজিব হয় হস্তক্ষেপ করণ পরিহার করা। আর তা এরূপ হতে পারে যে, সে নিজের শিকারকে তার আবাসে ছেড়ে দিবে। সুতরাং যখন অন্য ব্যাক্তি তার মালিকানা নষ্ট করে দিলো, তখন সে সীমা লংঘনকারী হলো। এর নযীর হলো গান বাজনার উপকরণ ভেংগে ফেলা সংক্রান্ত ব্যাপারের মতবিরোধ।

কোন মুহরিম যদি শিকার ধরে আর কেউ তার হাত থেকে ছেড়ে দেয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমেই তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। কেননা এই ধরার মাধ্যমে সে শিকারের মালিক হয়নি। কারণ মুহরিমের ক্ষেত্রে শিকার মালিকানা অর্জনের বস্তু থাকে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- স্থলের প্রাণী তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা মুহরিম থাকবে। সুতরাং তা হল যেমন কেউ মদ খরিদ করল।

যদি অন্য কোন মুহরিম উক্ত মুহরিমের হাতের শিকার হত্যা করে ফেলে তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের উপর জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা যে শিকার ধরেছে, সে নিরাপত্তা বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করেছে। আর হত্যাকারী এর স্থায়িত্ব দান করেছে। আর ক্ষতিপূরণ প্রয়োগ হওয়ার ব্যাপারে স্থায়িত্ব দান করা

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রথম অপরাধে সমতুল্য যেমন স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে তালাক প্রদানের সাক্ষীগণ জামীন হয়, যখন তারা সাক্ষী প্রত্যাহার করে নেয়।

আর শিকার যে ধরেছে, সে হত্যাকারীদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসূল করে নিবে। ইমাম যুফার(র.) বলেন, ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কেননা শিকার পাকড়াওকারী তার কর্মের কারণে নিজেই অপরাধী। সুতরাং সে অন্যের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে না।

আমাদের দলীল এই যে, শিকার পাকড়াও করা ক্ষতিপূরণের কারণরূপে সাব্যস্ত হবে, যখন তার সংগে 'বিনষ্টি' যুক্ত হয়। তাই হত্যাকারী হত্যা করার মাধ্যমে পাকড়াওকারীর কর্মটিকে কারণএ পরিণত করেছে। অতএব সে কারণের কারণ সম্পাদনকারীর সমপর্যায়ের হলো। সুতরাং ক্ষতিপূরণ বিষয়টি তার প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে।

যদি হরমের ঘাস বা মালিকানা বিহীন বৃক্ষ কেটে ফেলে, অর্থাত যে বৃক্ষ সাধারণতঃ মানুষ ফলায় না, তাহলে তার উপর উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে। তবে এগুলো শুকিয়ে গেলে (মুল্য প্রদান) ওয়াজিব হবে না। কেননা উল্লেখিত ঘাস ও বৃক্ষের কর্তন হারাম হওয়া সাব্যস্ত হচ্ছে 'হরম' এর কারণে।

রাসূলূল্লাহ্(সা.) বলেছেন- হরমের ঘাস উপড়ানো যাবে না এবং (কাটা ওয়ালা গাছ) ও কাটা যাবে না।

উক্ত মূল্যের ক্ষেত্রে রোযার কোন ভূমিকা নেই। কেননা ঘাস কর্তনের হুরমত 'হরম' এর মর্যাদার কারণে, ইহরামের কারণে নয়। সুতরাং এ হলো স্থান হিসাবে ক্ষতিপুরণ, যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

আর তার মূল্য দরিদ্রদের মাঝে সাদাকা করবে।

আর যখন তা আদায় করবে, তখন সে উক্ত ঘাস বা বৃক্ষের মালিক হয়ে যাবে,যেমন হক্কুল ইবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

অবশ্য কর্তনের পর তা বিক্রি করা মাকরূহ। কেননা শরীআতের নিষিদ্ধ উপায়ে তার মালিক হয়েছে। এখন যদি তাকে বিক্রির অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে

http://islaminonesite.wordpress.com/

মানুষ এ ধরনের বিষয়টি কাজে উৎসাহিত হয়ে পড়বে। তবে মাকরূহ হলেও এ বিক্রী বৈধ হবে। শিকারের বিষয়টি এর বিপরীত। উভয়ের মাঝে পার্থক্য আমরা সামনে বর্ণনা করবো।

আর মানুষ স্বাভাবিকভাবে যা রোপন করে থাকে, তা নিরাপত্তা লাভের অধিকারী নয়। এর উপর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত । আর এ জন্য যে, নিষিদ্ধ হলো ঐ সমস্ত বৃক্ষ, যা হরম এর সাথে সম্পৃক্ত। আর পূর্ণরূপে সম্পৃক্তি সাব্যস্ত হবে, রোপনের মাধ্যমে অন্যের দিকে সম্পৃক্তি সাব্যস্ত না করা। যেগুলো সাধারণতঃ রোপন করা হয় না, সেগুলো যদি কোন মানুষ রোপন করে তাহলে তা ও ঐ সকল উদ্ভিদের সংগে যুক্ত, যেগুলো সাধারণতঃ রোপন করা হয়।

(সাধারণতঃ রোপন করা হয় না এমনি উদ্ভিদ) যদি কারো মালিকানাধীন জমিতে নিজে নিজেই অংকুরিত হয়, তাহলে কর্তনকারীর উপর তারও মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে, হরমের সম্মান রক্ষার্থে শরীআতের হক হিসাবে।

আরেকটি মূল্য ওয়াজিব হবে, মালিকের ক্ষতিপূরণ হিসাবে। যেমন হরম এর মালিকানাধীন শিকার হত্যা করলে হয়ে থাকে।

হরমের যে বৃক্ষ শুকিয়ে গেছে, তাতে কোন ক্ষতিপূরণ নেই। কেননা তা বর্ধনশীল নয়। 'হরম' এর ঘাসে পশু চরানো যাবে না, আর ইযখির নামক উদ্ভিদ ব্যতীত কোন কিছু কাটাও যাবে না।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) বলেন, ঘাসে পশু চরানোতে আপত্তি নেই। কেননা এর প্রয়োজন রয়েছে। এবং তা থেকে পশুদেরকে বিরত রাখা দুষ্কর।

আমাদের দলীল হলো ইতোপূর্বে আমাদের বর্ণিত হাদীছ। আর পশুর দাতে কাটা কাস্তে দিয়ে কাটার সমতুল্য। আর 'হিল' (হরমের বাহির এলাকা) থেকে ঘাস বহন করে অন্যান্য করে আনা সম্ভব। সুতরাং হরমের ঘাসে পশু চরানোর প্রয়োজন নেই।

ইযখির নামক ঘাসের হুকুম ভিন্ন। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) নিষিদ্ধ ঘাস থেকে এটি বহির্ভূত করেছেন। সুতরাং তা কর্তন করা এবং তাতে পশু চরানো জাইয। 'ছত্রাক' এর ভিন্ন। কেননা মূলতঃ এটা উদ্ভিদভূক্ত নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কিরান হজ্জকারী যদি এমন কোন অপরাধ করে বসে, যে সম্পর্কে আমরা বলে এসেছি যে, এতে হজ্জে ইফরাদকারীর উপর একটি দম ওয়াজিব হবে, সেক্ষেত্রে তার উপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। একটি হলো হজ্জের কারণে দম আর একটি হলো উমরার কারণে দম।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, একটা দম ওয়াজিব হবে। এ কারণে যে, তার মতে কিরানকারী একটি ইহরাম দ্বারা মুহরিম। পক্ষান্তরে আমাদের মতে সে দু'টি ইহরাম দ্বারা মুহরিম। (কিরান অধ্যায়ে) এ সম্পর্কিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইমাম কুদুরী(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন।

(আমাদের দলীল এই যে,) মীকাতের সময় কর্তব্য ছিলো (হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য) একটি ইহরাম বাধা। আর একটি ওয়াজিব বিলম্বিত করার কারণে একটি মাত্র 'জাযাই' ওয়াজিব হতে পারে।

দুই মুহরিম যদি একটি শিকার হত্যায় শরীক হয়, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের উপর পূর্ণ জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা হত্যা কর্মে শরীক হওয়ার মাধ্যমে উভয়ের প্রত্যেকে এমন একটি অপরাধকারী হলো, যা শিকার দেখিয়ে দেয়ার অপরাধের চেয়ে গুরুতর, সুতরাং অপরাধ একাধিক হওয়ার কারণে 'জাযা' ও একাধিক হবে।

পক্ষান্তরে দুই হালাল ব্যক্তি যদি হরমের কোন শিকার হত্যা করার কাজে শরীফ হয়, তাহলে উভয়ের উপর একটি জাযা ওয়াজিব হবে। কেননা আলোচ্য ক্ষতিপূরণটি হলো স্থানের স্থলবর্তী, অপরাধের শাস্তি নয়। সুতরাং (হত্যার) স্থান এক হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণও এক হবে। যেমন লোক ভুলক্রমে একজন লোককে হত্যা করলো। এ অবস্থায় উভয়েরে উপর একটি দিয়্যত ওয়াজিব হয়ে থাকে। কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় উভয়ের প্রত্যেকের উপর আলাদাভাবে।

মুহরিম যদি শিকার বিক্রি করে কিংবা খরিদ করে, তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা জীবিত অবস্থায় মুহরিমের বিক্রি করার অর্থ হলো নিরাপত্তা নষ্ট করার মাধ্যমে শিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা। পক্ষান্তরে হত্যা করার পর বিক্রি করার অর্থ হলো মুদা বিক্রি করা।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি হরম অঞ্চল থেকে হরিনী ধরে নিয়ে গেল আর তা কয়েকটি বাচ্চা প্রসব করলো, অতঃপর হরিণীটি তার বাচ্চাগুলোসহ মারা গেল, তখন সব ক'টির মূল্য তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা হরম থেকে বের করার পরও শরীআতের দৃষ্টিতে উক্ত শিকার ওয়াজিব। আর এটি একটি শরীআত অনুমোদিত গুণ। সুতরাং শিকারের বাচ্চার মাঝেও তা সম্প্রসারিত হবে।

যদি উক্ত শিকারের জাযা আদায় করার পর বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে বাচ্চার জাযা আদায করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা জাযা আদায় করার পর তা আর নিরাপদ থাকে না। কেননা স্থলবর্তী পৌছে যাওয়া(অর্থাত্ মূল্য দরিদ্রদের নিকট পৌছে যাওয়া) মূল শিকার পৌছে যাওয়ার সমতূল্য।

সঠিক বিষয় আল্লাহই অধিক অবগত।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা

কুফার অধিবাসী কোন লোক যদি বনু 'আমির এর উদ্যানে প্রবেশ করে এবং উমরার ইহরামে বাধে অতঃপর 'যাতে ইরক' এ ফিরে গিয়ে তালবিয়া পড়ে, তাহলে (ইহরাম ছাড়া) মীকাত অতিক্রম করার দম রহিত হয়ে যাবে। আর যদি ফিরে আসে কিন্তু তালবিয়া না পড়ে এবং মক্কায় প্রবেশ করে উমরার তাওয়াফ করে ফেলে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এ হল ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত।

সাহেবাইন বলেন, যদি ইহরাম অবস্থায় (মীকাতে) ফিরে আসে, তাহলে তালবিয়া পাঠ করুক কিংবা তালবিয়া পাঠ না করুক, তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার(র.) বলেন, তালবিয়া পাঠ করুক কিংবা না করুক দম রহিত হবে না। কেননা ফিরে আসার কারণে মীকাত থেকে ইহরাম না করার অপরাধ রহিত হবে

http://islaminonesite.wordpress.com/

না। এটা (সূর্যাস্তের পূর্বে) আরাফা থেকে বের হয়ে সূর্যাস্তের পর আবার ফিরে আসার ন্যায় হলো।

আমাদের দলীল এই যে, সে তো ছেড়ে দেওয়া আমলটি যথাসময়ে পূরণ করে নিয়েছে। আর যথা সময় হলো, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং দম রহিত হয়ে যাবে।

আরাফা থেকে বের হয়ে আসার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা ছেড়ে দেওয়া আমলটি পূরণ করা হয়নি। যেমন পূর্বে (জিনায়ত অধ্যায়ে) বলা হয়েছে। তবে সাহেবাইনের মতে ক্ষতিপূরণ হলো মুহরিম অবস্থায় ফিরে আসা। কেননা এভাবে সে মীকাতের হক প্রকাশ করেছে, যেমন, যদি সে ইহরাম বেধে নীরব অবস্থায় মীকাত অতিক্রম করে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে (ক্ষতিপূরণ হবে) ইহরাম অবস্থায় তালবিয়া পাঠসহ ফিরে আসার মাধ্যমে। কেননা ইহরামের ক্ষেত্রে আযীমাত হলো আপন বাড়ি থেকে ইহরাম বাধা। যখন সে মীকাত পর্যন্ত ইহরামকে বিলম্বিত করার মাধ্যমে রখছাত গ্রহণ করলো, তখন তার অবশ্য কর্তব্য হবে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে মীকাতের হক আদায় করা। আর ক্ষতিপূরণ হলো তালবিয়া পাঠ অবস্থায় ফিরে আসার মাধ্যমে।

মীকাত অতিক্রম করার পরে উমরার পরিবর্তে যদি হজ্জের ইহরাম বেধে থাকে তাহলে উপরোল্লিখিত সকল ক্ষেত্রেই একই রকম মতভিন্নতা রয়েছে।

আর যদি মীকাতের দিকে ফিরে আসে তাওয়াফ শুরু ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার পর, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর থেকে দম রহিত হবে না।

যদি ইহরাম বাধার পূর্বে ঐ (মীকাতে) ফিরে আসে, তাহলে সকলের মতেই দম রহিত হয়ে যাবে। এই যে বিধান আমরা উল্লেখ করলাম, তা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন সে হজ্জ উমরার নিয়্যত করে থাকে।

যদি নিজস্ব প্রয়োজনে বনু 'আমিরের উদ্যানে (অর্থাৎ মীকাতের অভ্যন্তরে) প্রবেশ করে থাকে, তাহলে (উক্ত এলাকায় বাসকারীর ন্যায় সেও) ইহরাম ছাড়া মক্কায়

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রবেশ করতে পারবে এবং তার মীকাত হবে উক্ত উদ্যান। অর্থাত্ সে এবং উক্ত স্থানের অধিবাসী সমপর্যায়ের হবে। কেননা উক্ত উদ্যানে (অর্থাত্ মীকাতের অভ্যন্তরস্থ এলাকা) এর তাযীম ওয়াজিব নয়। সুতরাং উক্ত এলাকার উদ্দেশ্য আগমনের কারণে তার উপর ইহরাম ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে উক্ত এলাকার উদ্দেশ্য আগমনের কারণে তার উপর ইহরাম ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করে ফেললো, তখন উক্ত এলাকার অধিবাসীদের মতই হয়ে গেলো। আর যেহেতু স্থানীয় ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনের জন্য ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশের অনুমতি রয়েছে, সেহেতু তার জন্যও অনুমতি থাকবে।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর বক্তব্য 'তার মীকাত হলো উদ্যান' এর অর্থ হলো মীকাত ও হরমের মধ্যবর্তী সকল হালাল অঞ্চল। ইতোপূর্বে এ আলোচনা এসে গেছে। সুতরাং যে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করবে এবং স্থানীয়দের সংগে যুক্ত হয়ে যাবে, তার মীকাত হবে এটি।

এরা উভয়ে যদি হালাল অঞ্চল থেকে ইহরাম বাধে এবং আরাফায় উকুফ করে নেয়, তাহলে তাদের উপর কোন দম আসবে না।

'উভয়' দ্বারা উক্ত উদ্যান এলাকার বাসিন্দা এবং সেখানে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বুঝান হয়েছে। কেননা,তারা উভয়েই তাদের মীকাত থেকেই ইহরাম বেধেছে।

যে ব্যক্তি ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করলো অতঃপর সেই বছরেই মীকাতের উদ্দেশ্যে বের হলো এবং হজ্জের ইহরাম বাধল, তার এই ইহরামের (ইতোপূর্বে) বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশের (প্রতিকার রূপে) যথেষ্ট হবে।

ইমাম যুফার(র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। এই কিয়াসের দাবী। নযর বা মান্নাতের কারণে ওয়াজিব হওয়া হজ্জের উপর কিয়াস করে এটা বলা হয়েছে। সুতরাং এটা পরবর্তী বছরের হজ্জ করার মতো হলো।

আমাদের দলীল এই যে, সে যথা সময়ে ছেড়ে দেয়া আমলটি আদায় করে নিয়েছে। কেননা তার অবশ্য কর্তব্য ছিলো ইহরামের মধ্যমে পবিত্র ভূমির প্রতি তাযীম প্রকাশ করা(আর সে তা করেছে) যেমন শুরুতেই যদি ফজর হজ্জের ইহরাম বেধে আসতো।

http://islaminonesite.wordpress.com/

বছরান্তে হজ্জ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা তার যিম্মায় অনাদায়ী রূপে রয়ে গেছে। সুতরাং উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে কৃত স্বতন্ত্র ইহরাম ছাড়া তা আদায় হবে না। যেমন মান্নাতের কারণে ওয়াজিব হওয়া ই'তিকাফের বিষয়টি। কেননা উক্ত ই'তিকাফ বর্তমান বছরের রমাযানের রোযার সংগে তো আদায় হতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় বছরের রোযার সংগে হবে না। (বরং আলাদা রোযার মাধ্যমে ই'তিকাফ আদায় করতে হবে)।

যে ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম করার পর উমরার ইহরাম বাধল আবার (স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে) তা নষ্ট করে দিলো, সে উক্ত উমরা সম্পন্ন করবে এবং পরে কাযা করবে। কেননা ইহরামটি অবশ্য পালনীয় রূপে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা হজ্জ নষ্ট করার মতোই হলো।

তবে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার কারণে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না।

ইমাম যুফার(র.) এর মতামতের উপর কিয়াসের আলোকে দম রহিত হবে না। এটা বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমের পর হজ্জ ফউত হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতভিন্নতার সমতুল্য এবং বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার পর হজ্জের ইহরাম বেধে হজ্জ নষ্ট করে দেয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতভিন্নতার সমতূল্য।

ইমাম যুফার(র.) এই মীকাত অতিক্রমকে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের সাথে তুলনা করেন।

আমাদের দলীল এই যে, কাযা করার সময় মীকাত থেকে ইহরাম বাধার মাধ্যমে সে ইহরামের হক আদায় করে দিয়েছে। কেননা কাযার মাধ্যমে তো সে ফউত হওয়া আমলটিরই অনরূপ আদায় করেছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজতো কাযা করার কারণে অস্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে না। সুতরাং উভয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেলো।

মক্কী যদি হজ্জের উদ্দেশ্যে 'হিল' এর দিকে বের হয় এবং ইহরাম বাধে আর মক্কায় ফিরে না এসে আরাফায় উকুফ বা অবস্থান করে নেয়, তাহলে তার উপর একটি

http://islaminonesite.wordpress.com/

বকরী ওয়াজিব হবে। কেননা তার মীকাত হলো হরম। আর সে তা বীনা ইহরামে অতিক্রম করেছে।

যদি সে হরমে ফিরে আসে তাহলে বহিরাগত সম্পর্কে যে মতপার্থক্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, এখানেও সেই মতপার্থক্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, এখানেও সেই মতপার্থক্য বিদ্যমান থাকবে। তালবিয়া পাঠ করুক কিংবা না করুক।

তামাত্তুকারী যদি তার উমরা থেকে ফারেগ হওয়ার পর হরম থেকে বের হয় এবং ইহরাম বেধে আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। সে যখন মক্কায় প্রবেশ করে উমরার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করলো, তখন সে মক্কীর সমপর্যায়ের হয়ে গেলো। আর মক্কীর ইহরাম হরম থেকে হয়ে থাকে। এর কারণ (ইতোপূর্বে মীকাত পরিচ্ছেদে) আমরা উল্লেখ করেছি। সুতরাং ইহরামকে হরম থেকে বাইরে করার কারণ দম ওয়াজিব হবে।

যদি সে আরাফায় উকুফ করার পূর্বে হরমে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে ইহরাম বাধে,ে তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। বহিরাগতের ক্ষেত্রে পূর্বে যে মতপার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা এখানেও বিদ্যমান রয়েছে।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

ইহরামের সম্পর্ক সম্বন্ধে

ইমাম আবূ হানীফা(র.) বলেন, মক্কী যদি উমরার ইহরাম বাধে এবং এক চক্কর তাওয়াফ করে ফেলে অতঃপর হজ্জের ইহরাম বাধে, তাহলে সে হজ্জ বর্জন করবে এবং তা বর্জন করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর তার উপর একটি হজ্জ ও একটি উমরা ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, উমরা বর্জন করা আমাদের মতে অধিক পসন্দনীয়। পরে উমরা কাযা করে নেবে এবং তা বর্জন করার কারনে তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা দু'টির একটি বর্জন করা তো অনিবার্য।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা মক্কীর ক্ষেত্রে হজ্জ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরীআত সম্মত নয়। এমতাবস্থায় উমরা বর্জন করাই উত্তম। কারণ এটা মর্যাদার দিক থেকে নিম্নতর এবং ক্রিয়াকর্মের দিক থেকেও অপেক্ষাকৃত স্বল্প আর কাযা করার ব্যাপারেও সহজতর। কেননা তা নির্ধারিত সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়।

একই বিধান হবে যদি প্রথমে উমরার এবং পরে হজ্জের ইহরাম বাধে কিন্তু উমরার কোন ক্রিয়াকর্ম শুরু না করে। এর দলীল এই যে, যা আমরা এইমাত্র বলেছি।

যদি উমরার চার চক্কর তাওয়াফ করে ফেলে অতঃপর হজ্জের ইহরাম বাধে, তাহলে কোন দ্বিমত নেই যে, সে বর্জন করবে। কেননা অধিকাংশের জন্য সমগ্রের হুকুম রয়েছে। সুতরাং তা বর্জন করা কঠিন। যেমন, সে যদি উমরা থেকে পূর্ণ ফারেগ হয়ে যায়।

একই হুকুম হবে যদি উমরার জন্য এর চেয়ে কম চক্কর তাওয়াফ করে থাকে। এটি ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, কিছু আমল আদায় করার মাধ্যমে উমরার ইহরাম জোরদার হয়ে গেছে, পক্ষান্তরে হজ্জের ইহরাম জোরদার হয়নি। আর যা জোরদার নয়, তা বর্জন করা সহজ। তাছাড়া এই অবস্থায় উমরা বর্জন করার অর্থ হলো আমল নষ্ট করা। পক্ষান্তরে হজ্জ বর্জন করার অর্থ হলো হজ্জ থেকে বিরত থাকা।

অবশ্যই যেটাই বর্জন করবে সেটা বর্জন করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা পরবর্তী ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে সময়ের পূর্বেই সে হালাল হয়ে গেছে। সুতরাং সে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সম-পর্যায়ের হলো। তবে উমরা বর্জন করার ক্ষেত্রে শুধু উমরার কাযা করতে হবে। পক্ষান্তরে হজ্জ বর্জন করার ক্ষেত্রে হজ্জ কাযা করতে হবে এবং তদুপরি একটি উমরা আদায় করতে হবে। কেননা সে হজ্জ ফউতকারীর সমপর্যায়ে হয়েছে।

যদি সে হজ্জ-উমরা উভয়টি পালন করে যায়, তবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা উভয় আমল যেভাবে সে নিজের জন্য নির্ধারণ করেছে, সেভাবেই আদায়

http://islaminonesite.wordpress.com/

করেছে। যদিও উভয়টি এক সঙ্গে আদায় করা(শরীআতের পক্ষ থেকে) নিষেধকৃত। আর আমাদের মূলনীতি জানা রয়েছে যে, নিষেধ কর্মের অস্তিত্ব রোধ করে না।

তবে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা সে হজ্জ ও উমরা একত্রিত করেছে। আর নিষিদ্ধ কাজ করার কারণে তার আমলের মধ্যে ত্রুটি এসে গেছে। মক্কীর ক্ষেত্রে এটা হলো ক্ষতিপূরণের দম। পক্ষান্তরে বহিরাগতদের ক্ষেতে এটা হলো শোকরানার দম।

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাধল, অতঃপর দশ তারিখে আরেকটি হজ্জের ইহরাম বাধল, সে যদি প্রথম হজ্জের হলক করে ফেলে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় হজ্জও তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে। তবে তার উপর কোন দম আসবে না। যদি প্রথম হজ্জের হলক না করে থাকে তাহলেও দ্বিতীয় হজ্জটি তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে, (দ্বিতীয় ইহরামের পর) তার উপর দম ওয়াজিব হবে-চুল ছাটুক কিংবা না ছাটুক।

এটা ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, যদি চুল না ছাটে তাহলে তার উপর কোন দম ওয়াজিব হবে না। কেননা হজ্জের দুই ইহরাম একত্র করা কিংবা উমরার দুই ইহরাম একত্র করা বিদআত। সুতরাং যখন হলক করবে তখন সেই 'হলক' যদিও প্রথম ইহরামের জন্য একটি আমল, কিন্তু দ্বিতীয় ইহরামের জন্য তা অপরাধ। কেননা (দ্বিতীয় ইহরামের প্রেক্ষিতে) তা অসময়ে হয়েছে। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর যদি আগামী বছর হজ্জ করার পূর্বে হলক না করে, তাহলে প্রথম ইহরামের ক্ষেত্রে হলক কে সে যথা সময় থেকে বিলম্বিত করলো। আর ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে বিলম্ব দম ওয়াজিব করে। সাহেবাইনের মতে তার উপর কোন দম আসে না। যেমন ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করে এসেছি। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা(র.) চুল ছাটা না ছাটা উভয় অবস্থাকে অভিন্ন সাব্যস্ত করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবাইন (দম ওয়াজিব হওয়ার জন্য) চুল ছাটার শর্ত আরোপ করেছেন।

যে ব্যক্তি চুল ছাটা ছাড়া উমরার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম থেকে ফারেগ হয়ে গেছে অতঃপর অন্য উমরার ইহরাম বেধেছে, তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কারণ

http://islaminonesite.wordpress.com/

হলো সময়ের পূর্বে ইহরাম বাধার কারণে। কেননা সে উমরার দুই ইহরামকে একত্র করেছে, আর তা মাকরূহ। সুতরাং তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর এটা হলো ক্ষতিপূরণ ও কাফ্ফারার দম।

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাধার পর উমরার ইহরাম বাধলো, তার উপর দু'টোই আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা বহিরাগতদের জন্য হজ্জ ও উমরা উভয়কে একত্র করা শরীআতে বৈধ। আর মাসাআলাটি বহিরাগতদের সম্পর্কেই। সুতরাং এর মাধ্যমে সে কিরান হজ্জকারী হলো। তবে সুন্নাতের বিপরীত করার কারণে গুনাহগার হবে।

যদি সে উমরার আমলগুলো না করে আরাফায় উকুফ করে ফেলে, তাহলে সে উমরা বর্জনকারী হলো। কারণ তার জন্য তা আদায় করা সম্ভব নয়। কেননা তা হজ্জের উপর ভিত্তিকৃত হচ্ছে, যা শরীআতের অনুমোদিত নয়।

তবে যদি সে আরাফা অভিমূখে রওয়ানা হয়, তাহলে উকুফ করার পূর্ব পর্যন্ত সে উমরা বর্জনকারী হবে না। ইতোপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি।

যদি সে হজ্জের জন্য তাওয়াফ করে, অতঃপর উমরার জন্য ইহরাম বাধে এবং উভয়টির ক্রিয়াকর্ম চালিয়ে যায়, তাহলে দু'টোই তার উপর ওয়াজিব হবে। এবং উভয়কে একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা, আগেই বলে আসা হয়েছে যে, উভয়কে একত্র করা বৈধ। সুতরাং উভয়ের ইহরাম বাধাও শুদ্ধ হবে।

উল্লেখিত তাওয়াফ দ্বারা তাওয়াফ তাহিয়্যা উদ্দেশ্য। আর তা সুন্নাত। রুকন নয়। এমন কি তা তরক করলে কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে কোন রুকন আদায় করেনি তখন কি তা তরক করলে কিছু ওয়াজিব হবে না। আর যখন সে কোন রুকন সম্পাদন করা সম্ভব। এ কারণেই যদি সে উভয়টি সম্পাদন করতে থাকে বিশুদ্ধ মতে এটি কাফ্ফারা সম্পাদন করা সম্ভব। এ কারণেই যদি সে উভয়টি সম্পাদন করতে থাকে তাহলেও জাইয হবে। তবে উভয়টি একত্র করার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। আর বিশুদ্ধ মতে এটি কাফ্ফারা ও

http://islaminonesite.wordpress.com/

ক্ষতিপূরণের দম। কেননা একদিক থেকে সে উমরার কার্যসমূহকে হজ্জের কার্যসমূহের উপর ভিত্তি করেছে।

তবে তার জন্য উমরা ছেড়ে দেওয়া মুস্তাহাব। কেননা হজ্জের ইহরাম হজ্জের একটি আমল আদায় করার কারণে জোরদার হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি হজ্জের তাওয়াফ না করে থাকে তাহলে হুকুম বিপরীত হবে।

আর যখন উমরা ছাড়ার কারণে তার উপর দম ওয়াজিব হবে যে ব্যক্তি ইয়াওমুন-নহরে কিংবা আইয়ামে তাশরীকে উমরার ইহরাম বাধলে, ঐ উমরা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। (ইতোপূর্বে এর) কারণ আমরা বলে এসেছি।

তবে তা বর্জন করবে। অর্থাত্ বর্জন করা জরুরী হবে ।কেননা সে হজ্জের রুকন আদায় করে ফেলেছে। সুতরাং সর্ব দিক থেকেই সে হজ্জের কার্যসমূহের উপর উমরার কার্যসমূহের ভিত্তিকারী হয়ে যাবে। তাছাড়া এই দিনগুলোতে উমরা মাকরূহ। আমরা এটি বর্ণনা করবো। এ কারণেই উক্ত উমরা বর্জন করা তার উপর জাইয।

যদি সে উমরা বর্জন করে তাহলে বর্জন করার কারণে একটি দম ওয়াজিব হবে এবং তদস্থলে একটি উমরা করা ওয়াজিব হবে। এর কারণ আমরা আগেই বর্ণনা করে এসেছি।

অবশ্য যদি সে উমরার কাজ চালিয়ে তাহলে তা যথেষ্ট হবে। কেননা, উমরার হাকীকতের বাইরের কারণে কারাহাত এসেছে। আর তা এই যে, এই দিনগুলোতে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনে ব্যস্ত থাকবে। সুতরাং হজ্জের তাযীম রক্ষার জন্য সময়টাকে হজ্জের জন্য মুক্ত রাখা ওয়াজিব।

আর অবশ্য তার উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। উভয়কে একত্র করার কারণে ইহরামের মধ্যে কিংবা পরবর্তী কর্মসমূহের মধ্যে।

মাশায়েখগণ বলেছেন যে, এটিও কাফ্ফারার দম।

মাবসূতে যা বলা হয়েছে, বাহ্যতঃ সে আলোকে কেউ কেউ বলেছেন যে, যদি হজ্জের হলকের পর ইহরাম বাধে, তাহলে উমরা বর্জন করবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, এই দিনগুলোতে উমরা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা পরিহার করার জন্য তা বর্জন করবে। ফকীহ্ আবূ জাফর (র.) বলেছেন, আমাদের মাশায়েখগণ এ মতই পোষণ করেন।

যদি তার হজ্জ ফউত হয়ে যায়, অতঃপর সে উমরা বা হজ্জের ইহরাম বাধে তাহলে সে তা বর্জন করবে। কেননা যার হজ্জ ফউত হয় সে উমরার মাধ্যমে হালাল হয়। কিন্তু তার ইহরাম উমরার ইহরামে পরিবর্তিত হয় না। হজ্জ ফউত হওয়া অধ্যায়ে এ আলোচনা আসবে ইনশাল্লাহ্। সুতরাং সে কার্যসমূহের ক্ষেত্রে দুই উমরা একত্রকারী হয়ে যাবে। তাই তার কর্তব্য হলো দ্বিতীয়টি বর্জন করা-যেমন যদি দুই উমরার জন্য ইহরাম বাধে।

আর যদি হজ্জের ইহরাম বেধে থাকে তাহলে সে ইহরামের দিক থেকে দুই হজ্জ একত্রকারী হলো। সুতরাং দ্বিতীয়টি বর্জন করা তার ওয়াজিব হবে। যেমন দুই হজ্জের ইহরাম বাধলে একটি তাকে বর্জন করত হবে। তবে তা শুরু করা বৈধ হওয়ার কারণে কাযা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। আবার সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার কারণে তা বর্জন করায় দম ওয়াজিব হবে।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

অবরুদ্ধ হওয়া

মুহরিম যদি শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, কিংবা অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার কারণে হজ্জের কাজ পরিচালনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার জন্য ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাওয়া জাইয।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়া ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। কেননা হাদী প্রেরণের মাধ্যমে হালাল হওয়ার বিধান অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য অনুমোদনের

http://islaminonesite.wordpress.com/

উদ্দেশ্য হলো রেহাই লাভ করা। আর হালাল হওয়ার মাধ্যমে শত্রু থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে, অসুস্থতা থেকে নয়।

আমাদের দলীল এই, ভাষাবিদের সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সংক্রান্ত আয়াতে শামিল হয়েছে অসুস্থতার কারণে অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে। কেননা তারা বলেন শব্দটি অসুস্থতার এবং শব্দটি দুশমন কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সময়ের পূর্বে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্য হলো ইহরাম প্রলম্বিত হওয়ার কারণে উদ্ভুত কষ্ট দূর করা। আর অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্যের সাথে ইহরাম আকড়ে ধরার কষ্ট তা থেকে বেশী।

যখন হালাল হয়ে যাওয়া তার জন্য জাইয হলো, তখন তাকে বলা হবে, একটি বকরী পাঠিয়ে দাও, যা হরমে যবাহ করা হবে এবং যাকে দিয়ে পাঠাবে তার নিকট থেকে একটি নির্ধারিত দিনে তা যবাহ করার ওয়াদা গ্রহণ করো। এরপর তুমি হালাল হবে।

হরমে পাঠানোর কারণ এই যে, এর দম হলো ইবাদত। আর বর্ণিত হয়েছে যে, নির্ধারিত স্থান বা সময় ছাড়া রক্ত প্রবাহিত করা ইবাদত রুপে বিবেচিত নয়। সুতরাং হরম ছাড়া এটা ইবাদত হবে না এবং তা দ্বারা হালাল হওয়া যাবে না। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এদিকেই ইশারা করেছেন- হাদী তার নির্ধারিত স্থানে পৌছা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা মুড়াবে না।

বস্তুতঃ হাদী ঐ পশূকেই বলা হয়, যাকে হরম-এ প্রেরণ করা হয়। ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, হরমের সাথে আবদ্ধ হবে না। কেননা আবদ্ধ করা সহজ-সাধ্যতাকে রহিত করে। আমাদের দলীল এই যে, মূল সহজ-সাধ্যতার বিষয়িটই বিবেচনা করা হয়েছে, চূড়ান্ত সহজ-সাধ্যতার বিষয়টি নয়।

(হাদী হিসাবে) বকরীই জাইয হবে। কেননা আয়াতে হাদীর কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর সর্বনিম্ন হাদী হলো বকরী। তবে কুরবানীর মতো এখানেও গরু বা উট যথেষ্ট হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

আমাদের উল্লেখিত বক্তব্যের উদ্দেশ্য অবশ্য বকরী পশুটিই পাঠানো নয়। কেননা তা কখনো কষ্টকরও হতে পারে। বরং সে মূল্য পাঠিয়ে দিতে পারে, যাতে সেখানে বকরী খরিদ করে তার পক্ষ থেকে যবাহ্ করা হয়।

ইমাম কুদূরী(র.) এর বক্তব্য ‘অতঃপর হালাল হয়ে যাবে’ এদিকে ইংগিত করে যে, হলক বা চুল ছাটা তার জন্য জরুরী নয়। এ হল ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও মুহাম্মদ(র.)এর মত। ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) বলেন, তার উচিত হবে হলক করা বা চুল ছাটা। আর যদি তা না করে তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) হুদায়বিয়ার বছর সেখানে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় হলক করেছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে হলকের আদেশ দিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর দলীল এই যে, হলক ইবাদত রূপে বিবেচিত হয়, যদি তা হজ্জের ক্রিয়াকর্মের পরে সম্পন্ন হয়। সুতরাং তার আগে ইবাদত রূপে গণ্য হবে না ।

আর নবী করিম(সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম তা করে ছিলেন, যাতে ফিরে য্াওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, অবরূদ্ধ ব্যক্তি যদি কিরানকারী হয়, তাহলে দু'টির দম প্রেরণ করবে। কেননা তার দু'টি ইহরাম থেকে হালাল হওয়া প্রয়োজন।

যদি হজ্জ থেকে হালাল হওয়ার জন্য একটি হাদী প্রেরণ করে আর উমরার ইহরাম বহাল রাখে, তাহলে কোন ইহরাম থেকেই হালাল হবে না। কেননা একই সাথে উভয় ইহরাম থেকে হালাল হওয়া শরীআত অনুমোদন করেছে।

এর দম হরম ছাড়া অন্য কোথাও যবাহ করা জাইয নয়। তবে ইয়াওমুন-নহরের পূর্বে যবাহ করা জাইয রয়েছে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, হজ্জের অবস্থায় অবরূদ্ধ ব্যক্তির জন্য ইয়াওমুন-নহর ছাড়া অন্য সময় যবাহ করা জাইয নয়। পক্ষান্তরে উমরার অবস্থায় অবরূদ্ধ ব্যক্তি যখন ইচ্ছা যবাহ করতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

হজ্জ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে এ বিধান দেওয়া হয়েছে তামাত্তু ও কিরানের হাদীর-এর উপর কিয়াস করে।

সাহেবাইন অবরুদ্ধ ব্যক্তির যবাহ্কে সম্ভবতঃ হলক এর উপর কিয়াস করেছেন। কেননা উভয়ের প্রত্যেকটি ইহরাম থেকে হালালকারী।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) বলেন, এ হলো কাফ্ফারার দম। এজন্যই তা থেকে খাওয়া জাইয নেই। সুতরাং এটা স্থানের সাথে বিশিষ্ট হবে, কিন্তু কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ হবে না, যেমন অন্যান্য কাফ্ফারার দম।

তামাত্তু ও কিরানের দম এর বিপরীত।কেননা সেটা হলো ইবাদতের দম। (কাফ্ফারার দম নয়)। হলকের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেটা যথাসময়ে হচ্ছে। কারণ হজ্জের প্রধান কাজ উকুফ হলকের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, হজ্জ অবস্থায় অবরূদ্ধ ব্যক্তি যদি হালাল হয়ে যায়, তাহলে তাকে (পরবর্তীতে) একটি হজ্জ ও একটি উমরা করতে হবে।

ইবন আব্বাস(রা.) ও ইবনে উমর(রা.) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এ হেতু যে, হজ্জ কাযা করা তো ওয়াজিব হবে এই কারণে যে, তা শুরু করা সহীহ ছিলো। আর উমরা এই কারণে যে, সে হলো হজ্জ ফউতকারী ব্যক্তির সমপর্যায়ের।

উমরা অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির উপর পরে উমরা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

আমাদের মতে উমরার ক্ষেত্রেও অবরোধ সাব্যস্ত হয়।

ইমাম মালিক (র.) বলেন, সাব্যস্ত হবে না। কেননা, উমরা তো নির্ধারিত কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়।

আমাদের দলীল এই যে, নবী(সা.) ও সাহাবায়ে কিরাম উমরা অবস্থায় হুদায়বিয়ায় অবরুদ্ধ হয়েছিলেন।

তাছাড়া অসুবিধা দূর করার জন্যই হালাল হওয়া অনুমোদন করা হয়েছে। আর এটা উমরার ইহরামেও বিদ্যমান রয়েছে। আর যখন অবরোধ সাব্যস্ত হয়েছে, তখন তার উপর কাযা ওয়াজিব। যেহেতু সে হালাল হয়েছে, যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কিরানকারীর উপর একটি হজ্জ ও দু'টি উমরা ওয়াজিব হবে। হজ্জ ও দু'টি উমরার একটি ওয়াজিব হওয়ার কারণ তো আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আর দ্বিতীয় উমরা ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, শুরু করা শুদ্ধ হওয়ার পর সে তা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

কিরানকারী(অবরূদ্ধ ব্যক্তি) যদি হাদী প্রেরণ করে এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট হতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে যে, একটি নির্ধারিত দিনে তারা তা যবাহ করবে, এরপর বা অবরোধ উঠে যায়। এখন যদি অবস্থা এমন হয় যে, সে হজ্জ ও হাদী গিয়ে ধরতে পারবে না, তাহলে মক্কা অভিমুখে গমন করা তার জন্য জরুরী হবে না। বরং হাদী যবাহ করে হালাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেননা মক্কা অভিমুখে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য তথা হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার সময় ফউত হয়ে গেছে।

আর যদি সে উমরার মাধ্যমে হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যে যায়, তাহলে সে তাও করতে পারে। কেননা সে তো হজ্জ ফউতকারী।

আর যদি হজ্জ ও হাদী দু'টোই পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে যাওয়া তার জন্য জরুরী হবে। কেননা স্থলবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পূর্বে অক্ষমতা দূর হয়ে গেছে।

যদি (সেখানে গিয়ে) সে হাদী পেয়ে যায়, তাহলে সেটাকে (বিক্রি করা, সাদাকা করা ইত্যাদি) যা ইচ্ছা তা করতে পারে। কেননা সে তার মালিক, আর সেটা এমন একটা উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করে ছিলো, যা থেকে সে এখন মুক্ত হয়ে গেছে।

যদি এমন হয় যে, হাদী পাবে কিন্তু হজ্জ পাবে না, তাহলে হালাল হয়ে যাবে। কেননা সে মূল বিষয় লাভে অপারগ। আর যদি হজ্জ পাওয়া সম্ভব হয়, হাদী প্‌ওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য হালাল হওয়া জাইয হবে।

এ সিদ্ধান্ত সূক্ষ কিয়াসের ভিত্তিতে। এই শেষ প্রকারটি হজ্জ অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তি সম্পর্কে সাহেবাইনের মত অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে না্ কেননা তাদের মতে এর দম ইয়াওমুন নহরের সময় দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং যে হজ্জ পাবে সে হাদী অবশ্যই পাবে। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতে এই প্রকারটি প্রযোজ্য হবে। আর উমরা

http://islaminonesite.wordpress.com/

অবস্থায় অবরুদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক হবে। কেননা , (উমরার ক্ষেত্রে) যবাহ করার বিষয়টি দশ তারিখের সাথে আবদ্ধ নয়।

কিয়াসের দলীল এই যে, আর এটা হলো ইমাম যুফার(র.) এর মত, সে তো স্থলবর্তী তথা হাদী দ্বারা উদ্দেশ্য লাভের পূর্বে মূল তথা হজ্জ আদায় করতে সক্ষম।

সূক্ষ কিয়াসের দলীল এই যে, যদি আমরা মক্কা অভিমুখে যাওয়াকে তার জন্য আবশ্যকীয় বলে সাব্যস্ত করি, তাহলে তার সম্পদ নষ্ট হবে। কেননা, সে যবাহ্ করার জন্য হাদী অগ্রে প্রেরণ করেছে, অথচ তার উদ্দেশ্য লাভ হচ্ছে না। আর মালের সম্মানতো জানের সম্মানের মতই।

আর তার অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে সেখানে কিংবা অন্যখানে অবস্থান করবে, যাতে তার পক্ষ থেকে যবাহ্ করা হয়। আর সে হালাল হতে পারে। আর চাইলে ইহরামের মাধ্যমে যে ইবাদত আদায়ের বাধ্যবাধকতা সে গ্রহণ করেছে তা আদায় করার জন্য মক্কায় যেতে পারে। আর এটাই উত্তম। কেননা এটা কৃত ওয়াদা পূর্ণ করার অধিক নিকটবর্তী।

যে ব্যক্তি আরাফায় উকূফ করার পর অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো, সে অবরুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে না। কেননা হজ্জ ফউত হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছে এবং তাকে তাওয়াফ ও উকূফ হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি মক্কায় অবরুদ্ধ হয়েছে এবং তাকে তাওয়াফ ও উকূফ থেকে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে, সে অবরুদ্ধ বলেই অবরুদ্ধ হওয়ার মতই হলো। যদি তাওয়াফ ও উকূফ এ দু'টির যে কোন একটি করতে সক্ষম হয়, তাহলে সে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে না।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, হজ্জ ফউতকারী ব্যক্তি তাওয়াফ দ্বারাই হালাল হয়ে থাকে। আর হালাল হওয়ার জন্য দম ওয়াজিব হয় তাওয়াফের স্থলবর্তী হিসাবে। উকূফের ক্ষেত্রে কারণ আমরা আগে বর্ণনা করেছি(অর্থাত্ আরাফার উকুফ করার পর সাব্যস্ত হয় না।

তাওয়াফের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, হজ্জ ফউতকারী ব্যক্তি তাওয়াফ দ্বারাই হালাল হয়ে থাকে। আর হালাল হওয়ার জন্য দম ওয়াজিব হয় তাওয়াফের স্থলবর্তী

http://islaminonesite.wordpress.com/

হিসাবে। উকূফের ক্ষেত্রে কারণ আমরা আগে বর্ণনা করেছি (আর্থাত্ আরাফায় উকুফ করার পর সাব্যস্ত হয় না।

কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ(র.) এর মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আমি যে বিশদ বিবরণ তোমাকে অবহিত করেছি, তা-ই শুদ্ধ।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

হজ্জ ফউত হওয়া

যে ব্যক্তি হজ্জের ইহরাম বাধল, কিন্তু আরাফার উকুফ ফউত হয়ে গেলো, এমনকি দশ তারিখের ফজর উদিত হয়ে গেলো, তাহলে তার হজ্জ ফউত হয়ে গিয়েছে। কেননা আমরা উল্লেখ করেছি যে, উকুফের সময় দশ তারিখের ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত।

আর তার কর্তব্য্ তাওয়াফ ও সাঈ করে হালাল হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর হজ্জ কাযা করবে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি রাত্রেও আরাফার উকুফ ফউত করলো তার হজ্জ ফউত হয়ে গেলো। সুতরাং সে যেন উমরার মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়। আর তার উপর পরবর্তী বছর হজ্জ (কাযা) করা ওয়াজিব। আর উমরা তো তাওয়াফ ও সাঈ ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া ইহরাম বিশুদ্ধরূপে সংঘটিত হওয়ার পর দুই ইবাদতের (হজ্জ ও উমরার) যে কোন একটি আদায় করা ছাড়া উক্ত ইহরাম থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। যেমন অনির্ধারিত ইহরামের ক্ষেত্রে। তবে এখানে যেহেতু হজ্জ করতে সে অক্ষম হয়ে গেছে, সেহেতু তার জন্য উমরা নির্ধারিত হয়ে গেছে। আর তার উপর দম ওয়াজিব হবে না। কেননা উমরার ক্রিয়াকর্ম দ্বারাই হালাল হওয়া সম্পন্ন

http://islaminonesite.wordpress.com/

হয়েছে। সুতরাং হজ্জ ফউতকারীর ক্ষেত্রে উক্ত উমরা অবরুদ্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যবাহ্ এর পর্যায়ে গণ্য। তাই উভয়টিকে একত্র করা হবে না।

উমরা কখনো ফউত হয় না। পাচটি দিন ছাড়া সারা বছর তা জাইয রয়েছে। ঐ পাচদিন উমরা করা মাকরূহ। দিনগুলো হলো আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং আইয়ামে তাশরীক। কেননা ‘আ্ইশা(রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই পাচদিন তিনি উমরা মাকরূহ বলতেন। তাছাড়া এগুলো হলো হজ্জের দিন। সুতরাং সেগুলো হজ্জের জন্য নির্ধারিত থাকবে।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আরাফার দিন যাওয়ালের (সূর্য হেলে পড়ার) পূর্বে উমরা মাকরূহ হবে না। কেননা হজ্জের রুকন (অর্থাত্ আরাফার উকুফ) আরম্ভ হয় যাওয়ালে পরে, পূর্বে নয়। তবে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তাই হলো প্রকাশ্য মাযহাব।

অবশ্য মাকরূহ হওয়া সত্ত্বেও যদি এই দিনগুলোতে উমরা আদায় করে, তাহলে শুদ্ধ হবে। এবং ঐ দিনগুলোতে সে উমরার কারণে মুহরিম থাকবে। কেননা মাকরূহ হওয়ার কারণ উমরা বহির্ভূত কারণে রয়েছে। আর তা হলো হজ্জের বিষয়টির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং হজ্জের সময়কে হজ্জের জন্য খালেস করে রাখা। সুতরাং উমরা শুরু করা শুদ্ধ হবে।

উমরা হলো সুন্নাত (মুআক্কাদাহ)

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন,তা ফরয। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- হজ্জের ফরযের মতো উমরাও একটি ফরয।

আমাদের প্রমাণ হলো রাসূলুল্লাহ্(সা.) এর বাণী- হজ্জ হলো ফরয এবং উমরা হলো নফল।

তাছাড়া উমরা কোন সময়ের সাথে আবদ্ধ নয়। তদুপরি তা উমরা ব্যতীত অন্য (যেমন, হজ্জের) নিয়্যত দ্বারাও আদায় হয়। যেমন হজ্জ ফউতকারীর ক্ষেত্রে। আর এটা হলো নফলের আলামত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম শাফিই(র.)যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার ব্যাখ্যা এই যে, উমরা হজ্জের ন্যয় কতিপয় আমলের মাঝে নির্ধারিত। কেননা পরস্পর বিপরীথ হাদীছ দ্বারা ফরয ছাবিত হয় না।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, উমরা হলো তাওয়াফ ও সাঈ। তামাত্তু অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা করেছি। আল্লাহ্ সঠিক বিষয় অধিক অবগত।

নবম অনুচ্ছেদ

অপরের পক্ষে হজ্জ করা

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, মানুষ নিজের আমলের সাওয়াব অন্যের জন্য নির্ধারণ করতে পারে। চাই তা সালাত হোক, রোযা হোক, সাদাকা হোক বা অন্য আমল হোক। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী(সা.) সাদা কালো মিশ্রিত রং এর দু'টি মেষ কুরবানী করেছেন। একটি নিজের পক্ষ থেকে আর দ্বিতীয়টি তার উম্মতের পক্ষ থেকে- যারা আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে এবং তিনি যে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌছিয়েছেন তার সাক্ষ্য দেয়। এখানে তিনি দু'টি বকরীর একটিকে আপন উম্মতের জন্য নির্ধারিত করেছেন।

আর ইবাদত কয়েক প্রকার: ১) কেবলমাত্র আর্থিক, যেমন যাকাত; ২) কেবল দৈহিক, যেমন সালাত; ৩) উভয়টি জড়িত, যেমন, হজ্জ। প্রথম প্রকার ইবাদতের ক্ষেত্রে আদায় করার সার্মথ্য থাকা ও অক্ষমতা উভয় অবস্থায় স্থলবর্তীতা প্রয়োগ হয়। কেননা স্থলভিত্তিক কার্যা দ্বারাই উদ্দেশ অর্জিত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের কোন অবস্থাতেই স্থলবর্তিতা কার্যকর হয় না। কেননা নফসের সাধনা যা এ ইবাদতের উদ্দেশ্য, তা স্থলাভিষিক্ত দ্বারা অর্জিত হয় না।

তৃতীয় প্রকারে অক্ষমতার অবস্থায় স্থলবর্তিতা কার্যকর হয়। কেননা এতে দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাত্ মাল খরচের মাধ্যমে কষ্ট লাভের বিষয়টি অর্জিত হয়। কিন্তু সক্ষমতার অবস্থায় তা কার্যকর হবে না। কেননা এতে সাধনা অর্জিত হয় না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

হজ্জের ক্ষেত্রে স্থলবর্তিতা জাইয হওয়ার জন্য মৃত্যুর সময় পর্যন্ত স্থায়ী অক্ষমতা শর্ত। কেননা হজ্জ হলো সারা জীবনের ফরয। পক্ষান্তরে নফল হজ্জের ক্ষেত্রে সক্ষম অবস্থায়ও স্থলবর্তিতা জাইয রয়েছে। কেননা সফরের বিষয়ে অধিকতর গোঞ্জায়েশ আছে।

হানাফী মাযহাবের প্রকাশিত মতে যার পক্ষ থেকে হজ্জ করা হচ্ছে, তার পক্ষ থেকেই হজ্জটি সংঘটিত হবে। আলোচ্য বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহ একথারই সাক্ষ্য দেয়। যেমন খাছআম গোত্রের জনৈকা স্ত্রী লোক সম্পর্কিত হাদীছ। রাসূলুল্লাহ্(সা.) তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো এবং উমরা করো।

মুহাম্মদ(র.) থেকে একটি বর্ণনা অবশ্য আছে যে, যে হজ্জ করবে, তারই পক্ষে সংঘটিত হবে। তবে আদেশদাতা খরচের সাওয়াব পাবে। কেননা হজ্জ হলো একটি দৈহিক ইবাদত। আর অক্ষমতার ক্ষেত্রে অর্থব্যয়কে হজ্জের স্থলবর্তী করা হয়, যেমন, রোযার ক্ষেত্রে ফিদ্‌ইয়া।

কুদূরীর লেখক বলেন, যাকে দু'জন মানুষ আদেশ করলো যেন সে তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি হজ্জ পালন করে। আর সে তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম বাধল । তবে এ হজ্জটি হজ্জকারীর পক্ষ থেকেই গন্য হবে। তার তাকে খরচের ক্ষতিপুরণ দিতে হবে। কেননা, আদেশদাতার পক্ষ থেকেই হজ্জ সংঘটিত হয়। এ কারণেই হজ্জকারী ইসলামের ফরয হজ্জ থেকে মুক্ত হতে পারে না। আর এখানে উভয়ের প্রত্যেকে তাকে আদেশ করেছে, যেন সে হজ্জটিকে অন্য কারো শরিকানা ছাড়া তার একার জন্য আদায় করে। অথচ অগ্রাধিকার কোন সম্ভাবনা না থাকার কারণে হজ্জকে দু'জনের কোন একজনের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়।

সুতরাং আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই তা সংঘটিত হবে। আর তার পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়ার পরে দু'জনের কোন একজনের মাঝে নির্ধারণ করার সম্ভাবনা নেই।

পক্ষান্তরে যদি নিজের আম্মা-আব্বার পক্ষ থেকে হজ্জ করে,তবে তার হুকুম ভিন্ন। সেক্ষেত্রে হজ্জটিকে সে দু'জনের যে কোন একজনের নির্ধারণ করতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা, সে তো নিজের আমলের সাওয়াব দু'জনের একজনের জন্য কিংবা উভয়ের জন্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় দানকারী হচ্ছে, সুতরাং হজ্জটি তার সাওয়াবের সবব বা কারণ রূপে সম্পন্ন হওয়ার পর তার ইখতিয়ার অন্তর্ভূক্ত থাকবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তো সে আদেশদাতার আদেশের ভিত্তিতে আমলটি করছে। অথচ উভয়ের আদেশকেই সে লংঘন করেছে। সুতরাং আমলটি তার নিজের পক্ষ থেকে হবে। যদি সে তাদের প্রদত্ত অর্থ ব্যয় করে থাকে, তাহলে সে খরচের ক্ষতিপুরণ করবে। কেননা সে আদেশদাতার খরচের টাকা নিজের হজ্জে খরচ করেছে।

আর যদি ইহরামকে সে অনির্ধারিত রেখে থাকে, অর্থাত্ অনির্ধারিতভাবে দু'জনের একজনের নিয়্যত করে থাকে এবং এভাবেই হজ্জ করে যায়, তাহলে সে (আদেশ দাতার) কথা অমান্য করলো। অগ্রাধিকার না থাকার কারণে। পক্ষান্তরে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করার পূর্বে যদি একজনকে নির্ধারণ করে নেয় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর নিকট একই হুকুম হবে।

আর এই হলো কিয়াস। কেননা সি নির্ধারণ করার জন্য আদিষ্ট ছিল। আর অনির্ধারিত রাখা মানে সে আদেশের বিরূদ্ধাচরণ করা। সুতরাং তা নিজের পক্ষ থেকে হবে। পক্ষান্তরে হজ্জ বা উমরা নির্ধারণ না করার বিষয়টি ভিন্ন। এক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা মতো নির্ধারণ করার ইখতিয়ার তার রয়েছে। কেননা প্রথম সুরতে হজ্জের দায়িত্ব গ্রহণকারী অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরতে ইহরামের হকদার অজ্ঞাত।

সূক্ষ কিয়াসের যুক্তি কেননা সে নির্ধারণ করার আদিষ্ট ছিল। আর অণির্ধারিত রাখা মানে সে আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা। সুতরাং তা নিজের পক্ষ থেকে হবে। পক্ষান্তরে হজ্জ বা উমরা নির্ধারণ না করার বিষয়টি ভিন্ন। এক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা মতো নির্ধারণ করার ইখতিয়ার তার রয়েছে। কেননা প্রথম সুরতে হজ্জের দায়িত্ব গ্রহণকারী অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সুরতে ইহরামরের হকদার অজ্ঞাত।

সূক্ষ কিয়াসের যুক্তি এই যে, আমলের মাধ্যম বা উপায় রূপে ইহরাম শরীআত অনুযায়ী প্রবর্তিত হয়েছে। নিজস্ব সত্তায় মাকসুদ ও উদ্দেশ্য রূপে নয়। আর অস্পষ্ট

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইহরাম পরবর্তীতে নির্ধারনের মাধ্যমে উপায় বা ওসীলা রূপে গণ্য হতে পারে। সুতরাং শর্ত রূপে তা যথেষ্ট হবে ।

পক্ষান্তরে স্বয়ং ক্রিয়াকর্মগুলোই যদি অনির্ধারিতভাবে আদায় করে তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা যা আদায় করা হয়ে গেছে, সেটাকে নির্ধারণ করার উপায় নেই। সুতরাং সে আদেশদাতার বিরুদ্ধাচারণকারী হলো।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, যদি কেউ কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে কিরান করার আদেশ করে, তাহলে ইহরামকারীর উপর দম ওয়াজিব হবে। কেননা এটা তো ওয়াজিব হয়েছে আল্লাহ্ পাক দু'টি আমল একত্র করার যে তাওফীক দান করেছেন। তার শোকর হিসাবে। আর এই নিয়ামত তো আদিষ্ট ব্যক্তির আপন সত্তার সংগে বিশিষ্ট। কেননা প্রকৃত কাজ তো তার পক্ষ থেকেই হচ্ছে।

আলোচ্য মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মদ(র.) থেকে এ মর্মে বর্ণিত মতামতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে যে, হজ্জ তো আসলে আদিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকেই সংঘটিত হয়।

তদ্রুপ যদি কেউ তাকে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করার আদেশ করে আর অন্য একজন তাকে তার পক্ষ থেকে উমরা করার আদেশ করে, এবং উভয়ে তাকে কিরানের অনুমতি প্রদান করে, তবে দম তারই উপর ওয়াজিব হবে। এর কারণ যা আমরা বলে এসেছি। বাধগ্রস্ত হওয়ার দম আদেশদাতার উপর ওয়াজিব হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও মুহাম্মদ(র.) এর মত। আর ইমাম আবূ ইউসূফ (র.) বলেন, হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব। কেননা এটা ইহরাম প্রলম্বিত হওয়ার কষ্ট দূর করার জন্য হালাল হওয়ার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। আর এ্ই কষ্টের সম্পর্ক তারই সাথে। সুতরাং দম তারই উপরই ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও মুহাম্মদ(র.) এর দলীল এই যে, আদেশদাতাই তাকে এক যিম্মাদারিতে ঢুকিয়েছে। সুতরাং তারই কর্তব্য হবে তাকে মুক্ত করা।

যদি কোন মাইয়েতের পক্ষ থেকে হজ্জ করে থাকে আর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা(র.) ও মুহাম্মদ(র.) এর মাইয়েতের মাল থেকে দম ওয়াজিব হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, মাইয়েতের মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ওয়াজিব হবে। কেননা এটি দান। যেমন যাকাত ইত্যাদি।

আরো কারো কারো মতে, সমগ্র মাল থেকে দম ওয়াজিব হবে। কেননা তা আদেশদাতার জন্য হক হিসাবে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তা ঋণ পর্যায়ের।

স্ত্রী সহবাস জনিত দম হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এটি অপরাধের দম। আর সে স্বেচ্ছায় অপরাধী হয়েছে।

এবং খরচের ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে। অর্থাত্ যদি উকুফের পূর্বে সহবাস করে থাকে। যে কারণে হজ্জ ফাসিদ হয়ে যায়। কেননা তাকে শুদ্ধ হজ্জ আদায় করার আদেশই করা হয়েছে। হজ্জ ফউত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। তখন হজ্জকারীকে খরচের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা সে তা স্বেচ্ছায় ফউত করেনি।

আর যদি উকুফের পর সহবাস করে, তাহলে তার হজ্জ ফাসিদ হবে না এবং খরচের ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। কেননা আদেশদাতার উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে গেছে। আর আদিষ্ট ব্যক্তির নিজের মাল থেকেই তার উপর দম ওয়াজিব হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। তদ্রূপ কাফ্ফারার যাবতীয় দমও হজ্জকারীর উপর ওয়াজিব হবে। এর কারণও যা আমরা বলে এসেছি।

আর যদি কেউ ওসীয়ত করে যায় যে, তার পক্ষ থেকে যেন হজ্জ করান হয়। পরে ওয়ারিছগণ তার পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি দ্বারা হজ্জের জন্য পাঠাল। যখন সে কূফায় উপনীত হওয়ার পর সে মারা গেল কিংবা খরচের অর্থ চুরি হয়ে গেলো অথচ ইতোমধ্যে সে অর্ধেক অর্থ ব্যয় করে ফেলেছে, তাহলে মাইয়েতের পক্ষ থেকে তার বাড়ী থেকে হজ্জ করানো হবে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে।

এ হল ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মত। সাহেবাইন বলেন, যেখানে প্রথম ব্যক্তি মারা গেছে, সেখান থেকে হজ্জ করাতে হবে। তাহলে এখানে বিবেচ্য বিষয় হলো দু'টি : পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বিবেচনা করা এবং হজ্জের স্থান বিবেচনা করা।

http://islaminonesite.wordpress.com/

প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে ‘মতনে’ যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ(র.) এর মতে যে মাল তাকে দেয়া হয়েছিল তার কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই অবশিষ্ট মাল দ্বারা তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো হবে। অন্যথায় ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। তিনি একথা বলেন, ওসীয়তকারীর নিজের নির্ধারণ করার উপর কিয়াস করে। কেননা তত্ত্বাবধানকারীর নির্ধারণ করা তার নিজের নির্ধারণ করার মতই।

ইমাম আবূ ইউসূফ(র.) এর মতে প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে যা অবশিষ্ট আছে তা থেকেই তার পক্ষ হতে হজ্জ করান হবে। কেননা ঐ তৃতীয়াংশই হলো ওসীয়ত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্র।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর দলীল এই যে, তত্ত্বাবধায়কের মাল বন্টন করা এবং মাল পৃথক করা তখনই সহীহ হবে, যখন সে মাল ঐভাবে অর্পন করবে, যেভাবে ওসীয়তকারী নির্ধারণ করেছে। কেননা মাল কবজা করার জন্য তার কোন দাবীদার নেই। আর এখানে (ওসীয়তকারীর নির্ধারিত সুরতে) সম্পদ অর্পন করা পাওয়া যায়নি। তাই এটি হজ্জের খরচ আলাদা করার পূর্বে মারা যাওয়ার মত হলো। সুতরাং অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ থেকে হজ্জ করানো হবে।

দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর মতামতের দলীল এই যে, আর কিয়াসের দাবীও তাই সফরের যে পরিমাণ অংশ অস্তিত্ব লাভ করেছিল, তা দুনিয়ার কার্যকর বিধানের দিক থেকে বাতিল হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- ইব্ন আদম যখন মারা যায়, তখন তার আমল নিঃশেষ হয়ে যায় তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া।

আর ওসীয়তের কার্যকারিতা হলো দুনিয়ার আহকামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ওসীয়তকারীর বাড়ী থেকেই ওসীয়ত কারীর বাড়ী থেকেই ওসীয়ত বহাল থাকবে এবং ধরে নেয়া হবে যেন সফরে বের হওয়ার অস্তিত্বই ঘটেনি।

সাহেবাইনের দলীল হল, আর সূক্ষ এই কিয়াসের দাবী যে তার সফর বাতিল হয়নি। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেন-

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পথে বের হয় অতঃপর সে মারা যায়, তার আজর(ও সাওয়াব) আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে।

রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি হজ্জের পথে মারা যায়,তার জন্য প্রতি বছর একটি হজ্জে মাবরূর লেখা হবে।

যখন তার সফর বাতিল হলো না তখন সেই স্থান থেকেই তার ওসীয়ত বিবেচনা করা হবে। মূল মতপার্থক্য হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নিজেই হজ্জ করতে রওয়ানা হয়েছে (আর পথে মারা গেছে। এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করানো ওসীয়ত করেছে। এর উপর ভিত্তি হবে হজ্জ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি (যে পথে মারা গেল)। ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার পক্ষ থেকে হজ্জের ইহরাম বাধল, তার জন্য দু'জনের যে কোন একজনের জন্য হজ্জটি নির্ধারণ করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া হজ্জ করানো, সে মূলতঃ নিজের হজ্জের দাওয়াত তাকে প্রদান করল। আর তা সম্ভব হতে পারে হজ্জ আদায় হওয়ার পর। সুতরাং হজ্জ আদায়ের পূর্বে তার নিয়্যত মূল্যহীন হলো। আর হজ্জ আদায়ের পর তার সাওয়ার দু'জনের যে কোন একজনের জন্য নির্ধারণ করা বৈধ হবে।

হজ্জ করার জন্য আদিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। ইতোপূর্বে উভয়ের মাঝে পার্থক্য আমরা বর্ণনা করে এসেছি। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

দশম অনুচ্ছেদ

হাদী সম্পর্কে

সর্বনিম্ন হলো হাদী হলো বকরী। কেননা নবী(সা.) কে হাদী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, তার সর্বনিম্ন হলো বকরী।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, হাদী তিন প্রকার: উট, গরু ও বকরী। কেননা নবী(সা.) যখন বকরীকে সর্বনিম্ন সাব্যস্ত করেছেন, তখন তার উচ্চ পর্যায় পরিমাণ থাকাও জরুরী। আর তা হলো গরু ও উট।

আর এ কারণে যে, হাদী হল ঐ প্রাণী, যা হাদিয়া স্বরূপ হরম শরীফের দিকে প্রেরণ করা হয়, যাতে তথায় যবাহ্‌র মাধ্যমে তাকারুব হাসিল করা যায়। আর এই অর্থের দিক দিয়ে তিনটিই সমান।

কুরবানীতে যা যবাহ্ করা জাইয, তাই হাদী রূপেও জাইয। কেননা এটা এমন এক ইবাদত, যার সম্পর্কে হলো রক্ত প্রবাহিত করার সাথে যেমন কুরবানীর বিষয়। সুতরাং একই রকম পশুর সংগে উভয়টি সম্পৃক্ত থাকবে।

হজ্জের সকল ব্যাপারে বকরীই যথেষ্ট। কেবল দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত। (এক) যে ব্যক্তি জানাবাতের অবস্থায় তাওয়াফকে যিয়ারত করলো এবং (দুই) যে ব্যক্তি উকুফের পরে স্ত্রী সহবাস করলো।

এদু'টি ক্ষেত্রে বাদানাহ (উট বা গরু) ছাড়া জাইয হবে না। এর কারন পিছনে (জিনায়াত অধ্যায়ে) আমরা বলে এসেছি।

নফল তামাত্তু ও কিরামের হাদীর গোশত খাওয়া জাইয। কেননা এটা ইবাদত রূপে যবাহ্কৃত পশু। সুতরাং কুরবানীর ন্যায় এগুলোর গোশত খাওয়া জাইয। আর সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী(সা.) তার হাদীর গোশত আহার করেছেন এবং তার শুরুয়াও পান করেছেন।

আর হাজীদের জন্য হাদীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। এর দলীল আমাদের পূর্ব বর্ণিত হাদীছ। তদ্রুপ কুরবনীতে যেভাবে বলা হয়েছে, সেইভাবে হাদীর গোশত সাদাকা করা মুস্তাহাব।

অন্যান্য হাদীর গোশত খাওয়া জাইয নেই। কেননা সেগুলো হলো কাফ্‌ফারার দম। আর সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী(সা.) যখন হুদায়বিয়ার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং হযরত নাজিয়া আল-আসলামী(রা.) এর হাতে হাদী প্রেরণ

http://islaminonesite.wordpress.com/

করেছিলেন, তখন তাকে বলে দিয়েছিলেন, তুমি এবং তোমার সাথীরা তা থেকে কিছু খাবে না।

নফল তামাত্তু ও কিয়াসের হাদী ইয়াওমুন নহর ছাড়া যবাহ্ করা জাইয নয়।

লেখক বলেন, মাবসূত কিতাবে রয়েছে যে, নফল হাদী ইয়াওমুন নহরের পূর্বে যবাহ্ করা জাইয, তবে ইয়াওমুন নহরে যবাহ্ করা উত্তম।

আর এ-ই সহীহ মত। কেননা নফলরূপে যবাহ্ করার ক্ষেত্রে ইবাদত হলো এই হিসাবে যে, সেগুলো হাদী। আর তা সাব্যস্ত হয়ে যায় হরমে পৌছনোর মাধ্যমে।

আর তা যখন পাওয়া গেলো তখন ইয়াওমুন নহরের বাইরেও যবাহ্ করা জাইয হবে। তবে কুরবনীর দিনগুলোতেই উত্তম। কেননা ঐ দিনগুলোতে যবাহ্ করার মাধ্যমে ইবাদতের গুণ অধিক প্রবল।

তামাত্তু ও কিরানের দমের ক্ষেত্রে কারণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- অনন্তর তোমরা তা থেকে আহার কর। এবং দুস্থ-দরিদ্রদের আহার করাও। অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে।

আর অপরিচ্ছন্নতা দূর করার বিষয়টি ইয়াওমুন নহরের সংগে সম্পৃক্ত। তাছাড়া এটা হলো ইবাদতের দম। সুতরাং তা ইয়াওমুন- নহরের সাথে খাস হবে। যেমন, কুরবানী।

অন্যান্য হাদী যে কোন সময় ইচ্ছা যবাহ্ করা জাইয।

ইমাম শাফিঈ(র.) তামাত্তু ও কিরানের দমের উপর কিয়াস করে বলেন, ইয়াওমুন- নহর ছাড়া যবাহ্ করা জাইয নয়। কেননা তার মতে প্রতিটিই হলো ক্ষতিপূরণের দম।

আমাদের দলীল এই এই যে, এগুলো হলো কাফ্ফারার দম। সুতরাং ইয়াওমুন- নহরের সাথে তা বিশিষ্ট থাকবে না। কেননা এগুলো যখন ক্ষতি পূরনের জন্য ওয়াজিব হয়েছে, তখন অবিলম্বে তা দ্বারা ত্রুটি দূর করার জন্য তাড়াতাড়ি করাই উত্তম হবে। তামাত্তু ও কিরানের দম এর বিপরীত। কেননা, এ হলো ইবাদতের দম।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, হরম ছাড়া অন্যত্র হাদী যবাহ্ করা জাইয হবে না। কেননা শিকারের ক্ষতিপুরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- এমন হাদী-যা কা'বায় উপনীত হবে।

সুতরাং কাফ্ফারা জাতীয় প্রতিটি দমের ক্ষেত্রেও এটা মূলনীতি হয়ে গেলো। তাছাড়া (আভিধানিক ভাবে) হাদী বলাই হয় এমন পশুকে, যা কোন স্থানে হাদিয়া স্বরূপ পাঠান হয়। আর তার স্থান হলো হরম।

রাসূলুল্লাহ্(সা.) বলেছেন- সমগ্র মীনা হলো যবাহ্স্থল এবং মক্কার সমগ্র পথ হলো যবাহ্র স্থল।

হাদীর গোশত হরম এবং অন্যান্য স্থানের মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করা জাইয।

ইমাম শাফিঈ(র.) ভিন্নমত পোষণ করেন। (আমাদের দলীল এই যে,) কেননা সাদাকা হলো একটি বোধগম্য ইবাদত। আর যে কোন দরিদ্রকে সাদাকা করাই ইবাদত।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, হাদীসমূহকে আরাফায় ফিরে নিয়ে যাওয়া (যা চিহ্নিত করা) জরুরী নয়। কেননা হাদী শব্দটি বিশেষ স্থানে নিচে গিয়ে সেখানে যবাহ্ করার মাধ্যমে সাওয়াব অর্জনের অর্থ নির্দেশ করে, আরাফায় নিয়ে যাওয়া বা চিহ্নিত করার অর্থ জ্ঞাপন করে না। সুতরাং তা ওয়াজিব হবে না।

আর যদি তামাত্তুর হাদী আরাফায় গিয়ে যায়, তবে তা উত্তম। কেননা তা যবাহ্ করা 'ইয়াওমুন নহর' এর সাথে নির্দিষ্ট। আর হয়ত সম্ভবতঃ সে তা রাখার জন্য কাউকে নাও পেতে পারে, তখন সংগে করে আরাফায় নিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

তাছাড়া এটা হলো ইবাদতের দম। সুতরাং এর ভিত্তি হবে ঘোষণার উপর। কাফ্ফারার দম হলো এর বিপরীত। কেননা এগুলো ইয়াওমুন নহরের পূর্বে যবেহ করা জাইয রয়েছে। যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। এবার অপরাধই হলো তা (ওয়াজিব হওয়ার) কারণ। সুতরাং তা গোপন রাখাই সমীচীন।

ইমাম কুদুরী(র.) বলেন, উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু ও বকরীর ক্ষেত্রে যবাহ্ই উত্তম। কেননা আল্লাহ্ তা্'আলা বলেছেন- তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য সালাত

http://islaminonesite.wordpress.com/

আদায় কর এবং নহর কর। এখানে নহরের ব্যাখ্যায় উট বলা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র বলেছেন- আর তোমরা গরু যবাহ্ করবে।

আর আল্লাহ্ তা'আলা (বকরী সম্পর্কে) বলেছেন- আর আমরা তার পরিবর্তে ফিদ্ইয়া রূপে এক মহান যবিহা দান করেছি। আর 'যিবহ' বলা হয় ঐ পশুকে, যা যবাহ্র জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আর সহীহ্ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) উটকে নহর করেছেন এবং গরু ও বকরী যবাহ্ করেছেন।

হাদীসমূহের ক্ষেত্রে যদি সে ইচ্ছা করে তবে উটকে দাড়ানো অবস্থায় নহর করতে পারে, কিংবা তাকে বসিয়ে নহর করতে পারে। সে যা-ই করবে, তাই ভাল। তবে উত্তম হলো, দাড়ানো অবস্থায় নহর করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) দাড়ানো অবস্থায় রেখে হাদীসমূহকে নহর করেছেন। আর সাহাবা কিরামও সামনের বা পা বেধে দাড়ানো অবস্থায় নহর করেছেন।

গরু ও বকরী দাড়ানো অবস্থায় যবাহ করবে না। কেননা পার্শ্বে শোয়ানো অবস্থায় যবাহর স্থানটি অধিক স্পষ্ট থাকে। ফলে যবাহ্ করা সহজ হয়। আর এ দু'টির ক্ষেত্রে যবাহ্ই হলো সুন্নাত।

ভালভাবে যবাহ করতে পারলে উত্তম হলো নিজেই যবাহ্ করা। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী(সা.) বিদায় হজ্জের সময় একশ' উট নিয়েছিলেন এবং ষাটের কিছু উপরে (তেষট্টিটি) নিজে নহর করেছেন। এবং অবশিষ্টগুলোর ব্যাপারে হযরত 'আলী (রা.) কে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।

তাছাড়া এটা হলো ইবাদত, আর ইবাদত নিজে আঞ্জাম দেওয়াই উত্তম। কেননা এতে অধিক বিনয় রয়েছে। তবে কোন ব্যক্তি তা ভালরূপে করতে পারে না। তাই আমরা অন্যকে দায়িত্ব প্রদান অনুমোদন করেছি।

ইমাম কুদূরী(র.) বলেন, উটের গায়ের চট ও রশি সাদাকা করে দেবে আর এগুলো দ্বারা কসাইয়ের মজুরি প্রদান করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্(সা.) আলী(রা.) কে বলেছেন- তার গায়ের চট এবং রশি সাদাকা করে দাও। আর তার এগুলো দ্বারা কশাইয়ের মজুরি দিও না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

যে ব্যক্তি উট নিয়ে যাওয়ার সময় তাতে আরোহণ করতে বাধ্য হলো, সে তাতে আরোহণ করতে পারে। যদি তাতে আরোহণ না করার উপায় থাকে, তাহলে আরোহণ করবে না। কেননা, সে এটাকে আল্লাহ্‌র জন্য একান্তভাবে নির্ধারণ করেছে। যতক্ষণ না যবাহ্‌র স্থানে পৌছে যায়। তবে শুধু এ অবস্থায় যখন সে এর উপর সাওয়াব হতে বাধ্য হয়। কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী করীম(সা.) জনৈক ব্যক্তিকে উট নিয়ে যেতে দেখে বলেছিলেন, তোমরা সর্বনাশ। এতে আরোহণ করো।

এর ব্যাখ্যা এই যে, লোকটি অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত ছিলেন।

যদি তাতে আরোহণ করে আর সে কারণে তাতে খুত সৃষ্টি হয়, তাহলে তার যে পরিমাণ খুত সৃষ্টি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি তার দুধ থাকে তাহলে তা দোহন করবে না। কেননা দুধ তা থেকেই জন্মায়। সুতরাং তা নিজের কাজে লাগাবে না। বরং তার ওলানে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে, যাতে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ হুকুম হলো যবাহ্‌র সময় নিকটবর্তী হলে। পক্ষান্তরে যদি যবাহ্‌র সময় বিলম্বিত হয়, তাহলে দোহন করবে এবং দুধ খরচ করে ফেলে, তাহলে অনুরূপ পরিমাণ দুধ বা তার মূল্য সাদাকা করে দেবে। কেননা তার যিম্মায় ক্ষতিপূরণ রয়েছে।

হাদী নিয়ে যাওয়ার সময় যদি তা পথে হালাক হয়ে যায় আর তা নফল হাদী হয় তাহলে তার উপর অন্য হাদী ওয়াজিব হবে না। কেননা ইবাদতের সম্পর্ক হয়েছিলো এই জন্তু বিশেষের সংগে, আর তা ফউত হয়ে গিয়েছে।

যদি সে হাদী ওয়াজিব হিসাবে হয়ে থাকে তাহলে তার স্থলে অন্য একটি আদায় করা ওয়াজিব। কেননা ওয়াজিব তার যিম্মায় রয়ে গেছে।

যদি তাতে বড় ধরনের দোষ দেখা দেয়। তাহলে তার স্থলে অন্য একটি আদায় করতে হয়। কেননা বড় ধরনের দো্ষযুক্ত হলে তা দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয় না। সুতরাং অন্য একটি দ্বারা আদায় করা জরুরী। আর দোষযুক্ত পশুকে যা ইচ্ছা তাই করবে। কেননা এটা এখন তার অন্যান্য সম্পদের সংগে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com/

পথে যদি উট মুমুর্ষ হয়ে পড়ে, তবে নফল হলে নহর করবে আর তার (কালাদার) জুতা তার রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে দেবে। আর উহা দ্বারা তার কুজের পাশে ছাপ মেরে দেবে। সে কিংবা অন্য কোন মালদার তার গোশত খাবে না।

নজিয়া আসলামী(রা.) কে রাসূলুল্লাহ্(সা.) এরূপ করতে আদেশ করেছিলেন। মতনে বর্ণিত শব্দটি দ্বারা তার গলায় ঝুলানো কালাদা উদ্দেশ্য । এর ফলে মানুষ জানতে পারবে যে, এটি হাদী,তখন দরিদ্র লোকেরা তা ব্যবহার করবে। আর ধনী লোকেরা করবে না। এর কারণ এই যে, এটা খাওয়ার অনুমতি যবাহ্ করার স্থানে পৌছার শর্তের সাথে যুক্ত। সুতরাং এর পূর্বে তা হালাল না হওয়াই উচিত। তবে হিংস্র প্রাণীদের ছিড়ে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়ার চেয়ে দরিদ্রদের মাঝে সাদাকা করে দেয়া উত্তম। আর তাতে এক ধরণের ইবাদত রয়েছে এবং ইবাদতই হলো উদ্দেশ্য।

যদি উক্ত বাদানাহ্ ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তার স্থলে অন্য বাদানাহ্ আদায় করবে। আর মুমুর্ষটিকে যা ইচ্ছা করতে পারে। কেননা যে কাজের জন্য সেটাকে নির্ধারণ করেছিল, সেটা সে কাজের উপযুক্ত থাকেনি। আর এতে তার মালিকানা রয়েছে অন্যান্য সম্পদের মত। নফল, তামাত্তু ও কিরানের হাদীকে ‘কালাদাহ’ পরাবে। কেননা এটা ইবাদতের দম। আর কালাদাহ (ছেড়া জুতা বা চামড়ার মালা) ঝুলিয়ে দেয়াতে প্রচার ও ঘোষণা হয়, যা ইবাদতের দমের জন্য উপযোগী।

অবরোধের ও দন্ডসমূহের দম এর হাদীকে কালাদাহ্ পরাবে না। কেননা অপরাধ হলো এক কারণ। আর অপরাধকে গোপন রাখাই সম্মত। আর অবরোধের দম হলো ক্ষতিপূরণের জন্য। সুতরাং এটাকে ক্ষতিপূরণ জাতীয় (অর্থাত্ অপরাধ জনিত) সংগে যুক্ত করা হবে।

ইমাম কুদুরী(র.) হাদী শব্দটি উল্লেখ করেছেন। মুলতঃ তার উদ্দেশ্য হলো বাদানাহ্। কেননা বকরীকে সাধারণতঃ কালাদাহ পরানো হয় না। আর আমাদের মতে বকরীকে কালাদাহ্ পরানো সুন্নাত নয়। বকরীর ক্ষেত্রে কালাদাহ পরানোর মধ্যে কোন ফায়দা নেই। যেমন, পূর্বে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

http://islaminonesite.wordpress.com/

বিবিধ মাসআলা

যদি এমন হয় যে, আরাফায় লোকেরা একদিন অবস্থান করলো। আর একদল লোক সাক্ষ্য প্রদান করলো যে, তারা আসলে কুরবানীর দিন (দশই যিলহাজ্জ) উকুফ করেছে, তাহলে তাদের এ উকুফ যথেষ্ট হবে ।

কিয়াসের দাবী এই যে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। এটাকে ইয়াওমুত্তার বিয়া(আট তারিখ) উকুফের উপর বিবেচনার প্রেক্ষিতে।

এর কারণ এই যে, উকূফ হলো এমন একটি ইবাদত, যা নির্ধারিত সময় ও স্থানের সাথে বিশিষ্ট। সুতরাং এ দু'টি বিশিষ্টতা ছাড়া 'উকূফ' ইবাদত হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, এ সাক্ষ্য নেতিবাচক বিষয়ের উপর হয়েছে এবং এমন একটি বিষয়ের উপর হয়েছে, যা বিচারের আওতাভূক্ত কোন বিষয় নয়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

তাছাড়া এ একটি ব্যাপক সমস্যা, যা পরিহার করা সম্ভব নয় এবং তার ক্ষতিপূরণ করাও সম্ভব নয়। আর পরবর্তীতে পুনরায় হজ্জ আদায় করার আদেশ দানে স্পষ্ট জটিলতা রয়েছে। সুতরাং সন্দেহজনক অবস্থায় সেটাকেই যথেষ্ট বলে সাব্যস্ত করা জরুরী।

কিন্তু ইয়ামুত্তার-বিয়া উকুফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা আরাফার দিন উকুফ করে সন্দেহ নিরাসনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব।

তাছাড়া বিলম্বিত আমল জাইয হওয়ার নযীর রয়েছে, কিন্তু অগ্রবর্তী আমল জাইয হওয়ার নযীর নেই।

ইমাম আবূ হানীফা(র.) এর অনুসারিগণ বলেছেন, শাসকের কর্তব্য হলো এ ধরণের সাক্ষ্য গ্রহন না করা, এবং ঘোষণা দিয়ে দেয়া যে, লোকদের হজ্জ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা সবাই ফিরে যাও। কেননা সাক্ষ্য গ্রহণ করায় কেবল ফিতনাই সৃষ্টি হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com/

তদ্রুপ যদি তারা আরাফা দিবসের আগের সন্ধ্যায় (অর্থাত্ ইয়ামুত্তাবিয়ায় একদিন আগে) চাদ দেখার সাক্ষ্য দেয় আর ইমামের পক্ষে অবশিষ্ট রাতে লোকদেরকে নিয়ে কিংবা তাদের অধিকাংশের নিয়ে আরাফায় উকুফ করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইমাম উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না।

ইমাম মুহাম্মদ(র.) বলেন, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন (অর্থাত্ যিলহাজ্জের এগার তারিখে) মধ্যবর্তী ও তৃতীয় জামারায় কংকর নিক্ষেপ করল, কিন্তু প্রথমটি করলো না; তাহলে প্রথমটি কাযা করার সময় যদি পরবর্তী দু'টিও করে নেয় তাহলে উত্তম হয়। কেননা এতে মাসনূন তারতীবের সুন্নতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করল। আর যদি শুধু প্রথম জামারায় কংকর নিক্ষেপ করে তাহলেও তা যথেষ্ট হবে। কেননা সে যথা সময়ে ছেড়ে দেওয়া আমলটির ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে। শুধু তারতীব তরক করেছে।

ইমাম শাফিঈ(র.) বলেন, তা যথেষ্ট হবে না। যতক্ষণ না সকল রামী পুনরায় করে। কেননা এটা তারতীবের সংগেই শরীআত কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছে। সুতরাং এটা তাওয়াফের পূর্বে সাঈ করার মতো হলো। কিংবা সাফার পরিবর্তে মারওয়া থেকে সাঈ শুরু করার মতো হলো।

আমাদের দলীল এই যে, প্রতিটি জামারাহ্ হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইবাদত। সুতরাং একটার উপর অন্যটাকে অগ্রবর্তী করার সাথে তার বৈধতা সম্পৃক্ত হবে না। সাঈ-র বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা তাওয়াফের অনুগামী। কারন তা তাওয়াফের চেয়ে নিম্নমর্যাদার। তদ্রুপ মারওয়া যে সাঈ-র শেষপ্রান্তে, এটা 'নাস' দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং এর সাথে 'প্রারম্ভ' এর সম্পর্ক হতে পারে না।

ইমাম মুহাম্মদ(র.)বলেন, যে ব্যক্তি হেটে হজ্জ করবে বলে নিজের জন্য নির্ধারণ (মান্নাত) করেছে, সে সওয়ারীতে আরোহণ করবে না, যে পর্যন্ত না তাওয়াফ যিয়ারতের শেষ করে।

মাবসূত কিতাবে অবশ্য তাকে পায়ে হাটা বা সওয়াব, যে কোন একটির ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর এখানে মতনের ভাষ্যে ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইংগিত রয়েছে। এই হলো নীতিগত হুকুম।

http://islaminonesite.wordpress.com/

কেননা সে পূর্ণবার গুণসহ নিজের উপর ইবাদত লাযেম করেছে। সুতরাং সে গুণসহ তা তার উপর লাযেম হবে। যেমন, যদি লাগাতার রোযা রাখার মান্নত করে থাকে।

আর হজ্জের কর্মসমূহ যেহেতু তাওয়াফে যিয়ারতের মাধ্যমে শেষ হয়, তাই উক্ত তাওয়ায় করা পর্যন্ত হেটে চলতে হবে।

আর কেউ বলেছেন, ইহরাম করার পর থেকে পায়ে হেটে চলা শুরু করবে। আবার কেউ বলেছেন, তার ঘর থেকে শুরু করবে। কেননা বাহ্যতঃ এটাই হলো উদ্দেশ্য।

যদি সাওয়াব হয়ে চলে, তাহলে দম নিতে হবে, কেননা সে তাতে ত্রুটি স্পষ্ট করে ফেলেছে।

মাশায়েখগণ বলেছেন, দূরত্ব যখন অধিক হয় এবং হাটা কষ্টকর হয়, তখন আরোহণ করবে। আর স্থল নিকটবর্তী হলে এবং সে ব্যক্তি হাটায় অভ্যস্ত হলে এবং তার জন্য কষ্টকর না হলে আরোহণ না করাই উচিত।

আর কোন ব্যক্তি যদি ইহরাম অবস্থায় দাসীকে বিক্রি করে, যে তাকে ইহরামের অনুমতি দিয়েছিলো, তবে ক্রেতার জন্য জাইয হবে তাকে ইহরামযুক্ত করে তার সাথে সহবাস করা।

ইমাম যুফার(র.) বলেন, ক্রেতার জন্য তা জাইয হবে না। কেননা ইহরাম এমন এক ‘আকদ’, যা তার মালিকানার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং তা সে বাতিল করতে পারে না। যেমন, কেউ যদি বিবাহিতা দাসী খরিদ করে।

আমাদের দলীল এই যে, এখানে ক্রেতা বিক্রেতার স্থলবর্তী হয়েছে। আর বিক্রেতার জন্য তাকে ইহরামমুক্ত করে নেওয়া জাইয ছিল। সুতরাং ক্রেতার জন্যও তা জাইয হবে। অবশ্য বিক্রেতার জন্য তা মাকরূহ। কেননা তাতে ওয়াদা খিলাফী রয়েছে। আর এ কারণে ক্রেতার ক্ষেত্রে নেই।

বিবাহের বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা বিক্রেতার অনুমতি ক্রমে বিবাহ হয়ে থাকলে তা বাতিল করার অধিকার তার ছিল না। সুতরাং ক্রেতারও সে অধিকার থাকবে না।

http://islaminonesite.wordpress.com/

ক্রেতার যখন তাকে ইহরাম মুক্ত করে নেয়ার অধিকার রয়েছে,তখন আমাদের মতে 'ইহরামের দোষের' কারণে তাকে ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না। আর ইমাম যুফার(র.) এর মতে সে ফেরত দিতে পারবে।

কোন কোন নুসখায় এরূপ রয়েছে: 'অথবা তার সাথে সহবাস করতে পারবে'।

প্রথম মতনের ভাষ্যে বোঝা যায় যে, সহবাস ছাড়া চুল ছাটা কিংবা নখ কর্তন করার মাধ্যমে তাকে ইহরাম মুক্ত করবে। অতঃপর সহবাস করবে।

আর দ্বিতীয় এ বারত দ্বারা বোঝা যায় যে, সহবাস দ্বারা তার ইহরাম ভংগ করাবে। কেননা সহবাসের পূর্বে স্পর্শ সাধারণতঃ হয়েই থাকে। যার দ্বারা ইহরাম ভংগ হয়ে যাবে । আর উত্তম হবে হজ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সহবাস ব্যতীত তাকে ইহ্রাম মুক্ত করা। আল্লাহ্ই অধিক অবগত।

।। প্রথম খন্ড সমাপ্ত।।

http://islaminonesite.wordpress.com/